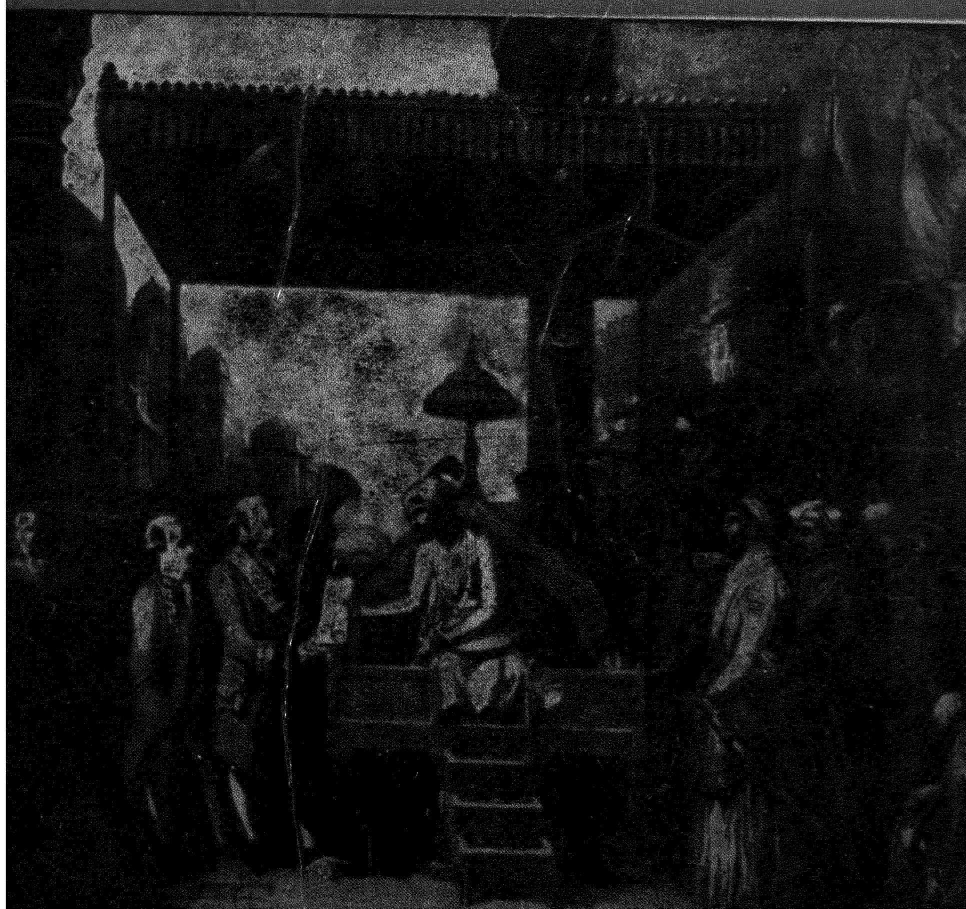
ভারতের ইতিহাসকথা

দ্বিতীয় খণ্ড

ডঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী



ভারতের ইতিহাসকথা

[দ্বিবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ]

দ্বিতীয় পত্র

[১৭০৭—১৯৫০ খ্রীঃ]

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী,

এম্. এ., এল্-এল্. বি., পি. এইচ্. ডি.

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্,

কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন হইতে পারে এরূপ আরও কিছু নূতন বিষয় সংযোজন করা হইয়াছে। যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তথাপি "ভারতীয় প্রজাতন্ত্র" সম্বন্ধে জানিবার জন্য বহু ছাত্র-ছাত্রী আগ্রহী। এইজন্য আমরা বইটিতে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত সংযোজন করিলাম। এর ফলে পাস ও অনার্স উভয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হইবে আশাকরি।

এই পুস্তক সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সকল মতামত সাদরে গৃহীত হইবে।

বিনীত

প্রকাশক

সূচীপত্র

অধ্যায় ১

সূচনা
(Introduction)

"মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্বপত্র যথা—

*   *   *

"তার পরে শূন্য হল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লিরাজশালা—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হল তার সীমা ॥"

—রবীন্দ্রনাথ

ঔরংজেবের মৃত্যু (১৭০৭) ও মুঘল সাম্রাজ্য (Death of Aurangzeb (1707) & the Moghul Empire) : ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ এক যুগান্তকারী ঘটনার নির্দেশক। ঐ বৎসর মুঘল সম্রাট ঔরংজেবের মৃত্যু ভারত-ইতিহাসের এক বিরাট অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটাইয়া এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। এই নূতন অধ্যায় ছিল এক দুর্বল অস্পষ্ট অধ্যায়। এই দুর্বলতা শাসনব্যবস্থার প্রতি ক্ষেত্রে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। শাসনযন্ত্রের বিভিন্নাংশের পূর্বেকার ভারসাম্য বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্কে অস্পষ্টতা দেখা দিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, সম্রাটের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার উপর নির্ভরশীল শাসনব্যবস্থায় দুর্বল শাসকগণ যখন সিংহাসনে আরোহণ করিতে লাগিলেন তখন শাসনব্যবস্থা স্বভাবতই শিথিল হইয়া পড়িল। পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা এজন্য দায়ী ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ঔরংজেবের অনুদার শাসন-নীতি উহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য।

এক অধ্যায়ের অবসান অপর অধ্যায়ের শুরু

ঔরংজেবের মৃত্যুকালে (১৭০৭) মুঘল সাম্রাজ্য মোট একুশটি প্রদেশ লইয়া গঠিত ছিল। এগুলির একটি—আফগানিস্তান ছিল ভারতবর্ষের বাহিরে, মোট ছয়টি ছিল দক্ষিণ-ভারতে এবং অবশিষ্ট চৌদ্দটি ছিল উত্তর-ভারতে। মুঘল সাম্রাজ্য তখনও হিন্দুকুশ হইতে তাঞ্জোরের উত্তর সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু মহারাষ্ট্র, কানাড়া, মহীশূর এবং কর্ণাটকের পূর্ব অংশে মুঘল আধিপত্য অস্বীকৃত হইতেছিল। ঔরংজেবের দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে উত্তর-ভারতের অভিজাত শ্রেণী ও স্থানীয় রাজকর্মচারীরা আইনের শাসন

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি : কোন কোন অঞ্চলে মুঘল শাসন অস্বীকৃত

অমান্য করিতে শুরু করিলে উহার ফল কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

ঔরংজেবের আমলে মুঘল সেনাবাহিনীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল বটে, সেনাবাহিনীর জন্য রাজকোষের অর্থব্যয় শাহ্‌জাহানের সময়ের তুলনায় দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঔরংজেবের সামরিক দক্ষতা, কঠোর সামরিক পরিদর্শন ব্যবস্থা সত্ত্বেও মুঘল সেনাবাহিনীর দক্ষতা তাঁহার আমলে পূর্বেকার তুলনায় অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে নৈতিকতার মানও বহু নিচু পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল।

সেনাবাহিনীর দক্ষতা ও নৈতিকতার মান হ্রাস

ঔরংজেবের গোঁড়ামি এবং আকবর প্রবর্তিত হিন্দু, রাজপুত প্রভৃতি অমুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি উদার, সহিষ্ণু নীতি বর্জন সাম্রাজের ভিত্তি দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে স্বভাবতই মুঘল শাসনের নিরঙ্কুশ অধিকার মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল না। পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের দক্ষতার অভাব, তাঁহাদের অকর্মণ্যতা, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের সম্রাটোচিত ব্যক্তিত্বের অভাব মুঘল সাম্রাজ্য ও শাসনের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। ঔরংজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণের মধ্যে প্রথম বাহাদুর শাহ্ তেষট্টি বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জাহান্দার শাহ্ সিংহাসন লাভ করেন একান্ন বৎসর বয়সে। এরূপ বৃদ্ধ বা প্রায়-বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য শাসনভার গ্রহণ করিয়া দক্ষতা প্রদর্শন করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল বলা যাইতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই স্বার্থান্বেষী আমীর-ওমরাহ্‌গণ এই সকল সম্রাটকে ক্রীড়নকে পরিণত করিয়া প্রকৃত শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়াছিল।

আকবরের সহিষ্ণু নীতি ত্যাগ : সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কারণ

পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের অকর্মণ্যতা

আমীর-ওমরাহ্‌দের প্রভাব বৃদ্ধি

বৈরাম খাঁ, মুনিম খাঁ, আসফ খাঁ, মহবৎ খাঁ, সাদুল্লা খাঁ-এর ন্যায় ওয়াজীর ও আমীর-ওমরাহের দিন তখন গত হইয়াছে। আমীর-ওমরাহ্‌দের মধ্যে ইরানী, তুরানী ও হিন্দুস্থানী এই তিন পরস্পর-বিবদমান ও প্রতিযোগী গোষ্ঠী প্রসাশনের উপর প্রভাব ও অধিকার বিস্তারের নেশায় মত্ত ছিল। এই স্বার্থদ্বন্দ্বের আবর্তে পড়িয়া দুর্বল মুঘল সম্রাটগণ শাসনযন্ত্রের উপর নিজ ক্ষমতা বজায় রাখিতে সক্ষম হন নাই। এইরূপ স্বার্থলোভী, অলস, আরামপ্রিয়, ব্যভিচারী আমীর-ওমরাহ্‌গণ শাসনব্যবস্থায় নীতিহীনতা, অকর্মণ্যতা ও বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া মুঘল শাসনের অধঃপতনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। পদস্থ আমীর-ওমরাহ্‌দের নৈতিক অধঃপতন, ব্যভিচার সংক্রামক ব্যাধির মতই সকল পর্যায়ের রাজকর্মচারী এমন কি, মুঘল শাসনের মূল শক্তি—সেনাবাহিনীর মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একদা দুর্ধর্ষ মুঘল বাহিনী এক শৃঙ্খলাহীন, অধঃপতিত উন্মত্ত বাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। অর্থের অপচয়, শাসনকার্যে অবহেলা, রাজকর্মচারী, সেনাবাহিনী সকল পর্যায়ের রাজকর্মচারীর মধ্যে আলস্য ও আরামপ্রিয়তা মুঘল শাসনব্যবস্থার কাঠামো যেমন অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি মুঘল

আমীর-ওমরাহ্, রাজকর্মচারী, সেনাবাহিনীর উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যভিচার

মুঘল শাসনের কাঠামো অন্তঃসারশূন্য

শাসনকে আর্থিক দিক দিয়া দেউলিয়া করিয়া দিয়াছিল। অর্থের অপচয়ের ফলে আর্থিক দুর্বলতা যতই বাড়িয়া চলিয়াছিল ততই জনসাধারণের শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছিল। সন্তুষ্ট প্রজাসাধারণ রাজ্য শাসনের পশ্চাতে যে এক বিরাট বল সেই কথা উপলব্ধি করিবার মত বুদ্ধি বা মানসিকতা তখনকার মুঘল সম্রাট বা আমীর-ওমরাহ্‌দের ছিল না। জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা স্বভাবতই চরমে পৌঁছিতেছিল।

জনসাধারণের শোষণ—চরম দুরবস্থা

এককেন্দ্রিক ব্যক্তি-আশ্রয়ী শাসনের প্রধান ত্রুটিই হইল এই যে, যখনই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুদক্ষ ও বিচক্ষণ শাসকের অভাব ঘটে তখনই সমগ্র শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঔরংজেবের পরবর্তী কালেও মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে তাহা ঘটিয়াছিল। গ্রন্থিহীন, অবিন্যস্ত মুঘল শাসনযন্ত্র যে-দিন দুর্বলতার চরমে পৌঁছিয়াছিল সেই দিন শিথিল মুঘল মুষ্টি হইতে রাজদণ্ড বিদেশী ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায় হস্তগত করিয়া লইয়াছিল। পরবর্তী ইতিহাস বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণতিরই ইতিহাস।

এককেন্দ্রিক ব্যক্তিশাসনের মূল দুর্বলতা

গ্রন্থিহীন শিথিল মুঘল মুষ্টি হইতে রাজদণ্ড ইংরেজগণ কর্তৃক হস্তগতকরণ

অধ্যায় ২

পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ

(The Later Moghuls)

ঔরংজেবের উত্তরাধিকারিগণ (Successors of Aurangzeb) : স্পর্ধিত মুঘল সাম্রাজ্যের ততোধিক স্পর্ধিত সম্রাট ঔরংজেব আলমগীরের জীবদ্দশায়ই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বেই মুঘল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হইয়া ঔরংজেব তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আজমের নিকট লিখিত তাঁহার সর্বশেষ পত্রে অকপটে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, রাজ্য শাসনের প্রয়োজনীয় কিছু তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই, কৃষকদের অবস্থা উন্নয়নেরও চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।* অসাধারণ পরিশ্রম, সদা-জাগ্রত সতর্ক দৃষ্টি, ধর্মীয় গোঁড়ামি, প্রশাসন-কার্যে দক্ষতা, কূটকৌশলে পারদর্শিতা, সর্বোপরি সুদক্ষ সেনানায়ক-সুলভ সামরিক প্রতিভা প্রভৃতি নানাবিধ গুণ সত্ত্বেও ঔরংজেবের শাসনকাল বিফল হইয়াছিল। এ-কথা তিনি শুধু উপলব্ধিই করেন নাই, আজমের নিকট পত্রে স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্রদের নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা-প্রসূত বহু সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার অবর্তমানে মুঘল সাম্রাজ্য কিভাবে বণ্টন করা হইবে, সেই নির্দেশ দিয়া তিনি উইল করিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার তিন পুত্র মোয়াজ্জেম, আজম ও কামবক্সের মধ্যে সাম্রাজ্য বণ্টন করিয়া লইবার শেষ নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছিলেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অঙ্কুরিত

শাহ্ আলম বা প্রথম বাহাদুর শাহ্ (১৭০৭-'১২) : কিন্তু ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে-না-করিতেই তিনি মৃত্যুশয্যায় যে-শেষ নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা লঙ্ঘন করিয়া তিন পুত্র মোয়াজ্জেম, আজম শাহ্ ও কামবক্স এক উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র মোয়াজ্জেম বা শাহ্ আলম প্রথম বাহাদুর শাহ্ উপাধি ধারণ করিয়া নিজেকে দিল্লীর বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এ-দিকে আজম শাহ্ আহ্মদনগরের নিকটবর্তী একস্থানে থাকাকালীন ঔরংজেবের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া নিজেকে দিল্লীর সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। কামবক্সও বাদ গেলেন না। তিনিও পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র নিজেকে বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব

* "I have not at all done any (true) government of the realm or cherishing of the peasantry. Life so valuable, has gone away for nothing."—J. N. Sarkar, *History of Aurangzeb*, vol. v, p. 264.

আজম শাহ্‌ আগ্রার সন্নিকটে পৌঁছাইয়া দেখিলেন যে, মোয়াজ্জেম অর্থাৎ বাহাদুর শাহ্‌ আগ্রা দখল করিয়া লইয়াছেন। বাহাদুর শাহ্‌ আজম শাহ্‌কে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইবার প্রস্তাব দিলে তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বাহাদুর শাহের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। সামুগড়ের নিকট আজম শাহ্‌ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন।

আজম শাহ্‌-এর পরাজয় ও মৃত্যু

কামবক্সকেও বাহাদুর শাহ্‌ শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ মিটাইয়া লইতে জানাইলেন। কিন্তু কামবক্স সেই প্রস্তাব গ্রহণে রাজী না হইয়া হায়দরাবাদের নিকট বাহাদুর শাহের সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন (১৭০৯) এবং যুদ্ধ করিবার কালে যে-আঘাত পাইয়াছিলেন সেই আঘাতের ফলেই শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু হইল। বাহাদুর শাহ্‌ এইভাবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হন।

কামবক্সের পরাজয় এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু

এ-দিকে রাজপুতানার যোধপুরে অজিত সিংহ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া (১৭০৮) অম্বরে মুঘলদের আক্রমণ করিতে শুরু করিলে বাহাদুর শাহ্‌ অজিত সিংহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অজিত সিংহকে পরাজিত করিয়া তিনি শেষে তাঁহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে মহারাজ উপাধিতে ভূষিত করিয়া তিন হাজার পাঁচ শত সৈনিকের মনসবদারের সম্মানে সম্মানিত করিলেন। তারপর তিনি দাক্ষিণাত্যে কামবক্সের বিরুদ্ধে রওয়ানা হইলে অজিত সিংহ, দুর্গাদাস ও মেবারের মহারাণা অমর সিংহ যুগ্মভাবে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইলেন। যোধপুর হইতে মুঘল সেনাবাহিনীকে তাঁহারা বিতাড়িত করিয়া মুঘল-আশ্রিত অম্বরের রাজা জয়সিংহ কচ্ছাওয়াকে পরাজিত করিয়া অম্বর দখল করিয়া লইলেন। মেবারের মুঘল সেনাধ্যক্ষ হুসেন খাঁকেও তাঁহারা হত্যা করিলেন। বাহাদুর শাহ্‌ কামবক্সকে পরাজিত করিয়া (১৭০৯) রাজপুতানার দিকে অগ্রসর হইলেন (১৭১০)। কিন্তু সেই সময়ে পাঞ্জাবে শিখরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে নিজ সামরিক দুর্বলতার কথা বিবেচনা করিয়া রাজপুত নেতৃবর্গের সহিত তিনি এক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এইভাবে রাজপুতদের সহিত তিনি বিবাদ মিটাইয়া লইলেন।

রাজপুত বিদ্রোহ

রাজপুতদের সহিত মিত্রতা-চুক্তি

পাঞ্জাবে বান্দা নিজেকে পুনরুজ্জীবিত গুরুগোবিন্দ সিংহ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং মুসলমান আধিপত্য হইতে শিখদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিলেন। তাঁহার চেহারার সহিত গুরুগোবিন্দ সিংহের অনেকখানি সাদৃশ্য ছিল। তিনি শিখদের লইয়া সোনেপেট ও শরহিন্দের ফৌজদারদিগকে হত্যা করিয়া মুঘল অধিকৃত বিভিন্ন স্থান লুণ্ঠন করিলেন। এমন কি, এক শিখ বাহিনী লাহোর আক্রমণ করিল। লাহোর আক্রমণ করিতে গিয়া অবশ্য মুঘল সেনাবাহিনীর হস্তে তাহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

শিখগুরু বান্দার বিদ্রোহ

বাহাদুর শাহ্ বান্দার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে শিখরা লোহ্‌গড় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। লোহ্‌গড় দখল করিতে বহু সংখ্যক মুঘল সেনাকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল।

বান্দার সাময়িক পরাজয়

বান্দা অবশ্য সেখান হইতে পলাইয়া গিয়াছিলেন। শরহিন্দ্ শহরটিও বাহাদুর শাহ্ পুনর্দখল করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও শিখদের দমন করা সম্ভব হয় নাই। তাহারা মুঘল-অধিকৃত স্থান বিশেষভাবে উত্তর-পাঞ্জাব, পুনঃপুনঃ আক্রমণ করিতে বিরত রহিল না। অবশ্য

বাহাদুর শাহের মৃত্যু ঃ বান্দা কর্তৃক লোহ্‌গড় ও শহদারা পুনর্দখল

বান্দা মুঘল সেনার হস্তে পরাজিত হইয়া জম্মুর নিকটবর্তী পাহাড়ে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ে (ফেব্রুয়ারি ১২, ১৭১২) বাহাদুর শাহ্ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বান্দার বিরুদ্ধে আর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। অল্পকালের মধ্যেই বান্দা লোহ্‌গড় ও শহদারা দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

বাহাদুর শাহ্ ব্যক্তিগত ব্যবহার ও চরিত্রের দিক দিয়া ছিলেন অতি নম্র, উদার এবং মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু সম্রাট-সুলভ দক্ষতা বা দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রে ছিল না। ফলে

বাহাদুর শাহের চরিত্র

তাঁহার শাসনব্যবস্থা ও শাসননীতি কোন স্থির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল হইতে পারে নাই। আমীর-ওমরাহ্‌গণ স্বাভাবিকভাবেই সম্রাটের এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাঁহার শাসনের উপর এক অবাঞ্ছিত প্রভাব

আমীর-ওমরাহের প্রভাব

বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাহাদুর শাহ্ কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে চাহিতেন না। এমন কি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও তিনি এই মনোভাব লইয়া চলিতেন। তিনি মুনিম খাঁকে তাঁহার

প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ

করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পিতার আমলের প্রধানমন্ত্রী আসাদ খাঁ সেই পদপ্রার্থী হওয়ায় তিনি মুনিম খাঁকে উজীর বা অর্থমন্ত্রী

কাহাকেও অসন্তুষ্ট না করিবার দুর্বল নীতি

এবং আসাদ খাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিলেন। শাসন-ব্যাপারে এরূপ বিভক্ত দায়িত্ব শাসনের দুর্বলতা ডাকিয়া আনিয়াছিল। ধর্ম-ব্যাপারে তিনি পিতার অসহিষ্ণু নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। অ-মুসলমানদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন এবং রাজকর্মচারি-পদে হিন্দুদের নিয়োগ না করিবার নিয়ম অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

ধর্মভীরু এবং অমায়িক হইলেও শাসন-ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের বা কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তাঁহার আমলে সাম্রাজ্যে

তাঁহার কৃতিত্ব বিচার

সাধারণভাবে বলিতে গেলে বাহ্যত শান্তি তিনি বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। রাজপুতদের বিদ্রোহ দমন করা অসম্ভব মনে করিয়া তিনি তাহাদের সহিত মিত্রতার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং মিত্রতা-চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। শম্ভুজীর পুত্র শাহুকে মুক্তি দিয়া এবং নিজ জীবদ্দশায় শিখদের দমন করিয়া সাম্রাজ্যে শান্তি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল দিক বিবেচনা করিলে তাঁহার রাজত্বকাল মোটামুটিভাবে সফল ছিল বলা যাইতে পারে।

জাহান্দার শাহ্ (১৭১২-'১৩)ঃ বাহাদুর শাহের মৃত্যু তাঁহার চারি পুত্র জাহান্দার শাহ্, আজিম-উস্-শান্, রফি-উস্-শান্ ও জাহান-শাহের মধ্যে এক উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সূচনা করিল। পিতা বাহাদুর শাহের আমলের প্রধানমন্ত্রী আসাদ খাঁর পুত্র জুলফিকর খাঁর সাহায্যে তিন ভ্রাতা আজিম-উস্-শানের বিরুদ্ধে যুগ্মভাবে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে আজিম-উস্-শান্ পরাজিত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার যাবতীয় ধনদৌলত তাঁহার তিন ভাইদের হস্তগত হইল। ইহার পর তিন ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে জুলফিকর খাঁর সাহায্যে জাহান্দার শাহ্ রফি-উস্-শান্ ও জাহান-শাহ্‌কে পরাজিত করিলেন। যুদ্ধে উভয়েরই মৃত্যু হইল। এইভাবে সিংহাসন অধিকার নিরঙ্কুশ করিয়া জাহান্দার শাহ্ হিন্দুস্তানের বাদশাহ্ হইয়া বসিলেন। জুলফিকর খাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত তাহাকে তিনি প্রধানমন্ত্রিপদে নিয়োগ করিলেন।

ভ্রাতৃবিরোধঃ জাহান্দার শাহের হস্তে তিন ভ্রাতার পরাজয় ও মৃত্যুঃ জুলফিকর খাঁর সহায়তা

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই জাহান্দার শাহ্ আমোদ-প্রমোদে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। শাসনকার্যে চরম অবহেলা শাসনযন্ত্রের গ্রন্থি ক্রমশই শিথিল করিয়া দিতে লাগিল। একান্ন বৎসর বয়সে সিংহাসন লাভের কালে তাঁহার পুত্র-প্রপৌত্রের সংখ্যা ছিল অনেক। কিন্তু তিনি সেই বয়সেও ব্যভিচারে গা ঢালিয়া দিয়া লাল কুয়ার নামে জনৈক উপ-পত্নীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়িলেন। শাসনকার্যে লাল কুয়ারের হস্তক্ষেপ, আমীর-উল্-উমারহ্ কর্তৃক জুলফিকর খাঁর অপসারণ—সব-কিছু মিলিয়া শাসনক্ষেত্রে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার সৃষ্টি করিল।

জাহান্দার শাহের ব্যভিচার ও অকর্মণ্যতাঃ শাসনক্ষেত্রে অরাজকতা

এ-দিকে আজিম-উস্-শানের দ্বিতীয় পুত্র ফারুক্‌শিয়ার জাহান্দার শাহের সম্রাট-পদ দাবি অস্বীকার করিলেন। তিনি সেই সময়ে বাংলার সহকারী সুবাদার ছিলেন। তিনি পাটনার সহকারী সুবাদার সৈয়দ হুসেন আলি খাঁ এবং এলাহাবাদের সহকারী সুবাদার সৈয়দ আবদুল্লা আলি খাঁর সাহায্য লইয়া সসৈন্যে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। জাহান্দার শাহ্ তাঁহার পুত্র আজ-উদ্-দিন'কে সেই আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সসৈন্যে পাঠাইলেন কিন্তু আজ-উদ্-দিন পরাজিত হইয়া আগ্রায় আশ্রয় লইলেন। তাঁহার যাবতীয় অর্থ, সামরিক সাজসরঞ্জাম ফারুক্‌শিয়ারের হস্তগত হইল। জাহান্দার শাহ্ নিজে ফারুক্‌শিয়ারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন (জানুয়ারি ১০, ১৭১৩)। দিল্লী ফিরিয়া গিয়া জাহান্দার শাহ্ পিতার প্রধানমন্ত্রী আসাদ খাঁর আশ্রয়প্রার্থী হইলে আসাদ খাঁ তাঁহাকে ধরিয়া ফারুক্‌শিয়ারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। জাহান্দার শাহ্‌কে হত্যা করিয়া ফারুক্‌শিয়ার ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন।

ফারুক্‌শিয়ার কর্তৃক জাহান্দার শাহের সিংহাসন দাবি অস্বীকার

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে ফারুক্‌শিয়ারের দিল্লীর সিংহাসন লাভ (১৭১৩)

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, মুঘল সম্রাটদের মধ্যে জাহান্দার শাহ্ই ছিলেন

সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ অসমর্থ, অপদার্থ এবং অক্ষম সম্রাট। তাঁহার ব্যভিচার, শাসনকার্যে অবহেলা, সম্রাট-সুলভ চালচলন ও আচার-আচরণে অসামর্থ্য, তাঁহার নিচ রুচিজ্ঞান তাঁহার পতনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার অল্প সময়ের রাজত্বকালে পূর্ববর্তী বাদশাহ্দের আমলে সঞ্চিত যাবতীয় ধনদৌলত নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, এমন কি, মুঘল দরবারের মূল্যবান বহু বস্তু হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

তাঁহার কৃতিত্ব বিচার

ফারুক্‌শিয়ার (১৭১৩-১৭১৯)ঃ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক, সুদর্শন ফারুক্‌শিয়ার সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বলচেতা এবং দৈহিক ও মানসিক দৃঢ়তাহীন। দুর্বল শাসকদের ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়া থাকে, ফারুক্‌শিয়ারের ক্ষেত্রেও অন্যথা হইল না। তিনি তাঁহার পারিষদ এবং সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাবে সম্পূর্ণ প্রভাবিত হইয়া পড়িলেন। অথচ তাঁহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন তিনি করিতে পারেন নাই। স্বাভাবিকভাবেই অন্তরে সন্দেহ লইয়া অপরের মত অনুসারে চলিবার ফলে তাঁহার বিচার-বুদ্ধি অনেক ক্ষেত্রে লোপ পাইল। তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত করিতে শুরু করিলে তাঁহার এবং সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল। ফারুক্‌শিয়ার মিরজুমলা ও খাজা আসিমের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া চলিলেন। কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধিতা করিবার সাহস তাহাদের ছিল না। ফলে সন্দেহ, ষড়যন্ত্র, অকর্মণ্যতা ও ভীরুতা মিশিয়া শাসনব্যবস্থায় চরম অব্যবস্থা দেখা দিল।

দুর্বলচেতা সম্রাট

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি সন্দেহ

মিরজুমলা ও খাজা আসিম মন্ত্রিপদে নিযুক্ত

এ-দিকে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি জাহান্দার শাহের ওয়াজীর জুলফিকর খাঁকে হত্যা করাইলেন, আসাদ খাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি চিন্ কিলিচ খাঁকে নিজাম-উল্-মুল্‌ক উপাধিতে ভূষিত করিয়া দাক্ষিণাত্যের ছয়টি মুঘল প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

নিজাম-উল্-মুল্‌ক

এ-দিকে অজিত সিংহের নেতৃত্বে রাজপুতগণ বিদ্রোহী হইয়া যোধপুর হইতে মুঘলসেনাকে বিতাড়িত করিল এবং আজমীর দখল করিয়া লইল। ফারুক্‌শিয়ার সৈয়দ হুসেন আলিকে অজিত সিংহের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। অজিত সিংহ মুঘল বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজ পুত্র অভয় সিংহকে মুঘল দরবারে প্রেরণ করিতে এবং নিজ কন্যাদের একটিকে সম্রাটের সহিত বিবাহ দিতে রাজী হইলেন। সেই সময়ে সৈয়দ হুসেন জানিতে পারিলেন যে, ফারুক্‌শিয়ার অপর সৈয়দ ভ্রাতা আব্দুল্লা খাঁর বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তিনি রাজপুতদের সহিত সকল ব্যবস্থা পাকাপাকি করিবার আগেই দিল্লী ফিরিতে বাধ্য হইলেন। এই পরিস্থিতিতে ফারুক্‌শিয়ার অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন এবং সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে খুশি করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পরামর্শদাতা মিরজুমলাকে পদচ্যুত করিলেন।

রাজপুতদের বিরোধিতা ও পরাজয়

মিরজুমলার পদচ্যুতি —সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে খুশিকরণ

শিখগুরু বান্দা এ-দিকে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে

লাহোরের শাসক আব্দুস্-সামাদ খাঁকে প্রেরণ করা হইল। শিখরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও শেষ পর্যন্ত শহদারা ত্যাগ করিয়া লোহ্‌গড় দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। আব্দুস্-সামাদ লোহ্‌গড় আক্রমণ করিলে বান্দা ও তাঁহার অনুচরগণ দুর্গ ত্যাগ করিয়া গেলেন। শেষ পর্যন্ত মুঘলদের হস্তে পরাজিত হইলে তাঁহাকে ও তাঁহার ৭৪০ জন অনুচরকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লী পাঠান হইল। তাহাদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অন্যথায় মৃত্যুবরণ করিতে বলা হইলে কেহ ধর্ম ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল না। সকলকেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। বান্দা এবং তাঁহার তিন বৎসর বয়সের পুত্রকেও অমানুষিক অত্যাচার করিয়া হত্যা করা হইল।

শিখদের আক্রমণ

বান্দা ও ৭৪০ জন শিখের আত্মত্যাগ

চূড়ামন জাঠ আগ্রার নিকটবর্তী অঞ্চলে লুণ্ঠন শুরু করিলে অম্বররাজ জয়সিংহ চূড়ামনকে বিরাট বাহিনী লইয়া আক্রমণ করিলেন, কিন্তু মুঘল সৈন্য তাঁহার সাহায্যে প্রেরিত হইলেও তিনি চূড়ামনের নিকট হইতে তাঁহার থান দুর্গটি দখল করিতে পারিলেন না। অবশেষে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় চূড়ামন মুঘল আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার দুর্গের অধিকার লাভ করিলেন।

জাঠ নেতা চূড়ামন

ইতিমধ্যে ফারুক্‌শিয়ার গোপনে তাঁহার কূটচক্রান্ত চালাইতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি নিজাম-উল্-মুলক্‌কে দাক্ষিণাত্যের ছয়টি মুঘল প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে অপসারণ করিয়া সৈয়দ ভ্রাতাদের অন্যতম হুসেন আলিকে সেই স্থলে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এখন আবার গোপনে নিজাম-উল্-মুলকের সাহায্যে হুসেন আলিকে বিতাড়নের চেষ্টা শুরু করিলেন। হুসেন আলি বিরক্ত হইয়া মুঘল দরবার ত্যাগ করিয়া গেলেন। ফারুক্‌শিয়ার এনায়েৎউল্লাকে উজীর নিযুক্ত করিলে তিনি জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করিলেন এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা শুরু করিলেন। কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে বা তাঁহাদের নিরঙ্কুশ প্রভাবকে প্রতিহত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাবমুক্ত হইবার জন্য তিনি মহম্মদ মুরাদকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন কাজ হইল না। অবশেষে ফারুক্‌শিয়ার সৈয়দ ভ্রাতা আব্দুল্লা খাঁকে ঈদের নামাজের সময় হত্যার ষড়যন্ত্র করিলেন। কিন্তু এ কথা ফাঁস হইয়া গেলে কিছু করা সম্ভব হইল না।

ফারুক্‌শিয়ারের কূটচক্রান্ত অব্যাহত

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

আব্দুল্লা খাঁ তাঁহার অপর ভ্রাতা হুসেন খাঁকে দাক্ষিণাত্য হইতে দিল্লী ফিরিয়া আসিতে জানাইলেন। হুসেন খাঁ মারাঠাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। হুসেন খাঁ দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে আসিলেন অজিত সিংহ ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সমগ্র প্রাসাদ ঘিরিয়া ফেলিলে ফারুক্‌শিয়ার হারেমে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ও শিখদের দ্বারা প্রাসাদ আক্রান্ত

১৭১৯ (২৮শে ফেব্রুয়ারি) ফারুক্‌শিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রফি-উস্-শানের পুত্র রফি-উদ্-দারাজাতকে সিংহাসনে বসান হইল। ফারুক্‌শিয়ারকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া

সিংহাসনচ্যুতি

কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। অল্প কিছুদিন পর তাঁহাকে হত্যা করা হইল। এইভাবে এক অকর্মণ্য, ষড়যন্ত্রপ্রিয় বাদশাহের রাজত্বের অবসান ঘটিল।

তাঁহার আমলেই ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে বিনা-শুল্কে তাহাদের বৈদেশিক বাণিজ্য চালাইবার অধিকার পাইয়াছিল।

রফি-উদ্-দারাজাত (২৮শে ফেব্রুয়ারি—৪ঠা জুন, ১৭১৯): বিশ বৎসর বয়স্ক ক্ষয়রোগগ্রস্ত রফি-উদ্-দারাজাত স্বভাবিকভাবেই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতের পুতুলে পরিণত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে তাঁহার স্থলে রফি-উদ্-দৌলা বা দ্বিতীয় শাহ্‌জাহানকে সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। ইহার কয়েক দিন পরই রফি-উদ্-দারাজাতের মৃত্যু হইল।

রফি-উদ্-দৌলা বা দ্বিতীয় শাহ্‌জাহান (জুন—সেপ্টেম্বর, ১৭১৯): রফি-উদ্-দৌলাও ক্ষয়রোগগ্রস্ত ছিলেন। তিনিও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতের পুতুল ভিন্ন কিছু ছিলেন না। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহারও মৃত্যু ঘটে।

মহম্মদ শাহ্‌ (১৭১৯--১৭৪৮): মহম্মদ শাহ্‌ অনভিজ্ঞ ও দুর্বল ছিলেন বটে, কিন্তু পূর্ববর্তী কয়েকজন সম্রাটের ন্যায় ততটা অকর্মণ্য ছিলেন না। মুঘল সাম্রাজ্যের তখন যে-অবস্থা একমাত্র আকবরের ন্যায় বিচক্ষণ, ক্ষমতাশালী, দুর্ধর্ষ সম্রাটের পক্ষেই সাম্রাজ্যের গ্রন্থি পুনরায় সুদৃঢ় করা সম্ভব ছিল।

অনভিজ্ঞ কিন্তু অকর্মণ্য নহে

মহম্মদ শাহ্‌ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হুসেন ও আব্দুল্লাকে হত্যা করিলেন। এই ব্যাপারে তিনি দাক্ষিণাত্যের নিজাম-উল্-মুল্‌কের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। নিজাম-উল্-মুল্‌ক প্রথমে কিছুকাল মহম্মদ শাহের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাজ তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গিয়া মৌখিকভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাধান্য মানিয়া লইয়া এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

মহম্মদ শাহ্‌ (১৭১৯-৪৮)

মহম্মদ শাহ্‌ সিংহাসনলাভের প্রথম কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিলেন বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি বিলাস-ব্যসনে গা ঢালিয়া দিলেন। শাসনব্যবস্থা তাহাতে স্বভাবতই শিথিল হইয়া পড়িল। ফলে, দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা ও বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মারাঠাগণ মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অপ্রতিহতভাবে হানা দিতে শুরু করিল। আগ্রার সন্নিকটে জাঠগণ, পাঞ্জাবে শিখগণ ও রুহেলখণ্ডে আফগান রুহেলাগণ স্বাধীন হইয়া উঠিল। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যখন এইরূপ ব্যাপক বিদ্রোহ ও অব্যবস্থা দেখা দিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে নাদির শাহের আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানিলে ঔরংজেবের বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। (নাদির শাহের আক্রমণ 'বৈদেশিক আক্রমণ' শীর্ষে দ্রষ্টব্য।)

ব্যাপক বিদ্রোহ: মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙন

আহম্মদ শাহ্‌ (১৭৪৮-'৫৪): মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আহম্মদ

শাহ্ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বিধ্বস্ত মুঘল সাম্রাজ্যকে পুনর্গঠিত বা পুনঃসঞ্জীবিত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ক্রমেই মুঘল সাম্রাজ্য সংকুচিত ও সংকীর্ণ হইতে লাগিল।

আহ্‌ম্মদ শাহ্ (১৭৪৮-'৫৪)

দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-'৫৯)ঃ আহ্‌ম্মদ শাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জাহান্দার শাহের পুত্র আজ-উদ্দিন 'দ্বিতীয় আলমগীর' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নিজাম-উল্-মুল্‌কের পৌত্র ইমাদ্-উল্-মুল্‌কের সহায়তায় দ্বিতীয় আলমগীর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ওয়াজীর বা প্রধানমন্ত্রী ইমাদ্-উল্-মুল্‌কের প্রাধান্য দ্বিতীয় আলমগীরের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি নিজেকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা শুরু করিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওয়াজীর ইমাদ্-উল্-মুল্‌কের হস্তে নিজেই প্রাণ হারাইলেন।

দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-'৫৯)

দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৫৯-১৮০৬)ঃ দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-'৩৭)ঃ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ (১৮৩৭-'৫৮)ঃ অতঃপর দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র দ্বিতীয় শাহ্ আলম সম্রাট-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ওয়াজীর ইমাদ্-উল্-মুল্‌কের ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত ইংরেজগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হিসাবেই জীবন ধারণ করেন। দ্বিতীয় শাহ্ আলমের পুত্র দ্বিতীয় আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। অবশেষে তৈমুর বংশের সর্বশেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করিয়া ইংরেজগণ কর্তৃক দেশ হইতে নির্বাসিত হইলেন। কয়েক বৎসর ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দ্বিতীয় শাহ্ আলম

দ্বিতীয় আকবর

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্

বৈদেশিক আক্রমণ (Foreign Invasion)

নাদির শাহ্, ১৭৩৮-'৩৯ (Nadir Shah)ঃ ঔরংজেবের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুর্যোগের ঘনমেঘ দেখা দিল, সেই সময়ে প্রতিরক্ষার দিক দিয়া সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত হইয়া পড়িয়াছে। ঔরংজেব কান্দাহার পুনরধিকার করিবার চেষ্টা না করিলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, কিন্তু পরবর্তী সম্রাটদের আমলে সেই সতর্কতার অভাব ঘটিয়াছিল। ঔরংজেবের আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাবুলের শাসনকর্তা আমিন খাঁ ও পরে যুবরাজ শাহ্ আলম সেখানকার শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উপজাতি দলগুলিকেও স্ববশে রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শাহ্ আলমের কাবুল ত্যাগ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অশান্ত করিয়া তুলিল। পারস্যের সাফাবী বংশের পতনের (১৭২২) পর পারস্যে আফগান প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সাফাবী সাম্রাজ্যের পতন বহু পূর্বেই শুরু হইয়াছিল,

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যখন আফগানগণ কর্তৃক সাফাবী সাম্রাজ্য আক্রান্ত হয় তখন মহম্মদ শাহ্ ছিলেন মুঘল সম্রাট। তাঁহার ওয়াজীর নিজাম-উল্-মুল্ক মহম্মদ শাহ্কে সাফাবী সম্রাটের সাহায্যে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। মহম্মদ শাহ্ অবশ্য এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। বস্তুত এই সময়কার মুঘল সম্রাটদের সাহসিকতা, দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার মনোবৃত্তি, অর্থবল, চরিত্রবল বা সামরিক বল কোন কিছুই ছিল না। ইরানী, তুরানী ও হিন্দুস্থানী—এই তিন দলে বিভক্ত বিবদমান আমীর-ওমরাহ্দের স্বার্থদ্বন্দ্ব তখন মুঘল সাম্রাজ্যকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। এই সময়ে নাদির ইমাম কুলি খাঁ পারস্য হইতে আফগানদের বিতাড়িত করিয়া সাফাবী বংশের সম্রাট তহ্মাস্প্কে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং নিজে পারস্যের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি প্রথমে (১৭৩২) রাজপ্রতিনিধি হিসাবে শাসনকার্য শুরু করেন এবং ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং 'নাদির শাহ্' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাদির ইমাম কুলি খাঁ প্রথম জীবনে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং কিছুকাল দস্যু দলের সর্দারও ছিলেন। এ-দিকে তখনও কাবুল মুঘল অধিকারে রহিয়াছে। তথাকার শাসনকর্তা নাদির শাহের সম্ভাব্য আক্রমণের সংবাদ দিল্লীতে প্রেরণ করিলে উহা অযথা ভীতিগ্রস্ত মনের বিকার বলিয়া অগ্রাহ্য করা হইল। পর বৎসর (১৭৩৭) নাদির শাহ্ কান্দাহার আক্রমণ করিলে পলায়মান আফগানদের অনেকেই ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। নাদির শাহ্ এ-বিষয়ে প্রতিবাদ জানাইয়া দিল্লীতে দূত প্রেরণ করেন। দীর্ঘ এক বৎসরের মধ্যেও এ-বিষয়ে কোন উত্তর না পাইয়া, উপরন্তু পারস্যের দূতকে মুঘল দরবারে আটক করিয়া রাখিলে নাদির শাহ্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ভারত আক্রমণ করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। প্রথমে তিনি আফগানিস্তান দখল করিলেন। আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা ঔরংজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ করেন নাই। ফলে আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব সহজেই নাদির শাহ্ কর্তৃক অধিকৃত হইল। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে নাদির শাহ্ পানিপথের অদূরবর্তী কার্ণাল নামক স্থানে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ্ নাদির শাহ্কে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ক্ষতিপূরণ দিবার শর্তে তিনি সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। এই অর্থ আদায় করিবার উদ্দেশ্যে নাদির শাহ্ স্বয়ং সম্রাট মহম্মদ শাহের সহিত দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন এবং শাহ্জাহানের প্রাসাদভবন দেওয়ান-ই-খাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দিল্লী অবস্থানকালে অকস্মাৎ গুজব রটিয়া গেল যে, নাদির শাহের মৃত্যু হইয়াছে। এই মিথ্যা রটনার উপর নির্ভর করিয়া দিল্লীবাসীরা নাদির শাহের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করিল এবং মোট নয় শত সৈন্যের প্রাণনাশ করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাদির শাহ্ প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে নির্বিচারে দিল্লীবাসীদের হত্যা করিতে

সাফাবী বংশের পতন

নাদির ইমাম কুলি খাঁর 'নাদির শাহ্' নাম ধারণ

ভারত আক্রমণের কারণ

আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবের নিরাপত্তা অবহেলিত

কার্ণালে মুঘল সম্রাটের পরাজয় (১৭৩৯)

নাদির শাহ্ কর্তৃক দিল্লীতে হত্যাকাণ্ড

নিজ সৈন্যদলকে আদেশ দিলেন। দীর্ঘ সাত ঘণ্টা ধরিয়া ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন চলিল। অসংখ্য নরনারীর রক্তে দিল্লীর ধূলি রঞ্জিত হইল। মহম্মদ শাহের কাতর অনুনয়ের ফলে নাদির শাহ্ হত্যাকাণ্ড হইতে নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি দিল্লী সম্রাটের যাবতীয় ঐশ্বর্য এবং প্রভূত পরিমাণ লুণ্ঠিত ধনরত্ন লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। শাহ্‌জাহানের বিখ্যাত ময়ূরসিংহাসন ও কোহিনূর মণি এবং প্রায় পনর কোটি মুদ্রা, বহু মণি-মাণিক্য, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ লইয়া নাদির শাহ্ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন। ইহা ভিন্ন, দশ হাজার ঘোড়া, তিন শত হাতী ও বহুসংখ্যক উটও তিনি সঙ্গে লইয়া গেলেন। সিন্ধু, কাবুল ও পশ্চিম-পাঞ্জাবও নাদির শাহ্‌কে ছাড়িয়া দিতে হইল। এই বিপুল পরিমাণ ঐশ্বর্য অপহৃত হওয়ায় মুঘল সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন হইয়া উঠিল। দিল্লীর আমীর-ওমরাহ্‌দের ভীরু-কাপুরুষতা এবং বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার আগ্রহ তাঁহাদের ক্লীবত্ব ও স্বার্থপরতার এক অতিশয় নিচ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল। নাদির শাহের আক্রমণ পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যকে যে-চরম আঘাত হানিল, তাহা হইতে ইহার পুনরুজ্জীবনের আর কোন আশাই রহিল না। স্পর্ধিত মুঘল সাম্রাজ্যের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। এক ঐক্যবদ্ধ মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে দিল্লীর মর্যাদা হ্রাস পাইল।

ময়ূরসিংহাসন, কোহিনূর মণি, পনর কোটি মুদ্রা ও প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন অপহরণ

মুঘল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত

আহ্‌ম্মদ শাহ্ আব্‌দালী (Ahmad Shah Abdali): নাদির শাহের ভারত-আক্রমণকালে আহ্‌ম্মদ শাহ্ আব্‌দালী নামে জনৈক আফগান উপজাতীয় দলপতি ভারতবর্ষে তাঁহার অনুচর হিসাবে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে নাদির শাহের মৃত্যু হইলে আহ্‌ম্মদ শাহ্ আব্‌দালী আফগানিস্তানকে স্বাধীন করিতে সমর্থ হন। তারপর তিনি স্বয়ং 'দুর্-ই-দুর্-রান্' উপাধি ধারণ করিয়া পারস্যের সম্রাট-পদ গ্রহণ করেন। নাদির শাহের অনুচর হিসাবে ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি ভারতের অভাবনীয় ঐশ্বর্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, ভারতবর্ষের সামরিক দুর্বলতাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। ১৭৪৮ হইতে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি মোট নয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া লাহোর অধিকার করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি ভাবী মুঘল সম্রাট আহ্‌ম্মদ শাহ্ এবং ওয়াজীর পুত্র মীর মন্নুর যুগ্ম চেষ্টায় মানপুরের যুদ্ধে পরাজিত হন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্তু দিল্লীতে তখন ইরানী ও তুরানীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছিল বলিয়া পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মীর মন্নু সেইবার দিল্লী হইতে কোন সাহায্য পাইলেন না। এককভাবে আহ্‌ম্মদ শাহ্ আব্‌দালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মীর মন্নু পরাজিত হন। তিনি সিন্ধু নদীর পূর্ব-তীরস্থ চারিটি জেলা মোট রাজস্ব হইতে যাহা উদ্‌বৃত্ত হইত তাহা আব্‌দালীতে প্রেরণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। পর বৎসর

পরিচয়

প্রথম আক্রমণ (১৭৪৮)

দ্বিতীয় আক্রমণ (১৭৫০)

(১৭৫২) আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালী পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এইবারও তিনি মীর মন্নুকে পরাজিত করিয়া শিরহিন্দ পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত যাবতীয় স্থান দখল করিয়া লন এবং মীর মন্নুকেই পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। কয়েক বৎসর পরই মীর মন্নুর মৃত্যু হইলে পাঞ্জাবে অব্যবস্থা দেখা দেয়। মন্নুর স্ত্রী মঘলানী বেগম এইরূপ পরিস্থিতিতে দিল্লীর সম্রাটের সাহায্য চাহিলে ওয়াজীর ইমাদ-উল্ মুল্‌ক এই সুযোগে পাঞ্জাব অধিকার করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আব্‌দালী তাঁহার চতুর্থ অভিযানে অবতীর্ণ হন (১৭৫৬)। তিনি এইবার দিল্লী প্রবেশ করিয়া অবাধে লুণ্ঠন করিলেন। বৃন্দাবন এবং মথুরাও আব্‌দালী কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল। তারপর দিল্লীর সম্রাটকে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, শিরহিন্দ, সিন্ধু প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিয়া তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। এইবার তিনি নিজ পুত্র তৈমুরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা-পদে নিযুক্ত করিয়া গেলেন। তৈমুরের শাসনকার্যে অক্ষমতার ফলে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ দেখা দিলে জলন্ধরের শাসনকর্তা, মারাঠা নেতা রঘুনাথ রাও প্রভৃতির সাহায্যে পাঞ্জাব হইতে আফগান শাসনের অবসান ঘটে। অতঃপর আব্‌দালী পঞ্চমবার (১৭৫৯) ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং পাঞ্জাব পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন। তারপর তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন ; ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আব্‌দালী মারাঠাগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের শক্তি বিধ্বস্ত করেন। ইহার ফলে মারাঠাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা চিরতরে নির্বাপিত হয়। এই আঘাতের পর মারাঠা শক্তি পুনঃসঞ্জীবিত হইতে পারে, সেই আশা তখন কেহ করে নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ভারত-ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা বলা যাইতে পারে। মারাঠা শক্তির দুর্বলতার সুযোগে শিখ জাতির উত্থানের পথ সহজ হয় এবং ইংরাজদের শক্তিবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে।

তৃতীয় আক্রমণ (১৭৫২)

চতুর্থ আক্রমণ (১৭৫৬)

পঞ্চম আক্রমণ (১৭৫৯)

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পরও আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালী আরও চারিবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাঞ্জাবের শিখ জাতিকে দমন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম আক্রমণ (১৭৬২, ১৭৬৪,১৭৬৫, ১৭৬৭)

আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালীর পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেল। মারাঠা শক্তির পরাজয়ে শিখ ও ইংরেজ শক্তির উত্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাইল।

আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালীর আক্রমণের ফলাফল

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের তাৎপর্য, ১৭৬১ (**Significance of the Third Battle of Panipat, 1761**) **:** মুঘল সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতা যখন বহিরাগত আক্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই সময়ে নাদির শাহের আক্রমণ (১৭৩৯) মুঘল সাম্রাজ্যকে

এক কঠোর আঘাত হানিয়া গিয়াছিল। ইহার পর আহম্মদ শাহ্ আবদালীর পুনঃপুনঃ ভারত-আক্রমণ মারাঠাদের ভারতে প্রাধান্য বিস্তার-নীতির পরিপন্থী বিবেচনায় স্বভাবতই আবদালীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার প্রয়োজনীয়তা মারাঠারা নীতি হিসাবে গ্রহণ করিল। পক্ষান্তরে আবদালীও দিল্লীর দুর্বল মুঘল বাদশাহ্ অপেক্ষা মারাঠাদিগকেই তাঁহার ভারত-লুণ্ঠনের প্রকৃত বাধা হিসাবে বিবেচনা করিলেন।

আবদালীর আক্রমণ মারাঠা স্বার্থের পরিপন্থী

এ-দিকে মারাঠাগণ শুধু শক্তিই সঞ্চয় করে নাই, তাহারা এক বিশাল অঞ্চলে তাহাদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে এবং সমগ্র ভারত লইয়া এক হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহারা মুঘল সাম্রাজ্যকে কেবল নামেই টিকাইয়া রাখিতে চাহিল এবং সর্বভারতে নিজ ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইবে এইরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। উজির অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী সফ্‌দরজঙ্গ্‌ও মনে-প্রাণে এই কথা বিশ্বাস করিতেন যে, তখনকার পরিস্থিতিতে আফগান আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার একমাত্র ভরসাই হইল মারাঠা সাহায্য। তিনি মারাঠাদের সহিত একটি মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। বাদশাহ্ অবশ্য এই চুক্তি আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু ইহা হইতে এই কথা সুস্পষ্ট হইল যে, ভারতবর্ষে সেই সময়ে মারাঠাগণই ছিল একমাত্র শক্তি, যাহা বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে সক্ষম।

ভারতবর্ষে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনে মারাঠা পরিকল্পনা

মুঘল শাসনকে বাহ্যত টিকাইয়া রাখা—যতদিন না মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভব হয়

মারাঠা-মুঘল মিত্রতা

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আবদালী ভারত আক্রমণ করিলে মারাঠাগণ মুঘল বাদশাহের সাহায্যে অগ্রসর হইল। অবশ্য দুই পক্ষে কোন যুদ্ধ হইল না। ঐ বৎসরই আবদালী ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন। এইদিকে পাঞ্জাব জয় করিবার পর আবদালী নিজ পুত্র তৈমুরকে সেই স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ পাঞ্জাব হইতে তৈমুরকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার স্থলে মুঘল বাদশাহের পক্ষে আদিনা বেগ খাঁ-কে শাসনকর্তা নিয়োগ করে। আদিনা বেগের মৃত্যু হইলে সাবাজি সিন্ধিয়া সেই পদে নিযুক্ত হন।

মারাঠাগণ কর্তৃক মুঘল সম্রাটের পক্ষ গ্রহণ : তৈমুর বিতাড়ন

মারাঠাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি আহম্মদ শাহ্ আবদালী নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ভব বলিয়া স্বভাবতই ধরিয়া লইলেন। এ-দিকে মুঘল সম্রাটের অধীন নাজির খাঁন ও বাঙ্গাস দুই পাঠান (আফগান) নেতা আবদালীর ভারত-আক্রমণে মারাঠাদের প্রভাব হইতে মুঘল সম্রাটকে মুক্ত করিবার সুযোগ দেখিতে পাইয়া আবদালীর পক্ষ গ্রহণ করিলেন।

আবদালীর ভারতীয় আফগান নেতাদের সাহায্য লাভ

নাজির খাঁন অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা ও রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমৎ খাঁন, সাদুল্লা খাঁন, দুন্দি খাঁন প্রভৃতির সমর্থন সংগ্রহ করিলেন। আবদালী ছিলেন একজন গোঁড়া মুসলমান। তিনি হিন্দুস্থানে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের আধিপত্য স্থাপন, অর্থাৎ মারাঠাদের আধিপত্য কোন মতেই সহ্য করিবার পাত্র ছিলেন না।

আবদালীর অযোধ্যার নবাব, রোহিলা সর্দার প্রভৃতির সাহায্য লাভ

পক্ষান্তরে মারাঠাগণ রাজপুতদের সহিত কোনপ্রকার মিত্রতা স্থাপন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে আব্দালীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিল না। বালাজির নীতিতে রুষ্ট রাজপুতগণ স্বভাবতই আব্দালী-মারাঠা যুদ্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রহিল। মারাঠাগণ শিখদেরও সাহায্য লাভে সমর্থ হইল না। জাতীয় দুর্দিনে বালাজির ভ্রান্ত নীতি ভারতবর্ষের সমসাময়িক রাজগণের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল।

বালাজির মারাঠা-নীতি রাজপুত, শিখ তথা ভারতীয় রাজগণের সাহায্য লাভে সমর্থ হইল না

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে দুই মাস ধরিয়া মারাঠা ও আফগান সৈনিকদের মধ্যে কতকগুলি খণ্ডযুদ্ধ হইল যাহার ফলে মারাঠা বাহিনী কেবল পরাজিতই হইল না, তাহারা প্রয়োজনীয় খাদ্য-সরবরাহের অভাবহেতু প্রায় উপবাসের সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল। ঠিক এইরূপ পরিস্থিতিতে মারাঠা বাহিনী পানিপথের প্রান্তরে আফগান নেতা আহম্মদ শাহ্ আব্দালীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে অগ্রসর হইল (জানুয়ারি ১৪, ১৭৬১)। ইহা তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ নামে পরিচিত। মারাঠা সেনানায়ক মলহার রাও হোলকার, জানকোজি সিন্ধিয়া, সদাশিব রাও ভাও, বিশ্বাস রাও প্রভৃতি মারাঠা সৈন্য পরিচালনা করিলেন। কিন্তু আব্দালীর সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠতর সমরকৌশল, তাহাদের ধর্মোন্মাদনা-প্রসূত যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগের চেষ্টা, তাহাদের বিশালতর সংখ্যা এবং সর্বোপরি আফগান অশ্বারোহী সৈনিকদের দুর্ধর্ষ যুদ্ধ-ক্ষমতা সব মিলিয়া আব্দালীর সেনাবাহিনীকে মারাঠা বাহিনী অপেক্ষা বহু গুণে বেশি শক্তি-সম্পন্ন করিয়া তুলিল। সামান্য প্রাথমিক সাফল্যের পরই মারাঠা সেনানায়ক বিশ্বাস রাও শত্রুপক্ষের গোলায় প্রাণ হারাইলেন এবং ইহার অব্যবহিত পরে সদাশিব রাও প্রাণ হারাইলেন। আহম্মদ শাহ্ আব্দালীর অশ্বসেনার পাঁচজন সদাশিব রাওয়ের দামী পোশাকের লোভে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া সেই মূল্যবান পোশাক আত্মসাৎ করিল।

মারাঠা-আফগান খণ্ডযুদ্ধ—মারাঠা পরাজয়

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (জানুয়ারি ১৪, ১৭৬১)

বিশ্বাস রাও ও সদাশিব রাওয়ের পতন

সদাশিব রাওয়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা বাহিনীর মধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সহস্র সহস্র মারাঠা সৈন্য আব্দালীর সেনাবাহিনীর তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ হারাইল। সাধারণ নর-নারী, শিশু কেহই তারপর বাদ পড়িল না। এইভাবে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের অবসান মারাঠাদের সম্পূর্ণ পরাজয়ে এবং মারাঠা বাহিনীর ধ্বংসে সম্পন্ন হইল।

মারাঠা বাহিনীর পরাজয়—মারাঠা বাহিনী বিধ্বস্ত—অসংখ্য নর-নারী, শিশু নিহত

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের এক সুদূরপ্রসারী ফল পরিলক্ষিত হয়। এই পরাজয় মারাঠাদের ক্ষেত্রে সর্বনাশাত্মক হইয়াছিল। কারণ এই পরাজয়ে মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের পরিকল্পনার আদর্শ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। মারাঠা সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের এক বিরাট সংখ্যা এই যুদ্ধে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাণনাশ

মারাঠা সামরিক ও বেসামরিক প্রাণনাশ

অপেক্ষাও যে-ক্ষতি মারাঠা শক্তিকে অধিকতর আঘাত করিয়াছিল তাহা হইল তাহাদের মনোবলের বিনাশ। তদুপরি এই পরাজয় এ-কথা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল যে, মারাঠা শক্তি নির্ভরযোগ্য শক্তি নহে। মারাঠাদের উপর নির্ভর করিয়া সামরিক নিরাপত্তা লাভের কোন আশা নাই।

মনোবল নাশ
মারাঠার উপর নির্ভরশীলতা নিরাপত্তার পন্থা নহে

ইহা ভিন্ন, মারাঠা রাষ্ট্রসংঘ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং পেশওয়ার পদমর্যাদা অত্যধিক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সর্বত্র এই ধারণারই সৃষ্টি হয় যে, মারাঠা শক্তির পুনরুজ্জীবন আর সম্ভব হইবে না।

মারাঠা রাষ্ট্রসংঘ বিচ্ছিন্ন, পেশওয়ার পদমর্যাদা হ্রাস

সামাজিক তথা মানবিক দিক হইতে বিচারে এই কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই যুদ্ধে মারাঠা নেতৃবৃন্দ ও যুবশক্তি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সে যেমন যুবশক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা যুবশক্তি ও নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। যদুনাথ বলেন, এমন কোন পরিবার ছিল না যেখানে এই যুদ্ধে পরিবারের প্রধানকে বা যুবকদের হারায় নাই। এক আঘাতে এক প্রজন্মের যাবতীয় নেতৃবৃন্দ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ফ্লডেন ফিল্ডের যুদ্ধের ন্যায়ই তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ ছিল এক জাতীয় সর্বনাশ।

মারাঠা নেতৃবৃন্দ ও যুবশক্তি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন

মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সাধারণত পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফলকে অনেকখানি লঘু করিয়া দেখিবার প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সামান্য নিরপেক্ষ বিচারে এই কথা উপলব্ধি করা যাইবে যে, যদিও মারাঠাগণ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাসিত মুঘল সম্রাট শাহ্ আলমকে দিল্লীতে লইয়া আসিয়া সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিয়াছিল, বস্তুত তাহারা মুঘল সম্রাটের পরিচালক হইতে পারে নাই, বা তাঁহার মন্ত্রী ও সেনাধ্যক্ষের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে নাই। সেইরূপ ক্ষমতা মহদজী সিন্ধিয়া ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরবর্তী কালে (১৮০৩) ইংরেজগণ প্রয়োগ করিতে পারিয়াছিল, এই কথা যদুনাথ বলিয়াছেন।

মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিকদের অভিমত

যদুনাথের অভিমত

মারাঠা ঐতিহাসিক সরদেশাই-এর মতে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাগণ সৈন্য সংখ্যা ভিন্ন বিশেষ কিছু হারায় নাই। আবদালীও এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তেমন লাভবান হন নাই। নানাফড়নবিশ ও মহদজী সিন্ধিয়া, যাঁহারা ভাগ্যক্রমে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে প্রাণে বাঁচিয়া ছিলেন, তাঁহারা মারাঠা শক্তিকে পূর্বেকার গৌরবে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে, নানাফড়নবিশ বা মহদজী সিন্ধিয়া মারাঠা শক্তিকে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার পরিস্থিতিতে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। সরদেশাই বলেন যে, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) মারাঠা জাতিকে যুদ্ধ ও রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের এক অপূর্ব সুযোগ দিয়াছিল এবং তাহাদের জাতীয় মর্যাদাবোধ বহুগুণে বাড়াইয়া

সরদেশাই-এর অভিমত ও বিপক্ষে যুক্তি

দিয়াছিল। কিন্তু সরদেশাই-এর এই উক্তি সত্ত্বেও এই কথা অনস্বীকার্য যে, এই যুদ্ধ মারাঠাদের মর্যাদা ও সম্মান ভারতীয় রাজনীতিতে বহুলাংশে হ্রাস করিয়াছিল। বস্তুত, এই যুদ্ধের পর অপর কোন দেশীয় শক্তি মারাঠাদের সাহায্য চাহে নাই। পানিপথ সর্বভারতব্যাপী একচ্ছত্র মারাঠা সাম্রাজ্যের আদর্শের সমাধি রচনা করিয়াছিল। [বালাজী বাজীরাও শীর্ষাধীন আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the downfall of the Moghul Empire): উত্থান ও পতনের চক্রবৎ আবর্তন—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। একদা বিশাল, শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্য কালের অতল তলে তলাইয়া গিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন—প্রাকৃতিক নিয়ম

কোন সাম্রাজ্যের পতনই কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত কারণে ঘটে নাই, এই উভয় প্রকার কারণের একত্র সন্নিবেশের ফলেই পূর্বেও বহু সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পশ্চাতেও অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কারণ পরিলক্ষিত হয়।

দুই প্রকারের কারণ—অভ্যন্তরীণ ও বহিবাগত

প্রথমত, মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি মুঘল সম্রাটগণের ব্যক্তিগত ক্ষমতা, উদ্যম ও সমর-নিপুণতার উপর নির্ভরশীল ছিল, প্রজাবর্গের স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর নহে। একমাত্র সম্রাট আকবর তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা, দূরদর্শিতা ও গভীর রাজনীতিজ্ঞানের সাহায্যে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতি প্রজাবর্গের স্বাভাবিক ও অকপট আনুগত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী সম্রাটগণ এই সকল নীতি অনুসরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও আকবর-গঠিত সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা এই দুই কারণেই ঔরংজেবের আমল পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য টিকিয়াছিল, কিন্তু এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রমেই দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতেছিল। ঔরংজেবের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হইল।

অভ্যন্তরীণ কারণ:

(১) একমাত্র আকবব ভিন্ন অপবাপব সম্রাটের প্রজাবর্গের স্বাভাবিক আনুগত্য লাভে অক্ষমতা

দ্বিতীয়ত, মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ছিল এককেন্দ্রিক স্বৈরতন্ত্র। সম্রাট আকবরের আমলে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় জনকল্যাণের ও প্রজাবর্গের প্রতি সমব্যবহারের নীতি অনুসৃত হইল, ফলে শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশ না থাকিলেও সুশাসন দাবি করিবার অধিকার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু আকবরের পরবর্তী সম্রাটগণের মধ্যে একমাত্র জাহাঙ্গীর ভিন্ন অপরাপর সম্রাটগণের ধর্মান্ধ, সংকীর্ণ নীতির ফলে প্রজাবর্গের এই দাবি উপেক্ষিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, এক-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সহজাত ত্রুটিই ছিল এই যে, যখনই কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়িত, তখনই দূরবর্তী অঞ্চলগুলি স্বাধীন হইয়া যাইত। ঔরংজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের দুর্বলতা স্বভাবতই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্বাধীনতার-স্পৃহা জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

(২) জনকল্যাণের নীতি পরিত্যক্ত

তৃতীয়ত, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি। দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানিগুলির অবসান ঘটাইয়া ঔরংজেব

মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ শত্রু মারাঠাগণের উত্থানের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানি রাজ্যগুলি নিজ-নিজ নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যেই মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইত। কিন্তু এগুলির স্বাধীনতা হরণ করিয়া ঔরংজেব সেই পথও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-বিজয় মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি না করিয়া বরঞ্চ দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। সার যদুনাথ, ডক্টর রায়চৌধুরী-মজুমদার-দত্ত প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলি ঔরংজেব কর্তৃক অধিকৃত না হইলেও মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান বন্ধ করা সম্ভব হইত না। সুযোগ্য নেতা শিবাজীর অধীনে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মারাঠা জাতিকে দমন করাও বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের পক্ষে সম্ভব হইত, এইরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য ঔরংজেবের দীর্ঘকাল রাজধানী হইতে অনুপস্থিতি তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে বহুল পরিমাণে শিথিল করিয়া দিয়াছিল, এবং উত্তর-ভারতে অব্যবস্থার সুযোগ বৃদ্ধি করিয়াছিল। সুতরাং ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিল এ-কথা অস্বীকার করা যায় না।

(৩) ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি

চতুর্থত, সম্রাট আকবর কর্তৃক অনুসৃত উদার, পরধর্মসহিষ্ণু এবং প্রজাবর্গের প্রতি সম-ব্যবহারের নীতি শাহ্‌জাহানের আমলেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ঔরংজেবের আমলে উদারতার পরিবর্তে সংকীর্ণতা, পরমধর্মসহিষ্ণুতার স্থলে পরধর্ম-বিদ্বেষ ও ধর্মান্ধতা, প্রজাবর্গের প্রতি সম-ব্যবহারের স্থলে অমুসলমানদের উপর নির্যাতন-নীতি রাজপুত, জাঠ, প্রভৃতি সকল হিন্দু-সম্প্রদায়কেই মুঘল সাম্রাজ্যের ঘোর শত্রুতে পরিণত করিয়াছিল। যাহাদের আনুগত্য ও সহযোগিতায় সম্রাট আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করিবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। এই দিক দিয়া বিচার করিলে শাহ্‌জাহানের, বিশেষভাবে ঔরংজেবের অদূরদর্শিতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ, এ-কথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। ফারুক্‌শিয়ারের কয়েক বৎসর রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের দিকে দ্রুত ধাবিত হইয়াছিল। বিশৃঙ্খলা সাম্রাজ্যের সর্বত্র দেখা দিয়াছিল। অভিজাতগণ, জমিদার শ্রেণী, উপদলীয় নেতৃবৃন্দ সরকারী নিয়মকানুন অমান্য করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। রাজপথগুলি দস্যুদের কবলে চলিয়া গিয়াছিল। সম্রাটের আদেশ অমান্য করিতে অথবা সম্রাটের অনুমতি না লইয়া পদস্থ রাজকর্মচারী নিজ পদ ত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করিত না।

(৪) অনুদার ও পরধর্ম অসহিষ্ণুতার নীতি

পঞ্চমত, শাহ্‌জাহানের আমল হইতে একমাত্র ঔরংজেব ভিন্ন, মুঘল সম্রাটদের মধ্যে যে-বিলাসপ্রিয়তা দেখা দিয়াছিল, তাহা ক্রমে অভিজাত শ্রেণী এমন কি, সেনাবাহিনীর মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে সেনাবাহিনীর সামরিক দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ প্রভৃতি লোপ পাইয়াছিল। দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সহিত

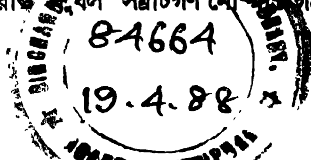
যুঝিয়া একেই মুঘল সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হইয়াছিল, তদুপরি তাহাদের মধ্যে বিলাস-ব্যসন দেখা দিলে, স্বভাবতই মারাঠাগণের আক্রমণ প্রতিহত করিবার বা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহাদের রহিল না। এ-দিকে রাজকোষ ক্রমেই অর্থশূন্য হইয়া পড়ায় সেনাবাহিনীর মাহিনা সময়মত দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যথেচ্ছভাবে জায়গীর প্রদান, শাসনকার্যে ব্যয়-বাহুল্য একদিকে যেমন সম্রাটের নিজস্ব ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস করিয়াছিল, অপর দিকে তেমনি রাজকোষের আর্থিক দুর্বলতা আনিয়াছিল।

(৫) সম্রাট, অভিজাত-বর্গ ও সেনাবাহিনীর বিলাসপ্রিয়তা

ষষ্ঠত, মুঘল রাজসভায় অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য-প্রতিপত্তি এবং পরস্পর স্বার্থদ্বন্দ্ব মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচ্য। ঔরংজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে মুঘল দরবারে অভিজাতবর্গের মধ্য হইতে দুইটি দল প্রাধান্য লাভ করে। পরবর্তী প্রায় চারি দশক ধরিয়া এই দুইটি দল মুঘল রাজসভা তথা মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অসাধারণ প্রতিপত্তি বিস্তার করে। এই দুইটি দল 'ইরানী ও 'তুরানী' দল নামে পরিচিত ছিল। ঔরংজেবের মৃত্যুকালে আসাদ খাঁ ও জুলফিকর খাঁ দুইজন ইরানী অভিজাত ব্যক্তি ওয়াজীর ও মীর বক্সী—এই দুইটি সর্বোচ্চ প্রশাসনিক-পদে আসীন হন। অপর দিকে, তুরানী দলের নেতৃত্বে ছিলেন ফিরুজ জঙ্ ও আমিন খাঁ। ঔরংজেব আমিন খাঁকে সদ্‌র-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইরানী অভিজাত দলের তুলনায় তুরানী দলের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কম ছিল। প্রথম হইতেই এই দুই দলের মধ্যে রেষারেষি শুরু হইয়াছিল। প্রত্যেক দলই নিজেদের জন্য নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে ব্যস্ত থাকিত। দীর্ঘকাল পূর্বে যে-সকল জাতির লোক ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করিতেছিল তাহাদের বংশধরগণ হিন্দুস্থানী দল নামে পরিচিত ছিল। নিজাম-উল্ মুল্‌ক ছিলেন এই দলের অন্যতন প্রধান নেতা। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব দেখা দিলে এই সকল অভিজাত ব্যক্তি সুবিধা-সুযোগ আদায় করিবার উদ্দেশ্যে কোন-না-কোন পক্ষে যোগদান করিত। উত্তরাধিকারীরাও এক বা অপর দলের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সিংহাসন আরোহণের পর যাহাদের সাহায্য লওয়া হইয়াছিল তাহাদের তত্ত্বাবধানাধীন হইয়া সম্রাটকে কাজ করিতে হইত। অভিজাত শ্রেণীর বিভিন্ন দলের নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা এবং সেই কারণে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণ এবং উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে বিজয়ী সম্রাটের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার সম্রাটদের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। এজন্য মুঘল দরবারে অভিজাতদের দল ও তাহাদের স্বার্থপ্রণোদিত রাজনীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

(৬) মুঘল দরবারে অভিজাত শ্রেণীর দলাদলি ও রাজনৈতিক প্রভাব

সপ্তমত, মুঘল সম্রাটগণের কেহই নৌ-বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। নৌবলে বলীয়ান বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায়গুলির উদ্ধত আচরণ, পোর্তুগীজগণের জলদস্যুতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াও মুঘল সম্রাটগণ নৌ-বাহিনী গঠনে মনোযোগী হইলেন



না। পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থারও যে উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন মুঘল সম্রাটগণ ইহা বুঝিলেন না। মুঘল সাম্রাজ্যের নৌ-শক্তির অভাবহেতুই ইওরোপীয় বণিকগণ ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

(৭) মুঘল সম্রাটগণের নৌ-বাহিনী গঠনে অবহেলা

অষ্টমত, মুঘল সাম্রাজ্যের বিশালতাও উহার পতনের অন্যতম কারণ ছিল, সন্দেহ নাই। ঔরংজেবের পরবর্তী সম্রাটগণের মধ্যে কেহই এত বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার উপযুক্ত ছিলেন না। একে সম্রাটগণের অকর্মণ্যতা তদুপরি সিংহাসনের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ঘন ঘন সম্রাট-পরিবর্তন ঔরংজেবের পরবর্তী কালে মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি নাশ করিয়াছিল। বাবর, আকবর ও ঔরংজেবের মত সম্রাটগণের উত্থানের দিন শেষ হইয়া গিয়াছিল। দুর্বল উত্তরাধিকারিগণের শাসন-দক্ষতার অভাবহেতু শাসনব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া উঠিল, সেনাবাহিনীও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যে স্ব-স্ব প্রধান হইয়া উঠিবেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল্-মুল্‌ক এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা মুর্শিদকুলী খাঁর অধীনে একপ্রকার স্বাধীন হইয়া গেল। অযোধ্যা, রুহেলখণ্ড প্রভৃতি স্থানও স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। শিখ ও জাঠগণ স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তুলিল। বিদেশী বণিক ইংরেজগণও কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণে পশ্চাৎপদ রহিল না। তাহারাও ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য-গঠনে প্রয়াসী হইল। এমন কি, দিল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হইয়া পড়িয়াছিল। শিখ জাঠ, রোহিলা, মারাঠা প্রভৃতি দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছিল। অভ্যন্তরীণ কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি যখন এইভাবে প্রায়-বিধ্বস্ত, মুঘল সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের মুখে, এমন সময়ে পারস্য-সম্রাট নাদির শাহের ভারত-আক্রমণ এবং দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন মুঘল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানিয়া গেল। এই আঘাত হইতে মুঘল সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা পরবর্তী কালে মুঘল সম্রাটগণের পক্ষে সম্ভব হইল না। নাদির শাহের আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যকে পতনের মুখে পৌঁছাইয়া দিল। কিন্তু ইহাতেই মুঘল সাম্রাজ্য বহিরাক্রমণ হইতে নিস্তার পাইল না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই আহম্মদ শাহ্ আব্দালী বা আহম্মদ শাহ্ দুর্‌রাণী পর পর নয়বার ভারত আক্রমণ করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া গেলেন। মুঘল যুগের শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। এই পথেই নাদির শাহ্ ও আহম্মদ শাহ্ আব্দালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানিতে পারিয়াছিলেন। এইভাবে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কারণে আকবরের অক্লান্ত চেষ্টা ও অনন্যসাধারণ দূরদর্শিতায় যে-বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার পতন ঘটিল।

(৮) মুঘল সাম্রাজ্যের বিশালতা—অন্তর্দ্বন্দ্ব, সেনাবাহিনীর উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের স্ব-স্ব প্রাধান্য

বহিরাগত কারণ:

(১) নাদির শাহের আক্রমণ

(২) আহম্মদ শাহ্ আব্দালী বা দুর্‌রাণীর পুনঃপুনঃ আক্রমণ

সীমান্ত-রক্ষার ব্যবস্থা উপেক্ষিত

স্বাধীন রাজ্যসমূহের উত্থান

(Rise of Independent States)

ধ্বংসোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয়-শাসন শিথিল হইয়া পড়িলে দিল্লী হইতে দূরবর্তী অঞ্চলগুলি একে-একে স্বাধীন হইয়া গেল। ক্রমে দিল্লীর নিকটবর্তী অযোধ্যা, এমন কি, দিল্লীর উপকণ্ঠে জাঠগণও স্বাধীনতা ঘোষণা করিল।

হায়দরাবাদ (Hyderabad) : হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মীর কামার-উদ্দিন। ইনি নিজাম-উল্-মুল্‌ক নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ঔরংজেবের রাজত্বকালে তাঁহার পিতামহ খাজা আবিদশেখ-উল্-ইস্‌লাম ও পিতা গাজী-উদ্দিন ফিরুজ্ জঙ্ বোখারা হইতে ভারতবর্ষে আসেন এবং ঔরংজেবের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। মীর কামার-উদ্দিনও অল্প বয়সেই মুঘল সেনা-বাহিনীতে কার্য গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদে উন্নীত হন এবং 'চিন-কিলিচ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত হন। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর সম্রাট বাহাদুর শাহ্ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে অযোধ্যার শাসনকর্তা হিসাবে বদলি করেন। তারপর কয়েক বৎসর দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা, মুরাদাবাদ, মালব প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করিয়া তিনি সম্রাট মহম্মদ শাহের ওয়াজীর বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই দিল্লী-দরবারের অভিজাতবর্গের ষড়যন্ত্র ও স্বার্থ-দ্বন্দ্বে অতিষ্ঠ হইয়া নিজাম-উল্-মুল্‌ক পুনরায় দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন এবং একপ্রকার স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি অবশ্য মুখে মুঘল সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকারে ত্রুটি করিলেন না। এ-দিকে সম্রাট মহম্মদ শাহ্ তাঁহার সভাসদ্‌গণের প্ররোচনায় নিজাম-উল্-মুল্‌কের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের শাসনকর্তা মুবারিজ খাঁকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দিলেন। মুবারিজ খাঁ নিজাম-উল্-মুল্‌কের হস্তে পরাজিত ও নিহত হইলে (১৭২৪) মহম্মদ শাহ্ বাধ্য হইয়াই নিজাম-উল্-মুল্‌ককে দাক্ষিণাত্যের একপ্রকার স্বাধীন শাসনকর্তা হিসাবেই স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি নিজাম-উল্-মুল্‌ককে 'আসফ্-জা' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। এইভাবে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্বাধীন হায়দরাবাদ রাজ্যের গোড়াপত্তন হইল। ইহার পর আরও দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর দক্ষতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আসফ্-জা'র মৃত্যু ঘটে।

নিজাম-উল্-মুল্‌কের পূর্ব-পরিচয়

নিজাম-উল্-মুল্‌কের স্বাধীনতা

স্বাধীন হায়দরাবাদ রাজ্যের গোড়াপত্তন (১৭২৪)

বাংলাদেশ (Bengal) : সমগ্র মুসলমান যুগ ধরিয়াই বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় শাসন অমান্য করিয়া চলিবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। আকবরের আমল হইতে ঔরংজেবের শাসনকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শাসন মানিয়া চলিয়াছিল বটে, কিন্তু ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব কর্তৃক মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলা সুবার শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার সময় হইতেই বাংলার স্বাধীনতার সূত্রপাত হয়।

মুর্শিদকুলী খাঁ

মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা চেষ্টিত ছিলেন। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফারুক্‌শিয়ার ইংরেজ বণিকগণকে বাংলাদেশে বিনা-শুল্কে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার দিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলাদেশের প্রজাবর্গের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া ইংরেজগণকে বিনা-শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিতে অস্বীকার করেন। তিনি সম্রাট ফারুক্‌শিয়ারের 'ফারমান' অগ্রাহ্য করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

তাঁহার স্বাধীন ও প্রজাহিতৈষী মনোবৃত্তি

মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজা-উদ্দিন খাঁ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন (১৭২৭)। তিনি বিহার সুবা জয় করিয়া বাংলার সহিত যুক্ত করেন (১৭৩৩) এবং আলীবর্দী খাঁকে বিহারের নায়েব-নাজিম পদে নিযুক্ত করেন। সুজা-উদ্দিনের পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হইলেন (১৭৩৯)। কিন্তু পর বৎসর (১৭৪০) বিহারের নায়েব-নাজিম (Deputy Governor) আলীবর্দী সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বয়ং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হইলেন। আলীবর্দী একাধারে সুদক্ষ শাসক, সমরকুশল সেনাপতি ও দূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন। তিনি ইংরেজ বণিকদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি তাহাদের প্রতি অন্যায়মূলক কোন ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার আমলে মারাঠাগণ বারংবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দী বৎসরে বার লক্ষ টাকা 'চৌথ' দানে স্বীকৃত হইয়া মারাঠা আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, উড়িষ্যার একাংশের বাৎসরিক রাজস্বও মারাঠাগণকে দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

সুজা-উদ্দিন : বিহার জয় (১৭৩৩)

সরফরাজ খাঁ

আলীবর্দী খাঁ (১৭৪০)

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ-উদ্‌-দৌলা বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার মসনদ লাভের এক বৎসরের মধ্যেই পলাশীর যুদ্ধে বাংলা তথা ভারত-ইতিহাসের এক বিরাট পটপরিবর্তন ঘটে।

সিরাজ-উদ্‌-দৌলা (১৭৫৬-৫৭)

অযোধ্যা (Oudh) : বর্তমান অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও কানপুরের একাংশ এবং বাণারস লইয়া মুঘল যুগে অযোধ্যা সুবা গঠিত ছিল। অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাদাত খাঁ। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সফদর জঙ্ অযোধ্যার শাসনকর্তা-পদ লাভ করেন। তিনি দিল্লীর সম্রাটের ওয়াজীর অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত

সাদাত খাঁ, সফদর জঙ্ ও সুজা-উদ্‌-দৌলা

হন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সুজা-উদ্-দৌলা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই অযোধ্যায় শাসনকার্য চালাইতে থাকেন। তিনি সম্রাট শাহ্ আলমের ওয়াজীর-পদেও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মীর কাশিমের পক্ষে যোগদান করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর তিনি ইংরেজদের আশ্রিত হইয়া পড়েন।

ইংরেজ হস্তে সুজা-উদ্-দৌলার পরাজয় (১৭৬৪)

জাঠ শক্তির উত্থান (Rise of the Jats): দিল্লী এবং আগ্রার মধ্যবর্তী অঞ্চলে জাঠ নামক এক সমরকুশলী, অধ্যবসায়ী এবং দুঃসাহসী জাতির বসবাস ছিল। ঔরংজেবের রাজত্বকালের শেষভাগে জাঠগণ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গোক্‌লা নামক নেতার অধীনে মুঘল সাম্রাজ্যের আনুগত্য অস্বীকার করে। রাজারাম, ভজু, চূড়ামন প্রভৃতি নেতৃগণের অধীনে জাঠগণ দিল্লী ও আগ্রার উপকণ্ঠে হানা দিতে শুরু করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাঠগণ সঙ্ঘবদ্ধ জাতি হিসাবে সংগঠিত হয়। চূড়ামনের ভ্রাতুষ্পুত্র বদন সিংহের অক্লান্ত চেষ্টা, অপরিসীম অধ্যবসায় ও বীরত্বে মথুরা ও আগ্রা জেলার সকল স্থান জাঠগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বদন সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র সুরজমলের নেতৃত্বে জাঠগণ এক বিশাল রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, জটিল সমস্যা সমাধানের অসাধারণ ক্ষমতার বলে সুরজমল জাঠ জাতিকে এক বিশাল স্বাধীন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এটোয়া, হাতরস, রোটক, মীরাট, গুরগাঁও, মেওয়াট, মৈনপুর, রেয়ারী, মথুরা, আগ্রা, ঢোলপুর প্রভৃতি স্থান জাঠ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জাঠনেতা সুরজমলের মৃত্যু হয়।

জাঠ জাতির অভ্যুত্থান

বদন সিংহ

সুরজমল

রাজপুত জাতি (The Rajputs): ঔরংজেবের ধর্মান্ধ অত্যাচারী নীতির ফলে রাজপুত জাতি মুঘল সাম্রাজ্যের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল। মেবার (উদয়পুর), মাড়বার (যোধপুর) এবং অম্বর (জয়পুর) ঔরংজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু মেবারের রাণা রাজসিংহের মৃত্যুর পর রাজপুত জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন মাড়বারের অজিত সিংহ এবং অম্বরের দ্বিতীয় জয়সিংহ। সম্রাট বাহাদুর শাহ্ অবশ্য সাময়িকভাবে রাজপুতগণকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই রাজপুতগণ তাঁহার বিরোধিতা শুরু করিল। সম্রাট বাহাদুর শাহ্ শিখ অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মুঘল-রাজপুত মৈত্রীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া রাজপুত জাতির প্রতি বন্ধুত্ব-পূর্ণ ব্যবহার শুরু করিলেন। রাজপুতগণের স্বাধীনতা একপ্রকার স্বীকার করিয়া লইয়া তিনি তাহাদের বিরোধিতা হইতে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মাড়বারের অজিত সিংহ মুঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে হুসেন আলী অজিত সিংহকে দমন করিতে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। অজিত সিংহ

রাজপুত জাতি পুনঃ-সঞ্জীবিত

ও হুসেন আলীর মধ্যে বিনা-যুদ্ধেই এক সন্ধি স্থাপিত হইল। অজিত সিংহ নিজ কন্যাকে মুঘল সম্রাটের সহিত বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন। ফলে তিনি মুঘলদের বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হইলেন এবং তাঁহাকে আজমীর ও গুজরাটের শাসনকর্তা-পদে নিযুক্ত করা হইল। অম্বরের দ্বিতীয় জয়সিংহও মুঘল সম্রাটের অধীনে কার্য গ্রহণ করিলেন। দিল্লীর প্রায় উপকণ্ঠ হইতে সুরাট পর্যন্ত ভূভাগ রাজপুত শাসনাধীনে স্থাপিত হইল। ইহা ভিন্ন, অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলি মুঘল সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া গেল। কিন্তু রাজপুত জাতি আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া ক্রমে নিজ শৌর্য ও স্বাধীন চেতনা হারাইয়া একে-একে মুঘল শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। ঐক্যবোধ এবং স্বাধীনচেতা রাজপুত বীরের অভাবহেতু রাজপুত গৌরব লুপ্তপ্রায় হইল। রাজপুত প্রাধান্য ও স্বাধীনতার আশা ক্রমে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল।

রাজপুত প্রাধান্য

রাজপুতগণের আত্ম-কলহ ও শক্তিহীনতা

শিখ শক্তির উত্থান (Rise of the Sikhs): ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ জনৈক আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলে শিখগণ বান্দা নামে একজন নেতার অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠে। শিরহিন্দের ফৌজদার ওয়াজীর খাঁ গুরুগোবিন্দের শিশুপুত্রদের হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বান্দা ওয়াজীর খাঁকে হত্যা করিয়া শিরহিন্দ অধিকার করেন। অল্পকালের মধ্যেই শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলও তাঁহার অধিকার-ভুক্ত হয়। বান্দা এক শক্তিশালী ও স্বাধীন শিখরাজ্য গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে মুখলীসপুরে লোহগড় নামে একটি দুর্গ স্থাপন করেন। মুঘল বাহিনী লোহগড় আক্রমণ করিলে বান্দা তাঁহার অনুচরবর্গ লইয়া লাহোরের উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরই সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে বান্দা লোহগড় দুর্গটি পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে বান্দা গুরুদাসপুর দুর্গে মুঘল বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। আপ্রাণ যুদ্ধ করিয়াও শিখগণ পরাজিত হইলে বান্দা মুঘলসৈন্যের হস্তে বন্দী হন। বান্দা ও তাঁহার প্রধান অনুচরগণকে বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে প্রেরণ করা হইলে প্রথমে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে তাঁহার পুত্রকে বর্বরোচিত অত্যাচার করিয়া হত্যা করা হয়। পরে তাঁহাকেও হাতীর পায়ের তলায় নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হয়। এইভাবে নেতৃহীন হইলেও শিখজাতি গুরুগোবিন্দের শিক্ষা ভুলিল না। নাদির শাহের আক্রমণের ফলে পাঞ্জাবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সেই সুযোগে শিখগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিল। ইহার অল্পকাল পরে আহম্মদ শাহ্ আবদালী বা দুররাণীর আক্রমণের সুযোগে শিখজাতি অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) জয়ী হইলেও আহম্মদ শাহ্ আবদালী কতক পরিমাণে দুর্বল হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে ফিরিবার পথে শিখদের আক্রমণে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর আহম্মদ শাহ্ আবদালী আরও কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে শিখগণ তাঁহাকে বাধা দিতে ত্রুটি করে নাই। এইভাবে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শাহের শেষ অভিযানের পর শিখগণ সমগ্র পাঞ্জাব লইয়া এক স্বাধীন রাজ্য গঠন করে।

বান্দা

বান্দা ও তাঁহার পুত্রের নৃশংস হত্যা

স্বাধীন শিখ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুদয় **(Revival of the Maratha Power) :** মুঘল সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতার সুযোগে যে-সকল হিন্দু রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে মারাঠা রাজ্যের অভ্যুত্থান-ই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। ঔরংজেব শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিশুপুত্র শাহুকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর মারাঠাগণ আত্মকলহে লিপ্ত থাকায় মারাঠা জাতি শক্তিবৃদ্ধির কোন চেষ্টা করে নাই। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা পুনরায় সংঘবদ্ধ হইয়া মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে হানা দিতে শুরু করে। এমন সময় আজম্ শাহ্ জুলফিকার খাঁ'র পরামর্শক্রমে শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজীকে বন্দিদশা হইতে মুক্তি দিলেন। এই মুক্তিদানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মারাঠা জাতির মধ্যে আত্মকলহের সৃষ্টি করা। ঐ সময়ে রাজারামের বিধবা পত্নী তারাবাঈ নিজ নাবালক পুত্রের প্রতিনিধি হিসাবে মারাঠা রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। শাহুকে মুক্তি দিলে মারাঠা রাজ্যের অধিকার লইয়া গোলযোগ সৃষ্টি হইবে এই কথা উপলব্ধি করিয়াই জুলফিকার খাঁ শাহুকে মুক্তিদানের পরামর্শ দিয়াছিলেন। ফলও হইল তাহা-ই। শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজী স্বদেশে ফিরিয়া গেলে তারাবাঈ শাহুর দাবি অস্বীকার করিলেন। ফলে মারাঠাদের মধ্যে এক অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইল। শেষ পর্যন্ত শাহু আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করিয়া সাতারা দুর্গে নিজ অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ফলে মারাঠা রাজ্য তারাবাঈ-এর পুত্র ও শাহুর মধ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। এই সময়ে তারাবাঈ-এর পুত্রের মৃত্যু ঘটিলে রাজারামের অন্যতমা পত্নী রাজসবাঈ তাঁহার পুত্র শম্ভুজীকে ঐ সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজ পুত্রের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শাহুর রাজ্যেও নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। সেই সময়ে শাহু কোঙ্কণের বালাজী বিশ্বনাথ নামে জনৈক দূরদর্শী, শক্তিমান চিৎপাবন ব্রাহ্মণের সহযোগিতালাভে সমর্থ হইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন অনন্যসাধারণ রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন দূরদর্শী নেতা। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় বিচ্ছিন্ন ও আত্মকলহে লিপ্ত মারাঠা জাতি পুনরায় সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

মারাঠা জাতির আত্মকলহ : তারাবাঈ ও শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজী

সাতারা দুর্গে শাহুর রাজ্যাভিষেক

বালাজী বিশ্বনাথ : বালাজী বিশ্বনাথ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজীর সেনাপতি ধনাজী যাদব কর্তৃক সামান্য 'কারকুন' অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগের কেরানি হিসাবে নিযুক্ত হন। ধনাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেন যাদব বালাজী বিশ্বনাথকে 'সেনাকর্তা' অর্থাৎ সেনাবাহিনীর সংগঠক হিসাবে নিযুক্ত করেন। এই কার্যে নিযুক্ত হইয়াই বালাজী বিশ্বনাথ নিজ প্রতিভার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'পেশওয়া' বা প্রধানমন্ত্রি-পদে নিযুক্ত হইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ নিজ প্রতিভা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা শীঘ্রই মারাঠা রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। 'ছত্রপতি' বা রাজা পেশওয়ার উপর শুধু

বালাজী বিশ্বনাথ

পেশওয়াতন্ত্রের সৃষ্টি

নামেমাত্রই অধিষ্ঠিত রহিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের আমল হইতে 'পেশওয়াতন্ত্রে'র সৃষ্টি হইল।

বালাজী বিশ্বনাথের নেতৃত্বে মারাঠাগণ ধ্বংসোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের কতকাংশ দখল করিতে সমর্থ হইল। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও বালাজী বিশ্বনাথ মারাঠা জাতিকে সংঘবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বালাজী সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে হুসেন আলীর নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবাগুলির ছয়টি হইতে 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন (১৭১৪)। হুসেন আলীর উদ্দেশ্য ছিল কোনপ্রকারে মারাঠাদিগের মিত্রতা অর্জন করা। ইহা ভিন্ন, শিবাজীর রাজ্যের যে-সকল অংশ মুঘলগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল সেগুলি তিনি মারাঠাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন। বেরার, খান্দেশ, গণ্ডোয়ানা প্রভৃতি রাজ্য যেগুলি মারাঠাগণ জয় করিয়াছিল তাহাও মারাঠা রাজ্যভুক্ত হইবে, এ-কথাও হুসেন আলী কর্তৃক স্বীকৃত হইল। বালাজী অবশ্য প্রয়োজনবোধে পনর হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা মুঘল সম্রাটকে সাহায্য করিতে এবং দশ লক্ষ টাকা বাৎসরিক কর হিসাবে দিতে রাজী হইলেন। মুঘল সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করা মারাঠাদের আদর্শ ও নীতি-বিরুদ্ধ ছিল বটে, তথাপি এইরূপ নামেমাত্র মুঘল প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া দাক্ষিণাত্যের মারাঠাগণ যে-শক্তি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছিল তাহা মারাঠা সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা সন্দেহ নাই। সেই সূত্রেই বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধী দলকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে যখন হুসেন আলীর সহিত সসৈন্যে দিল্লী প্রবেশ করিলেন, তখন হইতে মারাঠাগণও দিল্লীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। মারাঠাদের সাহায্যেই সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয় সম্রাট ফারুক্-শিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শাহ্ আলমকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। হুসেন আলী বালাজী বিশ্বনাথের সহিত যে-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন শাহ্ আলম সেই চুক্তির শর্তগুলি মানিয়া লইলেন। এইভাবে বালাজী বিশ্বনাথের আমলে মারাঠাগণ এক দুর্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত হইল।

বালাজী ও হুসেন আলীর সন্ধি (১৭১৪)

মারাঠাগণ কর্তৃক দিল্লীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ

বালাজী বিশ্বনাথ স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ছিলেন, এরূপ মনে করা ভুল হইবে। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মারাঠা জাতিকে সংঘবদ্ধ করিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে এক নব-চেতনা ও প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি মারাঠা রাজস্ব-নীতির সংস্কার সাধন করিয়া তাহাদিগকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় ও বণ্টনের নূতন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সরদেশমুখী হিসাবে আদায়িকৃত রাজস্বের সবই রাজা পাইতেন, চৌথেরও শতকরা পঁচিশ ভাগ তাঁহাকে দেওয়া হইত। অবশিষ্ট ৭৫ ভাগের মধ্যে মোট নয় ভাগ রাজা নিজ ইচ্ছামত যে-কোন অনুচর বা রাজ-কর্মচারীকে দান করিতে পারিতেন। ইহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা মারাঠা দলপতিগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতেন। এইভাবে রাজস্বের অংশ মারাঠা দলপতিগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহাদের মধ্যে ঐক্যবোধ আরও বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইলেন। চৌথ ও

বালাজী বিশ্বনাথ কর্তৃক মারাঠা রাজস্ব-নীতির সংস্কার

সরদেশমুখী আদায়ের ব্যাপারে বালাজী বিশ্বনাথ রাজা টোডরমলের নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে মারাঠা রাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। মারাঠা রাষ্ট্রের দুর্দিনে তিনি উহার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও দৃঢ়তা আনয়ন করিয়া উহার পুনরুজ্জীবন সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই মারাঠা রাষ্ট্র রাজতন্ত্র হইতে পেশওয়াতন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

মারাঠা শক্তিকে পুনঃ-সঞ্জীবিত করিয়া ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বাজীরাও পেশওয়া-পদ গ্রহণ করিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু (১৭২০)

প্রথম বাজীরাও ঃ সামরিক কৌশল, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠায় বাজীরাও তাঁহার পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানিয়া তিনি কৃষ্ণা হইতে সিন্ধু নদী পর্যন্ত বিশাল ভূভাগে এক ঐক্যবদ্ধ হিন্দু সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিতেন। সমগ্র ভারতের হিন্দু জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইবার উদ্দেশ্যে এবং হিন্দু দলপতিগণকে একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বাজীরাও তাঁহার 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' বা হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মালব আক্রমণ করিলে ঐ অঞ্চলের হিন্দু দলপতিগণ তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করেন। তিনি ক্রমে মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখণ্ডের একাংশ জয় করিতে সমর্থ হন। তারপর কর্ণাট জয় করিবার উদ্দেশ্যে এক অভিযান প্রেরণ করিয়া তিনি সেই অঞ্চল হইতেও কর আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। করদ রাজ্যগুলি বাজীরাওয়ের এক কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু তিনি একে-একে এই সকল রাজাকে মারাঠা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করেন।

বাজীরাও-এর চরিত্র ও 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' আদর্শ

বাজীরাও জয়পুরের 'সওয়াই' অর্থাৎ দ্বিতীয় জয়সিংহ এবং বুন্দেলরাজ ছত্রশালের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া মারাঠা শক্তিকে দৃঢ়তর করিয়া তোলেন। তিনি গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চল বারংবার আক্রমণ করেন এবং ক্রমে দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ্ ইহাতে ভীত হইয়া হায়দরাবাদের নিজামকে বাজীরাও-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য অনুরোধ জানান। নিজাম এই সূত্রে দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবাগুলি হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ে বাধা দান করেন। ভূপালের নিকট নিজাম ও বাজীরাও-এর মধ্যে এক যুদ্ধ ঘটে (১৭৩৮)। নিজাম পরাজিত হইয়া নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী যাবতীয় স্থান বাজীরাও-এর নিকট ত্যাগ করেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। পর বৎসর (১৭৩৯) বাজীরাও-এর ভ্রাতা চিমন্‌জী আপ্পারাও-এর অধীনে এক মারাঠা বাহিনী পোর্তুগীজগণকে পরাজিত করিয়া সল্‌সেট ও বেসিন দখল করে। সেই সময়ে নাদির শাহের ভারত-আক্রমণের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি নাদির শাহ্‌কে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি প্রতিবেশী মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত শান্তি স্থাপন করিয়া বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু প্রস্তুত হইবার পূর্বেই আকস্মিকভাবে মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল (১৭৪০)।

মারাঠা রাজ্যের প্রসার

বাজীরাও-এর মৃত্যু (১৭৪০)

বাজীরাও মারাঠা শক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মারাঠা রাজ্য তথাপি সুসংহত ও সুবিন্যস্ত রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। রাজারামের আমলে জায়গীর-প্রথার পুনঃ-প্রবর্তনের ফলে কয়েকটি শাসক-পরিবারের উত্থান ঘটিয়াছিল। বেরারের ভোঁসলে, বরোদার গাইকোয়াড়, গোয়ালিওরের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার এবং ধার নামক স্থানে পবার—এই পাঁচটি পরিবারের অধীনে পাঁচটি রাজ্য গড়িয়া উঠে। এই রাজ্য পাঁচটি মুখে পেশওয়ার অধীনে ছিল বটে, কিন্তু সর্বদাই নিজেদের মধ্যে স্বার্থদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিত। এই রাজ্যগুলির উত্থানেই মারাঠা শক্তির পতন ঘটিয়াছিল।

আপাতদৃষ্টিতে সঞ্জীবিত মারাঠা শক্তির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা

ভোঁসলে, গাইকোয়াড়, সিন্ধিয়া, হোলকার, ও পবার রাজ্য গঠন

প্রথম বাজীরাও-এর কৃতিত্ব বিচার (Estimate of Baji Rao I) : বাজীরাও-এর দূরদর্শিতা ও কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে প্রথম বাজীরাও ছিলেন অনন্যসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত সুদক্ষ সৈনিক, দূরদর্শী নেতা এবং রাষ্ট্রনায়ক। বাজীরাও এ-কথা সুস্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পতনোন্মুখ মুঘলদের হাত হইতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা একমাত্র মারাঠারাই গ্রহণ করিতে পারে। এজন্য ভারতে হিন্দু-চেতনা জাগাইয়া তোলা প্রয়োজন। তিনি এই উদ্দেশ্যে "হিন্দু-পাদ্-পাদশাহী" তাঁহার আদর্শ হিসাবে প্রচার করেন। তিনি তাঁহার পিতার অনুসৃত মারাঠা সাম্রাজ্যবাদ অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকেন। তিনি তাঁহার বিরোধী শক্তিগুলিকে কিভাবে দমন করিতে হয় সে-কথা ভালভাবেই জানিতেন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ত্রিম্বক রাও, নিজাম এবং দ্বিতীয় শম্ভুজীর পরিকল্পনাকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষমতা হোলকার, সিন্ধিয়া, ফাদকে, পাওয়ার প্রভৃতিকে নিজপক্ষে টানিতে সাহায্য করিয়াছিল। রাজপুত বুন্দেলা, জাঠ প্রভৃতি হিন্দুদের সহিত সম্মিলিতভাবে সমগ্র ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। সোয়াই জয় সিংহ এবং ছত্রশালের সহিত মিত্রতা তাঁহাকে বিপদে সাহায্য করিয়াছিল।

তাঁহার কৃতিত্ব সম্পর্কে দ্বিমত

'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী'র আদর্শ

কৃতিত্ব

বাজীরাও ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। তিনি পাঞ্জাব হইতে বাংলাদেশ মারাঠাদের অধীনে (১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাজীরাও-এর চেষ্টায় পিতা ও পিতামহের ন্যায় কেবল মারাঠা রাষ্ট্রের রাজপদেই শাহুর মর্যাদা সীমাবদ্ধ ছিল না, উহা ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজওয়াড়া, সাভারকার, এবং বহু অপরাপর লেখক বাজীরাও তাইমুরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া এক বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কে. এম. পানিক্করও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শিবাজী যেখানে মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বাজীরাও সেখানে সেই রাজ্যকে এক সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করিয়া-

বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতামত

পানিক্করের মতামত

ছিলেন। তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মারাঠা নেতা যিনি মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে মারাঠাদিগকে স্থাপন করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

বিরোধী মত

কোন কোন ঐতিহাসিক বাজীরাও-এর ব্যক্তিগত জীবনে ব্যভিচার, ধর্মাচরণে অনীহা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং দাক্ষিণাত্যে নিজামকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করিবার পূর্বেই উত্তর-ভারতের দিকে অগ্রসর হইবার অদূরদর্শিতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিজামের বিরুদ্ধে একমাত্র সাফল্যে তিনি যাহা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা হইল চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার। এই সকল ঐতিহাসিকের মতে নিজামের ন্যায় শত্রুকে পশ্চাতে রাখিয়া হিন্দুস্থান জয়ে প্রবৃত্ত হওয়া বাজীরাওয়ের পক্ষে নির্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছিল।

ডক্টর ডিঘি'র অভিমত

ডক্টর ডিঘি'র মতে বাজীরাও মারাঠা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক বা অপর কোন সংস্কার সাধন করেন নাই; জনসাধারণের উপকার হইতে পারে, সেইরূপ কোন কর্মপন্থা তিনি গ্রহণ করেন নাই। সামন্ত-প্রথা-জনিত যে-সকল বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতা শিবাজীর মৃত্যুর পরই দেখা দিয়াছিল, সেগুলি তিনি দমনের চেষ্টা করেন নাই।

উপসংহার

তথাপি উপসংহারে এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার কৃতিত্বের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে-সকল মতামত ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বিচার করিলে সপক্ষের যুক্তিই অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণিত হয়। সার যদুনাথ বলেন, অন্যান্য বহু কৃতিত্বের উপর, সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল বাজীরাওয়ের দূরদর্শিতা, সামরিক দক্ষতা, এবং ইংলণ্ডের সার ওয়ালপোলের ন্যায় মারাঠা রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রি-পদের সুযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই বাজীরাও-এর কৃতিত্ব ও ব্যক্তিত্বের এবং দূরদর্শিতার উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করিয়াছেন।

বালাজী বাজীরাও-এর পেশওয়া-পদ লাভ

বালাজী বাজীরাওঃ বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশওয়া-পদ লাভ করেন। ইনি নানাসাহেব নামেও পরিচিত। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহুর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি উইল করিয়া পেশওয়ার হস্তে মারাঠা রাষ্ট্রের সর্বাত্মক ক্ষমতা দান করিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য শিবাজীর বংশধরগণকে রাজপদে অধিষ্ঠিত রাখিবার শর্তও এই উইলে লিপিবদ্ধ ছিল। তারাবাঈ ও গাইকোয়াড় এই উইল অগ্রাহ্য করিয়া সাময়িকভাবে বালাজী বাজীরাওয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু বালাজী বাজীরাও এই বিদ্রোহ দমন করিয়া মারাঠা রাষ্ট্রে পেশওয়ার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' আদর্শ ত্যাগ

বালাজী তাঁহার পিতার ন্যায়ই সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার পিতার অনুসৃত নীতি ত্যাগ করিয়া মারাঠা বাহিনীতে অ-হিন্দু সৈনিক গ্রহণ করিতে শুরু করেন। ফলে মারাঠা বাহিনীর জাতীয়তাবোধ হ্রাস পাইতে থাকে। ইহা ভিন্ন, তিনি তাঁহার পিতার 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' আদর্শ ত্যাগ করিয়া হিন্দু রাজগণের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই নূতন নীতির ফলে আপাতদৃষ্টিতে কোন কুফল পরিলক্ষিত না হইলেও ক্রমে এই সকল কারণেই মারাঠা সংহতি বিনষ্ট হইয়াছিল।

বালাজী বাজীরাও পিতার নীতি অনুসরণ করিয়া মারাঠা রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন। তাঁহার আমলে মারাঠা শক্তি ও মর্যাদা চরমে পৌঁছিয়াছিল, এমন কি দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলম বালাজী বাজীরাও-এর হাতের পুতুলে পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি উদ্‌গীর নামক স্থানে নিজামকে পরাজিত করিয়া এবং বিজাপুর, দৌলতাবাদ, অসীরগড় প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া মারাঠা জাতিকে এক অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অধিককাল স্থায়ী হইল না। মারাঠাগণ পাঞ্জাব অধিকার করিলে আহ্‌ম্মদ শাহ্ আব্‌দালীর সহিত তাহাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রান্তরে আহ্‌ম্মদ শাহ্ আব্‌দালীর সহিত মারাঠাগণের এক যুদ্ধ হইল। ইহা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে খ্যাত। অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা, রুহেলা দলপতি নজিব খাঁ-ও মারাঠা পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে আব্‌দালীর সমরকুশলী সেনাবাহিনীর হস্তে মারাঠাগণের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। মারাঠা পক্ষের বহু সেনাপতি ও অগণিত সৈনিক যুদ্ধে নিহত হইল। বালাজী বাজীরাও পূর্ব হইতেই অসুস্থ ছিলেন, যুদ্ধে মারাঠা বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ পাইয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল (১৭৬১)।

বালাজী বাজীরাও-এর অধীনে মারাঠা শক্তির চরম বিকাশ

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ : মারাঠা শক্তির পরাজয় (১৭৬১)

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর আর মারাঠা শক্তিকে পুনঃ-সঞ্জীবিত করা সম্ভব হইল না। এই যুদ্ধে পরাজিত হইবার ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিল। মারাঠা শক্তিসংঘ অর্থাৎ পেশওয়ার অধীনে গাইকোয়াড়, সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলে প্রভৃতি লইয়া যে মারাঠা রাষ্ট্র গঠিত ছিল, উহা ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মারাঠা শক্তির পতনের ফলে পাঞ্জাবে শিখদের অভ্যুত্থান সহজ হইল। তথাপি পানিপথের যুদ্ধের পরে আংশিকভাবে মারাঠা শক্তি পুনর্গঠিত হইলেও উদীয়মান ব্রিটিশ শক্তিকে প্রতিহত করিবার মত শক্তি আর তাহারা সঞ্চয় করিতে পারিল না। সুতরাং পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণের ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গঠনের সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ব্রিটিশ শক্তিকে বাধা দিবার মত কোন শক্তি আর ভারতবর্ষে রহিল না।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফল

বালাজী বাজীরাও-এর মৃত্যুর (১৭৬১) পর তাঁহার সপ্তদশবর্ষীয় তরুণ পুত্র মাধবরাও পেশওয়া হইলেন। তিনি অসাধারণ রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে মারাঠাগণ তাহাদের হৃতগৌরব কতকাংশে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাধবরাও-এর মৃত্যু হইলে মারাঠা শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার আর কেহ রহিল না।

পেশওয়া প্রথম মাধবরাও

———

অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

(State, Society, Economy, Education, *Literature and Culture of the 18th Century India*)

রাষ্ট্র (State) : সাধারণ্যে এই ধারণা বিদ্যমান যে মুঘল তথা অষ্টাদশ শতকে মুসলমান রাষ্ট্রগুলি ছিল ঐশ্লামিক রাষ্ট্র। কিন্তু সামান্য অনুধাবন করিলেই বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, যদিও মুঘল বাদশাহ্গণ ধর্মে মুসলমান ছিলেন, তাঁহাদের অধীন রাষ্ট্র ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্র ছিল না। কারণ এই রাষ্ট্র কোন মুসলমান ধর্মজ্ঞানীদের নির্দেশ অনুযায়ী চলিত না। ইহা ভিন্ন, বাদশাহের ব্যক্তিগত ধর্মমত তাঁহার প্রশাসনিক নীতির উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিত না। অধ্যাপক হাবিব বলেন, বিদেশী জাতি-সম্ভূত মুসলমান শাসকগণ ভারতের সিংহাসনে ছয় হইতে সাত শত বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা "ঐশ্লামিক প্রশাসন" বলিতে যাহা বুঝায় ঠিক তাহাই যদি চালু করিতেন তাহা হইলে ভারতে মুসলমান শাসন এক পুরুষও টিকিয়া থাকিতে পারিত না।*

মুসলমান রাজত্বে ঐশ্লামিক শাসন ছিল না

ঐশ্লামিক শাসন ছিল না—এই কারণে মুসলিম শাসন দীর্ঘস্থায়ী

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর এত অল্প সময় রাজত্ব করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, এবং হুমায়ুন এত বেশি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা কেহই মুঘল প্রশাসনের দিকে নজর দিতে পারেন নাই। আকবরই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ করেন, কিন্তু তিনি প্রশাসনকে ঐশ্লামিক ধর্মনীতির প্রভাবাধীন করেন নাই। তিনি সকল ধর্মের প্রতিই সমান দৃষ্টি দিতেন এবং ধর্মে ও ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদগুলিতে তিনি অ-মুসলমানদের নিয়োগ করিয়াছিলেন। এমন কি, উলেমাদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া তিনি নিজেই ধর্ম-সম্পর্কে মতামত দিতেন। এই সকল মতামতের অন্যতম প্রধান উল্লেখ্য হইল জিজিয়া করের অবসান। আবুল ফজলের মতে রাজপদ ছিল ভগবানের দান। এই পদাধিকারী সকল প্রজাকেই যদি সমান চক্ষে না দেখেন এবং কাহারো কাহারো প্রতি পুত্রের মত এবং কাহারো কাহারো প্রতি বিমাতৃ-সুলভ আচরণ করেন, তাহা হইলে তিনি সেই উচ্চপদের উপযুক্ত নহেন। আকবর আবুল ফজল এর সংজ্ঞা অনুসারে শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন।

বাবর ও হুমায়ুনের প্রশাসনের প্রতি নজর দিবার সুযোগের অভাব

আকবরের ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসন

আকবরের সকলের প্রতি সমব্যবহারের নীতি অনুসরণ

---

* "It is true that Muslim Kings, mostly of foreign extraction, sat on Indian thrones for six or seven centuries. But they could only do so because their enthronement was not the enthronement of "Muslim rule", had it been otherwise, they could not have lasted for a single generation. Prof. Habib, *Medieval India Quarterly*, p. 5, Also Tara Chand, *History of the Freedom Movement in India*. vol. I. p. 111.

পরবর্তী বাদশাহ্‌দের আমলে আকবরের নীতি পরিত্যক্ত

পরবর্তী বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর হইতে শুরু করিয়া ঔরংজেব অবধি সকলেই আকবরের উদার প্রশাসনিক নীতি অনুসরণ করেন নাই। ঔরংজেব আকবরের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত প্রশাসনিক নীতি চালু করিয়াছিলেন।

এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুঘল বাদশাহ্‌গণ সুলতানী আমলের সুলতানদের ন্যায় খলিফার প্রতিনিধি হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন না। তাঁহাদের রাষ্ট্র-ধারণা ছিল পারসিক রাষ্ট্র-ধারণার অনুসরণ।

মুসলমান রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের কোন ক্ষমতা ছিল না। হজরত মহম্মদ কর্তৃক প্রদত্ত আইনের পর আর কোন নূতন আইন সংযোজন করা সম্ভব ছিল না। মুজাহিদ অর্থাৎ মুসলমান ধর্মজ্ঞানীদের মধ্যে ধর্মীয় আইন সংক্রান্ত বিভেদ দেখা দিলে আকবর নিজ অভিমত সিদ্ধান্ত হিসাবে চালু করিবার হুকুম দিতেন।

ঐশ্লামিক আইন—কোরান ও হাদিত

হিন্দুদের আইন-কানুন রঘুনন্দন, মিত্র মিশ্র প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের টীকার উপর নির্ভরশীল ছিল। ঐশ্লামিক আইনশাস্ত্র কোরান ও হাদিত হইতে গৃহীত হইয়াছে। এইগুলিতে ব্যক্তিগত, সামাজিক, দেওয়ানি, ফৌজদারী, শাসনতান্ত্রিক, সর্বপ্রকার আইনের উল্লেখ আছে। বিবাহ, সম্পত্তি বিষয়ে ঐশ্লামিক আইন অত্যন্ত দৃঢ় এবং কঠোর। মুসলমান-অ-মুসলমান বিবাহ ঐশ্লামিক আইনে স্বীকৃত।

বিচার-ব্যবস্থা

বিচারের ক্ষেত্রে মহকুমা, জেলা, প্রদেশ প্রভৃতিতে ক্রমপর্যায়ে কাজি বিচারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। সর্বোপরি ছিলেন প্রধান কাজি (কাজি-উল-কাজাত)। সর্বশেষ পর্যায়ে বাদশাহের সম্মুখে বিচারপ্রার্থী হওয়া যাইত।

মুঘল শাসনব্যবস্থায় তিনটি সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একটি হইল মোঙ্গল প্রভাব।

মুঘল প্রশাসনে মোঙ্গল, ইরানীয ও ভারতীয় প্রভাব

সামরিক সংগঠন, এবং সেনাবাহিনীর স্তর-বিন্যাসে মোঙ্গল প্রভাবের সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। প্রশাসনিক ব্যবস্থায়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজসভার মর্যাদা, শিল্পকলা, শিল্পজ্ঞান প্রভৃতিতে ইরানীয় প্রভাব এবং অর্থনৈতিক প্রশাসন ও ভূমি-রাজস্ব ব্যাপারে ভারতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সমাজ (Society)ঃ ভারতের সমাজ-সংগঠন চিরকালই এক অতিশয় জটিল ব্যবস্থা। চিরাচরিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি শ্রেণী ভিন্ন বহু সংখ্যক উপ-শ্রেণী, সংকর শ্রেণীর উদ্ভব সমাজ-সংগঠনকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। হিন্দু সমাজে শ্রেণী বা জাতি, জন্ম, পেশা, বিবাহ-সম্পর্ক খাদ্য-পানীয় গ্রহণ, এই ধরনের নানা প্রকার কারণে নির্ণীত হইত।

হিন্দু সমাজ-সংগঠনের জটিলতা

স্বভাবতই হিন্দু সমাজের জাতি-প্রথা সম্পর্কে বহু গ্রন্থাদি রচিত হইলেও সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া সম্ভব হয় নাই। হিন্দু জাতি বিভাগ মোটামুটি একই রূপ থাকিলেও তাহাতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

উপদলের অস্তিত্ব জটিলতা বৃদ্ধির কারণ

হিন্দু সামাজিক সংগঠনের জটিলতা উপদলগুলি আরও জটিল করিয়া দিয়াছে। বিভিন্ন উপদলের বিবাহের রীতি-নীতি, এক দলের সহিত অপর দলের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নিয়ম-

কানুন বা বাধা-নিষেধ, পারস্পরিক খাওয়া-দাওয়া করিবার বিধি-ব্যবস্থা, বিভিন্ন দলের আপেক্ষিক সামাজিক মর্যাদা সমস্ত কিছু মিলিয়া সমাজ-ব্যবস্থার জটিলতা বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছে। মূলত একই জাতি-সম্ভূত হইয়াও উপদলীয় স্বার্থ কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা আনিয়াছে। যেমন, জয়পুরের কচ্ছয়াইওয়া, যোধপুরের রাঠোর, উদয়পুরের শিশোদিয়া—এই তিনটি প্রধান রাজপুত জাতি উপদল, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও মর্যাদার প্রতিযোগিতায় অন্ধ হইয়া মুঘল বা মারাঠাদের অধীন থাকিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। তথাপি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে সংগঠিত হইতে তাহারা রাজী ছিল না।

উপদলীয় বিদ্বেষ বিচ্ছিন্নতার সহায়ক

অষ্টাদশ শতকের বহু পূর্বেই মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমন হিন্দু সমাজকে একদিকে যেমন অধিকতর রক্ষণশীল করিয়া তুলিয়াছিল, অপর দিকে মুঘল সম্রাটদের আমলে বিশেষভাবে, এবং কাশ্মীরে, হিন্দু-মুসলমান বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পথও উন্মুক্ত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, হিন্দুদের যে-অংশ ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়াছিল উহা "নৌ-মুসলমান" অর্থাৎ নূতন মুসলমান নামে অভিহিত হইত। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও উপদলীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব মুসলমান সামাজিক সংগঠনের জটিলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐশ্লামিক ধর্মনীতি অনুসারে মুসলমানদের মধ্যে একাধিক জাতি অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথা থাকা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবধান অষ্টাদশ শতক এবং উহার পূর্ববর্তী কালেও বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, সৈয়দ বংশ আরব এবং মধ্য-এশিয়ার মুঘলদের বংশসম্ভূত বলিয়া দাবি করিতেন। বস্তুত মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দগণ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হিন্দুদের ন্যায় মুসলমান সমাজেও "শরিফ" (Noble) এবং "রাধিল" (ignoble) এই দুই শ্রেণী ছিল। শেষোক্ত শ্রেণী প্রধানত ধর্মান্তরিত হিন্দুদের লইয়া গঠিত ছিল। ইহা ভিন্ন, পেশাগত শ্রেণী যেমন জোলা, ভিস্তি, কসাই, লালবেগী প্রভৃতি মুসলমান সমাজের নিম্নস্তরে ছিল।

মুসলমানদের আগমন : হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি : হিন্দু-মুসলমান বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন

মুসলমান সামাজিক সংগঠন

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন ভারতবাসী বলিতে অষ্টাদশ শতকে হিন্দু, মুসলমান উভয় সমাজকেই বুঝায়, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুই শ্রেণী এক ঐক্যবদ্ধ জাতি (nation) বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তখন গড়িয়া উঠে নাই।

ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতি (Nation) গড়িয়া উঠে নাই

সমাজ-জীবনের কেন্দ্রস্থল ছিল গ্রাম। গ্রামের অধিবাসীরা সাধারণত উচ্চ শ্রেণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শরিফ, কৃষক, শ্রমিক এবং অন্ত্যজ শ্রেণী ও রাধিল (নিচ মুসলমান শ্রেণী) এই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অবশ্য এই কয়টি শ্রেণীই যে গ্রামে বসবাস করিত এমন নহে, আরও বিভিন্ন উপশ্রেণী, উপদলীয় লোকও বসবাস করিত। মোটামুটি ভাবে একটি গ্রামে সাধারণত পনর হইতে কুড়িটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের বাস ছিল।

গ্রাম সমাজ-জীবনের কেন্দ্রস্থল

গ্রামবাসীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে কর্তব্য সম্পাদন

গ্রামবাসীর কার্যকলাপের মধ্যে নিজ নিজ শ্রেণী বা জাতির নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখা, নানাবিধ ধর্মাচরণ করা, কৃষি, কুটিরশিল্প প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, মহাজন প্রথায় অর্থ লগ্নির ব্যবস্থা। উদ্‌বৃত্ত ফসল গ্রামের বাহিরে চালান দেওয়া, টুল, মক্তব পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম

অর্থনীতি (Economy): অষ্টাদশ শতকে ভারতের অর্থনৈতিক চিত্রাঙ্কনে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তখনকার গ্রাম মাত্রেই ছিল অর্থনীতির দিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষি, গ্রামের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উৎপাদনের উপযুক্ত কুটিরশিল্প ব্যবস্থা, উদ্‌বৃত্ত ফসল অন্যত্র চালান দেওয়া প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্তব্যকার্যের মাধ্যমে গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ।

ভারতে নগর ও শহরের প্রাচুর্য

গ্রাম-প্রধান ভারতবর্ষে সেই যুগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে নগর, শহরের অভাব ছিল না। কিন্তু এই সকল নগর, শহরের সামান্য অংশই শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। অধিকাংশ গড়িয়া উঠিয়াছিল গ্রাম হইতে ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে। আকবরের আমলে ১২০টি নগর এবং ৩২০০টি শহর ছিল। দিল্লী সমসাময়িক কালের ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরীর সহিত তুলনীয় ছিল এবং আগ্রা জনসংখ্যার দিক দিয়া লণ্ডন শহর অপেক্ষাও বৃহত্তর ছিল। কিন্তু ইওরোপীয় নগর-শহরের ন্যায় ভারতীয় নগর-শহরে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী সমাজ গড়িয়া উঠে নাই। অষ্টাদশ শতকে পুনঃ-পুনঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদেশী আক্রমণ প্রভৃতির ফলে উত্তরে লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইওরোপীয়দের আগমনের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে-উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছিল। ইওরোপীয় ব্যবসায়ীরা ভারতীয় জিনিসপত্র কিনিবার ফলে সোনা, রূপা যাহা ভারতে আসিয়াছিল তাহাতে ভারতের শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়—ইওরোপীয় বণিকদের আগমনে বহুলাংশে দূরীভূত

শিল্পোৎপাদনে গ্রাম ও নগর-শহরের সমগুরুত্ব

ভারতের শিল্প, কলা যাহা সমাজের উচ্চ শ্রেণীর প্রয়োজন মিটাইত, তাহা কেবল শহরেই উৎপন্ন হইত এমন নহে। এইগুলি গ্রাম ও নগর-শহরে উভয় স্থানেই উৎপন্ন হইত। কোন কোন জিনিস আবার কোন কোন গ্রামে বা শহরে উৎপন্ন হইত। কোন কোন গ্রাম মসলিন, সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্র প্রভৃতি উৎপাদনে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিল। রেশমী কাপড়, সোনালী ও রূপালী সুতা উৎপাদনে কয়েকটি কেন্দ্র বিশেষত্ব অর্জন করিয়াছিল।

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিদেশে বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন

ভারতীয় বণিকগণ ভারতে উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রয়ার্থ পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর অঞ্চল এবং কান্দাহার, কাবুল, বখ্, বুখারা, খাসগড়, মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান, শিরাজ, ইস্‌পাহান, রাশিয়া, ইরান প্রভৃতি দেশে ব্যবসায়-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল।*

* Hamilton, *Problems of Middle East*, p. 62

গ্রামাঞ্চলের শিল্প দ্রব্যাদি গ্রামের কৃষক শ্রেণীই কৃষিকার্যের উদ্বৃত্ত সময়ে উৎপাদন করিত। গ্রামের শিল্পোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

গ্রামের শিল্পোৎপাদন কৃষকগণ উদ্বৃত্ত সময়ে করিত

শহরাঞ্চলে কারখানা নামে উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। এইগুলি সমাজের উচ্চতম শ্রেণী, বাদশাহ্, আমীর-ওমরাহ্, প্রভৃতির প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিত।

কারখানা

শিল্প কর্মীরা প্রায়ই দরিদ্র ছিল বলিয়া তাহাদিগকে উৎপন্ন সামগ্রীর দালালগণ দাদন অর্থাৎ অগ্রিম অর্থ দিত এবং তাহার বিনিময়ে উৎপন্ন সামগ্রী লইয়া যাইত। ইহাতে প্রকৃত উৎপাদন অর্থাৎ প্রস্তুতকারক বা মজুর স্বভাবতই উৎপন্ন সামগ্রীর উপযুক্ত মূল্য হইতে বঞ্চিত হইত।

দালাল শ্রেণী ও দাদন-প্রথা

ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় বলিতে ব্যবসায়ী, মহাজন এবং ঋণদানের প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইত। ইহা ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসাবে পরিগণিত হইত। ইহাদের অনেকেই বাণিজ্য-বন্দরে তাহাদের কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিত।

বণিক-সম্প্রদায়

উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে সূতীবস্ত্র, রেশমী সূতা ও বস্ত্র, ধাতু-নির্মিত দ্রব্যাদি যেমন লোহা, ইস্পাত, তামা, কাঁসা, সোনা, রূপা প্রভৃতি দিয়া তৈরী নানাবিধ সামগ্রী, অলঙ্কার প্রভৃতি, নীল, তামাক, আফিং প্রভৃতি কৃষিজাত সামগ্রী ; খনিজ দ্রব্যের মধ্যে লবণ, হীরা, টিন, সোরা প্রভৃতি উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে প্রধান হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উৎপন্ন সামগ্রী

সূতীবস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল ঢাকা, বারাণসী, আগ্রা, মুলতান, বুরহানপুর, লাহোর, আহ্‌ম্মদাবাদ, পাটনা, বরোদা, ভারুচ, সুরাট প্রভৃতি। রেশম দ্রব্য, পশমী সামগ্রী, শন, পাট প্রভৃতি প্রধানত বাংলাদেশে উৎপন্ন হইত।

উৎপাদনের কেন্দ্রসমূহ

অন্তর্দেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্য প্রধানত জলপথেই পরিচালিত হইত। এজন্য প্রয়োজন হইত নৌকা এবং সমুদ্রগামী বাণিজ্যপোতের। নৌকা নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা, এলাহাবাদ, লাহোর, মসুলিপত্তনম্, কালিকট, পুলিকট, বেসিন, সুরাট ও গোয়া। সমুদ্রপোত নির্মাণে ভারতবর্ষ ইওরোপীয় দেশগুলি হইতেও অগ্রসর ছিল, এ-কথা পার্কিনসন নামক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতা উল্লেখ করিয়াছেন।* সমুদ্রপোত গোয়া, বেসিন, সুরাট, মসুলিপত্তনম্, সাতগাঁও, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নির্মিত হইত।

সমুদ্রপোত নির্মাণ-কেন্দ্রসমূহ

অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে কাঁচা রেশম, হাতীর দাঁত, সীসা, কচ্ছপের খোলা, প্রবাল, টিন, জিঙ্ক, পারদ, সোনা, রূপা, তামা আমদানি করিত। রপ্তানি করিত সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র, রেশমী বস্ত্র, মসলা, নীল, চিনি, ঔষধ, মূল্যবান পাথর এবং নানা ধরনের অপরাপর মূল্যবান সামগ্রী।

আমদানি

রপ্তানি

* Parkinson, *Trade of the Eastern Seas*, p. 50

শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (Education, Art, Literature and Culture) : অষ্টাদশ শতকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় শিক্ষা-ব্যবস্থাই ছিল অনগ্রসর এবং পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞানের অগ্রসরতা সম্পর্কে তাহাদের কোন ধারণা এমন কি, ঔৎসুক্যও ছিল না। অথচ মধ্যযুগের অন্ধকার হইতে মুক্তি পাইবার উপায় হিসাবে পাশ্চাত্য জগৎ ভারতীয় গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞানের ব্যবহার করিয়াছিল। অনুরূপ মুসলমানের মধ্যেও গ্রীক ও ভারতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট উন্নত জ্ঞান ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রে, রসায়নশাস্ত্রে আরবের মুসলমানগণ যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিল। মুসলমানদের নিকট হইতে লব্ধ বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্পর্কে পঠন-পাঠন ইওরোপীয় যথা, ইতালীয়, স্পেনীয়, ফরাসী প্রভৃতি খ্রীষ্টান বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে চলিতেছিল। অথচ সেই সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায় তাহাদের সেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা অর্থাৎ টোল ও মক্তবের পড়াশুনায় সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল। ঊনবিংশ শতকের পূর্বাবধি পাশ্চাত্যের শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের কোন ব্যবস্থা ভারতে শুরু হয় নাই।

অনগ্রসর শিক্ষা-ব্যবস্থা

পূর্বেকার হিন্দু ও মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন বিস্মৃত

হিন্দুদের টোল, মুসলমানদের মক্তব—শিক্ষা-ব্যবস্থা

অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষণীয় বিষয় ছিল উহার সাম্প্রদায়িক পঠন-পাঠন। হিন্দুদের শিক্ষা ছিল সংস্কৃত-ভিত্তিক। ইহার মাধ্যমে দর্শন, মীমাংসা, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু সাধারণত ব্রাহ্মণরাই এই সুযোগ গ্রহণ করিত। অপর শিক্ষা-ব্যবস্থায় কেবল দৈনন্দিন জীবনের হিসাবপত্র রাখা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় হিসাব রাখা প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনুরূপ মাদ্রাসা-মক্তবে আরবী, ফার্সী শিক্ষা দেওয়া হইত। সাধারণ লোকের জন্য সামান্য হিসাবপত্র জানিবাব জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সরকারী চাকরি গ্রহণেচ্ছুদের ফার্সী ভাষা ভালভাবে শিক্ষা করিতে হইত। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করিত।

সম্প্রদায়-ভিত্তিক শিক্ষা

অষ্টাদশ শতকের মানসিক প্রসার ও উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় সেই যুগের শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্যে। ঔরংজেবের রাজত্বকালের পূর্বাবধি শিল্প ও স্থাপত্য-কর্মে মুঘল বাদশাহদের অবদান অদ্যাবধি দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু ঔরংজেবের সময় হইতে এই বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়। অষ্টাদশ শতকে সেই কারণে শিল্পকলা ও স্থাপত্য-কার্যের যাহা কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, সে-সকলই প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উৎসাহে সম্পন্ন হইয়াছিল। অযোধ্যার নবাবদের অবদান এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ঔরংজেবের আমল হইতেই স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষে যে-অবনতি ঘটিতে শুরু হইয়াছিল অষ্টাদশ শতকে তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। চিত্রশিল্প

শিল্পকলা ও স্থাপত্য

ঔরংজেবের রাজত্বকাল হইতে স্থাপত্য ও চিত্র-কলার অবনতি

যাহা শাহ্জাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা পরবর্তী কালে বিশেষভাবে ঔরংজেবের গোঁড়ামির ফলে যেভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে ক্রমেই অতিশয় দুর্বল এবং শিল্প-কৌশলে নিম্নমানের হইয়া পড়িয়াছিল। দিল্লী হইতে দূরবর্তী অঞ্চলে যেখানে বৈদেশিক আক্রমণের সর্বনাশাত্মক ফলাফল বা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাৎ দিল্লীর বাদশাহের গোঁড়ামির আওতার বাহিরে ছিল, সেই সকল অঞ্চলে চিত্রশিল্প উহার বলিষ্ঠ শিল্প-শৈলী বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলে চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ বিদ্যমান

সাহিত্য হইল সমাজের দর্পণস্বরূপ। সমাজের পরিবর্তন সাহিত্যেই বিধৃত হয়। সমাজের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সঙ্গীতও অনুরূপ সমাজের মানুষের অন্তস্তলের গভীর অনুভূতি প্রকাশের সহায়ক। মুঘল আমলে এই সকল ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধি আসিয়াছিল। দিল্লী, গোয়ালিওর, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া আমীর খসরু, তানসেন, বৈজু, আবুল ফজল প্রভৃতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা যখনই হ্রাস পাইতে লাগিল, তখন হইতেই এই সকল ক্ষেত্রে এক অবনতি পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যে এই অবনতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে উত্তর-ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রসারিত হইবার ফলে উর্দু ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। মুসলমান, হিন্দু সকলেই উর্দু ভাষাকেই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিত। এই সময়ে যে-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সমসাময়িক সমাজের যাবতীয় দুর্দশার চিত্র স্বভাবতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। হতাশা ও নৈরাশ্যের অন্ধকার যেন সেই সাহিত্য-কীর্তিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। এই অবস্থা হইতে মুক্তির উপায় হিসাবে উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যিকগণ বাস্তববাদিতা ত্যাগ করিয়া কল্পনাজগতের অর্থাৎ রোমান্টিসিজমের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শব্দ-যোজনা, তাঁহাদের সীমাহীন কল্পনার জগৎ উর্দু ও হিন্দি ভাষাকে এক অতি সুন্দর, অভিনব রূপ দান করিল। উর্দু সাহিত্যিকদের মধ্যে সৌদা, মীর, মোমিন এবং গালিবের নাম বিশেষ উল্লেখ্য। হিন্দি ও উর্দু ভিন্ন উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের সাহিত্য ক্ষেত্রেও এক অবনতির যুগ অষ্টাদশ শতকে দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যেও প্রাচীন সাহিত্য-রীতিরই এক দুর্বল অনুকরণ ঐ সময়ে পরিলক্ষিত হয়।

মুঘলযুগে সাহিত্যের উৎকর্ষ

অষ্টাদশ শতকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নৈরাশ্য ও হতাশা

রোমান্টিসিজমের উদ্ভব

উর্দু, হিন্দি ও অপরাপর আঞ্চলিক ভাষার অবনতি

অধ্যায় ৫

আধুনিক যুগের সূচনা

(Beginning of The Modern Period)

"আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে—
* * *
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে॥"

—রবীন্দ্রনাথ

আধুনিক যুগ (Modern Period): স্তিমিতপ্রায় মুঘল সাম্রাজ্য যে-দিন শ্মশানশয্যা রচনা করিয়া যবনিকার অন্তরালে আত্ম-অপসরণে উদ্যত, স্পর্ধিত মুঘল সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড যে-দিন ধূল্যবলুণ্ঠিত, সেইদিন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রেই ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় ঐ রাজদণ্ড শিথিল মুঘল-মুষ্টি হইতে হস্তগত করিয়া বিশাল ভারতের কোটি কোটি নরনারীকে এক নূতন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। তদানীন্তন ভারতবাসীর রাজনৈতিক ঔদাসীন্য ও অনৈক্যের শাস্তিস্বরূপ প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া ইংরাজগণ অপ্রতিহতভাবে ভারতের বুকে শাসন ও শোষণ চালাইতে সক্ষম হইয়াছিল। ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাসের প্রথমাংশ সেই কারণে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণতিরই ইতিহাস, বলা বাহুল্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রধানত বাণিজ্য-বিস্তারের সূত্র ধরিয়াই প্রসারলাভ করিয়াছিল।

ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় কর্তৃক মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ গ্রহণ : বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত

দীর্ঘকালব্যাপী ইংরাজ শাসনে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। পর-সম্পদলোভী ইংরাজ বণিকদের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্পগুলির অপমৃত্যু ঘটিল। ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি হইয়া পড়িল পরমুখাপেক্ষী। যান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিবার এবং রেলপথ প্রভৃতি স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন গ্রাম্য জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিনাশপ্রাপ্ত হইল, অপরদিকে তেমনি মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ভিত্তিক এক নূতন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠিল। কিন্তু যে-বিষ প্রাণনাশ করে, উহাতেই আবার বিষক্ষয়ের ঔষধ নিহিত থাকে। ইংরাজ শাসনের ক্ষেত্রেও এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমে দেখা দিল এক নব-চেতনা বা জাগরণ। সমাজ-সংস্কার, কুসংস্কার হইতে মুক্তির আগ্রহ, জাতীয় আন্দোলন প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে এই নব-চেতনা প্রকাশলাভ করিল। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি হইল এই নব-জাগরণের অগ্রদূত।

ইংরাজ শাসনে ভারতের জাতীয় জীবনে পরিবর্তন

জাতীয় আন্দোলন

ইহার পর বহু বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-দুর্দশা ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলন সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর আন্দোলনের অভিনবত্ব, ভারতবাসীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা পৃথিবীর সকল অংশের নরনারীকে বিস্ময়াভিভূত করিল। এই আন্দোলনের শক্তিকে প্রতিহত করিবার ক্ষমতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরও ছিল না। প্রধানত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনে ভারতের মুক্তি আন্দোলন জয়যুক্ত হইল। অবশ্য এ-বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সন্ত্রাসবাদ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র কর্তৃক সংগঠিত আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ বা আই. এন্. এ , দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতীয় নৌসেনাদের বিদ্রোহ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপ প্রভৃতির উল্লেখযোগ্য দান রহিয়াছে, এ-কথা অনস্বীকার্য।

স্বাধীনতা লাভে কংগ্রেস, সন্ত্রাসবাদ, আই. এন্. এ., নৌসেনাদের বিদ্রোহ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রভৃতির অবদান

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট, প্রায় দুইশত বৎসরের পরাধীনতার পর ভারতবর্ষ ইংরাজ কবলমুক্ত হইল। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মরিবার কালেও ভারতভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া শেষ সর্বনাশটুকু সাধন করিয়া যাইতে ত্রুটি করিল না। ভারতবাসীর জাতীয় ঐক্য, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ঐক্য উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িকতার এবং দ্বি-জাতিতত্ত্বের কৃত্রিম ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা হইল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভস্মাবশেষ হইতে ভারত ও পাকিস্তান—এই দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। ভারতের জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত, ধারক ও বাহক বাঙালী জাতিকে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ করিয়া পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের অংশ হিসাবে 'পূর্ব-পাকিস্তান' নামকরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু পঁচিশ বৎসরের অধিক এই কৃত্রিম ব্যবচ্ছেদ টিকিল না। জাতি, ভাষা, সংস্কৃতির ঐক্য ও ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করিয়া যে-রাজনৈতিক ব্যবচ্ছেদ কার্যকর করা হইয়াছিল, পূর্ববঙ্গের বাঙালী তাহা যে অসম্ভব, এ-কথা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। ৮৫ শতাংশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান হইতে স্বাধীন হইয়া গিয়া ধর্মের ভিত্তিতে দেশ-বিভাগের মূঢ়তা প্রমাণ করিয়া দিয়া স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' গড়িয়াছেন এবং ভারতের বাঙালীদের সহিত আত্মার বন্ধন পুনঃস্থাপন করিয়াছেন। পাকিস্তান হইতে স্বাধীন হইবার পূর্বে বাংলাদেশের অধিবাসিগণের অনেকে বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আন্দোলন করিয়া শহীদ হইয়াছেন। বাংলা ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাহিত্যসেবীদের অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ পৃথক, সার্বভৌম রাষ্ট্র, কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্ম-নিরপেক্ষতা সকল দিক দিয়া উহা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সহিত একাত্ম। পাকিস্তান বলিতে আজ একমাত্র 'পশ্চিম পাকিস্তানকে'ই বুঝায়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ আঘাত

আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক উপাদান (Sources of Modern Indian History): ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানের অভাব নাই। পরন্তু উপাদানের প্রাচুর্য ঐতিহাসিককে কোন্‌টি ত্যাগ করিয়া কোন্‌টি গ্রহণ করা উচিত, সে-বিষয়ে কতকটা বিভ্রান্ত

পাঁচ প্রকারের উপাদান

করিয়া তোলে। এই সকল উপাদানকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া বিচার করা বাঞ্ছনীয়। যথা, (১) সরকারী কাগজপত্র, (২) সাধারণ ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত সমসাময়িক দলিল, (৩) ইওরোপীয় বাণিজ্য-কুঠিতে প্রাপ্ত কাগজপত্রাদি, (৪) সমসাময়িক ভারতীয়দের রচনা ও (৫) ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণের রচনা।

(১) **সরকারী কাগজপত্র (State Papers) :** ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনায় সরকারী কাগজপত্রের গুরুত্ব অত্যধিক, বলা বাহুল্য। অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রীয় বিষয়াদি সম্পর্কিত যাবতীয় কাগজপত্র এ-বিষয়ে অত্যন্ত সহায়ক।

সরকারী কাগজপত্রাদির গুরুত্ব

সরকারী কাগজপত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ফরাসী পর্যটক জ্যাকেমোঁ (Jaquemont)-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পর্যটনে আসিয়া তদানীন্তন সরকারী কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের সরকার 'কাগজ-কলমের দ্বারা পরিচালিত'। জ্যাকেমোঁর এই মন্তব্য হইতে ঐ যুগের ইতিহাস রচনায় সরকারী কাগজপত্রাদির গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। ব্রিটিশ শাসনকালে সরকারী কাগজপত্রের প্রাচুর্য এত অধিক যে, সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পাঠ করিয়া ঐ যুগের ইতিহাসের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা কোন কালেই সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যখন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, সেই সময় হইতে নানাপ্রকারের নথিপত্র,

দিল্লীর মহাফেজ-খানায় রক্ষিত দলিলপত্রাদি

সরকারী কাগজপত্রাদি সঞ্চিত হইতেছিল। এগুলি ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার অমূল্য উপাদান সন্দেহ নাই। নূতন দিল্লীতে জাতীয় মহাফেজখানায় (National Archives) রক্ষিত কাগজপত্রাদি, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পুণা, লাহোর প্রভৃতি স্থানে রক্ষিত সরকারী দলিলপত্রাদি ঐ যুগের ইতিহাস রচনার অপরিহার্য মূল্যবান উপাদান।

পোর্তুগীজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ মহাফেজ-খানায় রক্ষিত দলিলপত্রাদি

পোর্তুগীজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত অনুরূপ দলিলপত্রাদিতেও ব্রিটিশ শাসনকালে ইওরোপীয় দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়।

(২) **সাধারণ ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত সমসাময়িক দলিলপত্রাদি (Private Original Documents) :** ব্রিটিশ শাসনকালে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে

রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক কারণে আদান-প্রদান

ব্রিটিশ সরকারের সহিত বহু সংখ্যক পরিবারের আদান-প্রদান ও পত্র-বিনিময় চলিত। ঐ সকল কাগজপত্রাদি বহু পরিবারে এখনও পাওয়া যায়। এগুলি হইতেও বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কিন্তু এযাবৎ এইরূপ দলিলপত্রের সাহায্য ঐতিহাসিকগণ তেমন গ্রহণ করেন নাই।

(৩) **ইওরোপীয় বাণিজ্য-কুঠিতে প্রাপ্ত কাগজপত্রাদি (European Factory Papers) :** পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি

ইওরোপীয় বাণিজ্য-কুঠির কাগজপত্রাদি

ইওরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য-কুঠির কাগজপত্রাদি হইতেও সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক, বিশেষভাবে সমসাময়িক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়।

(৪) **ভারতীয়দের রচনা** (**Writings of the Indigenous Writers**): ব্রিটিশ যুগ তথা আধুনিক যুগের ইতিহাস গঠনে ফার্সী ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি সাধারণত সহায়ক নহে। কিন্তু 'সিয়ার-উল্-মুতাখ্রিণ' নামক ফার্সী গ্রন্থখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস রচনায় অপরিহার্য বলা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন, মারাঠী ভাষায় রচিত সমসাময়িক গ্রন্থাদি হইতেও এ-বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলির কয়েকখানি ইতিমধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। তামিল ভাষায় লিখিত এ. আর. পিলাই-এর ডাইরী, ফরাসী গবর্ণর দুপ্লে রচিত 'দুবাস' (*Dubash*) প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সমসাময়িক ইতিহাস রচনার বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের কয়েকটি ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

ফার্সী মারাঠী, তামিল প্রভৃতি ভাষায় রচিত সমসাময়িক গ্রন্থাদি

দুপ্লে রচিত 'দুবাস'

(৫) **ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের রচনা** (**Writings of the British Historians**): ব্রিটিশ যুগে বহু ইংরাজ কর্মচারী ভারতবর্ষে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের আবার জীবনস্মৃতিও প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলি হইতে সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক তথ্যাদিও সংগ্রহ করা যায়। এইরূপ ব্যক্তিগত রচনা ভিন্ন জেম্স্ মিল (James Mill), উইলক্স্ (Wilks), গ্রাণ্ট্ ডাফ্ (Grant Duff), ক্যানিংহাম (Cunningham) প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগের ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপাদান। অবশ্য এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সকল ঐতিহাসিকের রচনা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নহে। কিন্তু তাঁহাদের রচনায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে, এ-কথা মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

মিল, উইলক্স্, ডাফ্, কানিংহাম প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিক-গণের রচনা

ইওরোপীয়দের আগমন (**Advent of the Europeans**): পাশ্চাত্যের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ আধুনিক কালের কথা নহে। অতি-প্রাচীনকাল হইতেই পাশ্চাত্যের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও দূত-বিনিময়ের কথা আমাদের অবিদিত নহে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে আরব সাগর ও লোহিত সাগর পথে আরবগণের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হওয়ায় ভারতের সমুদ্রবাহী বাণিজ্য তাহাদের হাতে চলিয়া যায়। অবশ্য তখনও ইতালির ফ্লোরেন্স্, জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতি নগরের বণিকগণ আরবদের নিকট হইতে রেশম, মণি-মুক্তা, মূল্যবান পাথর, মসলা প্রভৃতি ভারতীয় পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ইতালির সর্বত্র এবং পাশ্চাত্যের সকল দেশে রপ্তানি করিত। কিন্তু মধ্যযুগের শেষ ভাগে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে পরস্পর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা যেমন বৃদ্ধি পাইল, তেমনি নব-আবিষ্কৃত সমুদ্রপথ ধরিয়া প্রাচ্যের দেশগুলির শোষণের ইতিহাসও শুরু হইল। বস্তুত, ভারতবর্ষে পৌঁছিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হওয়ায় পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাসে যে-সুদূরপ্রসারী প্রভাব

পাশ্চাত্যের সহিত ভারতের যোগাযোগ

পরিলক্ষিত হইয়াছিল, সমগ্র মধ্যযুগের অপর কোন একটি ঘটনা হইতে সেইরূপ হয় নাই। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীজ নাবিক বারথলোমিউ দিয়াজ (Bartholomew Diaz) আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ সীমায় উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই (১৪ই মে, ১৩৯৮) ঐ পথ ধরিয়া ভাস্কো-ডা-গামা (Vasco-da-Gama) কালিকট বন্দরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এইভাবে পাশ্চাত্য হইতে জলপথে ভারতবর্ষে পৌঁছিবার এক নূতন পথ আবিষ্কৃত হইল।

পাশ্চাত্য হইতে ভারতবর্ষে পৌঁছিবার জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ার ফল

ভারতে পোর্তুগীজদের আগমনের পশ্চাতে ভয়, ঈর্ষা ও উদ্দীপনা এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবের সমষ্টিগত ফল পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টান দেশগুলির উপর ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের আধিপত্য বিস্তারের ফলে পোর্তুগীজ জাতি নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকটা ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলির সহিত ভারত তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসমূহের বাণিজ্য-সম্ভার একমাত্র আরব দেশীয় মুসলমানগণই চালান দিত এবং প্রভূত পরিমাণ অর্থ রোজগার করিত। পোর্তুগীজ বণিকগণ ইহাতে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বাণিজ্যের অংশ তাহারাও গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর ছিল। ইহা ভিন্ন, ভারত এবং ভারতীয় অঞ্চলের অ-খ্রীষ্টানদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উৎসাহ-উদ্দীপনাও তাহাদিগকে ভারতীয় অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইতে অনুপ্রাণিত করিল।

ভারতের দিকে পোর্তুগীজদের অগ্রসর হইবার মূল কারণ

পর্তুগীজ বণিকদের ভারতে আগমন (Advent of the Portuguese in India): ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা কালিকট বন্দরে উপস্থিত হইলে স্থানীয় 'জামোরিণ' অর্থাৎ রাজা তাঁহার প্রতি উদার এবং প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু ভাস্কো-ডা-গামা প্রতিদানে জামোরিণের পাঁচজন প্রজাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পোর্তুগীজ-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন। পোর্তুগীজদের ভারতে আগমন সর্বপ্রথম জলপথে ভারত-আক্রমণের উদাহরণস্বরূপ। ইহার পূর্বাবধি একমাত্র ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথেই ভারত-আক্রমণ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, ভাস্কো-ডা-গামার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া দুই বৎসরের (১৫০০) মধ্যেই পেড্রো আল্‌ভারেজ্‌ কাব্রাল (Pedro Alverez Cabral) নামে জনৈক নাবিকের নেতৃত্বে তেরোখানি জাহাজ, বারো শত পোর্তুগীজ এবং প্রচুর পরিমাণ পণ্যদ্রব্য লইয়া কালিকট অভিমুখে যাত্রা করিল। ইহাই পোর্তুগাল হইতে দ্বিতীয় বাণিজ্য অভিযান। আল্‌ভারেজ্‌ কালিকটে পৌঁছিয়াই নিজ উদ্ধত আচরণহেতু জামোরিণের শত্রুতে পরিণত হইলেন। কালিকট বন্দরে ঐ সময়ে অসংখ্য আরব বণিক বাণিজ্যব্যপদেশে যাতায়াত করিত। বস্তুত, কালিকট বন্দরের সমৃদ্ধি আরবদের সহিত বাণিজ্যের ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আল্‌ভারেজ্‌ কালিকট বন্দর হইতে আরব বাণিকগণকে

ভাস্কো-ডা-গামা

পেড্রো আল্‌ভারেজ্‌ কাব্রাল

* Vide, *The Cambridge History of India*, vol. v, p. 4.

হিসাবে নেদারল্যাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানিগুলি 'ইউনাইটেড ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামে এক সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল (১৬০২)। এই সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি নামে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইলেও যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগদান, শান্তি-চুক্তি স্থাপন, দুর্গ-নির্মাণ, সৈন্য-পোষণ প্রভৃতি অধিকারও নেদারল্যাণ্ড সরকার হইতে লাভ করিল। ওলন্দাজ নাবিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতে আসিয়া প্রথমেই পোর্তুগীজগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িল। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা পোর্তুগীজ অধিকৃত এ্যাম্বোয়ানা (Amboyna) দখল করিয়া লইল; ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা জেন পীটারসুন কোয়েন (Jan Petersoon Coen) নামক নেতার নেতৃত্বে জাকার্তা জয় করিয়া সেই স্থানে বাটাভিয়া নামক ওলন্দাজ বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করিল। পীটারসুন কোয়েন-ই ছিলেন প্রাচ্যে ওলন্দাজ শক্তির প্রকৃত স্থাপয়িতা। সেই সময়ে ইংরাজ বণিকগণও মালয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু ওলন্দাজগণের অক্লান্ত চেষ্টায় অপর কোন ইওরোপীয় বণিক-সম্প্রদায় ঐ অঞ্চলে বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। ওলন্দাজগণ পোর্তুগীজদের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি দখল করিবার জন্যও চেষ্টার ত্রুটি করিল না। ১৬৩৬ হইতে ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহারা প্রতি বৎসর একবার করিয়া গোয়া আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশ্য এ-ব্যাপারে তাহারা সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে মালাক্কা এবং ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলের সর্বশেষ পোর্তুগীজ বাণিজ্য-কেন্দ্রটি জয় করিয়া ওলন্দাজগণ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়াস্থ দ্বীপগুলিতে এক অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত হইল। যবদ্বীপ সুমাত্রা, মালাক্কা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া ক্রমে ওলন্দাজ বণিকগণ করমণ্ডল, গুজরাট, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিতে সক্ষম হইল। ভারতবর্ষে ওলন্দাজ-কুঠিগুলির মধ্যে পুলিকট, সুরাট, নেগাপট্টম, কোচিন, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, বরানগর, পাটনা, বালেশ্বর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীল, রেশম, সোরা, চাউল, সুতীবস্ত্র, আফিং প্রভৃতি ছিল তাহাদের প্রধান রপ্তানি সামগ্রী।

ওলন্দাজ ইউনাইটেড ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন (১৬০২)

ওলন্দাজ-পোর্তুগীজ সংঘর্ষ

ভারতে ওলন্দাজ-কুঠি স্থাপন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ দ্বীপপুঞ্জে এবং ভারতবর্ষে ওলন্দাজ বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পোর্তুগীজ ও ইংরাজ বণিকদের সহিত সংঘর্ষ। ১৫৮০ হইতে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পোর্তুগালও স্পেনের অধীন ছিল। স্পেনের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ওলন্দাজগণ সর্বদাই বিদ্রোহ করিত। এই কারণে ওলন্দাজ ও স্পেনীয়দের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পোর্তুগাল স্পেন কর্তৃক অধিকৃত হইলে ওলন্দাজগণ পোর্তুগীজদের সহিতও শত্রুতা শুরু করিয়াছিল। ধর্মের ব্যাপারেও প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী ওলন্দাজগণ ক্যাথলিক স্পেনীয়দের অনমনীয় শত্রু ছিল। ইহা ভিন্ন, প্রাচ্যের বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভের ইচ্ছাও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই সকল কারণে ওলন্দাজ-পোর্তুগীজ দ্বন্দ্ব অনিবার্য ছিল এবং এই

পোর্তুগীজ-ওলন্দাজ সংঘর্ষের কারণ

দ্বন্দ্বে ওলন্দাজগণের হস্তে পোর্তুগীজ বণিকগণ পরাজিত হইলে তাহাদের শক্তি ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

স্টুয়ার্ট যুগে এবং ক্রমওয়েলের আমলে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক প্রাধান্য লইয়া দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সেই সূত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতবর্ষের ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিকদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। ১৬৭২ হইতে ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুই বৎসর ওলন্দাজগণের হস্তে ইংরাজ বণিকগণকে নানাভাবে লাঞ্ছনা ভোগ এবং বহু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইঙ্গ-ওলন্দাজ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদ সমভাবেই বিদ্যমান ছিল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে এই দ্বন্দ্বের কতক উপশম হয়। সেই সময় হইতে ওলন্দাজগণ মালয় দ্বীপপুঞ্জেই একাধিপত্য স্থাপনে মনোযোগী হইয়া পড়ে এবং ইংরাজগণ ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে।

ইঙ্গ-ওলন্দাজ সংঘর্ষ

ফরাসী বণিকদের আগমন (Advent of the French Traders): ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ফরাসী বণিকগণের একখানি বাণিজ্যপোত পোর্তুগীজ বাণিজ্য-কেন্দ্র দিউ-তে পৌঁছিয়াছিল; কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন ফরাসী বাণিজ্যপোত ভারতবর্ষের কোন বন্দরে না আসিলেও ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে দুইখানি ফরাসী জাহাজ সুমাত্রায় পৌঁছিয়াছিল এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। বুরবোঁ বংশের প্রতিষ্ঠাতা চতুর্থ হেনরী ইংলণ্ড এবং নেদারল্যাণ্ডের অনুকরণে 'ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রয়াসী হন। কিন্তু এ-বিষয়ে বিশেষ কোন সাফল্য লাভ করা সম্ভব না হওয়ায় সাময়িকভাবে প্রাচ্যের সহিত ফরাসী বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা স্থগিত থাকে। তথাপি কয়েকজন নর্মান নাবিক সরকারী সাহায্য না লইয়াই সেই সময়ে পারস্য, আরব, ভারতবর্ষের বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি বন্দরে আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে গাইলস্ ডি রেজিমেণ্ট (Giles de Regiment) ও রিগ্যাল্ট (Rigault), এই দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী পর্যটক টেভার্নিয়ে মুঘল দরবার এবং ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য ও পণ্য-দ্রব্যাদি সম্পর্কে যে-পুস্তক প্রকাশ করেন তাহা পাঠ করিয়া ফরাসী নাবিক ও বণিকদের মনে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের এক ব্যাপক উৎসাহ দেখা দেয়। ইহার অল্পকালের মধ্যেই ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই (Louis XIV)-এর অর্থসচিব কলবেয়ার (Colbert)-এর চেষ্টায় ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' (Compagnie des Indes Orientales) নামে একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। চতুর্দশ লুই এই কোম্পানিকে বিনা-সুদে ত্রিশ লক্ষ লিভ্র (Livres) ঋণ দিয়াছিলেন। এইভাবে সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হইলে ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া ক্যারোঁ (Francois Carbon) সুরাটে

ফরাসী বণিকগণের প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্কের সূচনা

'ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' গঠন

সর্বপ্রথম ফরাসী বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন। মার্‌কারা নামে অপর একজন বণিক পর বৎসর (১৬৬৯) মসুলিপট্টমে আরও একটি ফরাসী কুঠি স্থাপন করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ফরাসী বণিকগণ ওলন্দাজ বণিকদের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইল। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা ওলন্দাজ বাণিজ্য-কেন্দ্র সান্‌ টোম (San Thome) বলপূর্বক দখল করিলে গোলকুণ্ডার সুলতান ও ওলন্দাজগণের এক যুগ্মবাহিনী ফরাসী এ্যাডমিরাল ডি লা হে (De La Haye)-কে পরাজিত করিয়া সান্‌ টোম ওলন্দাজগণকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করিলেন। পর বৎসর (১৬৭৩) ফ্রাঁসোয়া মার্টিন (Francois Martin) ও লেস্‌পিনে (Bellanger de Lespinay) পণ্ডিচেরি নামক ফরাসী উপনিবেশটি স্থাপন করেন। এই উপনিবেশটি ক্রমেই সমৃদ্ধ হইয়া অল্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ষে ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির সর্বপ্রধান হইয়া উঠে। ফ্রাঁসোয়া মার্টিন, দুমা (Duma) ও দুপ্লে (Dupleix)-এর চেষ্টায় পণ্ডিচেরি ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির মধ্যে সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।* ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীগণ বাংলার তদানীন্তন নবাব শায়েস্তা খাঁর নিকট হইতে চন্দননগর নামক স্থানটির অধিকার লাভ করে। কয়েক বৎসর পর এখানেও একটি ফরাসী কুঠি স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাসী ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থবল হ্রাস পাইলে সুরাট ও মসুলিপট্টমে তাহাদের কুঠি পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি পুনর্গঠিত হইলে ফরাসীগণ কারিকল ও মাহে অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইহার পরবর্তী ঘটনা হইল দুপ্লের অধীনে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা। এই সূত্রেই ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল।

ভারতে ফরাসী বাণিজ্য-কুঠি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সূত্রপাত

ইংরাজ বণিকদের আগমন (Coming of the English Traders): পোর্তুগীজদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ইংরাজ বণিকগণও প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহান্বিত হইল। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে পরবর্তী একশত বৎসর অর্থাৎ ক্রমওয়েলের মৃত্যু পর্যন্ত (১৬৫৮) ইংলণ্ড বিদেশে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য এক অদম্য উৎসাহ লইয়া চেষ্টা করিতেছিল। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্‌ ড্রেক (Francis Drake) সমুদ্রপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। আবার ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যাল্‌ফ ফীচ্‌ (Ralph Fitch) ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ পর্যটন করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলে ইংরাজগণের মধ্যে প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপনের এক ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেল। ইতিমধ্যে স্পেনীয় আর্মাডার বিরুদ্ধে ইংরাজ নৌবাহিনীর সাফল্যে ইংরাজ নাবিকদের মধ্যে এক বিপুল উৎসাহ ও আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জলপথে নিকোবর, পেনাং, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সকল নাবিকের মধ্যে জেম্‌স্‌ ল্যাংকাস্টার (James Lancaster)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন

প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনে বণিকদের আগ্রহ

* *Ibid*, p. 67.

মিলডেনহল (John Mildenhall) স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিয়া পেঁছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে ইংরাজ বণিকগণকে পোর্তুগীজ বণিকদের ন্যায় বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে দিবার অনুরোধ-পত্র লইয়া তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা শুরু হইল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। ঐ বৎসর রাণী এলিজাবেথ The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies নামক বণিক কোম্পানিকে প্রাচ্যের যাবতীয় দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দান করিলেন। এই কোম্পানিই সাধারণ্যে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে পরিচিত। প্রথম কয়েক বৎসর অবশ্য এই কোম্পানি ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য স্থাপনের চেষ্টা না করিয়া সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালাক্কা প্রভৃতি অঞ্চলে মসলার ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণে সচেষ্ট হইল। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্-এর সুপারিশপত্র সহ মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হইলেন।* জাহাঙ্গীর ক্যাপ্টেন হকিন্সকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করিলেন না এবং হকিন্স-এর প্রার্থনা অনুযায়ী ইংরাজ বণিকগণকে সুরাটে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিতে দিবেন বলিয়াও মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু পোর্তুগীজ বণিকগণ এবং সুরাটের বণিক সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতার ফলে শেষ পর্যন্ত হকিন্সের দৌত্য বিফলতায় পর্যবসিত হইল। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে হকিন্স আগ্রা ত্যাগ করিয়া সুরাটে আসিলেন। ইতিমধ্যে সার হেনরী মিড্লটন (Sir Henry Middleton) বাবেলমাণ্ডেব প্রণালীতে সুরাটের বণিকদের কয়েকখানি বাণিজ্যপোতের যাবতীয় পণ্য ইংলণ্ড হইতে আনীত তিনখানি বাণিজ্য-পোতের পণ্যের সহিত বিনিময় করিতে বাধ্য করেন। ইহাতে ভীত হইয়া সুরাটের বণিক-সম্প্রদায় ক্যাপ্টেন বেস্ট্-এর অধীনে দুইখানি ব্রিটিশ বাণিজ্যপোতের সুরাট বন্দর প্রবেশে কোন বাধা প্রদান করিলেন না (১৬১২)। পোর্তুগীজগণ ক্যাপ্টেন বেস্ট্কে সুরাট বন্দর হইতে বিতাড়নের জন্য একটি নৌবহর প্রেরণ করিলে ক্যাপ্টেন বেস্ট্ তাহা বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইলেন। ফলে ভারতীয়দের চক্ষে ইংরাজদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর একটি 'ফারমান' দ্বারা ইংরাজ বণিকগণকে সুরাট বন্দরে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের অনুমতি দান করিলেন। দুই বৎসর পর (১৬১৫) পোর্তুগীজগণের সহিত ইংরাজদের পুনরায় সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইহাতেও পোর্তুগীজগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। এইভাবে ইংরাজ নৌবহরের শ্রেষ্ঠত্ব ভারতীয়দের নিকট ক্রমেই প্রমাণিত হইতে থাকিলে ইংলণ্ডরাজ

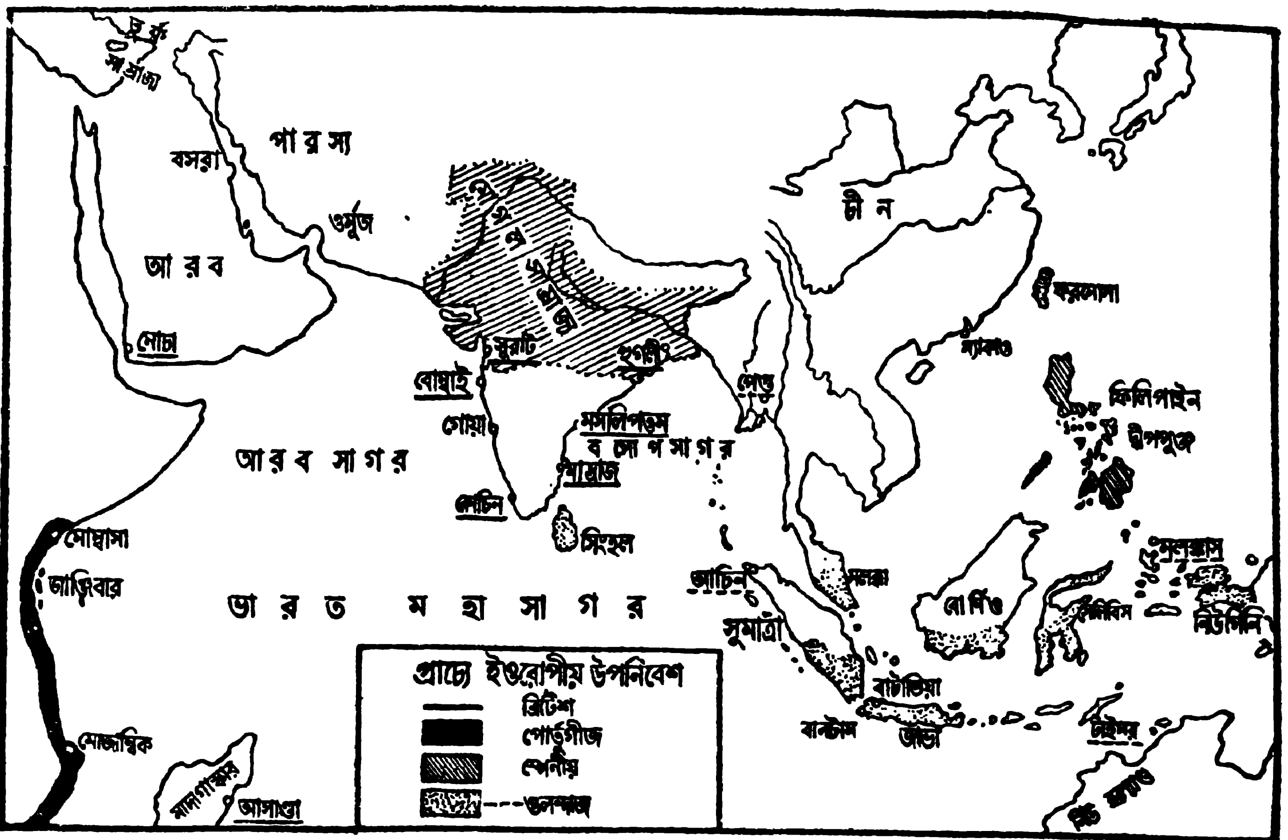
ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপন

হকিন্সের দৌত্য

সার হেনরী মিড্লটন (১৬১০-১১)

ক্যাপ্টেন বেস্ট্

* ...he (William Hawkins) was provided with a letter from King James to the Emperor Akbar (whose death was yet unknown in London) desiring permission to establish trade in his dominion." *The Cambridge History of India*, vol. v. p. 77.


তুর্কি সাম্রাজ্য
পারস্য
বসরা
ওর্মুজ
আরব
মোচা
আরব সাগর
মোগল সাম্রাজ্য
সুরাট
বোম্বাই
গোয়া
কোচিন
মসলিপত্তম
বঙ্গোপসাগর
মাদ্রাজ
হুগলী
পেগু
সিংহল
চীন
ম্যাকাও
ফিলিপাইন
দ্বীপপুঞ্জ
বোর্নিও
সেলিবিস
নিউগিনি
আচিন
সুমাত্রা
বাটাভিয়া
বান্টাম
জাভা
টাইমর
মোম্বাসা
জাঞ্জিবার
মোজাম্বিক
মাদাগাস্কার
ভারত মহাসাগর
প্রাচ্যে ইওরোপীয় উপনিবেশ
ব্রিটিশ
পোর্তুগীজ
স্পেনীয়
ওলন্দাজ

প্রথম জেমস্ সার টমাস্ রো (Sir Thomas Roe) নামক জনৈক বিদ্বান ও বিচক্ষণ* ব্যক্তিকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে দূত হিসাবে প্রেরণ করিলেন। সার টমাস্ রো ১৬১৫ হইতে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসর জাহাঙ্গীরের দরবারে অবস্থান করেন এবং তাঁহার সহিত কোন বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনে কৃতকার্য না হইলেও মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ইংরাজ বণিকদের বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে সার টমাস্ রো যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন তখন সুরাট, আগ্রা আহমদাবাদ, ভারুচ প্রভৃতি স্থানে ইংরাজ বণিকগণ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিয়া পূর্ণোদ্যমে বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছিল। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় চার্লস্ পোর্তুগালের রাজকন্যা ক্যাথারিণ বারগাঞ্জাকে বিবাহ করিলে ভারতে পোর্তুগীজ অধিকৃত স্থান– বোম্বাই শহরটি তাঁহাকে যৌতুক হিসাবে দেওয়া হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় চার্লস্ অর্থাভাবহেতু পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে বোম্বাই ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হস্তান্তরিত করিলেন। ইহার পর হইতেই বোম্বাই ইংরাজ কুঠিগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কুঠিতে পরিণত হইল।

সার টমাস্ রো-এর দৌত্য (১৬১৫-১৬১৮)

সার টমাস্ রো কর্তৃক ইংরাজ বণিকদের অনুকূলে সুযোগ-সুবিধা লাভ

ইতিমধ্যে গোলকুণ্ডার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র, মসুলিপট্টম, পুলিকট-এর অনতিদূরে আরমাগাঁও প্রভৃতি স্থানেও ইংরাজগণ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডার সুলতানের নিকট হইতে ইংরাজগণ বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক দিবার প্রতিশ্রুতিতে গোলকুণ্ডার সর্বত্র বাণিজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইল। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে ফ্রান্সিস্ ডে নামে জনৈক ইংরাজ বণিক মাদ্রাজে সুরক্ষিত বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। এই সুরক্ষিত বাণিজ্য-কুঠি তৎকালে ফোর্ট সেণ্ট্ জর্জ (Fort St. George) নামে পরিচিত ছিল।

ইংরাজ বণিকদের বাণিজ্য সম্প্রসারণ

উপরি-উক্ত অঞ্চল ভিন্ন হরিহরপুর, হুগলী, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানেও ইংরাজ বণিকগণ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিতে সমর্থ হইল। ১৬৪৯ হইতে ১৬৮৯ এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ইংরাজদের বাণিজ্য খুব বৃদ্ধি পাইল। বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইল, ক্রমে তাহারা রাজ্য স্থাপন ও রাজ্য শাসনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরগণের প্রধান সার জোশিয়া চাইল্ড (Sir Joshia Child) বলপ্রয়োগে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন ও উহা হইতে অর্থাগমের স্থায়ী ব্যবস্থা করিবার নীতি গ্রহণ করিলেন। তদনুসারে ইংরাজ নৌ-

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির যুদ্ধ-নীতি গ্রহণ

* "The Company were extra-ordinary lucky in such a representative......Roe's *Journal* and correspondence show up not only his integrity but his farsightedness." —Thompson and Garratt ; *Rise and Fulfilment of British Rule in India*, p. 11.

বাহিনী জোশিয়া চাইল্ডের ভ্রাতা* জন চাইল্ডের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বন্দরটি দখল করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। ইংরাজ বণিকদের এই উদ্ধত আচরণে মুঘল সম্রাট ঔরংজেব স্বভাবতই ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মুঘল-বাহিনী বোম্বাই আক্রমণ করিল। অবশেষে জন চাইল্ড সম্রাট ঔরংজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে (১৬৯০) উভয় পক্ষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি অনুসারে জন চাইল্ডকে বোম্বাই-এর গবর্ণর-পদ হইতে অপসারিত করিবার প্রতিশ্রুতি ইংরাজ কোম্পানিকে দিতে হইল। ইহা ভিন্ন, যে-সকল ভারতীয় বাণিজ্যপোত ইংরাজগণ বলপূর্বক দখল করিয়াছিল সেগুলি ফিরাইয়া দিতে এবং দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হইল।

ঔরংজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও চুক্তি সাক্ষর

এ-দিকে বাংলাদেশেও ইংরাজদের সহিত মুঘল সম্রাটদের সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল। ইংরাজ বণিকগণ বাংলাদেশে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা শুল্ক প্রদানের বিনিময়ে অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিল। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ বাংলাদেশে ইংরাজ বণিকগণকে বিনা-শুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দান করিয়াছিলেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব একটি ফারমান দ্বারা ইংরাজগণকে পণ্য-দ্রব্যাদির উপর শতকরা দুই টাকা এবং জিজিয়া কর হিসাবে শতকরা দেড় টাকা দিবার শর্তে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধ-বাণিজ্যের অনুমতি দান করেন। তথাপি স্থানীয় রাজকর্মচারিবর্গের হস্তে তাহাদের নিস্তার ছিল না। স্থানীয় কর্মচারিগণ ইংরাজ বণিকদের নিকট হইতে কেবল শুল্কই আদায় করিত না, সময় সময় তাহাদের পণ্যাদিও বাজেয়াপ্ত করিয়া লইত। তখন ইংরাজ বণিকগণ বলপ্রয়োগে রাজকর্মচারীদের বিরোধিতা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া হুগলীর বাণিজ্য-কুঠিকে একটি দুর্গে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইল। সেই সূত্রে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশেও ইঙ্গ-মুঘল সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগণ মুঘল বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত হইল। কিন্তু জব চার্ণক (Job Charnock) নামে জনৈক দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ইংরাজ কর্মচারী পুনরায় মুঘল সম্রাটের অনুমতিক্রমে সুতানুটি (বর্তমান কলিকাতার শোভাবাজার এলাকা) নামক স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু পর বৎসর (১৬৮৭) ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হিথ্ (Capt. William Heath) এক নৌবহরসহ ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলে ইঙ্গ-মুঘল সংঘর্ষ পুনরায় শুরু হইল। জব চার্ণক ও অপরাপর ইংরাজগণ সুতানুটি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সংঘর্ষে উইলিয়াম হিথ্ পরাজিত হইয়া মাদ্রাজে অপসরণ করিলেন। উইলিয়াম হিথের এই অপচেষ্টায় ইংরাজ বণিকগণ কর্তৃক দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে বাণিজ্য বিস্তারের যে-চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল তাহা সবই ব্যর্থ হইয়া

বাংলাদেশে ইঙ্গ-মুঘল সংঘর্ষ

জব চার্ণক

* "Until Mr. and Mrs. Strachey proved otherwise, he (Sir Joshia Child) and Sir John Child in Surat were thought to be brothers. They were distantly related." Thompson and Garratt; *Rise and Fulfilment of British Rule in India*, p. 38.

যায়। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সহিত ঔরংজেবের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে জব চার্ণককে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হইল। ইংরাজগণ ভারতীয় বণিকদের যাহা কিছু প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন, সার জোশিয়া চাইল্ডকে ভারতবর্ষ হইতে দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার আদেশ দিতে ইংরাজরা বাধ্য হইল। তিনি ঐ বৎসর সুতানুটি গ্রামে বর্তমান কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই সময় হইতে ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত জব চার্ণক কলিকাতায় রাজ-ক্ষমতা অপেক্ষাও স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই স্বৈরাচার যে অত্যাচারের নামান্তর ছিল তাহা হ্যামিলটন-এর বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়।* ইহার পর হইতে বাংলাদেশে ইংরাজ কোম্পানির সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা নব-প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্য-কুঠি সুরক্ষিত করিবার অনুমতিও লাভ করিল। দুই বৎসর পর (১৬৯৮) তাহারা বাৎসরিক বারো শত টাকা খাজনা দিবার শর্তে কলিকাতা (কালীঘাটা), সুতানুটি, গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রামের জমিদারি লাভ করিল।

কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠা (১৬৯০)

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের ইংরাজ বাণিজ্য-কুঠিগুলি একটি স্বতন্ত্র কাউন্সিলের অধীনে স্থাপন করা হইল এবং কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম নামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মিত হইল। ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুকরণে উহার নাম রাখা হইয়াছিল ফোর্ট উইলিয়াম। নব-গঠিত কাউন্সিলের কর্মকেন্দ্র হইল ফোর্ট উইলিয়াম এবং সার চার্লস্ আয়ার (Sir Charles Eyre) এই কাউন্সিলের সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট ও গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণ (১৭০০)

১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে জন সারম্যান (John Surman) নামে জনৈক ইংরাজ দূতকে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে মুঘল দরবারে প্রেরণ করা হইল। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফারুক্‌শিয়ার একটি ফারমান দ্বারা বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর ইংরাজ বণিকগণকে বিনা শুল্কে অবাধ-বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার দান করিলেন। তদুপরি ইংরাজগণ নিজেদের মুদ্রা প্রচলনের অধিকারও লাভ করিল। ঐতিহাসিক ওরম্ (Orme) এই ফারমানকে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'ম্যাগনা কার্টা' (Magna Carta) বা মহাসনন্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মুঘল সাম্রাজ্যের আসন্ন পতনের কালে তথা ভারত-ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তাহাদের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সম্রাট ফারুক্‌শিয়ারের 'ফারমান' (১৭১৭)

* "Charnock reigned more absolutely than a Rajah, only be wanted much of their Humanity, for when any poor ignorant Native transgressed his Laws, they were sure to undergo a severe whipping for a penalty, and the execution was generally done, when he was at dinner so near his dinning room that the groans and cries of the poor delinquents served him for music."—Hamilton, quoted by Thompson & Garratt, pp. 45-46.

অপরাপর ইওরোপীয় বণিকদল (Other European Traders) : পোর্তুগীজ বণিকদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কেবল ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল এমন নহে। দিনেমার বণিকগণ 'দিনেমার ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' (Dutch East India Company) গঠন (১৬২০) করিয়া কিছুকাল ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসী বণিকদের প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিনেমার বণিকগণ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে (১৮৪৫)। শ্রীরামপুর ও ট্রাঙ্কুভার এই দুই স্থানে দিনেমার বণিকদের কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্ল্যাণ্ডার্সের বণিকগণ 'ওস্টেণ্ড্ কোম্পানি', ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের বণিক-সম্প্রদায় 'সুইডিশ্ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি', অস্ট্রিয়ার বণিকগণ 'অস্ট্রিয়ান ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' প্রভৃতি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

দিনেমার, ফ্ল্যামিশ, সুইডিশ্ ও অস্ট্রিয়ান বণিকগণ

ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব : ব্রিটিশ শক্তির উত্থান

(Anglo-French Conflict in India : Rise of the British Power)

দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব (Anglo French Conflict in the Deccan) : অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক পটপরিবর্তন ঘটে। পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই রাজ্যগুলি যেমন ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসংহত, তেমনি ছিল পরস্পর-বিবদমান। দাক্ষিণাত্যে অসংহত, দুর্বল ও পরস্পর-বিবদমান রাজ্যগুলির মধ্যে ইওরোপীয় বণিক-সম্প্রদায়গুলির নিকট হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণের আগ্রহ স্বভাবতই দেখা দিল।* ফলে এইরূপ পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করা ইওরোপীয়দের পক্ষে সহজ হইল। সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণ নিজ নিজ বাণিজ্য-কেন্দ্র দৃঢ় ও স্থায়িভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং তাহারা বণিক-সম্প্রদায় হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। আবার ঠিক সেই সময়েই ইওরোপ মহাদেশ ও আমেরিকায় ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। এই সকল কারণে এবং ভারতবর্ষে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার ফলে এই দুই জাতির মধ্যে দাক্ষিণাত্যে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্য যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যে রাজনৈতিক অসংহতি ও অব্যবস্থা : ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণ কর্তৃক সুযোগ গ্রহণ

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ (The First Carnatic War) : দক্ষিণ-ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব ইওরোপের ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের-ই ভারতীয় সংস্করণ বলা যাইতে পারে। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপ মহাদেশে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ (War of Austrian Succession) শুরু হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পরস্পর-বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে। উহার পরিপূরক হিসাবেই দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। সেই সময় মাদ্রাজ ও সেণ্ট্ ফোর্ট ডেভিড্-এ ইংরাজগণের এবং পণ্ডিচেরিতে ফরাসীদের সুরক্ষিত বাণিজ্য-কুঠি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজ ও ফরাসী বাণিজ্য-কুঠিগুলি দাক্ষিণাত্যের পূর্ব-উপকূলে অবস্থিত ছিল।

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৭৪০-'৪৮)— ভারতবর্ষেও বিস্তারলাভ

---

* "Meanwhile India's internal strength was being ruined by war of the country power against another" everywhere

'Hercules killed Hart-a-grease
And Hart-a-grease killed Hercules'.

"The carcase was in a condition to invite the eagles." Thompson & Garratt, p. 63.

সুতরাং স্বদেশ হইতে জলপথে সাহায্য পাইবার সুযোগ এবং নৌ-বাহিনীর সাহায্যে নিজ নিজ কুঠিগুলি রক্ষা করিবার যথেষ্ট সুবিধা তাহাদের ছিল। দাক্ষিণাত্যে স্থানীয় রাজগণের সামরিক দুর্বলতা ও নৌশক্তির অভাবহেতু দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার অলক্ষিতে স্বভাবতই ইংরাজ ও ফরাসীদের হস্তে চলিয়া গেল।

ইওরোপীয়রা করমণ্ডলের উপকূল নামকরণ করিয়াছিল কর্ণাট (The Carnatic)। কর্ণাট ছিল হায়দরাবাদের নিজামের রাজ্যভুক্ত। কিন্তু নিজাম যেমন স্বয়ং দিল্লী সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতেন না, কর্ণাটের নবাবও সেইরূপ নিজামের আধিপত্য একপ্রকার অমান্য করিয়াই চলিতেন। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলি মারাঠাদের হস্তে নিহত হইলে তাঁহার রাজ্যে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত নানাপ্রকার গোলযোগ দেখা দিল। নিজাম স্বয়ং কর্ণাটে আসিয়া এই অব্যবস্থার অবসান ঘটাইতে চাহিলেন। তিনি আনোয়ার-উদ্দিনকে কর্ণাটের শাসনকর্তা বা নবাব নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ইহাতে কর্ণাটে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত হওয়া দূরের কথা, বিশৃঙ্খলা বহু গুণে বৃদ্ধি পাইল। দোস্ত আলির পরিবারের প্রতি যে-সকল জায়গীরদার অনুগত ছিলেন তাঁহারা আনওয়ার-উদ্দিনের নবাব-পদে নিয়োগ অবৈধ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এ-দিকে দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেবকে মারাঠাগণ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী হিসাবে সাতারা দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। চাঁদা সাহেবও আনওয়ার-উদ্দিনের নবাব-পদ লাভে অসন্তুষ্ট হইলেন। কর্ণাটের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন এইরূপ জটিলতাপূর্ণ তখন দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সূচনা হয়।

করমণ্ডল উপকূল বা কর্ণাটের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধে (১৭৪০-৪৮) ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর-বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিলেও পণ্ডিচেরির ফরাসী গবর্ণর দুপ্লে (Dupleix) প্রথমে ভারতবর্ষে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সহিত এ-বিষয়ে পত্রালাপ করিয়াও তিনি তাহাদের সম্মতি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। উপরন্তু ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কমডোর বার্ণেট (Commodore Barnett)-এর অধীনে একটি ব্রিটিশ নৌবহর কয়েকখানি ফরাসী জাহাজ বলপূর্বক অধিকার করিয়া লইল, এমন কি, পণ্ডিচেরি আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। দুপ্লে কর্ণাটের নবাব আনওয়ার-উদ্দিনের নিকট আবেদন জানাইলে তাঁহার আদেশে ইংরাজগণ তাহাদের নৌবহর অপসারণে বাধ্য হইল। কিন্তু দুপ্লে ইংরাজ-নৌবহরের দাক্ষিণাত্যে উপস্থিতিতে আশঙ্কিত হইয়া ফরাসী অধিকৃত মরিশাসের গবর্ণর লা বুরদনে (La Bourdonnais)-এর সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ইওরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধ শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে মরিশাসের গবর্ণর লা বুরদনে ফ্রান্সের সরকারের নিকট একটি নৌবহর চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এই নৌবহরের সাহায্যে ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে ইংরাজ নৌ-

কমডোর বার্ণেট কর্তৃক ফরাসী জাহাজ দখল

পণ্ডিচেরির নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ—আনওয়ার-উদ্দিনের হস্তক্ষেপ

বাণিজ্য ধ্বংস করিবার জন্য সময়মত ইংরাজ বাণিজ্য জাহাজগুলিকে আক্রমণ করা। ফরাসী সরকার লা বুরদনের আবেদন মত একটি নৌবহর মরিশাসে পাঠাইয়াছিলেন।

লা বুরদনে কর্তৃক মাদ্রাজ অবরোধ

এমন সময় দুপ্লে সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলে বুরদনে আটখানি ফরাসী জাহাজের একটি নৌবহরসহ করমণ্ডল বা কর্ণাট উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লা বুরদনের নৌবহরসহ উপস্থিত হওয়ায় ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। ইংরাজ নৌ-সেনাপতি ফরাসী নৌ-বাহিনীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সাহস পাইলেন না। তিনি ইংরাজ বাণিজ্য-ঘাঁটি মাদ্রাজকে একপ্রকার অরক্ষিত রাখিয়াই ব্রিটিশ নৌবহরসহ হুগলীতে চলিয়া আসিলেন। এই সুবর্ণ সুযোগ লা বুরদনে হারাইলেন না। তিনি মাদ্রাজ আক্রমণ করিয়া অতি সহজেই তথাকার ইংরাজগণকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিলেন। ফরাসীগণ কর্তৃক মাদ্রাজ আক্রান্ত হইলে ইংরাজগণ ফরাসীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য নবাব আনওয়ার-উদ্দিনের নিকট আবেদন জানাইয়াছিল। নবাব আনওয়ার-উদ্দিন দুপ্লেকে মাদ্রাজের অবরোধ উঠাইয়া লইতে আদেশ দিলে কূটকৌশলী দুপ্লে

লা বুরদনে কর্তৃক ইংরাজগণের সহিত চুক্তির শর্তাদি স্থিরীকৃত : দুপ্লের বিরোধিতা

আনওয়ার-উদ্দিনকে জানাইয়াছিলেন যে, ফরাসীদের মাদ্রাজ আক্রমণের উদ্দেশ্যই হইল উহা জয় করিয়া আনওয়ার-উদ্দিনকে দান করা। আনওয়ার-উদ্দিন দুপ্লের এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিলেন। মাদ্রাজ জয় সমাপ্ত করিয়া লা বুরদনে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ লাভের শর্তে মাদ্রাজ ইংরাজগণকে ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু দুপ্লে লা বুরদনে কর্তৃক স্বীকৃত এই চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া মাদ্রাজ ফরাসী অধিকারেই রাখিয়া দিলেন। এই ব্যাপারে লা বুরদনে ও দুপ্লের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল। ফলে, লা বুরদনে তাঁহার অধীনে নৌবহর লইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ-দিকে আনওয়ার-উদ্দিন দেখিলেন যে, দুপ্লে তাঁহার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁহাকে মাদ্রাজ সমর্পণ করিতে মোটেই ইচ্ছুক নহেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি এক বিশাল সেনাবাহিনী সহ স্বয়ং মাদ্রাজ দখল করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মাইলাপুর বা সেণ্ট্ টোম্ (Mailapur or St. Thome)-এর যুদ্ধে (১৭৪৬)

আনওয়ার-উদ্দিনের শোচনীয় পরাজয় : ফল

মুষ্টিমেয় ফরাসী সৈন্যের হস্তে আনওয়ার-উদ্দিন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। মুষ্টিমেয় ফরাসী সৈন্যের কাছে আনওয়ার-উদ্দিনের বিশাল বাহিনীর এইরূপ শোচনীয় পরাজয় ইওরোপীয়দের চক্ষু খুলিয়া দিল। তাহারা, বিশেষত, ফরাসী গবর্ণর দুপ্লে এ-কথা উপলব্ধি করিলেন যে, একদল সুসংগঠিত এবং ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত সৈনিকের সাহায্যে ফরাসীগণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই ভারতবর্ষে এক সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হইবে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই ইওরোপীয়গণ, বিশেষত, ফরাসীরা ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে অধিকতর উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল।

লা বুরদনের সহিত বিরোধের সৃষ্টি করিয়া দুপ্লে যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। লা বুরদনের ভারত ত্যাগ ফরাসীদের নৌশক্তির

দুর্বলতার সূচনা করিয়াছিল। ফলে দুপ্লে ফোর্ট সেন্ট্ ডেভিড জয় করিতে অগ্রসর হইয়া অকৃতকার্য হইলেন। ইতিমধ্যে নৌ-অধ্যক্ষ বোস্কাওয়েন (Boscawen) এর অধীনে এক বিরাট নৌবহর ইংলণ্ড হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বোস্কাওয়েন পণ্ডিচেরি আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। ঐ বৎসরই (১৭৪৮) এই-লা-স্যাপল্ (Aix-la-Chapelle)-এর সন্ধি দ্বারা ইওরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে কর্ণাটেও ইঙ্গ-ফরাসী-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিল। দুপ্লে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই-লা-স্যাপল্-এর সন্ধির শর্ত মানিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাকে ইংরাজদের নিকট মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ করিতে হইল। অবশ্য মাদ্রাজ ফিরাইয়া দিবার বিনিময়ে ফরাসী সরকার উত্তর-আমেরিকাস্থ লুইসবার্গ স্থানটি লাভ করিলেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

এই-লা-স্যাপল্-এর সন্ধি (১৭৪৮): কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধের অবসান

আপাতদৃষ্টিতে কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধের ফলে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। ভারতে ঔপনিবেশিক অধিকারের দিক দিয়া ইংরাজ বা ফরাসী কোন পক্ষেরই এই যুদ্ধের ফলে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। কিন্তু সামান্য অনুধাবন করিলেই এই যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী ফলাফল পরিস্ফুট হইবে। প্রথমত, কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ হইতে এই কথাই প্রমাণিত হইয়াছিল যে, দাক্ষিণাত্য তথা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গঠনে সাফল্যের প্রধান শর্তই ছিল শক্তিশালী নৌবহর।* দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুষ্টিমেয় ফরাসী সৈন্যের হস্তে আনওয়ার-উদ্দিনের শোচনীয় পরাজয় ইওরোপীয় সৈনিকদের সহিত তুলনায় ভারতীয় সৈনিকদের অপকর্ষতা প্রমাণিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই দুপ্লে পরবর্তী কালে যুদ্ধ-নীতি অনুসরণের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয়ত, কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধেই সর্বপ্রথম ইওরোপীয় বণিকগণ ভারতীয় রাজগণের সামরিক দুর্বলতার সম্যক্ পরিচয় লাভ করিয়াছিল। ফলে, দুপ্লে তথা ইওরোপীয় বণিক-সম্প্রদায় ভারতীয় রাজনীতিতে প্রকাশ্যভাবে অংশ গ্রহণে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্যে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হইয়াছিল। চতুর্থত, এই যুদ্ধে ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় পতনোন্মুখতাও পরিস্ফুট হইয়াছিল। আনওয়ার-উদ্দিনের রাজ্যের মধ্যে ইঙ্গ-ফরাসী বণিক-সম্প্রদায়ের যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার স্বাধীনতা তদানীন্তন ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দুর্বলতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধের ফলাফল

---

* "The war of Austrian Succession though a appearance if achieved nothing and left the political foundation of India unaltered yet marks an epoch in Indian history. It demonstrated the overwhelming influence of sea-power when intelligently directed, it displayed the superiority of European methods of war over those followed by Indian armies ; it revealed the political decay that had eaten into the heart of the Indian system......In short it set the stage for Dupleix and Clive."—Dodwell, vide, *Text-Book of Modern Indian History*, Sarkar & Dutta. p. 75.

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ (The Second Carnatic War) : এই-লা-স্যাপেল্-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী দুপ্লে ইংরাজদিগকে মাদ্রাজ ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে ইহাতে মোটেই রাজী ছিলেন না। তিনি একথা বুঝিয়াছিলেন যে, তদানীন্তন ভারতের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য গঠন করিবার একমাত্র অন্তরায় ছিল ইংরাজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মাদ্রাজ ফরাসী অধিকারে রাখিতে পারিলে ইংরাজগণের শক্তি বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইত, বলা বাহুল্য। এই কারণে দুপ্লে ইংরাজগণকে মাদ্রাজ প্রত্যর্পণের পক্ষপাতী ছিলেন না। অবশ্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে ফরাসী সরকারের আদেশ মানিয়া লইতে হইয়াছিল।

দুপ্লের দূরদর্শিতা

যাহা হউক, অল্পকালের মধ্যেই দুপ্লের সম্মুখে নূতন সুযোগ উপস্থিত হইল ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে হায়দরাবাদের নিজাম আসফ্ জা (নিজাম-উল্-মুল্ক)-এর মৃত্যু হইলে নিজাম-পদের উত্তরাধিকার লইয়া এক জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। আসফ্ জার পুত্র নাসির জঙ্গ ও পৌত্র মুজফ্ফর জঙ্গ উভয়েই নিজাম-পদ দাবি করিলেন। এ-দিকে আনওয়ার-উদ্দিনের পূর্ববর্তী নবাবের জামাতা চাঁদা সাহেব আনওয়ার-উদ্দিনকে অপসারিত করিয়াও স্বয়ং কর্ণাটের নবাব-পদ অধিকার করিতে চাহিলেন। মুজফ্ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেব যুগ্মভাবে গোলযোগ শুরু করিলেন।

হায়দরাবাদ ও কর্ণাটে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব

দুপ্লে দেশীয় রাজগণের এই অন্তর্দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করিয়া ফরাসী স্বার্থসিদ্ধি করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি নিজাম নাসির জঙ্গ এবং নবাব আনওয়ার-উদ্দিনের বিরুদ্ধে মুজফ্ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবকে সাহায্য দানে স্বীকৃত হইলেন। মুজফ্ফর জঙ্গ, চাঁদা সাহেব এবং দুপ্লের সম্মিলিত শক্তির আঘাতে আনওয়ার-উদ্দিন অম্বুর-এর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৭[illegible]) এবং তাঁহার পুত্র মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফলে প্রায় সমগ্র কর্ণাট চাঁদা সাহেবের অধিকারে আসিল। চাঁদা সাহেবের মিত্রশক্তি ফরাসীগণ স্বভাবতই কর্ণাটে এক অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিল।

ফরাসীগণ কর্তৃক মুজফ্ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবের পক্ষ গ্রহণ

চাঁদা সাহেবের সাফল্য

ফরাসীদের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে ইংরাজগণের মনে ঈর্ষা ও ভীতি—দুইয়েরই সঞ্চার হইল। হায়দরাবাদ ও কর্ণাটের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে ইংরাজগণ মৌখিকভাবে নাসির জঙ্গ ও আনওয়ার-উদ্দিনের পক্ষ সমর্থন করিলেও কার্যত কোন সাহায্যদান করে নাই। কিন্তু ফরাসীদের উত্তরোত্তর শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া তাহারা এখন নাসির জঙ্গ ও আনওয়ার-উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিল। ফলে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে এক প্রকাশ্য যুদ্ধের সূত্রপাত হইল (১৭৫১-৫৪)। ইংরাজ বা ফরাসী সরকারের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই দাক্ষিণাত্যে এক ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ শুরু হইল।

ইংরাজগণ কর্তৃক নাসির জঙ্গ ও মহম্মদ আলির পক্ষ গ্রহণ

এ-দিকে চাঁদা সাহেব তাঞ্জোর জয় করিতে গিয়া অযথা কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ত্রিচিনপল্লিতে মহম্মদ আলিকে আক্রমণ না করিয়া তিনি তাঁহাকে ইংরাজদের সাহায্যে শক্তি-সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়া অদূরদর্শিতার কাজ করিলেন। এ-দিকে নাসির জঙ্গ এক বিশাল সেনাবাহিনী সহ কর্ণাটে প্রবেশ করিলে মেজর লরেন্স (Major Lawrence)-এর অধীনে ছয়শত ইংরাজ সৈন্য তাঁহার বাহিনীতে যোগদান করিল। নাসির জঙ্গ ও ইংরাজগণের যুগ্মবাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া চাঁদা সাহেব পণ্ডিচেরিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর দুপ্লের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তিনি জিঞ্জি নদীতীরে ভ্যালুদাভুর নামক স্থানে নাসির জঙ্গের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন (১৭৫০)। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তেরজন ফরাসী সামরিক কর্মচারী যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গেলে একপ্রকার বাধ্য হইয়াই চাঁদা সাহেব ও ফরাসী সেনাধ্যক্ষ অতেউল (Auteuil) পণ্ডিচেরিতে অপসরণ করিলেন, মুজফ্‌ফর্ জঙ্গ আত্মরক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া পিতৃব্য নাসির জঙ্গের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। এইভাবে সাময়িক কালের জন্য ফরাসীশক্তি প্রতিহত হইলেও দুপ্লের সামরিক দূরদর্শিতা, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে ফরাসীগণ জিঞ্জি, তিরুভিতি, মসুলিপট্টম্, ভিল্লুপুরম্ প্রভৃতি স্থান জয় করিতে সমর্থ হইল। নাসির জঙ্গও এই সময়েই আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলে মুজফ্‌ফর জঙ্গ মুক্তি-লাভ করিলেন। দুপ্লে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার-পদে স্থাপন করিয়া তাঁহার সাহায্যের পরিবর্তে কৃতজ্ঞ মুজফ্‌ফর জঙ্গের নিকট হইতে দিভি, মসুলিপট্টম্ ও প্রভূত পরিমাণ অর্থ ফরাসী কোম্পানির জন্য পুরস্কার হিসাবে গ্রহণ করিলেন। মুজফ্‌ফর্ জঙ্গ দুপ্লেকে কৃষ্ণা নদী হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যাবতীয় রাজ্যাংশের গবর্ণর বলিয়া সম্মানিত করেন। ইহা ছাড়া, দুপ্লে নিজে বাৎসরিক দশ হাজার পাউন্ড আয়ের একটি জায়গীর ও প্রভূত পরিমাণ অর্থ ব্যক্তিগত পুরস্কার হিসাবেও লাভ করিলেন। চাঁদা সাহেব আর্কটের অর্থাৎ কর্ণাটের নবাব-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দুপ্লের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইল। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, দুপ্লের কৃষ্ণা হইতে কুমারিকা রাজ্যাংশের গবর্ণর আখ্যা সম্পূর্ণ মৌখিক সম্মান ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না।* কিন্তু মুজফ্‌ফর জঙ্গকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার এবং চাঁদা সাহেবকে কর্ণাটের নবাব-পদে স্থাপন করিবার ফলে দুপ্লের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি যে বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চাঁদা সাহেব ও মুজফ্‌ফর জঙ্গের পরাজয়

দুপ্লের সাহায্যে মুজফ্‌ফর্ জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবের জয়লাভ

চাঁদা সাহেব আর্কটের নবাব-পদে অধিষ্ঠিত

মুজফ্‌ফর জঙ্গের দাক্ষিণাত্যের সুবাদার-পদ লাভ : দুপ্লের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

এ-দিকে আনওয়ার-উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলি তখনও ত্রিচিনপল্লিতে অবস্থান

* 'The title conferred merely an honorary suzerainty.' Vide, P. E. Roberts : *History of British India*, p. 109, Sarkar & Dutta. *Text-Book of Modern Indian History*, p. 79.

করিতেছিলেন। তিনি নিজ পিতার ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং দাক্ষিণাত্যের একাংশের উপর অধিকার লাভের বিনিময়ে চাঁদা সাহেবকে কর্ণাটের নবাব বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী আছেন, এই প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। কিন্তু নিজ সাফল্যে গর্বিত দুপ্লে এই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইয়া অদূরদর্শিতার কাজ করিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন নিজের ইচ্ছামত দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে। সেই সময়ে সণ্ডার্স (Saund.rs) ফোর্ট সেণ্ট্ ডেভিডের গবর্ণর হইয়া আসিলেন। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। ত্রিচিনপলি ফরাসী হস্তে চলিয়া গেলে ইংরাজদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সর্বনাশ সাধিত হইবে বুঝিতে পারিয়া তিনি মহম্মদ আলিকে যথাসম্ভব সাহায্য দানে প্রস্তুত হইলেন।

দুপ্লের অদূরদর্শিতা, সণ্ডার্স কর্তৃক মহম্মদ আলির পক্ষ গ্রহণ

মুজফ্‌ফর জঙ্গের অভিষেক-ক্রিয়া পণ্ডিচেরিতে সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ফরাসীদের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি বুসী (Bussy)-কে সঙ্গে লইয়া তিনি হায়দরাবাদ যাত্রা করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যেই আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। বুসী কালক্ষেপ না করিয়া আসফ্ জা (নিজাম-উল্-মুল্ক)-এর তৃতীয় পুত্র সলাবৎ জঙ্গকে দাক্ষিণাত্যের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া স্বয়ং হায়দরাবাদে নিজ সেনাবাহিনীসহ অবস্থান করিতে লাগিলেন। বুসী ছিলেন দূরদর্শী ও ক্ষমতাবান রাজনীতিক। সামরিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার হায়দরাবাদে অবস্থানকালে তথায় ফরাসীদের এক অপরিমিত প্রতিপত্তি ও প্রাধান্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বুসী তাঁহার সেনাবাহিনীর ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য সলাবৎ জঙ্গের নিকট হইতে ইলোর, রাজমহেন্দ্রী, চিকাকোল ও মুস্তাফা নগর—এই চারিটি জেলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইভাবে দুপ্লের পরিকল্পনা ও বুসীর বিচক্ষণ কার্যক্ষমতায় দাক্ষিণাত্যে ফরাসী অধিকার, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সলাবৎ জঙ্গ-কে দাক্ষিণাত্যের সিংহাসনে স্থাপন : বুসীর প্রতিপত্তি

ত্রিচিনপলির ভৌগোলিক অবস্থান বাণিজ্যিক ও সামরিক উভয় দিক দিয়াই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুতরাং ফরাসী সৈন্য ত্রিচিনপলি অবরোধ করিল। ফোর্ট সেণ্ট্ ডেভিডের নূতন গবর্ণর সণ্ডার্স অবরুদ্ধ মহম্মদ আলিকে সামরিক সাহায্য দান করিলেন। ইহা ভিন্ন, তাঞ্জোরের রাজা, মহীশূরের রাজা ও মারাঠাগণ ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন করিল। সণ্ডার্স কর্ণাটের রাজধানী আক্রমণের দায়িত্ব রবার্ট ক্লাইভ নামে জনৈক কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করিলেন।

ত্রিচিনপলির গুরুত্ব : সণ্ডার্স কর্তৃক ত্রিচিনপলি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ

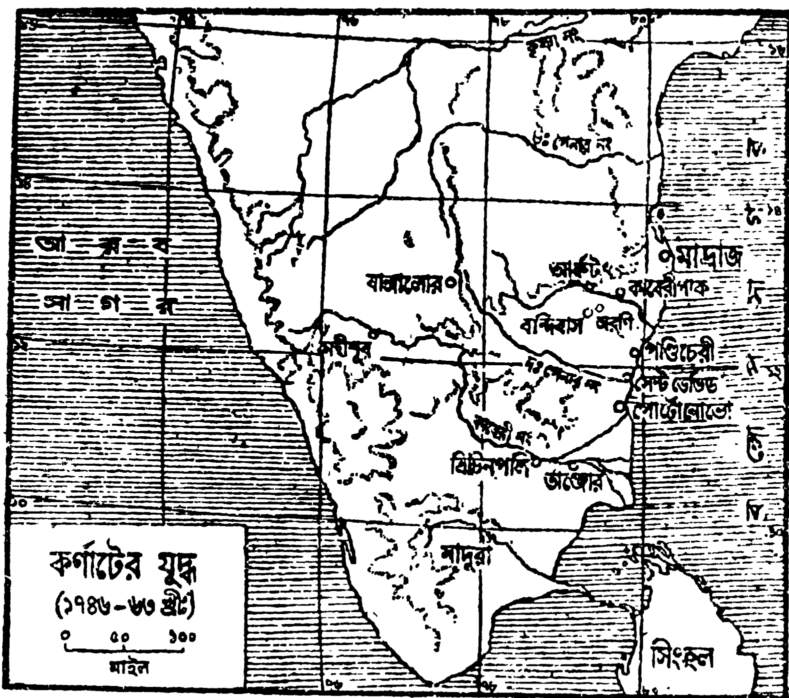
ক্লাইভ প্রথম জীবনে সামান্য কেরাণী হিসাবে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কার্য গ্রহণ করিয়া পরে মেজর স্ট্রিন্‌জার (Major Strainger)-এর অধীনে সামরিক কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্লাইভ অসাধারণ বীরত্ব, সামরিক কৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে আর্কট জয় করিয়া (১৭৫১) চাঁদা সাহেব ও ফরাসী সৈন্যের আক্রমণ হইতে উহার নিরাপত্তা বিধান করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর ক্লাইভ অরনি ও কাবেরীপাক-এর যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। আর্কট অধিকার ক্লাইভের তথা

ক্লাইভের কৃতিত্ব : আর্কট জয়

দাক্ষিণাত্যের ইংরাজগণের ভাগ্য পরিবর্তন করিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। চাঁদা সাহেব এবং ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ জেক্‌স্‌ ল' (Jaques Law) আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আত্মসমর্পণের পর চাঁদা সাহেবকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। এইভাবে ব্রিটিশের সাহায্যে মহম্মদ আলি সমগ্র কর্ণাটের নবাব-পদ লাভ করিলেন।

চাঁদা সাহেব ও জেক্‌স্‌ ল'-এর আত্মসমর্পণ

কিন্তু দুপ্লে ইহাতেও দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি কূটকৌশলে মহীশূরের রাজা ও মারাঠা নেতা মুরার রাওকে স্বপক্ষে আনিতে সক্ষম হইলেন। তাঞ্জোরের



রাজাও ফরাসীদের বিরোধিতা করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। পরিস্থিতির এইরূপ পরিবর্তনে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজগণের অবস্থা পুনরায় সংকটাপন্ন হইয়া উঠিল। এই অবস্থা হইতে ইংরাজদের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষা করিলেন রবার্ট ক্লাইভ। ক্লাইভের সামরিক দক্ষতার বিরুদ্ধে ফরাসী, মারাঠা ও মহীশূরের যুদ্ধবাহিনীও আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। এ-দিকে ফরাসীদের অর্থাভাব চরমে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু দুপ্লে নিজ অর্থ ব্যয় করিয়াও যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।

দুপ্লের কূটকৌশল : ক্লাইভের সামরিক কৃতিত্ব

১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে লা বুরদনে ও দুপ্লের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে লা বুরদনে ফ্রান্সে চলিয়া গিয়াছিলেন, এ-কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি স্বদেশে পৌঁছিয়াই দাক্ষিণাত্যে ফরাসী কোম্পানির কার্যাদি পরিচালনা ব্যাপারে দুপ্লের স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ করিয়া এক দীর্ঘ পত্র ফরাসী কোম্পানির কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিয়াছিলেন। এই অভিযোগপত্র এবং বিশেষভাবে কর্তৃপক্ষের বিনা-অনুমতিতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইবার অপরাধের জন্য দুপ্লের স্থলে গডেহু (Godehu) নামে জনৈক পদস্থ ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া প্রেরণ করা হইল। প্রয়োজনবোধে দুপ্লেকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতাও গডেহুকে দেওয়া হইল। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পণ্ডিচেরিতে পৌঁছিয়া গডেহু দুপ্লের নিকট হইতে সকল দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। পর বৎসর (১৭৫৫) জানুয়ারি মাসে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে এক শান্তি-চুক্তি স্থাপিত হইল। কোন পক্ষই ভবিষ্যতে ভারতীয় রাজগণের পরস্পর দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করিবে না, এই নীতি গৃহীত হইল। অবশ্য এই চুক্তি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে অবস্থিত কোম্পানির কর্তৃপক্ষের অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল।

দুপ্লের পদচ্যুতি

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসান

দুপ্লের চরিত্র, নীতি ও কৃতিত্ব (Character, Policy & Achievements of Dupleix) : যোসেফ্ দুপ্লে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরের শাসনকর্তা হিসাবে ভারতবর্ষে আসেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পণ্ডিচেরির গবর্ণর-পদে নিযুক্ত হন। পণ্ডিচেরির গবর্ণর হিসাবেই দুপ্লে ভারত-ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন সাহসী যোদ্ধা এবং দূরদর্শী রাজনীতিক। বিপদে তিনি ধৈর্য হারাইতেন না। যে-কোন জটিল পরিস্থিতিতে স্থিরভাবে বিচার করিয়া অগ্রসর হইবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিসীম। কর্ণেল ম্যালেসন্ (Colonel Malleson), হিউ মারে, (Hugh Murray) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তাঁহার কর্মপন্থা ও নীতির যৌক্তিকতা, তাঁহার সামরিক কৌশল এবং দূরদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। রবার্টস্ (P. E. Roberts) প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ ম্যালেসন্ বা হিউ মারে-এর প্রশংসায় অতিশয়োক্তি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অর্থগৃধ্নুতা, আত্মম্ভরিতা, অধীন কর্মচারীদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রভৃতি দোষ দুপ্লের চরিত্রে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাঁহারাও দুপ্লের স্বদেশ-প্রীতি, ফরাসী স্বার্থরক্ষার জন্য নিজ অর্থব্যয় করিবার মত ত্যাগ এবং সর্বোপরি তাঁহার বিচক্ষণতার প্রশংসা করিয়াছেন। ব্রিটিশ-শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী গবর্ণরের চরিত্র-বিচারে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের একদেশদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি তাঁহাদের রচনায় দুপ্লের চরিত্রের প্রশংসা, দুপ্লের চরিত্রকে নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে অধিকতর মর্যাদা দান করিবে, বলা বাহুল্য।

চরিত্র

দুপ্লে যখন পণ্ডিচেরির গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন দাক্ষিণাত্যে এক ব্যাপক রাজনৈতিক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। হায়দরাবাদের নিজাম আসফ্জার মৃত্যু হইলে হায়দরাবাদ ও কর্ণাট-এর উত্তরাধিকার লইয়া এক জটিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিচক্ষণ দুপ্লে ভারতীয় সেনাবাহিনী তথা ভারতীয় রাজগণের দুর্বলতার

কথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে সাহস বা বীরত্বে ভারতীয় সৈনিকগণ ইওরোপীয় সৈনিক অপেক্ষা কোন অংশে কম না হইলেও সংগঠন, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাবহেতু তাহারা ইওরোপীয়দের মত দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারে না। তদুপরি সামরিক কৌশল এবং সামরিক শিক্ষার দিক দিয়াও তাহারা ইওরোপীয় সৈন্যদের অপেক্ষা বহু নিকৃষ্ট। এই সকল দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া দুপ্লে একদল ভারতীয় সৈন্যকে ইওরোপীয় পদ্ধতিতে সামরিক শিক্ষা দান করিয়া উহার সাহায্যে ভারতীয় রাজগণের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদে অংশ গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। এইভাবে তিনি দেশীয় রাজগণের নিকট ফরাসী সামরিক সাহায্য অপরিহার্য করিয়া তুলিয়া ক্রমে ভারতবর্ষে এক বিশাল ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারিলে ফ্রান্স হইতে ভারতীয় বাণিজ্যের জন্য আর রৌপ্য প্রেরণেরও প্রয়োজন থাকিবে না, এ-কথাও দুপ্লে ভাবিয়াছিলেন। তদানীন্তন ভারতের রাজনৈতিক অব্যবস্থা দুপ্লের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল ছিল। স্বভাবতই দুপ্লের নীতি সাফল্যমণ্ডিত হইবার পথে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না।

নীতি ও কর্মপন্থা

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব শুরু হইলে দুপ্লে ইংরাজদের ঘাঁটি মাদ্রাজ অবরোধ করিলেন। কর্ণাটের নবাব আনওয়ার-উদ্দিন ইহাতে আপত্তি জানাইলেন এবং মাদ্রাজ হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণের আদেশ দিলেন। দুপ্লে কূটকৌশলে নবাব আনওয়ার-উদ্দিনকে নিরস্ত করিলেন। তিনি মাদ্রাজ জয় করিয়া আনওয়ার-উদ্দিনকে দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন, কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে ইহার অন্যথা হওয়ায় আনওয়ার-উদ্দিন ফরাসী অধিকার হইতে মাদ্রাজ দখল করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। মাইলাপুর বা সেণ্ট্ টোম-এর যুদ্ধে মুষ্টিমেয় ফরাসী সৈন্যের হস্তে আনওয়ার-উদ্দিন পরাজিত হইলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল, বলা যাইতে পারে। অতঃপর দুপ্লে ভারতীয় রাজগণের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ইংরাজগণের নিকট লা বুর্দনের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া মাদ্রাজ ফরাসী অধিকারে রাখিয়া দিলেন। ফলে, লা বুর্দনের সহিত তাঁহার এক তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং লা বুর্দনে শেষ পর্যন্ত পণ্ডিচেরি ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পরে দুপ্লে, ইংরাজ ঘাঁটি ফোর্ট সেণ্ট্ ডেভিড্ দখল করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইলেন। কিন্তু তিনি ইংরাজ নৌ ও স্থলবাহিনী কর্তৃক পণ্ডিচেরির পাল্টা আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে এই-লা-স্যাপল্-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী মাদ্রাজ ইংরাজদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধে দুপ্লের সাফল্য মূল্যহীন হইয়া পড়িল।

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ, মাদ্রাজ অধিকার

ফোর্ট সেণ্ট্ ডেভিড্ আক্রমণ বিফল, পণ্ডিচেরি আক্রমণ প্রতিহত

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নূতন সুযোগ উপস্থিত হইল। নিজাম আসফ্জার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হায়দরাবাদ ও কর্ণাট উভয় স্থানে উত্তরাধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব শুরু হইলে দুপ্লে মুজফ্ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অপর দিকে, ইংরাজগণ নাসির জঙ্গ ও আনওয়ার-উদ্দিনের

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ

পক্ষ গ্রহণ করিল। এইভাবে কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধের সূচনা হইল। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংরাজগণ তেমন তৎপরতা দেখাইল না। ফলে, দুপ্লের সাহায্যপুষ্ট মুজফ্‌ফর জঙ্গ হায়দরাবাদের এবং চাঁদা সাহেব কর্ণাটের সিংহাসন লাভে সমর্থ হইলেন। দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। দেশীয় রাজগণের চক্ষে ফরাসীদের মর্যাদাও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ইহার প্রায় অব্যবহিত পরেই মুজফ্‌ফর জঙ্গের মৃত্যু ঘটিলে ফরাসীরা নিজাম আসফ্‌জার পৌত্র সলাবৎ জঙ্গকে হায়দরাবাদের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যে তাহাদের প্রাধান্য বজায় রাখিল। কিন্তু ফরাসী প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। ইংরাজগণ ফরাসী মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল। তাহারা আনওয়ার-উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলি এবং নাসির জঙ্গকে সর্বতোভাবে সাহায্য দান করিতে লাগিল। ফলে, পুনরায় এক তীব্র দ্বন্দ্বের সূচনা হইল। এই দ্বন্দ্বে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজগণের অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়া উঠিল। এমন সময়ে রবার্ট ক্লাইভের তৎপরতায় যুদ্ধের গতি ইংরাজগণের স্বপক্ষে পরিবর্তিত হইল। ক্লাইভ আর্কট জয় করিলেন এবং চাঁদা সাহেব ও জেক্‌স্‌ল' আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। সমগ্র কর্ণাটে ফরাসী প্রাধান্যের স্থলে ইংরাজ প্রধান্য স্থাপিত হইল। মহম্মদ আলি কর্ণাটের নবাব-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে এইভাবে পরাজিত হওয়ায় দুপ্লের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ধূলিসাৎ হইল। ফরাসী সরকারের বিনা অনুমতিতে কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পরাজিত হওয়ার অপরাধে দুপ্লে পদচ্যুত হইলেন। তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। দুপ্লের স্থলে গডেহু পণ্ডিচেরির গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন।

দুপ্লের সাফল্য

ইংরাজদের ভীতি ও ঈর্ষা—রবার্ট ক্লাইভের কৃতিত্ব—ফরাসী পরাজয়

দুপ্লের পদচ্যুতি

কিছুকালের মধ্যে ফরাসী কর্তৃপক্ষ দুপ্লের কর্মপন্থার বিশদ বিবরণ ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে অবগত হইয়া তাঁহার পদচ্যুতির আদেশ প্রত্যাহার করিলেন এবং তাঁহাকে পুনরায় পণ্ডিচেরিতে গবর্ণর-পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু এই আদেশ পণ্ডিচেরিতে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই দুপ্লে পণ্ডিচেরি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

ফরাসী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দুপ্লের নীতি সমর্থন

দক্ষিণ-ভারতের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার যে-আশা দুপ্লে পোষণ করিতেন তাহা শেষ পর্যন্ত বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ফরাসীদের অসাফল্যের জন্য দুপ্লের ব্যক্তিগত ত্রুটি এবং সামরিক ভুলও যে কতক পরিমাণে দায়ী ছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি দুপ্লেই যে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য গঠনের কথা ভাবিয়াছিলেন, এ-কথা অনস্বীকার্য। তিনি স্বয়ং এই নীতি কার্যকরী করিতে সমর্থ হন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার নীতি অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী কালে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। দুপ্লে যে ভারতে ইওরোপীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের পথপ্রদর্শক ছিলেন, এ-কথা অনস্বীকার্য।

দুপ্লের কৃতিত্ব

দ্যুপ্লের পরিকল্পনা তাঁহার বলিষ্ঠ মানসিক শক্তি, তাঁহার দুঃসাহসিকতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল। ম্যালেসনের মতে দ্যুপ্লে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মত অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া এক বিরাট আদর্শ কার্যকরী করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি যে পরিমাণ প্রতিভা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কূটকৌশল, দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন তাহা যুগপৎ প্রশংসা ও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। দ্যুপ্লে যখন পণ্ডিচেরিতে ফরাসী গভর্ণর-পদ গ্রহণ করিয়া আসেন (১৭৪২) সেই সময়ে ইওরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে ফ্রান্স জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধও আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে ফরাসী সরকার দ্যুপ্লেকে যথাসম্ভব ব্যয় হ্রাস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। দ্যুপ্লে অপ্রয়োজনীয় পদগুলি উঠাইয়া দিয়া এবং চরম মিতব্যয়িতা অনুসরণ করিয়া আয়-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিলেন এবং শুধু তাহাই নহে, পণ্ডিচেরির প্রতিরক্ষা দৃঢ়তর করিলেন। ফরাসী বাণিজ্যের প্রসার সাধন করিয়া পণ্ডিচেরিকে দক্ষিণ-ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত করিলেন। দ্যুপ্লে কেবলমাত্র রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। তিনি যে-সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন পরবর্তী কালে সেগুলি সুযৌক্তিক সে-কথা প্রমাণিত হইয়াছিল। তিনি যে বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ফরাসী বণিক কোম্পানির ন্যায় অর্থাভাবগ্রস্ত ও জাতীয় সরকারের সমর্থনহীন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না। ইহার জন্য প্রয়োজন ছিল ফরাসী সরকার ও সমগ্র ফরাসী জাতির সাহায্য, সহানুভূতি ও সমর্থন। কিন্তু অর্থাভাব ও নানাবিধ বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করিয়াও ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে দ্যুপ্লে ভারতবর্ষে ফরাসীদের এক অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফরাসী প্রতিপত্তি ও মর্যাদা সেই সময়ে চরমে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্যুপ্লের বিফলতা তাঁহার প্রতিভা ও গৌরবকে ম্লান করিতে পারে নাই। তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি, ফরাসী স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি তাঁহাকে ভারতবর্ষে ফরাসী অধিকারের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল আসন দান করিয়াছে।*

দ্যুপ্লের বিফলতার কারণ (Causes of Dupleix's Failure)ঃ দ্যুপ্লের বিফলতার কারণ সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভেই তাঁহার বিফলতা কি পরিমাণে তাঁহার পরিকল্পনার ত্রুটির ফলে ঘটিয়াছিল সেই আলোচনা করা সমীচীন। দ্যুপ্লের নীতি ছিল ভারতীয় নৃপতিদের দুর্বলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ। দেশীয় নৃপতিদের সামরিক দুর্বলতা এবং ভারতীয় সৈনিকদের সামরিক অপকর্ষতা, তাহাদের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব প্রভৃতি সুচতুর দ্যুপ্লের দৃষ্টি এড়ায় নাই। এইরূপ পরিস্থিতিতে দ্যুপ্লের নীতি ও কর্মপন্থা যে সর্বাধিক উপযোগী ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার বিফলতা তাঁহার নীতি বা পরিকল্পনার ত্রুটির জন্য ঘটিয়াছিল বলা যায় না। তাঁহারই প্রদর্শিত নীতি অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠনে সক্ষম হইয়াছিল। দ্যুপ্লের ন্যায়

দ্যুপ্লের বিফলতা—তাঁহার নীতি বা পরিকল্পনার ত্রুটির ফল (?)

* "But in spite of his final failure, Dupleix is a striking and brilliant figure in Indian History." Roberts, *History of British India*, p. 115.

বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতার পরাজয় এবং ঠিক অনুরূপ নীতি অনুসরণ করিয়া রবার্ট ক্লাইভের জয়লাভ বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। সুতরাং দুপ্লের বিফলতার কারণ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে।

বিফলতার প্রকৃত কারণ ঃ

প্রথমত, দুপ্লে ফরাসী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সমর্থনের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের পক্ষপাতী ছিলেন। ফরাসী সরকারের নিকট নিজ পরিকল্পনা প্রথমে গোপন রাখিয়া যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে ভারতে এক ফরাসী সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়া তিনি কৃতিত্ব অর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারিলে বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় রৌপ্য আর ফ্রান্স হইতে আনিতে হইবে না। ভারতীয় সাম্রাজ্য হইতেই তাহা সংগ্রহ করা যাইবে। কিন্তু দুপ্লে নিজ পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নিকট গোপন রাখিয়া ভুল করিয়াছিলেন। বিশেষত, লা বুর্দনে যখন স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন তাহার পর হইতে কর্তৃপক্ষের নিকট সব-কিছু গোপন রাখা অদূরদর্শিতার কাজ হইয়াছিল। কারণ লা বুর্দনের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের মনে দুপ্লের প্রতি কতকটা বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। এমত অবস্থায় নিজ পরিকল্পনা গোপন রাখিয়া তিনি তাঁহার প্রতি ফরাসী কর্তৃপক্ষের মনে সন্দেহ ও বিরুদ্ধভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষকে সকল বিষয়ে অবহিত রাখিলে তাঁহার পদচ্যুতির কোন প্রশ্নই উঠিত না। কারণ, দুপ্লের কর্মপন্থার বিশদ বিবরণ ও যুক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়ামাত্র ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাঁহার পদচ্যুতির আদেশ নাকচ করিয়া তাঁহাকে পুনরায় পণ্ডিচেরির গবর্ণর-পদে বহাল করিয়াছিলেন।

(১) কর্তৃপক্ষ হইতে কর্মপন্থা গোপন রাখিবার ভ্রান্ত নীতি

দ্বিতীয়ত, ফরাসী পক্ষের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি বুসীকে হায়দরাবাদে প্রেরণ করিয়া দুপ্লে ভুল করিয়াছিলেন। কারণ ইংরাজদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে বুসীর সহায়তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। বুসী ও দুপ্লের যুগ্ম-চেষ্টায় কর্ণাটি রক্ষা করা হয়ত সম্ভব হইত। দুপ্লের পরবর্তী কালে অবশ্য বুসীকে কর্ণাটি রক্ষার জন্য বিশেষত মাদ্রাজ জয়ের জন্য ফিরিয়া আসিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তখন ফরাসী শক্তি প্রায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

(২) বুসী ও দুপ্লের যুগ্মভাবে কর্ণাটি রক্ষার চেষ্টার ত্রুটি

তৃতীয়ত, চাঁদা সাহেব ও জেক্‌স্ ল'-এর আত্মসমর্পণের পর দুপ্লের পক্ষে ইংরাজ-দের সহিত যথাসম্ভব সুবিধাজনক শর্তে শান্তি স্থাপন করা উচিত ছিল। কারণ, ঐ সময়ে পণ্ডিচেরিতেও দুপ্লের বিরোধী পক্ষ ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। বুসীও দুপ্লেকে শান্তি স্থাপনের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দুপ্লে যখন ক্রমাগত পরাজয়ে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার অর্থাভাব চরমে পৌঁছিল তখন তিনি শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হইলেন। কারণ ইংরাজ পক্ষ সেই সময়ে নিজেদের বিজয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিল। সুতরাং শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হইল না।

(৩) ইংরাজগণের সহিত শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুপলব্ধ

চতুর্থত, ইংরাজপক্ষে রবার্ট ক্লাইভের উদ্দীপনা ও দুঃসাহসিকতা, লরেন্সের দক্ষতা ও সমরকুশলতা এবং সণ্ডার্সের একাগ্রতার সহিত তুলনা করিবার মত ক্ষমতা বা দক্ষতা ফরাসীপক্ষে কাহারও ছিল না। এই ব্যক্তিগত অপকর্ষতাও দুপ্লের পতনের অন্যতম কারণ ছিল, বলা বাহুল্য।

(৪) ফরাসীপক্ষে ব্যক্তিগত অপকর্ষতা

পঞ্চমত, দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুপ্লের অর্থের প্রয়োজনও দিন-দিনই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছিল। অথচ ইতিপূর্বেই তিনি ফরাসী কর্তৃপক্ষের মনে ভারতে ফরাসী-অধিকৃত স্থানের আর্থিক প্রাচুর্য সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাতে কর্তৃপক্ষের নিকটও অর্থ সাহায্য চাহিবার মত কোন যুক্তি তাঁহার ছিল না। তাঁহার বিফলতার জন্য অর্থাভাব যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিল, ইহা অনস্বীকার্য।

(৫) অর্থাভাব

ষষ্ঠত, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গঠনে নৌশক্তির প্রয়োজনীয়তা দুপ্লে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ফলে লা বুর্দনের ভারত ত্যাগেও তিনি তেমন বিচলিত হন নাই বা লা বুর্দনের সাহায্যের প্রকৃত মূল্যও তিনি উপলব্ধি করেন নাই। স্বভাবতই, নৌবলে বলীয়ান ইংরাজদের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে ফরাসী পক্ষ পরাজিত হইয়াছিল। নৌশক্তির অভাব দুপ্লে তথা ফরাসীদের বিফলতার অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইহা অনস্বীকার্য।

(৬) উপযুক্ত নৌশক্তির অভাব

সর্বশেষে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দুপ্লে সমসাময়িক ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহায়তা লাভ করেন নাই। সাম্রাজ্য গঠনের আর্থিক বা সামরিক প্রয়োজন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মিটান সম্ভব নহে। কিন্তু ফরাসী সরকার তথা ফরাসী জাতির সহায়তা পশ্চাতে থাকিলে দুপ্লে হয়ত অকৃতকার্য হইতেন না।

(৭) ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহায়তার অভাব

কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ (The Third Carnatic War)ঃ দুপ্লের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী কয়েক বৎসর দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব স্থগিত রহিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপ ও আমেরিকার সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (Seven Years' War) শুরু হইলে ভারতবর্ষে পুনরায় ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশ্য এইবারের ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। দাক্ষিণাত্যেও দুই পক্ষের যুদ্ধের ত্রুটি হইল না। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সরকার কাউণ্ট লালি (Count Lally) নামক জনৈক সেনাধ্যক্ষের উপর ইংরাজদের ঘাঁটি ফোর্ট সেণ্ট্ ডেভিড্ জয় করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া প্রেরণ করিলেন। লালি প্রথমে ফোর্ট সেণ্ট্ ডেভিড জয় করিতে সমর্থ হইলেও তাঞ্জোর আক্রমণ করিতে গিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন। এমন সময়ে লালি এক মারাত্মক সামরিক ভুল করিয়া বসিলেন। তিনি বুসীকে হায়দরাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিতে আদেশ দিলেন। লালির উদ্দেশ্য ছিল বুসীর সহিত যুগ্মভাবে মাদ্রাজ আক্রমণ করিয়া তথা হইতে ইংরাজগণকে বিতাড়িত করা। কিন্তু বুসীর স্থলে দাক্ষিণাত্যে তিনি যাঁহাকে পাঠাইলেন তিনি ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল ফোর্ড (Colonen Forde)-এর হস্তে পরাজিত হইলেন।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূচনা (১৭৫৬) কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ

হায়দরাবাদ হইতে বুসীকে চলিয়া আসিবার আদেশ—মারাত্মক ভুল

পরিস্থিতির এইরূপ পরিবর্তনে নিজাম সলাবৎ জঙ্গ চিকাকোল, ইলোর, রাজমহেন্দ্রী প্রভৃতি স্থান ইংরাজগণকে দান করিলেন। এই সকল স্থান ইংরাজগণ কর্তৃক 'উত্তর সরকার' (Northern Sircars) নামে অভিহিত হইল। সলাবৎ জঙ্গ পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া ইংরাজ পক্ষে যোগদান করিলেন। এ-দিকে লালি ও বুসীর যুগ্ম আক্রমণেও মাদ্রাজ অধিকার করা সম্ভব হইল না। ইহার পর লালি ইংরাজ সেনাপতি স্যার আয়ার কূট (Sir Eyre Coote) এর হস্তে বন্দিবাসের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে দাক্ষিণাত্যে তথা ভারতে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের আশা চিরতরে নির্বাপিত হইল। বন্দিবাসের যুদ্ধের পর লালি পণ্ডিচেরিতে অপসরণ করিলেন। কিন্তু ইংরাজ সৈন্য পণ্ডিচেরিও অবরোধ করিল। দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া অবশেষে খাদ্যাভাবহেতু লালিকে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। ইংরাজ সৈন্য পণ্ডিচেরি শহরে প্রবেশ করিয়া সমগ্র শহরটিকে ধূলিসাৎ করিল। পণ্ডিচেরি দুর্গেরও কোন চিহ্ন তাহারা রাখিল না। পণ্ডিচেরির পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের শেষ আশাও লোপ পাইল। লালিকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল এবং সেখানে যুদ্ধে পরাজিত হইবার অপরাধে অন্যায়ভাবে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

লালি ও বুসীর মাদ্রাজ আক্রমণে অসাফল্য

পণ্ডিচেরির পতন

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় এবং শেষ পর্যায় (The Second and Last phase of the Anglo-French Conflict) : ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় এবং শেষ পর্যায় বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইলে উহার সূত্র ধরিয়া ভারতের ইংরাজ ও ফরাসীগণ পরস্পর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। বাংলাদেশে ইংরাজ ও ফরাসীগণ নিজ নিজ বাণিজ্য-কুঠি রক্ষার্থে দুর্গ, প্রাচীর প্রভৃতি নির্মাণ ও পরিখা খনন করিতে আরম্ভ করিলে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা উভয় পক্ষকেই এই সকল সামরিক প্রস্তুতি বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। বস্তুত, বিদেশী বণিক-সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেশের শাসনকর্তা নবাবেরই ছিল। তাহাদের পক্ষে নিজ নিজ ইচ্ছামত সামরিক প্রস্তুতি যেমন ছিল বে-আইনী তেমনি ছিল ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূত্রে বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব

যাহা হউক, ফরাসীরা সিরাজ-উদ্-দৌলার আদেশ পালন করিল। কিন্তু উদ্ধত ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় নবাবের আদেশ অমান্য করিয়া পূর্ণোদ্যমে সামরিক প্রস্তুতি চালাইতে লাগিল। এই সূত্রে সিরাজ-উদ্-দৌলার সহিত ইংরাজদের প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। সিরাজ ইংরাজ দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিলেন। কিন্তু সেই বৎসরই মাদ্রাজ হইতে ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন্ এক নৌ-বাহিনী ও একদল সৈন্যসহ কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া ফোর্ট উইলিয়াম পুনরুদ্ধার করিলেন। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা আলিনগরের সন্ধি দ্বারা ইংরাজগণকে নানাপ্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দানে স্বীকৃত হইলেন। নবাবের সহিত এইভাবে যুদ্ধ মিটিয়া গেলে ইংরাজগণ

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা ও ইংরাজদের মধ্যে সংঘর্ষ

ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগর দখল করিল। অপর দিকে দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধেও ফরাসী পক্ষ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসানে প্যারিসের সন্ধি দ্বারা ফরাসীগণ ভারতে পণ্ডিচেরি, কারিকল, মাহে, জিঞ্জি প্রভৃতি তাহাদের পূর্বেকার সকল স্থানই একমাত্র বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হইবে, এই প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দিতে হইল। ফরাসীরা তাহাদের নিরাপত্তার জন্য কি পরিমাণ সৈন্য রাখিতে পারিবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। ইংরাজগণের অজ্ঞাতে কোন ফরাসী অধিকৃত স্থানে কোন ইওরোপবাসীকে অবস্থান করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ হইল। এইভাবে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হইল।

প্যারিসের সন্ধি (১৭৬৩) ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত

ফরাসীদের বিফলতার কারণ (Causes of the French Failure): ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনে ফরাসীদের বিফলতা তথা ইংরাজগণের সাফল্যের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরাজগণ ফরাসীদের অপেক্ষা বহুগুণে বেশি সমৃদ্ধ ও দক্ষ ছিল। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহাদের সমৃদ্ধি ইংরাজদের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করিয়াছিল, বলা বাহুল্য। অপর পক্ষে, ফরাসীদের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির অভাবহেতু তাহাদের অর্থাভাবও দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধবিগ্রহে ও শাসনকার্যে দক্ষতা ও সাফল্যের পশ্চাতে অর্থবল থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ফরাসীপক্ষের উপযুক্ত অর্থবল ছিল না। দুপ্লে ফরাসী স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নিজের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনের তুলনায় সেই অর্থ অকিঞ্চিৎকর ছিল, বলা বাহুল্য। অর্থাভাবই ফরাসী শক্তিকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ইংরাজ বণিকগণ ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিলেও নিজেদের প্রধান উদ্দেশ্য যে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি, সেই কথা কখনও বিস্মৃত হয় নাই।* তাহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। সেই কারণে তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহের কালেও বাণিজ্যকে উপেক্ষা করে নাই। অপর পক্ষে দুপ্লে মনে করিতেন যে, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ফরাসীরা সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হইয়াছিল। তাহাদের একমাত্র পন্থা হইল সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য গঠন করা। কিন্তু ইওরোপীয় মহাদেশ হইতে ভারতবর্ষের মত দূরবর্তী দেশে সামরিক শক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্য স্থাপন করা যে কতদূর কঠিন কাজ ছিল, সেই কথা ফরাসীরা তেমন উপলব্ধি করে নাই। তৃতীয়ত, ভারতবর্ষে ইওরোপীয়দের পক্ষে সাম্রাজ্য গঠন করিবার একমাত্র শর্তই ছিল শক্তিশালী নৌবহর। অথচ এদিক দিয়া ফরাসী নৌবহর তেমন শক্তিশালী

(১) ফরাসীদের অর্থাভাব

(২) ফরাসীদের বাণিজ্যিক আদর্শ ত্যাগ ও সামরিক আদর্শ গ্রহণ

(৩) নৌবহরের অভাব

---

* "The English never forgot that they were primarily a trading body. Dupleix on the other hand, deliberately came to the conclusion that for French, at any rate the Indian trade was failure and that a career of military conquest opened up a more attractive prospect." Roberts, *History of British India*. p. 124.

ছিল না। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী ফরাসী নৌ-বাহিনী অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। ইহাও ফরাসীদের বিফলতার এবং ইংরাজদের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তদুপরি দুপ্লে ভারতে সাম্রাজ্য গঠনে নৌশক্তির প্রয়োজনীয়তা তেমন উপলব্ধিও করিতে পারেন নাই। ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত স্থলবাহিনীর উপর তাঁহার অধিকতর আস্থা স্থাপন ফরাসীদের বিফলতার সর্ব-প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মনে করা ভুল হইবে না। চতুর্থত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়াছিল। ফলে কাঁচামালের চাহিদা এবং তৈয়ারী মালের জন্য বাজারের প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই কারণে ইংরাজ বণিকদের মধ্যে যে-উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছিল ফরাসী বণিকদের মধ্যে অনুরূপ উৎসাহ বা উদ্দীপনার কোন কারণ ছিল না। পঞ্চমত, ইংরাজ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ উহার পশ্চাতে ছিল ইংরাজ জাতির স্বার্থ ও সমর্থন। জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই ব্রিটিশ সরকার ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অপর পক্ষে ফরাসী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল রাষ্ট্রীয় সাহায্য-সহায়তার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অধীনে এবং সহায়তায় গঠিত ফরাসী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ফরাসী জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল না। তথাপি চতুর্দশ লুই ও তাঁহার বাণিজ্য-সচিব কলবেয়ারের (Colbert) পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত ফরাসী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়াছিল এবং সেই সময়ে ফরাসী জাতির মধ্যে এক দারুণ বাণিজ্যিক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে কলবেয়ারের ন্যায় সুদক্ষ মন্ত্রীর নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে ফরাসী ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি তথা সকল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। অত্যধিক সরকারী সাহায্যপুষ্ট বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান মাত্রই রাষ্ট্রীয় সাহায্য-সহায়তার অভাবে স্বভাবতই নোম্মুখ হইয়া পড়িল। ষষ্ঠত, ফরাসীদের পতনের পশ্চাতে ব্যক্তিগত চরিত্রের অপকর্ষতাও যে ছিল না, এমন নহে। লালি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সুদক্ষ, সমরকুশলী নেতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মেজাজ ছিল রুক্ষ। বিপদের সময় নির্ভর করিবার মত ব্যক্তি তিনি ছিলেন না। পণ্ডিচেরি কাউন্সিলের সহিত তাঁহার বিবাদ-বিসংবাদ ফরাসীপক্ষের কার্যদক্ষতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, সণ্ডার্স, আয়ার কুট, ক্লাইভ, ফোর্ড প্রভৃতি সেনানায়কদের বিরুদ্ধে যুঝিবার মত সামরিক দক্ষতা ফরাসী পক্ষের কাহারও ছিল না। সপ্তমত, ফরাসী কর্তৃপক্ষের ভুল, ফরাসী সেনানায়কদের সামরিক ভুল প্রভৃতিও ফরাসীদের বিফলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দুপ্লেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ফরাসী কর্তৃপক্ষ চরম ভুল করিয়াছিলেন। ভারতে ইওরোপীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা দুপ্লেই সর্ব-প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সামরিকভাবে বিফল হইলেও

(৪) উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব

(৫) জাতীয় স্বার্থ ও সমর্থনহীন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান

(৬) ব্যক্তিগত অপকর্ষতা ; সামরিক দক্ষতার অভাব

(৭) দুপ্লেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশের অদূরদর্শিতা

তাঁহার কার্যপন্থার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য এবং তদানীন্তন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উহা খুবই উপযোগী ছিল। সুতরাং সামরিক বিফলতা সত্ত্বেও তাঁহার সাফল্যলাভের সম্ভাবনা ছিল না, এ-কথা বলা চলে না। কিন্তু ফরাসী কর্তৃপক্ষ দুপ্লেকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিবার সুযোগ দান না করিয়া ভুল করিয়াছিলেন এবং যখন তাঁহারা নিজেদের ভুল উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তখন আর উহা সংশোধনের অবকাশ ছিল না।

(৮) লালি কর্তৃক বুসীকে দাক্ষিণাত্য হইতে অপসারণ

অষ্টমত, দাক্ষিণাত্য হইতে বুসীকে অপসারণের ফলে সেখানে ফরাসী প্রাধান্যনাশের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। বুসী ছিলেন ফরাসী সেনানায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার স্থলে অপর কেহ দাক্ষিণাত্যের ফরাসী প্রাধান্য রক্ষার মত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। সর্বশেষে, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফরাসী সরকার ইওরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে ইংরাজগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় ভারতে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রেরণের সামর্থ্য ফরাসী সরকারের ছিল। এই সকল কারণে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

(৯) ফরাসী সরকারের সাহায্য প্রেরণের অক্ষমতা

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণতি
(Transformation of the East India Company into a Political Power)

বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্বের সূত্রপাত (Rise of the British Power in Bengal) : মুঘল সম্রাট আকবরের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া ঔরংজেবের মৃত্যু পর্যন্ত বাংলাদেশ মুঘল সম্রাটগণের সম্পূর্ণ আনুগত্যাধীন ছিল। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট ঔরংজেব নিজ পৌত্র মহম্মদ আজিমকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। মহম্মদ আজিম (পরবর্তী কালে সম্রাট আজিম-উস্-শান্) ছিলেন ঔরংজেবের পুত্র প্রথম বাহাদুর শাহের পুত্র। মহম্মদ আজিম বাংলার সুবাদার হইয়া আসিয়া প্রথম তিন বৎসর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লইয়া শাসন করিতে থাকেন। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর একচেটিয়া কারবার করিয়া তিনি প্রচুর অর্থলাভ করিতে শুরু করেন। এইভাবে কারবারে সুবাদারের অংশ গ্রহণ করা যেমন ছিল অবৈধ তেমনি প্রজার স্বার্থ-বিরোধী। কারণ একচেটিয়া কারবারে প্রচুর মুনাফা রাখিবার ফলে জিনিসপত্রের দাম স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইত। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার আর্থিক পরিস্থিতি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ঔরংজেব মুর্শিদকুলি খাঁকে দেওয়ান নিয়োগ করিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন ঔরংজেবের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন, বিচক্ষণ ব্যক্তি। দেওয়ান-পদ লাভ করিয়া তিনি প্রজার এবং সরকারের মঙ্গলার্থে একচেটিয়া কারবার বন্ধ করিয়া দিলেন। আর্থিক ব্যয়ে মিতব্যয়িতা অনুসরণ করিয়া বাংলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাইলেন সত্য কিন্তু এই সকল কাজে সুবাদার আজিম অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। তিনি মুর্শিদকুলিকে হত্যার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলে মুর্শিদকুলি খাঁ ঔরংজেবের অনুমতিক্রমে ঢাকা হইতে দেওয়ানের কার্যালয় বা দপ্তর এক নূতন শহরে স্থানান্তরিত করিলেন। এই শহরের নাম তাঁহার নামানুকরণে রাখা হইল মুর্শিদাবাদ। সম্রাট ফারুকশিয়ারের আমলে ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে কিছুকাল তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইয়াছিল।

মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭০০-১৭২৭)

যুবরাজ আজিমের সহিত বিরোধ

দেওয়ানী কার্যালয় নূতন শহর মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত

মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন ঔরংজেবের বিশ্বস্ত কর্মচারী। তাঁহার কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ঔরংজেব তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। বস্তুত মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব-নীতি নির্ধারণে, শাসন-দক্ষতায় এবং সর্বোপরি স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থার ইতিহাসে মুর্শিদকুলির নাম অমর হইয়া আছে। দেওয়ান-পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি বাংলাদেশে আসিয়া প্রথমেই লক্ষ্য করিলেন যে, রাজকর্মচারিগণ বেতনের পরিবর্তে বিশাল পরিমাণ জমি জায়গির হিসাবে ভোগদখল

মুর্শিদকুলির রাজস্ব-নীতি

করিতেছেন। ইহাতে সরকারের যেমন জমি হইতে কোন রাজস্ব আয় হইত না, তেমনি জায়গিরদারের স্থানীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়িতে থাকিত। এজন্য তিনি সরকারী কর্মচারীদের অধীন জমি সরকারের হাতে লইয়া আসিলেন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক রাজস্ব দিবার বিনিময়ে সেই জমি ইজারা দিলেন। এই সকল ইজারাদারই পরবর্তী কালে জমিদার বলিয়া পরিচিত হন। মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব আদায়ের ব্যয় হ্রাস, অপ্রয়োজনীয় সৈন্যসংখ্যা হ্রাস এবং শাসনকার্যে মিতব্যয়িতা অনুসরণ করিয়া সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাইয়াছিলেন। রাজস্ব সময়মত আদায় না দিলে মুর্শিদকুলি জমিদারদের অত্যাচার করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। "চল্লিশ স্তম্ভের হলঘর"-এ অনাহারে বন্দী রাখিয়া অথবা মলমূত্রের গহ্বরে ফেলিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিতেন। স্বভাবতই কেহই রাজস্ব অনাদায়ী রাখিতে সাহস পাইত না। তাঁহার শাসন-দক্ষতার ফলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছিল। তিনি নিজেই কেবল শাসন-দক্ষতা প্রদর্শন করেন নাই, তিনি ফারসী ভাষায় পারদর্শী, কর্মদক্ষ, বুদ্ধিমান বাঙালী হিন্দুদিগকে সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারি-পদে নিয়োগ করিয়া বাংলার শাসনব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। এই সকল পদের নাম ছিল সরকার, কানুনগো, দাস্তদার, বক্সি, মুন্সি, তরফদার, চাকলাদার, খাঁন্, লস্কর প্রভৃতি। মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন দূরদর্শী বিচক্ষণ শাসক। ইংরাজ বণিকদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির বিপদ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বাংলাদেশে ইংরাজদের বিশেষ বাণিজ্য অধিকার দানের পক্ষপাতী ছিলেন না। এজন্য তাঁহার আমলে ইংরাজ বণিকগণ পূর্বেকার 'ফারমান' অনুযায়ী বিনা-শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ ইংরাজ বণিকদের নিকট হইতে প্রচলিত হারে শুল্ক আদায় করিবার আদেশ দিলেন। নিজেদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলার ইংরাজ বণিকগণ সারমান্ ও হ্যামিল্টনকে দিল্লীর সম্রাট ফারুক্-শিয়ারের নিকট প্রেরণ করিল। হ্যামিল্টন ছিলেন একজন সুদক্ষ চিকিৎসক। তাঁহার চিকিৎসায় সম্রাট ফারুক্‌শিয়ার এক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিলে কৃতজ্ঞতার প্রতিদানস্বরূপ তিনি ইংরাজ বণিকগণকে এক নূতন ফারমান দ্বারা বাংলাদেশে বিনা-শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার দিলেন (১৭১৭)। কিন্তু স্বাধীনচেতা নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সম্রাট ফারুক্‌শিয়ারের ফারমান অগ্রাহ্য করিতেও দ্বিধাবোধ করিলেন না। সুতরাং মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে ইংরাজগণকে নিরুপায় হইয়াই অসুবিধা ভোগ করিয়া চলিতে হইল।

ফারুক্‌শিয়ারের ফারমান (১৭১৭)

মুর্শিদকুলির কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁহার জামাতা সুজা-উদ্দিন খাঁ (১৭২৭-৩৯) বা সুজা-উদ্-দৌলা বাংলার পরবর্তী নবাব হইলেন। সুজা-উদ্-দৌলা মুর্শিদকুলির কন্যা জিনাৎ-উন্-নিসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন তুর্কী-বংশসম্ভূত। এই বিবাহের ফলে যে পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল তাঁহার নাম ছিল সরফরাজখাঁ। সুজা-উদ্-দৌলার ব্যভিচারে রুষ্ট জিনাৎ-উন্-নিসার দুঃখে কাতর মুর্শিদকুলি সুজা-উদ্-দৌলাকে বাংলা ও উড়িষ্যার মসনদে উত্তরাধিকার না দিয়া

দৌহিত্র সরফরাজকে দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সুজা-উদ্-দিন দিল্লী হইতে সেই অধিকার আদায় করিয়া প্রয়োজনীয় ফারমান লাভ করেন। মুর্শিদকুলির অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদের পথে মেদিনীপুরে যখন তিনি পেঁছিয়াছিলেন সেই সময় দিল্লীর ফারমান তাঁহার হস্তগত হয়। পথিমধ্যেই মুর্শিদকুলির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি দ্রুত মুর্শিদাবাদ পেঁছান এবং "চিহিল সিতুন" অর্থাৎ চল্লিশ স্তম্ভের হল ঘরে নিজ অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। জিনাৎ-উন্-নিসা এবং মুর্শিদকুলির বেগমের অনুরোধে সরফরাজ পিতার বিরুদ্ধে মসনদ লাভের দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন নাই।

সুজা-উদ্দিন খাঁ (১৭২৭-৩৯)

সুজা-উদ্-দিনের মসনদ লাভ

সুজা-উদ্-দিন সরফরাজকে বাংলার দেওয়ান-পদে বহাল রাখিলেন। এই পদে সরফরাজকে মুর্শিদকুলিই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র তাকি-কে উড়িষ্যার শাসনকর্তা এবং জামাতাকে ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা নিয়োগ করিলেন। উড়িষ্যার শাসনকর্তা থাকাকালীন আলম চাঁদ ছিলেন সুজা-উদ্-দৌলার দেওয়ান। তাঁহাকে মুর্শিদাবাদের দেওয়ান-পদে নিয়োগ করিলেন। এইভাবে নিজ আত্মীয়-স্বজন ও বিশ্বস্ত লোক-জনকে উচ্চ পদে নিয়োগ করিয়া সুজা-উদ্-দৌলা প্রশাসনের উপর নিজ ক্ষমতা সুদৃঢ় করিলেন। শাসনের প্রথম দিকে সুজা-উদ্দিন খাঁ ছিলেন উদারচেতা, ন্যায়পরায়ণ নবাব। প্রজার মঙ্গলসাধন, নিরপেক্ষ বিচার, জমিদারদের প্রতি মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার এবং অধীন কর্মচারীদের প্রতি উদার ব্যবহার ছিল তাঁহার শাসনকালের বৈশিষ্ট্য। মুর্শিদাবাদে খিলাৎখানা, দেওয়ানখানা প্রভৃতি কয়েকটি অতিসুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া তিনি তাঁহার স্থাপত্য-শিল্পানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে বিহার প্রদেশটি বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি আলিবর্দী খাঁকে বিহারের শাসনকর্তা-পদে নিযুক্ত করেন।

উচ্চ পদে আত্মীয়-স্বজন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ

কিন্তু নিজ চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য তিনি কিছুকাল পরেই আমোদ-আহ্লাদে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ ফতেচাঁদের উপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়া তিনি বাংলার নবাবীর পতনের পথ প্রস্তুতের কাজ সহজ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে রাজস্ব আদায়ের দৃঢ়তা জমিদার ও রায়তদের পক্ষে সর্বনাশাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। সুজা-উদ্-দিন জমিদার শ্রেণীর উপর রাজস্ব আদায়ের যে-কঠোরতা প্রদর্শন শুরু করিয়াছিলেন তাহার ফলে পরবর্তী কালে জমিদার শ্রেণী নিজেরা আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে রায়তদের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং নানা প্রকার অপ্রয়োজনীয় অত্যাচার করিতে শুরু করিয়াছিল। জমিদারদের এবং রায়তদের সর্বনাশ সাধনে সুজা-উদ্-দিনের রাজস্ব আদায়ের পন্থা সমর্থনযোগ্য ছিল না, এ-কথা যদুনাথ বলিয়াছেন।

সর্বনাশাত্মক রাজস্বনীতি

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুজা-উদ্দিনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হইলেন। তিনি ছিলেন যেমন অকর্মণ্য তেমনি ক্ষমতাহীন। বাংলাদেশের উপর ক্ষমতা বজায় রাখিতে হইলে যে ব্যক্তিত্ব, শাসন-দক্ষতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন

ছিল তাহার কিছুই সরফরাজ খাঁর চরিত্রে ছিল না। ফলে, বাংলাদেশের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিল। স্থানীয় রাজকর্মচারিগণ স্ব-স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন। এই দুর্বলতার এবং বিশেষত নাদির শাহের আক্রমণে দিল্লীতে রাজনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁ তাঁহাকে মসনদচ্যুত করেন (১৭৪০)।

সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯-৪০)

আলিবর্দী খাঁর মূল নাম ছিল মির্জা মহম্মদ। প্রথম জীবনে বাংলার নবাব সুজা-উদ্দিন খাঁর অধীনে সামান্য কর্মচারী হিসাবে তিনি তাঁহার কর্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দান করেন। ইহাতে স্বভাবতই তিনি সুজা-উদ্দিনের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন। সুজা-উদ্দিনের রাজত্বকালে বাংলা সুবার সহিত বিহার সুবা সংযুক্ত হইলে তাঁহাকে বিহার সুবার সহকারী সুবাদার অর্থাৎ সহকারী নবাব নিযুক্ত করা হয়। এইভাবে উত্তরোত্তর পদমর্যাদা বৃদ্ধির ফলে আলিবর্দী খাঁর আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইল। বাংলার মসনদের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

সুজা-উদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খাঁর আমলে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিলে আলিবর্দীর সুযোগ উপস্থিত হইল। সেই সময়ে নাদির শাহ্ দিল্লী আক্রমণ করায় সেখানে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। সুতরাং বাংলার মসনদ বলপূর্বক দখল করিলে দিল্লী হইতে তাঁহার বিরোধিতার কোন প্রশ্ন ছিল না। এমতাবস্থায় আলিবর্দী খাঁ সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। সরফরাজ খাঁ তাঁহাকে ঘেরিয়া নামক স্থানে বাধা দিতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হইলেন। আলিবর্দী খাঁ বাংলার মসনদ দখল করিলেন। মুর্শিদকুলি খাঁ মৃত্যুর (১৭২৭) পর হইতে ইংরাজদের বাণিজ্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করিতেছিল। আলিবর্দী খাঁর আমলে কোন কোন বিষয়ে সাময়িকভাবে অসুবিধা ভোগ করিলেও মোটামুটিভাবে ইংরাজদের বাণিজ্য ক্রমেই বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

আলিবর্দী খাঁ (১৭৪০-৫৬)

আলিবর্দী মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌কে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ উপঢৌকন দিয়া অন্যায়ভাবে লব্ধ বাংলার শাসনকর্তা-পদে তাঁহার অধিকার আইনত স্বীকার করাইয়া লইলেন। বলপূর্বক বাংলার মসনদ দখল করিলেও আলিবর্দী খাঁ দায়িত্বজ্ঞানহীন শাসক ছিলেন না। তিনি ছিলেন যেমন সুশাসক তেমনি দূরদর্শী। আলিবর্দীর আমলে বাংলাদেশে মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ একটি বাৎসরিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মারাঠাদের আক্রমণের প্রায় একই সময়ে আফগানের বিদ্রোহ আলিবর্দীর রাজ্যের নিরাপত্তা এবং শান্তি উভয়ই বিঘ্নিত করিয়াছিল। দেশরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও আলিবর্দী যখন মারাঠাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি বাৎসরিক বারো লক্ষ টাকা চৌথ এবং উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের অধিকার তাহাদিগকে দিতে স্বীকার করিয়া মারাঠা আক্রমণ হইতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিধান করিলেন (১৭৫১)। উড়িষ্যা নামেমাত্র তাঁহার অধীন রহিলেও কার্যত উহা তাঁহার অধিকারচ্যুত হইয়া গেল।

মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ—তাহাদের সহিত আলিবর্দী খাঁর চুক্তি

আলিবর্দী ছিলেন নির্ভীক সেনানায়ক; তিনি সৈন্য-পরিচালনায় অসাধারণ

পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। সিয়ার-উল্-মুতাখ্‌রিণের রচয়িতা গোলাম হুসেনের মতে আলিবর্দীর সৈন্য-পরিচালনার দক্ষতা একমাত্র আসফ্‌জা-নিজাম-উল্-মুল্‌কের দক্ষতার সহিত তুলনা করা চলে। নবাব হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়াপ্রবণ। অধীনস্থ সর্বস্তরের কর্মচারীদের স্বার্থের প্রতি তাঁহার সমদৃষ্টি ছিল: বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যেমন তিনি উদরতা প্রদর্শন করিতেন এবং তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করিতেন, তেমনি অপরের উপকার তিনি বিস্মৃত হইতেন না। শিল্প, সাহিত্য এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ওর্‌মের রচনা হইতে তাঁহার গোঁড়া অনাড়ম্বর জীবনের কথা আমরা জানিতে পারি। কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জীন ল'র কথায়, তিনি ছিলেন কপটতাপূর্ণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সম্পন্ন ব্যক্তি, কিন্তু পারিবারিক জীবনে, খাদ্য, পানীয় প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংযমী।

আলিবর্দীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র

দূরদর্শী আলিবর্দী খাঁ ইংরাজ বণিকদের প্রতি কোনপ্রকার বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার না করিলেও ইংরাজদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন না। তিনি তাহাদিগকে বণিক হিসাবেই বাণিজ্য করিবার অধিকার দানে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরাজদিগকে দুর্গ নির্মাণ বা অনুরূপ কোন সামরিক বা রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগদানের পক্ষপাতী না থাকিলেও মারাঠা আক্রমণ হইতে যাহাতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে সেজন্য ইংরাজদিগকে 'মারাঠা পরিখা' (Maratha Ditch) খনন করিবার এবং কাশিমবাজারার কুঠির নিরাপত্তার জন্য প্রাচীর নির্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন। আলিবর্দী ইংরেজদের নিকট হইতে ইচ্ছামত অর্থ আদায় করিতেন বলিয়া যে অভিযোগ কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক করিয়া থাকেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বস্তুত, বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিশেষভাবে মারাঠা আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যয়-সংকুলানের জন্য তিনি জমিদারগণের নিকট হইতে কোন কোন সময়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদার হিসাবে ইংরাজগণকেও অপরাপর দেশীয় জমিদারগণের ন্যায় এই অর্থ দিতে হইত। ইহাতে অত্যাচারী মনোবৃত্তির বা অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।*

আলিবর্দী খাঁ ও ইংরাজ বণিকগণ

ইংরাজদের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে আলিবর্দী খাঁর সন্দেহ ও ভীতি যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দূরদর্শী নবাব আলিবর্দী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নৌবলে বলীয়ান ইংরাজগণকে বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত করা সহজসাধ্য নহে। একবার জনৈক সভাসদ্ তাঁহাকে বাংলাদেশ হইতে ইংরাজ বণিকদের বহিষ্কারের পরামর্শ দিলে আলিবর্দী উত্তর করিয়াছিলেন: "স্থলে আগুন লাগিলে তাহা নিভান কঠিন হয়, আর সমগ্র সমুদ্রে আগুন লাগিলে তাহা নিভাইবার সাধ্য কার?" অর্থাৎ স্থলপথে

আলিবর্দী খাঁর দূরদর্শিতা

---

* "Ali Vardi Khan whilst continuing privileges granted by his predecessors had merely called upon the English as he called upon all the zemindars of Bengal, to contribute to the expenses of the defence of the province." Malleson : *Decisive Battles of India*, p. 49.

আক্রমণকারী মারাঠা বর্গীদের প্রতিহত করা-ই যেখানে দুরূহ ব্যাপার সেখানে নৌবলে বলীয়ান ইংরাজগণ বিরোধিতা শুরু করিলে উহা দমন করা শুধু কঠিন নহে অসম্ভব হইয়া উঠিবে।* এই কারণেই আলিবর্দী খাঁ ইংরাজগণের প্রতি সতর্কতামূলক বন্ধুত্বনীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

সিরাজ-উদ্-দৌলা নবাব মনোনীত

নবাব আলিবর্দী খাঁর কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বেই তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র সিরাজ-উদ্-দৌলাকে বাংলার পরবর্তী নবাব মনোনীত করিয়া যান। তাঁহার দৌহিত্রদের মধ্যে সিরাজ-উদ্-দৌলাই ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রিয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলার মসনদে আরোহণ করিলেন।

সিরাজ-উদ্-দৌলা, ১৭৫৬ (Siraj-ud-daulah): ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সিরাজ-উদ্-দৌলা যখন মসনদে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স তেইশ বৎসর মাত্র। মাতামহ আলিবর্দীর অত্যধিক স্নেহে লালিত-পালিত হওয়ায় সিরাজ রাজনৈতিক জ্ঞান বা রাজনৈতিক কার্যকলাপের জটিলতার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং মাতামহের মৃত্যুর পর যখন শাসনকার্যের সমগ্র দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল তখন স্বভাবতই প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনে তিনি সমর্থ হইলেন না।

উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত জটিলতা

আলিবর্দী খাঁর অপর দুইজন জামাতার মধ্যে একজন ছিলেন ঢাকার ও অপরজন ছিলেন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা। তিনি তাঁহার তিন কন্যাকেই তাঁহার তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এই নিকট আত্মীয়দের অনেকেই অপুত্রক আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর মসনদ লাভের আশা পোষণ করিতেন। সুতরাং আলিবর্দী সিরাজকে পরবর্তী নবাব মনোনীত করিলে তাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য আলিবর্দী খাঁর জীবদ্দশারই ঢাকা ও পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা অর্থাৎ আলিবর্দী খাঁর দুই জামাতারই মৃত্যু হইয়াছিল।

ঘসেটি বেগম সৌকৎ জঙ্গ ও রাজবল্লভের ষড়যন্ত্র

আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর ঢাকার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার বিধবা পত্নী আলিবর্দী খাঁর অন্যতমা কন্যা ঘসেটি বেগম এবং পূর্ণিয়ার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার পুত্র—আলিবর্দীর অন্যতম দৌহিত্র—সৌকৎ জঙ্গ সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন। ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজবল্লভ এই ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ঘসেটি বেগম ও সৌকৎ জঙ্গের ষড়যন্ত্রে সিরাজ-উদ্-দৌলা যখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন এমন সময়ে ইংরাজ কোম্পানির সহিত সিরাজ-উদ্-দৌলার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল।

* "It is now difficult to extinguish fire on land but should the sea be in flames, who can put the fire out?" Vide, Smith, *Oxford History of India*, p. 488.

আলিবর্দী খাঁর মৃত্যু আসন্ন এই সংবাদ পাওয়ামাত্র বাংলার ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণ ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রস্তুতির সূত্র ধরিয়া বাংলাদেশে অবস্থিত তাহাদের ঘাঁটিগুলিতে দুর্গ নির্মাণ শুরু করিল। আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুতে নূতন নবাবের মসনদে আরোহণের আনুষঙ্গিক ব্যস্ততার সুযোগ গ্রহণ করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রতি ইংরাজগণ প্রথম হইতেই উদ্ধত ব্যবহার ও অবহেলা প্রদর্শন করিতে শুরু করিল। আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে সিরাজ-উদ্-দৌলা সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, ইংরাজগণ আলিবর্দীর মৃত্যুর পর ঘসেটি বেগমকে সিরাজের বিরুদ্ধে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠির ডাক্তার ফোর্থ (Dr. Forth) আলিবর্দী খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহাকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। ফোর্থ অবশ্য ইংরাজ জাতির নামে শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় রাজনীতিতে ইংরাজগণ কখনও অংশ গ্রহণ করিবে না। কিন্তু সিরাজ যখন মসনদে আরোহণ করেন তখন ইংরাজগণ নূতন নবাব হিসাবে তাঁহাকে উপঢৌকন প্রেরণের চিরাচরিত রীতি অমান্য করিয়াছিল। রাজা রাজবল্লভ ছিলেন ঢাকার দেওয়ান। সিরাজ তাঁহাকে রাজস্বের হিসাব দাখিল করিতে বলিলে তাঁহার গোপন নির্দেশে তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস পরিবার-পরিজন ও প্রভূত ধনরত্নসহ পলাইয়া কলিকাতায় আসিলে ইংরাজগণ তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিল। সিরাজ-উদ্-দৌলা কৃষ্ণদাসকে ফেরত দেওয়ার আদেশ দিলে কৃষ্ণদাস ইংরাজদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছিলেন। সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগম, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির ষড়যন্ত্রে ইংরাজগণও যে জড়িত ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এমতাবস্থায় ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অজুহাতে ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণ বাংলাদেশে দুর্গ নির্মাণ শুরু করিলে সিরাজ-উদ্-দৌলা তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে আদেশ দিলেন। ফরাসী বণিকগণ সিরাজের আদেশ অনুযায়ী দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করিল, কিন্তু উদ্ধত ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিয়া চলিল। উপরন্তু নবাবের দূতকে অপমান করিতেও দ্বিধাবোধ করিল না। নবাব কৃষ্ণদাসের প্রত্যর্পণ দাবি করিলে তাহাও ইংরাজগণ অমান্য করিল।

ইংরাজ ও ফরাসী বণিকদের দুর্গ নির্মাণ

সিরাজের প্রতি ইংরাজদের উদ্ধত আচরণ

সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে ইংরাজদের অংশ গ্রহণ

এক সময়ে সিরাজ-উদ্-দৌলা কৌশলে কোনপ্রকার রক্তপাত ছাড়াই ঘসেটি বেগমকে নিজ প্রাসাদে লইয়া আসিতে সমর্থ হইলেন। সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা এইভাবে সিরাজের কবলে পড়িয়াছেন এবং একপ্রকার বন্দী অবস্থায় আছেন, এই সংবাদ পাওয়ামাত্র ইংরাজগণ ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার বিপদ বুঝিতে পারিল এবং পূর্ব আচরণের জন্য সিরাজের নিকট অনুতাপ প্রকাশ করিল। সিরাজ-উদ্-দৌলা ইংরাজগণকে অবিলম্বে দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করিবার এবং নির্মিত অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই সৌকৎ জঙ্গকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পূর্ণিয়ার দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

ঘসেটি বেগমকে সিরাজের প্রাসাদে অপসারণ - ইংরাজদের ভীতি

তিনি যখন রাজমহলে পৌঁছিলেন তখন গবর্ণর ড্রেক (Governor Drake)-প্রদত্ত পত্র তাঁহার হস্তগত হইল। এই পত্রে ড্রেক ইংরাজদের সদিচ্ছার কথা অতি নম্র ভাষায় সিরাজ-উদ্-দৌলাকে জানাইলেও দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করা হইবে কিনা সেই বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা পূর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর না হইয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই কলিকাতার ইংরাজগণকে উপযুক্ত শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি কাশিমবাজারের ইংরাজ বাণিজ্য-কুঠি দখল করিয়া লইয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইলেন। কলিকাতাস্থ ইংরাজ ঘাঁটি ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইল না। গবর্ণর ড্রেক ও অপরাপর ইংরাজগণ ফোর্ট উইলিয়াম ত্যাগ করিয়া জলপথে ফলতা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম দখল প্রসঙ্গেই 'অন্ধকূপ হত্যা' নামক বীভৎস কাল্পনিক কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল। হলওয়েল (Holwell) নামে জনৈক ইংরাজ কর্মচারীই এই কাহিনীর স্রষ্টা। এক সময়ে অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী সিরাজ-উদ্-দৌলার অমানুষিক নৃশংসতার দৃষ্টান্ত হিসাবে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিতেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় অন্ধকূপ হত্যার নৃশংসতার কাহিনী যে নিছক কাল্পনিক এবং হলওয়েলের উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত, সে-বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। হলওয়েলের কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে, ১৮' × ১৪' ফুট একখানি অতি ক্ষুদ্র কক্ষে সিরাজ-উদ্-দৌলার আদেশে ১৪৬ জন ইংরাজ বন্দীকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা গিয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ স্বল্প পরিসর কক্ষে ১৪৬ জন প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিকে আবদ্ধ রাখা একেবারে অসম্ভব ছিল। কারণ, তাহাদিগকে বইয়ের মত সাজাইয়া রাখিলেও ঐরূপ স্বল্প পরিসর কক্ষে ১৪৬ জনের স্থান সংকুলান সম্ভব ছিল না। এই কারণে ম্যানি দেসান্ত্ বলিয়াছেন: "Geometry disproving arithmetic gave lie to the story" ইহা ভিন্ন, সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণের পূর্বদিনই ড্রেক ও অপরাপর ইংরাজগণ উহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং ১৪৬ জন ইংরাজ কোথা হইতে আসিল? ঐ সময়ে কলিকাতায় হাজার হাজার ইংরাজ ছিল না। সুতরাং ১৪৬ জন পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে এইরূপ মনে করিবার কোন যুক্তি নাই। কতজন বন্দীকে ঐ কক্ষে রাখা হইয়াছিল সে-বিষয়ে এযাবৎ সঠিক কিছু জানা সম্ভব হয় নাই। তবে মোট সংখ্যা ৬০-এর অধিক ছিল না ইহাই মনে করা হইয়া থাকে। সিরাজ-উদ্-দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিয়া যে-সকল ইংরাজ তখনও সেখানে ছিল তাহাদিগকে রাত্রিতে কোথায় রাখা যাইতে পারে সেই প্রশ্ন করিলে ইংরাজ-গণ ফোর্ট উইলিয়ামের অভ্যন্তরস্থ অন্ধকূপ (Black Hole) নামক কক্ষটির উল্লেখ করিয়াছিল। কারণ ইংরাজ অপরাধিগণকে ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃপক্ষ ঐ কক্ষে আবদ্ধ রাখিতেন। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা স্বভাবতই ঐ কক্ষে ইংরাজ বন্দীদিগকে

গবর্ণর ড্রেক-এর ঔদ্ধত্য

সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক কাশিমবাজার কুঠি ও ফোর্ট উইলিয়াম অধিকার

হলওয়েল-উদ্ভাবিত অন্ধকূপ হত্যার কাল্পনিক কাহিনী

কাহিনীর অযৌক্তিকতা

রাত্রির জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণকালে আঘাতপ্রাপ্ত দুই-একজনও বন্দীদের মধ্যে স্বভাবতই ছিল এবং নবাবের অধস্তন কর্মচারীদের অনবধানতা-বশত তাহাদের কেহ কেহ রাত্রিতে ঐ কক্ষে হয়ত মারা গিয়াছিল। কিন্তু অন্ধকূপ হত্যা সম্পর্কে অধিকাংশ ইংরাজ লেখকগণের রচনায় যে-বর্ণনা রহিয়াছে উহাতে সত্য অপেক্ষা কল্পনাই অধিক প্রাধান্য পাইয়াছে। স্বয়ং হল্‌ওয়েলও সিরাজ-উদ্-দৌলাকে অন্ধকূপ হত্যার জন্য দায়ী করেন নাই।*

সিরাজ-উদ্-দৌলা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত

সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক কলিকাতা দখলের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে তথাকার ইংরাজ কর্তৃপক্ষ (Madras Council) অ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সন্ ও রবার্ট ক্লাইভকে একটি নৌবহর ও একদল সৈন্য সহ কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিলেন। ওয়াট্‌সন্ ও ক্লাইভ অনায়াসেই কলিকাতা পুনর্দখল করিতে সক্ষম হইয়াছেন (জানুয়ারি, ১৭৫৭), এই সংবাদ পাইয়া সিরাজ ক্লাইভের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ক্লাইভ কলিকাতার নিকটবর্তী কাশীপুরে নবাবের সেনাবাহিনীকে বাধাদানের জন্য অগ্রসর হইলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারির কুয়াশাচ্ছন্ন প্রাতঃকালে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে গিয়া রবার্ট ক্লাইভ সিরাজের শিবিরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্লাইভের এই পথভ্রান্তি সিরাজ-উদ্-দৌলা তাঁহার দুঃসাহসিকতা বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং ক্লাইভ কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার সহিত আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সন্ধির শর্তানুসারে ইংরাজগণ বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার নানা সুযোগ-সুবিধা লাভ করিল। বিনা-শুল্কে আমাদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করিবার এবং দুর্গ নির্মাণের অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হইল।

ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন্ কর্তৃক কলিকাতা পুনর্দখল (জানুয়ারি ২, ১৭৫৭)

সিরাজ-উদ্-দৌলার ক্লাইভের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা—আলিনগরের সন্ধি (ফেব্রুয়ারি ৯, ১৭৫৭)

পরবর্তী ঘটনাবলী দ্রুতগতিতে ঘটিতে লাগিল। সিরাজের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইলেও রবার্ট ক্লাইভ তাঁহার প্রতি মিত্রতাপূর্ণ আচরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সিরাজ-উদ্-দৌলাকে শত্রু বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং সুযোগ পাইলে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবেন, ইহাও স্থির করিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে সেই সময় ইংরাজদের অপর শত্রু ছিল ফরাসীগণ। ফরাসীদের সহিত

* "I had in all three interviews with him (the Nawab), the last in Darbar before seven, when he repeated his assurance to me, *on the word of a soldier* that no harm should come to us; and indeed. I believe his orders were only general that for that night we should be secured; and wha followed was the result of the revenge and resentment in the breasts of the lower jemadars to whose custody we were delivered for the number of their order killed during the seige." *Mr. Holwell's Narrative*, vide, Malleson; *Decisive Battles of India*, pp. 44-45

সিরাজ-উদ্-দৌলার ঐক্য যাহাতে স্থাপিত হইতে না পারে ক্লাইভ প্রথমে সেই ব্যবস্থাই করিতে চাহিলেন। ইতিমধ্যে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইয়া গিয়াছিল। সেই সূত্র ধরিয়া নবাবের আপত্তি সত্ত্বেও ক্লাইভ ফরাসী ঘাটি ও বাণিজ্যকেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন। ফলে, ফরাসীদের সাহায্য লইয়া নবাব ইংরাজ বিতাড়নের যে-আশা পোষণ করিতেন তাহা বিনষ্ট হইল। ক্লাইভ ইংরাজগণের শত্রুপক্ষ সিরাজ ও ফরাসীদের ঐক্যের পথ বন্ধ করিয়া দিয়া নবাবের বিরোধিতা শুরু করিলেন।

ক্লাইভ কর্তৃক ফরাসী ঘাটি চন্দননগর অধিকার

এ-দিকে মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার শত্রুপক্ষ তাঁহাকে মসনদচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে এক গোপন ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছে। এই সংবাদ ইংরাজদের নিকট পেঁীছিলে রবার্ট ক্লাইভ সেই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। মিরজাফর ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি ছিলেন ভূতপূর্ব নবাব আলিবর্দী খাঁর ভগ্নীপতি। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর বাংলার মসনদ দখল করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহারও ছিল। সিরাজ-উদ্-দৌলা নবাব-পদ লাভ করিলে স্বভাবতই তিনি অসন্তুষ্ট ও ঈর্ষান্বিত হইলেন। গোপন ষড়যন্ত্রের দ্বারা সিরাজকে মসনদচ্যুত করিয়া স্বয়ং নবাব হইবার উদ্দেশ্যে তিনি সিরাজের কর্মচারিবর্গের মধ্যে অনেককেই স্বপক্ষে টানিলেন। এমন-কি বিদেশী বণিক সম্প্রদায় ইংরাজদের সাহায্য গ্রহণেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। মুর্শিদাবাদে ইংরাজ প্রতিনিধি (Agent) ওয়াটস্-এর মারফত মিরজাফর ক্লাইভের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। মুর্শিদাবাদের অর্থগৃধ্নু শেঠ-সম্প্রদায়, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ এবং ইয়ার লতিফ খাঁ প্রভৃতি পদস্থ রাজকর্মচারিগণও মিরজাফরের সহিত যোগ দিলেন। ক্লাইভ, মিরজাফর ও শেঠ উমিচাঁদ-এর মধ্যে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, স্বার্থপরতা ও দেশদ্রোহিতার এক অতি নীচ ও জঘন্য ষড়যন্ত্রের সাহায্যে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে মসনদচ্যুত করিবার চেষ্টা চলিল।

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

মিরজাফর, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ ও ক্লাইভের ষড়যন্ত্র

পলাশীর যুদ্ধ (Battle of Plassey): ষড়যন্ত্রকারী যখন সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত তখন রবার্ট ক্লাইভ অতি সামান্য অজুহাতে সিরাজের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। সিরাজ-উদ্-দৌলাও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ইংরাজগণের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাইয়া তিনি পূর্বেই পলাশীর প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে ভারত-ইতিহাসের এক যুগান্তকারী যুদ্ধ ঘটিল। এই যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর এবং রায়দুর্লভের চক্রান্তে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সেনাবাহিনীর এক বিশাল অংশ যুদ্ধ হইতে নিরস্ত রহিল। মোহনলাল ও মিরমদন নামে দুইজন সামরিক নেতার অধীনে অল্পসংখ্যক সৈন্য নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিল। মিরমদন ও মোহনলালের

পলাশীর যুদ্ধ (জুন ২৩, ১৭৫৭)

সমর-কুশলতার সম্মুখে ইংরাজ বাহিনী দীর্ঘকাল টিকিয়া থাকিতে পারিল না। পার্শ্ববর্তী আম্রকাননে ক্লাইভ তাঁহার সেনাবাহিনী অপসারণে বাধ্য হইলেন। কিন্তু আকস্মিক আঘাতে মিরমদনের মৃত্যু ঘটিলে একমাত্র মোহনলাল যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।

মিরমদনের মৃত্যু সিরাজ-উদ্-দৌলার জয়ের আশা নির্বাপিত করিল। বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থায়ও মিরমদনের সাহায্যে সিরাজের জয়লাভের আশা ছিল।* কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে সিরাজ হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি মিরজাফরকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আলিবর্দী খাঁর আমলে মিরজাফরের আনুগত্যপূর্ণ ব্যবহারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া উপস্থিত বিপদে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে অনুনয় করিলেন। এমন কি তিনি নিজ উষ্ণীষ মিরজাফরের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "জাফর খাঁ, এই উষ্ণীষের সম্মান রক্ষা করুন।" এইভাবে তিনি বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের অন্তরে দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগাইতে চাহিলেন। মিরজাফর মুখে সিরাজের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দান করিতে ত্রুটি করিলেন না বটে, কিন্তু সিরাজের হতাশা লক্ষ্য করিয়া অন্তরে অন্তরে তাঁহার সর্বনাশ সাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন † তিনি সিরাজ-উদ্-দৌলাকে যুদ্ধত্যাগের পরামর্শ দান করিলেন। গোলামহুসেন-রচিত 'সিয়ার-উল্-মুতাখ্‌রিণ' গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, মিরমদনের মৃত্যুর পরও মোহনলালের একক চেষ্টায় যুদ্ধের গতি সিরাজের অনুকূলেই ছিল। কিন্তু নিজ অদূরদর্শিতা ও মানসিক দুর্বলতাহেতু সিরাজ মিরজাফরের সর্বনাশাত্মক পরামর্শ গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। তিনি মোহনলালকে যুদ্ধত্যাগের আদেশ দিলেন। মোহনলাল প্রথমে এই আদেশ মানিয়া লইতে রাজী হইলেন না।‡ কিন্তু সিরাজের পুনঃপুনঃ

মিরমদনের মৃত্যু: সিরাজের হতাশা

মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা সর্বনাশাত্মক পরামর্শ দান

মোহনলালের উপর যুদ্ধত্যাগের আদেশ

* "As long as Mir Madan lived, the chances of Siraj-ud-daulah, surrounded though he was by traitors was not desperate." Malleson, *Decisive Battles of India*, p. 62.

† "He *(Siraj)* reminded him *(Mir Jafar)* of the loyalty he had always displayed towards his grandfather Alivardi Khan, of his relationship to himself; then taking off his turban and casting it on the ground before him, he exclaimed 'Jafar, that turban thou must defend.' Mir Jafar responded with apparent sincerity......(yet) never was he more firmly resolved than at that moment to betray his master." *Ibid*, pp. 62-63.

‡ "......It was at this moment that he received order of falling back and of retreating. He *(Mohanlal)* answered that this was not a time to retreat that action was so far advanced, that whatever might happen, would happen now and that should he turn his head to march back to camp, his people would disperse and perhaps abandon them to open fight." *Siyar-ul-Mutakherin*, vide, *An Advanced History of India*, pp. 62-64.

আদেশে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে যুদ্ধ ত্যাগ করিতে হইল। পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজগণ একপ্রকার পরাজিত হইয়াও জয়ী হইল। হতভাগ্য সিরাজ দ্রুত মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া পুনরায় সৈন্য সংগঠনের বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ভাগলপুরে ফরাসী সেনাধ্যক্ষ মসিয়েঁ ল'র সহিত যোগদান করিয়া পুনরায় ইংরাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু পথিমধ্যে রাজমহলে রাত্রি কাটাইতে গিয়া তিনি ধরা পড়িলেন। সাধারণ বন্দীর ন্যায় তাঁহাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় মুর্শিদাবাদে মিরজাফরের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। সিরাজকে মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় লইয়া আসিলে মুর্শিদাবাদে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। সিরাজের সমর্থকেরও অভাব নাই দেখিয়া মিরজাফর তাঁহাকে অনতিবিলম্বে হত্যা করাই একান্ত প্রয়োজন মনে করিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহারই পুত্র মীরণ ঐ রাত্রেই কারাগারে আবদ্ধ অবস্থায় মহম্মদী বেগকে দিয়া সিরাজকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করাইল। হতভাগ্য নবাব সিরাজের জন্য প্রকাশ্যে সমবেদনা প্রকাশের দুঃসাহস সে-দিন কাহারও ছিল না।

ইংরাজ পক্ষের জয়

সিরাজের প্রাণনাশ

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল (**Results of the Battle of Plassey**): ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য-বিবর্তনের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ অন্যতম প্রধান ঘটনা, এ-কথা বলা বাহুল্য।

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে সাধারণ্যে এই ধারণা স্থিতিলাভ করিয়াছে যে, এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলেই ব্রিটিশ শক্তির প্রভুত্ব বাংলাদেশে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে কেহ কেহ এ-কথাও মনে করেন যে, পলাশীর যুদ্ধ মুসলমান যুগের চিরাচরিত শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা সিংহাসন দখলের একটি নূতন দৃষ্টান্ত ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না। ইংরাজগণ এই যুদ্ধে মিরজাফরকে সাহায্য দানের পুরস্কারস্বরূপ প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নবাব মিরজাফরকে মসনদে স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। বস্তুত, মিরজাফরের সহিত ইংরাজ পক্ষের যে-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাতে মিরজাফরের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হইতে পারে, এইরূপ কোন শর্ত ছিল না।

পরস্পর-বিরোধী দুইটি মত

উপরি-উক্ত দুইটি পরস্পর-বিরোধী মতের আলোচনা করিতে গেলে সর্বপ্রথমেই এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই দুয়ের কোনটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। (১) পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরাজগণ বাংলাদেশে সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিল বা এই যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ তাহারা জয় করিয়াছিল, একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজগণ কোন কালেই বাংলাদেশ জয় করে নাই। বাংলায় নবাবী শাসনের স্থলে ব্রিটিশ শাসন ক্রমবিবর্তনের ফলেই স্থাপিত হইয়াছিল। (২) মিরজাফর মসনদে আরোহণ করিয়া ইংরাজ কোম্পানিকে চব্বিশ পরগণার জমিদারি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও ইংরাজ কোম্পানি অপরাপর জমিদারদের মত

বাৎসরিক খাজনা দিতে বাধ্য ছিল। (৩) সেই সময় ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'কোর্ট-অব্-ডিরেক্টরস্' বা ডাইরেক্টর সভা (Court of Directors) ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহাদের চিঠিপত্রাদিতে দেশীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার এবং দুর্গ নির্মাণ না করিবার নির্দেশ প্রায়ই থাকিত। পলাশীর যুদ্ধের পরও বহরমপুরে দুর্গ নির্মাণের প্রস্তাব ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক অগ্রাহ্য হইয়াছিল। (৪) পরবর্তী কালে মিরকাশিম কর্তৃক তাঁহার রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করা, জার্মান সামরিক নেতা সামরুর অধীনে নিজ সেনাবাহিনীকে ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান প্রভৃতিতে বাংলার নবাবের সার্বভৌমত্বের সুস্পষ্ট পরিচয় ছিল, সন্দেহ নাই। (৫) ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ উইলিয়াম পিট্ (William Pitt Earl of Chatham)-এর নিকট বাংলাদেশ জয় করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। (৬) ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দেওয়ানী গ্রহণ করিতে তখনও তাহারা সাহস পায় নাই। দেওয়ানী লাভের ফলে ইংরাজ কোম্পানি আইনত নবাবের সম-পর্যায়ে স্থাপিত হইয়াছিল। বস্তুত, দেওয়ানী-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নবাবের অধীন কর্মচারিবর্গের হস্তেই ছিল।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজগণ বাংলাদেশে প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হয় নাই—এই মতের সপক্ষে যুক্তি

তথাপি পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরাজদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি যে বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ইহা অনস্বীকার্য। প্রথমত, ইংরাজগণের সমরকুশলতার পরিচয় হিসাবে পলাশীর যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য না হইলেও এই যুদ্ধের ফলে সিরাজ মসনদচ্যুত হওয়ায় দেশীয় রাজগণ ও জনসাধারণের মনে ইংরাজদের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে এক উচ্চ এবং ভীতিপূর্ণ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। অপরাপর ইওরোপীয় বণিক-সম্প্রদায়ের চক্ষেও ইংরাজগণের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, মিরজাফরের সহিত ইংরাজ কোম্পানির যে-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহাতে মিরজাফরের প্রয়োজনমত ইংরাজগণ সামরিক সাহায্যদানে বাধ্য থাকিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিল। মিরজাফর মসনদে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল, মারাঠাগণও বাংলাদেশে হানা দিতে শুরু করিয়াছিল। শাহ্জাদা (পরবর্তী সম্রাট শাহ্ আলম) বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সকল বিপদে মিরজাফর ইংরাজ কোম্পানির নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বেই হউক নবাব ইংরাজদের সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৃতীয়ত, এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে সেই সময়কার ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শস্যশ্যামল, সমৃদ্ধ অংশ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শোষণের পথ ইংরাজদের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছিল এবং চতুর্থত, ইংরাজগণ কর্তৃক মিরজাফরের স্থলে মিরকাশিমকে স্থাপন, বক্সারের যুদ্ধে মিরকাশিমকে পরাজিত করা, অযোধ্যার নবাব ও শাহ্ আলমকে তাহাদের প্রভাবাধীনে

অপর মতের সপক্ষে যুক্তি

স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের মর্যাদা, শক্তি ও প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির সূত্রপাত পলাশী যুদ্ধের পর হইতেই হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজগণ বাংলার শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে এক অতি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণতির ইতিহাস এই সময় হইতেই বিশেষভাবে শুরু হইয়াছিল। এই দিক হইতে বিচার করিলে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজগণ যে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিল, এ-কথা অস্বীকার করা চলে না।

যাহা হউক, উপসংহারে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর আপাতদৃষ্টিতে ইংরাজগণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব স্থাপিত না হইলেও ইংরাজ কোম্পানি যে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বেকার অধীনতা হইতে তাহারা এখন বহুল পরিমাণে মুক্ত, অধিকতর শক্তিশালী এবং নবাবের অপরিহার্য সহায়ক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

উপসংহার

সিরাজ-উদ্-দৌলার চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার (Critical Estimate of the Character & Career of Siraj-ud-daulah): মাতামহ আলিবর্দী খাঁর ভাগ্যোন্নতির কালে সিরাজের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া আলিবর্দী তাঁহাকে প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। স্নেহান্ধ আলিবর্দী দৌহিত্রের বিলাস-ব্যসন এবং যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দান করেন নাই। নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করিয়াও দৌহিত্রকে শাসন ও সংসার সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও তিনি করিলেন না। স্বভাবতই সিরাজ বিলাস-ব্যসনপ্রিয়, উচ্ছৃঙ্খল, অনভিজ্ঞ যুবক হিসাবে বাংলার মসনদে আরোহণ করিয়াছিলেন।

সিরাজের চরিত্রের উপর আলিবর্দীর স্নেহান্ধতার প্রভাব

সিরাজের চরিত্র-বিচারে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, এ কথা অনস্বীকার্য। সিরাজের অভিজ্ঞতার অভাব, সমসাময়িক সুলতান-বাদশাহ্‌দের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের রীতি, মুসলমান-শাসনে পুনঃপুনঃ সিংহাসন লইয়া বিবাদ-বিসংবাদের ইতিহাস স্মরণে রাখিলেই সিরাজের চরিত্র ও পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচার করা সম্ভব হইবে। ব্যক্তিগত চরিত্রের অপকর্ষতা ভিন্ন অনভিজ্ঞতাবশতঃ সিরাজ কতকগুলি ত্রুটির জন্য দায়ী ছিলেন। তিনি মিরজাফরের দুরভিসন্ধির কথা জানিতে পারিয়াও মিরজাফরকে কারারুদ্ধ না করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের পরামর্শ গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন। মোহনলালকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিবার সুযোগ দান না করিয়া তিনি জয়ের মুহূর্তে পরাজয় ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা হইতে তাঁহার দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার অভাব ছিল একথা প্রমাণিত হয়, বলা বাহুল্য। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, চতুর্দিকে শত্রু ও বিশ্বাসঘাতক দ্বারা পরিবৃত অবস্থায় মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখা অভিজ্ঞ শাসকের পক্ষেও হয়ত সম্ভব হইত না। অবশ্য তিনি যে কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় না দিয়াছিলেন এমন নহে। ঘসেটি বেগমকে আকস্মিকভাবে নিজ প্রাসাদে আবদ্ধ করিয়া তিনি রাজনৈতিক

তাঁহার চরিত্র

কূটকৌশলের পরিচয় দান করিয়াছিলেন, এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু দেশাত্মবোধ ও সততার দিক হইতে বিচার করিলে তিনি যে তাঁহার প্রতিপক্ষ মিরজাফর ও ক্লাইভ অপেক্ষা বহু ঊর্ধ্বে ছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা বাংলার মসনদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করাই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি মিরজাফরকে বাংলার নবাবের উষ্ণীষের মর্যাদা রক্ষার জন্যই কাতর অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। অন্তত তিনি ক্লাইভ বা মিরজাফরের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকদের সহিত তুলনীয় ছিলেন না, এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে নিজেদের দেশ বিদেশীয়দের নিকট বিক্রয়ের নীচতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন।*

ক্লাইভ ও মিরজাফর-এর সহিত তুলনা

মিরজাফর, ১৭৫৭-৬০ (**Mir Jafar**) **:** বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, শঠতা—সর্বপ্রকার নীচ স্বার্থপরতার মিলিত আঘাতে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতন ঘটিলে (১৭৫৭) বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ ইংরাজদের সাহায্যে মিরজাফর বাংলার মসনদ লাভ করিলেন। ইংরাজদের সাহায্যলাভের আগ্রহে মিরজাফর নবাবের অর্থভাণ্ডারের ক্ষমতার অতিরিক্ত পুরস্কার ইংরাজ কোম্পানিকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু মসনদে আরোহণ করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদে রাজকোষে সেই পরিমাণ অর্থ পাইলেন না। কিন্তু ইংরাজদের দাবি উপেক্ষা করা চলিল না। আসবাবপত্র, মূল্যবান ধাতু-নির্মিত বাসনপত্র বিক্রয় করিয়া দেড় কোটি টাকারও অধিক অর্থ ইংরাজ কোম্পানিকে দিতে হইল। ক্লাইভ স্বয়ং প্রভূত পরিমাণ অর্থ পুরস্কার হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তিনি বাৎসরিক ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের একটি জায়গীরও গ্রহণ করিলেন। মিরজাফরের আর্থিক অনটনের কথা জানিয়াও ক্লাইভ তাঁহার নিকট হইতে এইভাবে অর্থ আদায় করিয়া মিরজাফরের শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিলেন। শাসনকার্যে মিরজাফরের অসাফল্যের পশ্চাতে ক্লাইভের অর্থগৃধ্নুতা যে বহুলাংশে দায়ী ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন, উমিচাঁদ নামক জনৈক শিখ বণিকের মাধ্যমে মিরজাফরের সহিত ষড়যন্ত্র সম্পন্ন হইয়াছিল। এই কারণে উমিচাঁদ নিজ পারিশ্রমিক হিসাবে প্রভূত পরিমাণ কমিশন (Commission) বা বাট্টা দাবি করিয়াছিলেন। ক্লাইভ উমিচাঁদের দাবি স্বীকার করিয়া একটি জাল দলিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু মিরজাফরের সহিত যে-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহাতে উমিচাঁদের প্রাপ্য অর্থের কোন উল্লেখ তিনি করেন নাই। শুধু তাহাই নহে, এই জাল দলিলে ওয়াট্সন্ স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলে ক্লাইভ উহাতে ওয়াট্সনের স্বাক্ষর জাল করাইয়াছিলেন। কার্যসিদ্ধি হইলে পর ক্লাইভ উমিচাঁদের দলিল খাঁটি

মিরজাফরের আর্থিক অনটন

ক্লাইভের অর্থগৃধ্নুতা, জালিয়াতি

* "Whatever may have been his faults, Siraj-ud-daulah had neither betrayed his master nor sold his country. Nay more, no unbiassed Englishman sitting in judgement on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June can deny that the name of Siraj-ud-daulah stands higher in the scale of honour than does the name of Clive. He was the only one of the principal actors in that tragic drama who did not attempt to deceive!" **Malleson ;** ***Decisive Battles of India*, p. 71.**

নহে, এ-কথা বলিয়া তাঁহার প্রাপ্য এড়াইতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। ষড়যন্ত্রকারী উমিচাঁদের তাহাতে উচিত শাস্তি হইলেও ক্লাইভ যে ইহা দ্বারা নিজ চরিত্র মসীলিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে দ্বিমতের অবকাশ নাই।

মসনদে আরোহণ করিয়াই আর্থিক অনটনের মধ্যেও ইংরাজদের দাবি মিটাইবার ফলে মিরজাফরের শাসনব্যবস্থায় যে-দুর্বলতা দেখা দিল উহার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁহার পরবর্তী কার্যকলাপ বিচার্য। তিনি উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী ও জমিদারগণের নিকট হইতে অন্যায় অত্যাচারের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে চাহিলেন। মেদিনীপুরের শাসনকর্তা রামরাম সিং, বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণ এবং দেওয়ান রায়দুর্লভের সঞ্চিত অর্থ তিনি আত্মসাৎ করিতে চাহিলেন। রামরাম সিংকে তিনি পূর্বেকার কয়েক বৎসরের অনাদায়িকৃত খাজনার কৈফিয়ত দিবার জন্য মুর্শিদাবাদে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এমন সময়ে ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিলে এ-বিষয়ে তিনি আর অগ্রসর হইবার অবকাশ পাইলেন না। ক্লাইভের সাহায্যে ঢাকার বিদ্রোহ দমন করা হইল বটে, কিন্তু পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইবার কালে মিরজাফরের সেনাবাহিনী তাহাদের বহুদিন যাবৎ প্রাপ্য বেতন না পাইলে পূর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে রাজী হইল না। মিরজাফর বাধ্য হইয়াই ইংরাজদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। ফলে, সেই সাহায্যের জন্য ইংরাজ কোম্পানির নিকট তাঁহাকে আরও ঋণগ্রস্ত হইতে হইল। পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন করিয়া ক্লাইভ সৈন্য সাহায্যদানের জন্য কোম্পানির প্রাপ্য মিরজাফরের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইলেন। মিরজাফরের আর্থিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছিল।

মিরজাফরের অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা

ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ

ইতিমধ্যে মিরজাফরের ন্যায় হীনচেতা ব্যক্তির পক্ষেও ইংরাজদের ঔদ্ধত্য সহ্য করা আর সম্ভব হইল না। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে, ঢাকা ও পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমনে এবং সম্রাট শাহ্ আলমের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ ইংরাজ সাহায্য গ্রহণের ফলে তাহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, মিরজাফর নবাব হইয়াও নবাবের প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করিতে পারিলেন না। অতিষ্ঠ হইয়া তিনি ওলন্দাজগণের সাহায্যে বাংলাদেশ হইতে ইংরাজগণকে দূর করিবার জন্য গোপনে পত্রালাপ শুরু করিলেন। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ বাটাভিয়া হইতে এই উদ্দেশ্যে সাতখানি যুদ্ধজাহাজ আনাইলেন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে হুগলী নদীর মোহনায় ওলন্দাজ নৌবহর উপস্থিত হইল। ক্লাইভ পূর্ব হইতেই মিরজাফরের সহিত ওলন্দাজগণের গোপন যোগাযোগের সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি ওলন্দাজ নৌবহর আক্রমণ করিয়া বিদারা (Bidderah)-এর যুদ্ধে উহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিলেন। এই যুদ্ধে ওলন্দাজগণের পরাজয়ে ওলন্দাজ বণিক ও মিরজাফর উভয়েরই ভবিষ্যৎ আশা বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

ওলন্দাজগণের সহিত মিরজাফরের গোপন যোগাযোগ ঃ বিদারার যুদ্ধ (১৭৫৯)

এমন সময় মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র শাহ্‌জাদা আলি গৌহর, ওয়াজীর গাজী উদ্দিনের হস্তে পিতা একপ্রকার বন্দিদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করেন। তিনি এলাহাবাদের শাসনকর্তা মহম্মদ কুলী খাঁ ও অযোধ্যার

শাসনকর্তা সুজা-উদ্-দৌলার সাহায্য লইয়া বাংলাদেশ জয় করিতে চাহিলেন। এইভাবে তিনি এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি কুলী খাঁর সাহায্য লইয়া ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিহার আক্রমণ করিলেন। কিন্তু কুলী খাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া সুজা-উদ্-দৌলা এলাহাবাদ আক্রমণ করিলে কুলী খাঁ বাধ্য হইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। আলি গোহর এককভাবে বিহার জয় করা অসম্ভব দেখিয়া এ-যাত্রা ফিরিয়া গেলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই ওয়াজীর গাজী-উদ্দিন সম্রাট আলমগীরকে হত্যা করিলে আলি গোহর 'দ্বিতীয় শাহ্ আলম' উপাধি ধারণ করিয়া বাদশাহ্ হইলেন এবং সুজা-উদ্-দৌলাকে নিজ ওয়াজীর নিযুক্ত করিলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ও সুজা-উদ্-দৌলা পুনরায় পাটনা আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হইলেন। ইহার পর তিনি মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়া ইংরাজদের হস্তে পরাজিত হইলেন।

শাহ্জাদা আলি গোহর কর্তৃক বিহার ও বাংলা আক্রমণ

মিরজাফরের অকর্মণ্যতা ইংরাজদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলে হলওয়েলের প্রস্তাবক্রমে তাঁহাকে মসনদচ্যুত করা স্থির হইল।* ওলন্দাজদের সহিত ষড়যন্ত্র এবং আলি গোহরের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের অভিযোগে মিরজাফর মসনদচ্যুত হইলেন। ইতিমধ্যে (১৭৬০) রবার্ট ক্লাইভ ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতায় ইংরাজ গবর্ণর ছিলেন ভ্যান্সিটার্ট (Vansittart)। ইংরাজদের সাহায্যে মিরজাফরের জামাতা মিরকাশিম বাংলার নবাব-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সম্রাট শাহ্ আলম বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্বের পরিবর্তে মিরকাশিমকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলিয়া আইনত স্বীকার করিয়া লইলেন; ইংরাজ কোম্পানিও মিরকাশিমের নিকট হইতে উপযুক্ত পুরস্কার গ্রহণে ত্রুটি করিল না। নবাব পরিবর্তন তাহাদের নিকট একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল। ঐ যুগের বাংলাদেশের ইতিহাসে ইংরাজদের এরূপ স্বার্থলোলুপতা ইংরাজ জাতির চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে সন্দেহ নাই। 'মানবতা' ও 'ভগবানের' নামে শপথ করিয়া তাহারা মিরজাফরকে বাংলার মসনদে স্থাপন করিয়াছিল এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে তাহারা কুণ্ঠাবোধ করে নাই। এই সময়কার ইংরাজদের নীচ স্বার্থপরতার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া সার আলফ্রেড্ লায়েল (Sir Alfred Lyall) বলিয়াছেন যে, উহা ইংরাজ নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল।†

মিরজাফরের মসনদচ্যুতি

ইংরাজ জাতির চরিত্রে কলঙ্ক লেপন

* "It cannot be doubted that Holwell and in turn Vansittart honestly believed that the Nawab, whom the English had enthroned after Plassey, was a person in whom no confidence could be placed. They held that he was not only incompetent but also treacherous ....." Ferminger.

† "The only period of Anglo-Indian history which throws grave and unpardonable discredit on the English name." *Sir Alfred Lyall*, vide, Roberts, p. 149.

মিরকাশিম, ১৭৬০-৬৪ (Mir Qasim) : মিরজাফরের পদচ্যুতির ফলে মিরকাশিম বাংলার মসনদে আরোহণ করিলেন। তিনি ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিক। তিনি ছিলেন দেশাত্মবোধসম্পন্ন সুদক্ষ শাসক। মুর্শিদাবাদে কোম্পানির প্রতিনিধি (Resident) থাকাকালে ওয়ারেন হেস্টিংস মিরকাশিমকে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন, ধৈর্যশীল, মিতব্যয়ী, সুদক্ষ ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন।* মিরজাফরের পতনের প্রধান কারণই যে ছিল তাঁহার আর্থিক দুর্বলতা, এ-কথা মিরকাশিম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং নবাব-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি আর্থিক সচ্ছলতা আনিবার চেষ্টা শুরু করিলেন। প্রথমেই তিনি ইংরাজ কোম্পানির প্রাপ্য চুকাইয়া দিলেন। তিনি বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম—এই তিনটি জেলা কোম্পানিকে তাহাদের যাবতীয় প্রাপ্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হিসাবে দিয়া দিলেন। এইভাবে ইংরাজ কোম্পানির সহিত দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়া তিনি শাসনকার্যে মনোযোগ দিলেন। শাসন-ব্যাপারে যথাসম্ভব ব্যয়সংকোচ করিয়া এবং কয়েকটি নূতন 'আব্ওয়াব' বা অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়া তিনি অর্থাভাব দূর করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর উদ্ধত এবং বিদ্রোহী জমিদারগণকে তিনি তাঁহার অনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন এবং ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি পূর্বেকার যাবতীয় আর্থিক ও শাসন-সংক্রান্ত অব্যবস্থা হইতে শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিলেন।

মিরকাশিমের দূরদর্শিতা

মিরকাশিম ছিলেন মিরজাফর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। ইংরাজদের সহিত বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হইবার ইচ্ছা তাঁহার না থাকিলেও তাহাদের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া থাকিবার মত হীন মনোবৃত্তিও তাঁহার ছিল না। মিরকাশিম প্রকৃত নবাব হিসাবেই শাসনকার্য চালাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। (১) তিনি বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণের ইংরাজ-প্রীতি এবং অসাধুতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। (২) ইংরাজ কোম্পানির প্রভাব হইতে দূরে থাকিবার উদ্দেশ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন এবং নব-প্রতিষ্ঠিত রাজধানীকে দুর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিলেন। (৩) মিরকাশিম বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নিজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে হয়ত শেষ পর্যন্ত ইংরাজ কোম্পানির সহিত প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সুতরাং তিনি সামরু (Walter Reinhard, nicknamed Sumroo) ও মার্কার নামে দুইজন ইওরোপীয় সৈনিকের সাহায্যে নিজ সেনাবাহিনীকে ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলেন। (৪) তিনি কামান ও বন্দুক নির্মাণের ব্যবস্থাও করিলেন।

মিরকাশিমের উদ্দেশ্য ও কার্যাদি

* "Mir Qasim was a genuine patriot, an able ruler, who quickly retrenched expenditure and suppressed disorders." Thompson & Garratt : *Rise and Fulfilment of British Rule in India*, p. 100.

"........a man of understanding of an uncommon talent for business and great application and perseverance joined to a thriftness." Hastings about Mir Qasim. *Idem.*

এই সকল ব্যবস্থা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মিরকাশিম মিরজাফরের ন্যায় বিনা-যুদ্ধে মসনদচ্যুত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তথাপি এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিরকাশিম অযথা ইংরাজ কোম্পানির সহিত বিবাদ-বিসংবাদের পক্ষপাতীও ছিলেন না। কলিকাতার ইংরাজ গবর্ণর ভ্যান্সিটার্টের সহিত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-শুল্ক সম্পর্কে মতানৈক্যের কালে মিরকাশিমের ব্যবহার হইতেও এ-কথা প্রমাণিত হইবে।

ইংরাজ বণিকগণ কর্তৃক বাণিজ্য-অধিকারের অপব্যবহার

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিনা শুল্কে কেবলমাত্র আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিল। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারিগণ 'দস্তক' নামক ছাড়পত্র মাল আমদানি বা রপ্তানি বাণিজ্য-সংক্রান্ত এ-কথা লিখিয়া দিলেই বিনা-শুল্কে কোম্পানির পণ্যদ্রব্যাদি একস্থান হইতে অপর স্থানে লইয়া যাওয়া চলিত। এই সকল 'দস্তক' স্বাক্ষরেরর ভার নবাব ইংরাজ কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীদের উপরই বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজ কর্মচারিগণ এই দস্তকের অপব্যবহার করিয়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। দস্তক দেখাইয়া তাহারা একস্থান হইতে অপর স্থানে বিনা-শুল্কে মাল চালান দিত, কিন্তু এই মাল তাহারা দেশীয় বাজারেই বিক্রয় করিত। পক্ষান্তরে, দেশীয় বণিকগণ সরকারী শুল্ক-ঘাটিগুলিতে শুল্ক দিতে বাধ্য হইত। শুল্ক ফাঁকি দিয়া ইংরাজ বণিকগণ স্বভাবতই

দেশীয় বণিকগণের সর্বনাশসাধন

অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারিত, অথচ শুল্কে দিবার ফলে দেশীয় বণিকগণ ঐ দামে মাল বিক্রয় করিলে তাহাদিগকে লোকসান দিতে হইত। ফলে দেশীয় বণিকদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িল। কোন স্বাধীন রাজা বা নবাবের পক্ষে বিদেশী বণিকদের এই ধরনের বিনা-শুল্কে একচেটিয়া ব্যবসায় করিবার অবৈধ অধিকার অস্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব ছিল না। মিরকাশিম এ-বিষয়ে ইংরাজ গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, প্রতিবাদ জানাইলেন।* কিন্তু তাহাতেও এই অন্যায় আচরণের কোন প্রতিকার করা

মিরকাশিমের উদারতা

সম্ভব হইল না দেখিয়া মিরকাশিম দেশীয় প্রজাদের উপর হইতেও শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে রাজকোষের যথেষ্ট ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু দেশীয় প্রজার স্বার্থরক্ষার জন্য মিরকাশিম এই ক্ষতি স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এই ব্যবস্থাও ইংরাজদের মনঃপুত হইল না। পাটনার ইংরাজ বাণিজ্য-কুঠির এজেণ্ট এলিস্ (Ellis) ইহাতে বিরক্ত হইয়া নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ-ই একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিলেন। ঐতিহাসিক র‍্যামসে মুর (Ramsay Muir) স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, এলিস্ নিজের এবং বন্ধুবান্ধবদের অবৈধ অর্থোপার্জনের পথে বাধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মিরকাশিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এমিয়ট, হে, স্মিথ্ ও ভেরেলষ্ট (Amyatt, Hay, Smith,

* "No Indian ruler would or could, have granted foreigners leave to wreck his whole system by a monopoly duty free trade along every road and river of his kingdom." *Ibid*, p. 101.

Verelst) প্রভৃতি ইংরাজ কর্মকর্তাগণও এলিসের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। এলিস্ সাহেব পাটনা শহর আক্রমণ করিলে মিরকাশিম ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি পাটনা শহর হইতে ইংরাজগণকে বিতাড়িত করিয়া উহা পুনর্দখল করিলেন। কিন্তু ইহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে ইংরাজদের হস্তে পরাজিত হইয়া অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলার আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। অযোধ্যায় অবস্থানকালে তিনি সুজা-উদ্-দৌলা ও সম্রাট শাহ্ আলমের সাহায্য লইয়া পুনরায় ইংরাজদের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সার নামক স্থানে মিরকাশিম, সুজা-উদ্-দৌলা ও সম্রাট শাহ্ আলমের সম্মিলিত বাহিনী ইংরাজ-সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। এই যুদ্ধেও ইংরাজগণ জয়ী হইলে বাংলার শেষ স্বাধীন ও দেশাত্মবোধসম্পন্ন নবাবের পতন ঘটিল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে ইংরাজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। এই যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইবার ফলে অযোধ্যার নবাব সুজ-উদ্-দৌলা, সম্রাট শাহ্ আলম ইংরাজ কোম্পানির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। মিরকাশিম আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিলেন। পলাতক অবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের দিক দিয়া বিচার করিলে বক্সারের যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শক্তিকে আর নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হয় নাই। পরবর্তী যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তারের যুদ্ধ।

মিরকাশিমের সহিত ইংরাজগণের সংঘর্ষ

কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে মিরকাশিমের পরাজয়

বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪) মিরকাশিমের পরাজয়

বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল

মিরকাশিমের পরাজয়ের পর ইংরাজগণ পুনরায় মিরজাফরকে বাংলার মসনদে বসাইল। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে (১৭৬৫) তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পুত্র নাজিম-উদ্-দৌলা ইংরাজ কোম্পানিকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ পুরস্কার হিসাবে দান করিয়া কোম্পানির অনুমোদনক্রমে বাংলার মসনদে আরোহণ করিলেন। বস্তুত, মিরকাশিমের পর হইতে বাংলার নবাব কেবল নামে-মাত্রই নবাব রহিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা ক্রমেই ইংরাজদের হস্তে চলিয়া গেল। সুতরাং মিরকাশিমের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের নবাবীর পতন ঘটিয়াছিল বলা যাইতে পারে।

মিরজাফর ও তাঁহার মৃত্যুর পর নাজিম উদ্-দৌলার মসনদে আরোহণ

মুর্শিদাবাদের নবাবীর পতনের কারণ (Causes of the downfall of the Nawabs of Murshidabad): মুর্শিদাবাদের নবাবীর পতনের পশ্চাতে নিম্নলিখিত কারণগুলি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, আলিবর্দীর মৃত্যুর পর একমাত্র মিরকাশিম ভিন্ন অপর কোন ক্ষমতাবান নবাব বাংলার মসনদে আরোহণ করেন নাই। অনভিজ্ঞ এবং অল্পবয়স্ক নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা ছিল বটে, কিন্তু অনভিজ্ঞতাহেতু দূরদর্শিতা ও দৃঢ়-

আলিবর্দী খাঁর পর ক্ষমতাবান নবাবের অভাব

প্রতিভার অভাব তাঁহার সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিল। তাঁহার মসনদলাভের সময় হইতেই মুর্শিদাবাদের নবাবীর পতনের সূচনা হইয়াছিল।

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

দ্বিতীয়ত, আলিবর্দীর কন্যা ঘসেটি বেগম ও অন্যতম দৌহিত্র সৌকৎ জঙ্গের ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা এবং মুর্শিদাবাদের আমীর-ওমরাহ্দের স্বার্থপরতা, ইংরাজ কোম্পানির অর্থ ও ক্ষমতালিপ্সা সিরাজের তথা মুর্শিদাবাদের নবাবীর পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। তৃতীয়ত,

মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ও ইংরাজদের নিকট আত্মবিক্রয়; বক্সারের যুদ্ধে মিরকাশিমের পরাজয়

মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং নবাব-পদ লাভের জন্য ইংরাজগণের নিকট আত্মবিক্রয় মুর্শিদাবাদের নবাবীর মর্যাদা নাশ করিয়া উহাকে পতনের পথে আগাইয়া দিয়াছিল। সর্বশেষে, বক্সারে যুদ্ধে শেষ স্বাধীনচেতা নবাব মিরকাশিমের পরাজয় মুর্শিদাবাদের তথা বাংলার নবাবীর পতন ঘটাইয়াছিল। পরবর্তী নবাবগণ নামে-মাত্রই নবাব ছিলেন।

রবার্ট ক্লাইভ (Robert Clive): রবার্ট ক্লাইভ ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামান্য কেরাণী (writer) হিসাবে

ক্লাইভের প্রথম জীবন

মাদ্রাজে আসেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি মসি ছাড়িয়া অসি ধরিলেন এবং ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ক্যাপ্টেন-পদে উন্নীত হইলেন। কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরাজপক্ষ যখন ফরাসীদের হস্তে প্রায় পরাভূত তখন রবার্ট ক্লাইভ এক নূতন যুদ্ধ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ত্রিচিনপলি রক্ষা করিতে না পারিলে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজদের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। এজন্য তিনি শত্রুপক্ষকে ত্রিচিনপলিতে আক্রমণ না করিয়া আর্কটে আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁহার পরিকল্পনার যৌক্তিকতা লক্ষ্য করিয়া উহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ক্লাইভের পরিকল্পনা মত অগ্রসর

আর্কট অধিকার

হইয়াই কর্ণাটের রাজধানী আর্কট দখল করা সম্ভব হইল। ক্লাইভ স্বয়ং এই যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। আর্কট অধিকার করিবার পর দীর্ঘ ৫৩ দিন ধরিয়া তিনি শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে উহা রক্ষা করিয়া চলিলেন। ইহার পর অর্ণি ও কাবেরীপাক-এর যুদ্ধে তিনি ফরাসীদের পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ স্বার্থ রক্ষা করিলেন। ফলে, কর্ণাটের সিংহাসনে ইংরাজদের সমর্থিত প্রার্থী মহম্মদ আলিকে স্থাপন করিয়া ইংরাজগণ কর্ণাটে তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইল। কাবেরীপাক-এর যুদ্ধে পরাজয়ের

দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ স্বার্থ রক্ষা

পর দক্ষিণ-ভারতে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের আশা প্রায় বিলুপ্ত হইল। এইভাবে ক্লাইভের সামরিক দূরদৃষ্টি, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে ইংরাজ স্বার্থ যেমন রক্ষা পাইল, তেমনি তাঁহার খ্যাতি এবং মর্যাদাও বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক কলিকাতা অধিকারের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে ক্লাইভ ও ওয়াট্সনকে কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করা হইল। ক্লাইভ ও ওয়াট্সন্ সহজেই কলিকাতা পুনর্দখল করিতে সমর্থ হইলেন।

ইহা ভিন্ন, হ‌ুগলীও তাঁহারা অধিকার করিয়া লইলেন। ইহাতে সিরাজ-উদ্-দৌলা সসৈন্যে কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইলে ক্লাইভ তাঁহাকে একপ্রকার বিনা যুদ্ধেই পরাজিত করিয়া আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন। এই সন্ধিদ্বারা ইংরাজগণ বিনাশুল্কে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনার এবং অপরাপর নানাপ্রকার বাণিজ্য-সুযোগ লাভ করিল। ইহা ভিন্ন, তাহাদের দুর্গ নির্মাণের অধিকারও স্বীকৃত হইল।

কলিকাতা পুনরধিকার

অতঃপর রবার্ট ক্লাইভ ইংরাজ কোম্পানির শক্তি ও স্বার্থবৃদ্ধির জন্য চক্রান্ত, জালিয়াতি, দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার প্রভৃতি সর্বপ্রকারের নীচ ও জঘন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন কর্মচারীদের সহিত তিনি এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। এই সকল নবাব-বিরোধী বিশ্বাসঘাতক কর্মচারিবর্গের নেতা ছিলেন মিরজাফর। ক্লাইভ প্রভূত পরিমাণ অর্থ ও বাণিজ্যের নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে মসনদচ্যুত করিয়া সেই স্থলে মিরজাফরকে স্থাপনের জন্য গোপনে চুক্তিবদ্ধ হইলেন। এই সময়ে ক্লাইভের চরিত্রের নীচ স্বার্থপরতার এক জঘন্যতম প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

ক্লাইভের ষড়যন্ত্র

মিরজাফরের সহিত গোপন ষড়যন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ক্লাইভ সিরাজ-উদ্-দৌলার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। পলাশীর প্রান্তরে মিরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতির বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের পরাজয় ঘটিলে মিরজাফর বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ক্লাইভ তথা ইংরাজ কোম্পানি বাংলার নবাবীর পশ্চাতে থাকিয়া প্রচ্ছন্নভাবে প্রকৃত শক্তি হস্তগত করিলেন। মিরজাফর কোম্পানিকে চব্বিশ পরগণার জমিদারি দান করিলে, কোম্পানি কর্তৃক ক্লাইভ এই জমিদারির গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। ক্লাইভ স্বয়ং প্রভূত পরিমাণ অর্থ এবং একটি জায়গীর পরিতোষিক হিসাবে গ্রহণ করিলেন। মিরজাফরের চরম অর্থাভাবের কথা জানিয়াও রবার্ট ক্লাইভ মিরজাফর কর্তৃক প্রতিশ্রুত কোম্পানির প্রাপ্য আদায় করিতে বিলম্ব করিলেন না। ঢাকা ও পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন এবং শাহ্‌জাদা আলি গৌহর কর্তৃক বিহার আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য মিরজাফরকে সৈন্য সাহায্যদানের জন্য প্রাপ্য অর্থও তিনি অবিলম্বে আদায় করিলেন। ইতিমধ্যে ইংরাজ প্রাধান্যে বিরক্ত হইয়া মিরজাফর ওলন্দাজগণের সাহায্যে ইংরাজদের বিতাড়িত করিতে চাহিলে ক্লাইভ ওলন্দাজগণকে বিদারা (Bidderah)-এর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মিরজাফরের ইংরাজপ্রাধান্য হইতে মুক্তির আশা যেমন বিনষ্ট করিলেন তেমনি ওলন্দাজগণের শক্তি হ্রাস করিলেন। এইভাবে যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, জালিয়াতি প্রভৃতির সাহায্যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়া ও প্রভূত পরিমাণ অর্থ লইয়া ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ : মিরজাফরকে মসনদে স্থাপন

বিদারার যুদ্ধ : ক্লাইভের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৭৫৯-৬০)

ক্লাইভ চলিয়া যাইবার পর বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে এক ঘোর অরাজকতা দেখা দিল। অবশ্য মিরজাফরকে কপর্দকহীন করিয়া ক্লাইভ নিজেই এই অরাজকতার

সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন। মিরজাফরের দুর্বলতার অজুহাতে ইংরাজ কোম্পানি তাঁহার স্থলে মিরকাশিমকে মসনদে স্থাপন করিল। নূতন নবাব মসনদে স্থাপন করা ইংরাজ কোম্পানির অর্থাগমের এক অভিনব পন্থা হইয়া দাঁড়াইল।

১৭৬০-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার অব্যবস্থা ও দুর্নীতি

কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায়ও দুর্নীতি প্রবলভাবে দেখা দিল। কোম্পানির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া ইংরাজ কর্মচারিগণ ব্যক্তিগত স্বার্থবৃদ্ধিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে তাহারা নবাব মিরকাশিমকে পরাজিত করিয়া বাংলার সর্বশেষ প্রকৃত স্বাধীন নবাবের পতন ঘটাইল।

কোম্পানির অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দিন-দিনই বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে দেখিয়া ইংলণ্ডে ডাইরেক্টর বোর্ডের সভ্যদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। এই অব্যবস্থা ও দুর্নীতির অবসানকল্পে তাঁহারা রবার্ট ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার বাংলার গবর্ণর হিসাবে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ভারতবর্ষে কোম্পানির স্বার্থবৃদ্ধি বা কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ভারতীয় শাসনে দুর্নীতি-প্রবর্তক এবং জালিয়াতিতে সিদ্ধহস্ত রবার্ট ক্লাইভ এখন হইতে হইলেন লর্ড ক্লাইভ। ক্লাইভের প্রথমবার স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন ও পুনর্নিয়োগের অন্তর্বর্তী কালে কলিকাতার গবর্ণর ছিলেন ভ্যান্সিটার্ট (Vansittart)।

ক্লাইভের দ্বিতীয় শাসনকাল, ১৭৬৪-৬৭ (Clive's second Governorship): ক্লাইভের প্রথমবারের শাসন-অভিজ্ঞতা তাঁহাকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। প্রথমত, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, কোম্পানির অধিকৃত রাজ্যের সীমা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং সেইহেতু কেবলমাত্র একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের হস্তে উহার শাসনভার ন্যস্ত থাকা সমীচীন হইবে না। এ-বিষয়ে তিনি পিট (Pitt the Elder)-এর নিকট একটি পত্রও লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি একথা মনে করিতেন যে. দেশীয় নৃপতিদের উপর নির্ভর করিয়া ইংরাজগণের পক্ষে ভারতবর্ষে বাণিজ্য পরিচালনা সম্ভব হইবে না। এজন্য ইংরাজ স্বার্থের খাতিরে দেশীয় নৃপতিগণকেই ইংরাজ কোম্পানির উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইবে। তৃতীয়ত, কোম্পানির পক্ষে প্রকাশ্যভাবে কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় হইবে না, কারণ ইহাতে অপরাপর ইওরোপীয় বণিক-সম্প্রদায় এবং দেশীয় নৃপতিগণের মনে সন্দেহ ও ঈর্ষার উদ্রেক অবশ্যই হইবে। চতুর্থত, ইংরাজ কোম্পানির অধিকার বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন হইবে এবং এই তিনটি প্রদেশের নিরাপত্তা বিধানের যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে হইবে। ক্লাইভ যখন দ্বিতীয়বার গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন তখন উপরি-উক্ত নীতিগুলি কার্যকরী করিবার পক্ষে বাংলাদেশের পরিস্থিতিও অত্যন্ত উপযোগী ছিল।

ক্লাইভের অভিজ্ঞতা-প্রসূত নীতি

প্রথমেই তিনি বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত সুজা-উদ্-দৌলা এবং শাহ্ আলমের সহিত বোঝাপড়া করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি তখন ইচ্ছা করিলে অযোধ্যার নবাবকে পদচ্যুত করিতে পারিতেন, কিন্তু দেশীয় নৃপতিগণকে ইংরাজ কোম্পানির

উপর নির্ভরশীল রাখা এবং প্রকাশ্যে ক্ষমতা গ্রহণ না-করা এবং সর্বোপরি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সীমার বাহিরে রাজ্য বিস্তার না করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি সুজা-উদ্-দৌলার নিকট হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং কারা ও এলাহাবাদ—এই দুইটি স্থান আদায় করিলেন। দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলম তখন নামে মাত্রই সম্রাট। তাঁহার পিতার নৃশংস হত্যার পর তিনি দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিতে তখনও সমর্থ হন নাই। লর্ড ক্লাইভ শাহ্ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুইটি দান করিলেন এবং উহার বিনিময়ে এবং বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দানের শর্তে সম্রাটের নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিলেন (১২ আগস্ট, ১৭৬৫)। দেওয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি আইনত বাংলা সুবার রাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইল। বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরাজ প্রভুত্ব স্থাপনের ইতিহাসে ইংরাজগণের দেওয়ানী লাভ এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইহার ফলে একদিকে যেমন কোম্পানির অধিকার আইনত স্বীকৃত হইল, অপরদিকে বাংলার নবাব কোম্পানির উপর অর্থের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। দেওয়ানের কর্তব্য ছিল আদায়ীকৃত অর্থ হইতে শাসনকার্য পরিচালনা ও ব্যয়-সংকুলান করিয়া উদ্‌বৃত্ত অর্থ দিল্লীতে প্রেরণ করা। সম্রাটের সহিত বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে শাসনকার্যের ব্যয়-সংকুলানের পর উদ্‌বৃত্ত রাজস্ব ইংরাজ কোম্পানি নিজ হস্তে রাখিবার অধিকার লাভ করিল। ফলে, কোম্পানি বাংলার নবাবের সম-মর্যাদাভুক্ত হইল।

সুজা-উদ্-দৌলার সহিত সন্ধি

শাহ্ আলমের সহিত চুক্তি—দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫)

নবাব নাজিম-উদ্-দৌলাকে ক্লাইভ বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা ভাতাদানের বিনিময়ে বাংলা সুবার রাজস্বের উপর তাঁহার দাবি ত্যাগে বাধ্য করিলেন। নাজিম-উদ্-দৌলার মসনদ লাভের ফলে মহম্মদ রেজা খাঁ'কে নায়েব-সুবা (Deputy Governor) নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ক্লাইভ দুর্লভ রায় ও জগৎ শেঠকে রেজা খাঁ'র সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করিয়া একই হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার সম্ভাব্য বিপদ এড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহা ভিন্ন, রাজা সীতাব রায়কে পাটনার বাণিজ্য-কুঠির প্রধান (Chief)-এর সহিত যুগ্মভাবে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হইল। শাসনকার্যে নাজিম-উদ্-দৌলা বহাল থাকিলেও উপরি-উক্ত ব্যবস্থার দ্বারা মিরকাশিমের ন্যায় নবাবের উত্থানের পথ চিরতরে রুদ্ধ করা হইল।

নবাব নাজিম-উদ্-দৌলার সহিত বন্দোবস্ত

কোম্পানির কর্মচারিবর্গের দেশীয় রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা, তাহাদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি এবং সর্বোপরি বিদেশী বণিক-সম্প্রদায়ের ঈর্ষা প্রভৃতির কথা বিবেচনা করিয়া ক্লাইভ দেওয়ানীর কাজ প্রকাশ্যভাবে কোম্পানির হস্তে গ্রহণ করিলেন না। দেওয়ানী-সংক্রান্ত কাজের প্রধান দুইটি দায়িত্ব ছিল রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী মামলার বিচার। নবাবের উপর এই সকল দায়িত্ব পূর্ববৎই রহিয়া গেল। অথচ রাজস্বের মালিক এখন হইতে হইল ইংরাজ কোম্পানি। ফলে, নবাব পাইলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর

'দ্বৈত শাসন' (Double Govt.)

কোম্পানি লাভ করিল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। এই অদ্ভুত অবস্থাই ইতিহাসে 'দ্বৈত শাসন' (Double Govt.) নামে পরিচিত। এরূপ অকার্যকর ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে বাংলাদেশের প্রজাবর্গের দুর্দশার সীমা ছিল না

ক্লাইভের সীমান্ত-নীতি অর্থাৎ অযোধ্যার নবাব সম্রাট শাহ্ আলমের সহিত ব্যবস্থার ত্রুটি প্রদর্শন করিতে গিয়া ম্যালেসন (Malleson) বলিয়াছেন যে, ক্লাইভের নীতি বাস্তব যুক্তিবাদী রাজনীতিকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইলেও মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতবর্ষে যে-অব্যবস্থা বিদ্যমান সেই পরিস্থিতির পক্ষে মোটেই উপযোগী ছিল না। ঐরূপ পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়ই ছিল অগ্রসর-নীতি (Forward Policy) অনুসরণ করা। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারিবর্গের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, কোম্পানির মোট সামরিক শক্তি প্রভৃতির কথা স্মরণ করিলে অগ্রসর-নীতির অযৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না।

সীমান্ত-নীতির সমালোচনা

দেওয়ানী গ্রহণ করিয়াও প্রকাশ্যভাবে দেওয়ানী-সংক্রান্ত দায়িত্ব গ্রহণ না করিবার যুক্তি হিসাবে ক্লাইভ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, সেই সময়ে ইংরাজ কোম্পানি দেওয়ানীর কার্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। ইহা ভিন্ন, তাহাদের দুর্নীতি এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণের পরিপন্থী ছিল। সর্বোপরি, প্রকাশ্যভাবে দেওয়ানী সংক্রান্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিলে অপরাপর ইওরোপীয় বণিক-সম্প্রদায়ের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হইত, ফলে হয় ত' ইংরাজদিগকে সব কিছুই হারাইতে হইত।

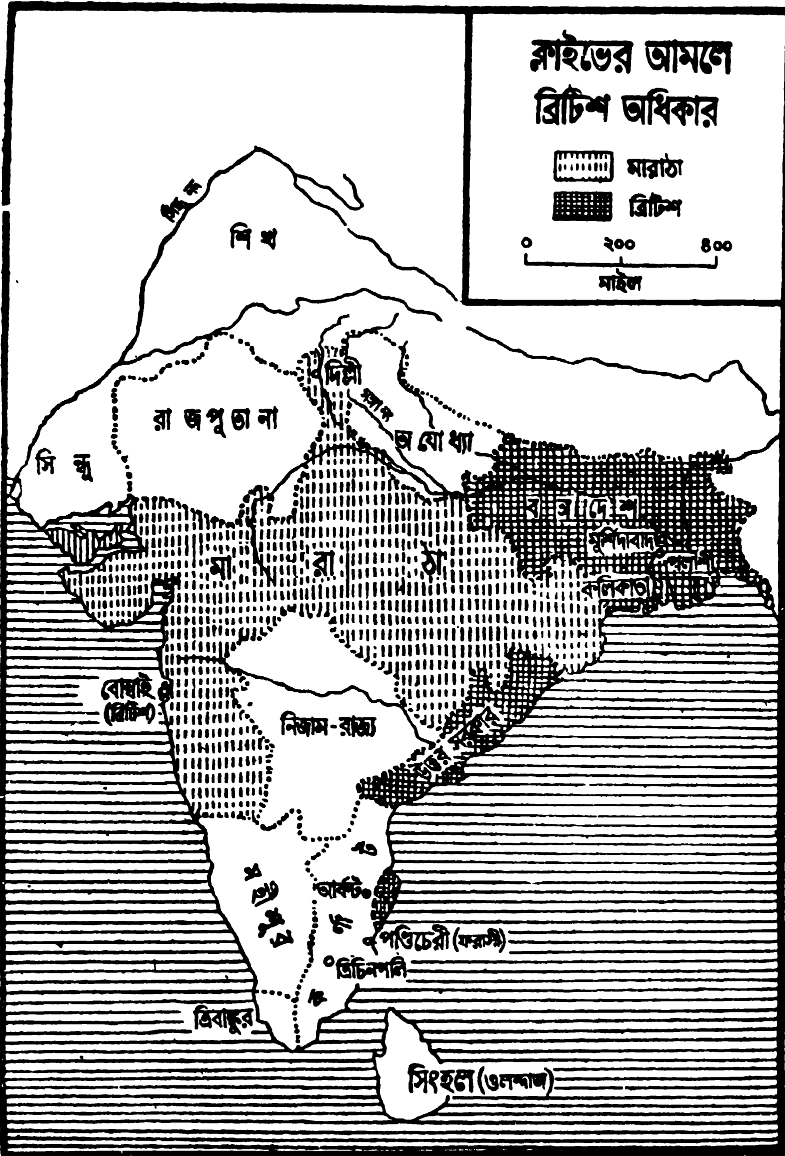
দেওয়ানী-সংক্রান্ত যুক্তি

ক্লাইভের সংস্কার (**Clive's Reforms**): ক্লাইভ দ্বিতীয়বার যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁহার উপর ডাইরেক্টর সভার বিশেষ নির্দেশ ছিল কোম্পানির অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির অবসান ঘটান। ক্লাইভ কলিকাতায় পৌঁছিয়া কোম্পানির কর্মচারিবর্গের দুর্নীতি ও স্বার্থপরতার যে-পরিচয় পাইলেন তাহা সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা দূর করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। ডাইরেক্টর সভার নির্দেশ অনুযায়ী তিনি নিজ সাহায্যের জন্য 'সিলেক্ট্ কমিটি' (Select Committee) নামে একটি সমিতি গঠন করিলেন এবং সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। (১) প্রথমেই তিনি কোম্পানির কর্মচারিবর্গের পক্ষে কোন প্রকারের পারিতোষিক গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করিলেন। (২) অতঃপর তিনি ইংরাজ কর্মচারীদের পক্ষে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন অতি অল্প ছিল বলিয়া তিনি লবণ, সুপারি ও তামাকের একচেটিয়া কারবারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন এবং কোম্পানির কর্মচারিবর্গকে তাহাদের পর্যায় অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের অংশ দিবার ব্যবস্থাও করিলেন। (৩) কোম্পানির কলিকাতাস্থ কাউন্সিলের সভ্যগণ প্রায়ই বিভিন্ন স্থানের বাণিজ্য-কুঠির প্রধান (Chief)-এর কাজ গ্রহণ করিয়া কলিকাতার বাহিরে চলিয়া যাইতেন, কারণ তাহাতে নানা অবৈধ উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের

সিলেক্ট্ কমিটি গঠন

বেসামরিক সংস্কার: (১), (২), (৩)

সুযোগ পাওয়া যাইত। ফলে কলিকাতা কাউন্সিলের কাজের ব্যাঘাত ঘটিত। ক্লাইভ এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভিসের (Civil Service)



সংস্কার সাধন করেন। তিনি দুর্নীতিপরায়ণ কাউন্সিলারদের পাঁচজনকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করেন এবং অপর তিনজনকে কাউন্সিলের সদস্য-পদ হইতে অপসারিত করেন।

এইভাবে তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতার অবসান ঘটান। (৪) ক্লাইভ কোম্পানির সেনাবাহিনীকে নূতনভাবে গঠন করিয়া জেনারেল কারনাক্ (Carnac)-কে কোম্পানির সেনাবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করেন। (৫) সেনাবাহিনীর ব্যয়-হ্রাসের উদ্দেশ্যে তিনি সৈনিকদের ডবল ভাতা (double allowance) বন্ধ করিয়া দিলেন। মিরজাফর ইংরাজ সৈন্যের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া তাহাদের ভাতা বা বাট্টা দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই ভাতা যুদ্ধের সময়ে দিবার কথা ছিল, কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের সময় হইতে শান্তির কালেও দ্বিগুণ ভাতা দেওয়া হইতেছিল। ক্লাইভ নিয়ম করিলেন যে, কেবলমাত্র যুদ্ধে নিযুক্ত থাকাকালীন সৈনিকগণ ভাতা পাইবে। ভাতা বন্ধ করিবার ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে ক্লাইভ দৃঢ়হস্তে তাহা দমন করিতে ত্রুটি করিলেন না।

সামরিক সংস্কার: (৪) (৫)

ক্লাইভের চরিত্র ও কৃতিত্ব (Clive's Character and Estimate): অতি সাধারণ কেরাণী হিসাবে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি গ্রহণ করিয়া একমাত্র নিজ ক্ষমতা, উৎসাহ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোপরি উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে ক্লাইভ বাংলার গবর্ণর-পদে অধিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একনিষ্ঠভাবে কর্তব্য পালন করিয়া তিনি ডাইরেক্টর সভার বিশ্বাস অর্জন করিয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহাকে দ্বিতীয়বার গবর্ণর-পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল গুণের অধিকারী হইলেও ক্লাইভের অর্থলোলুপতার অন্ত ছিল না। নিজ তথা ইংরাজ জাতির স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি জালিয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তথাপি ইংরাজ স্বার্থের দিক হইতে দেখিতে গেলে তিনিই ভারতবর্ষে ইংরাজ স্বার্থ শুধু রক্ষা নহে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছিলেন এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

চরিত্র

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিয়াই ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যে আত্মরক্ষা এবং শেষ পর্যন্ত কর্ণাটে প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। আর্কটের যুদ্ধ, অবণি ও কাবেরীপাক-এর যুদ্ধ জয় তাঁহার সামরিক প্রতিভার প্রমাণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। কাবেরীপাক-এর যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজিত করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে ফরাসী শক্তির মূলে চরম আঘাত হানিয়াছিলেন। বাংলাদেশে কলিকাতা পুনর্দখল করিয়া সিরাজ-উদ্-দৌলার কলিকাতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ব্যাহত করিয়া এবং সর্বোপরি পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে পরাজিত করিয়া তিনি ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিলেন। বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজগণকে পরাজিত করিয়া তিনি ওলন্দাজ শক্তির মূলেও চরম আঘাত হানিয়াছিলেন। এইভাবে ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছিলেন।

কৃতিত্ব

দ্বিতীয়বার গবর্ণর হিসাবে আসিয়া সামরিক ও বেসামরিক সংস্কার সাধন করিয়া তিনি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা দুর্নীতি ও সেনাবাহিনীর বিশৃঙ্খলা দূর

করিয়াছিলেন। বক্সারের যুদ্ধের পর সুজা-উদ্-দৌলা ও শাহ্ আলমের সহিত তিনি চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন। সুজা-উদ্-দৌলাকে ইংরাজদের উপর নির্ভরশীল মিত্ররূপে পরিণত করিয়া তিনি অযোধ্যা রাজ্যকে বাংলাদেশের ও মারাঠাদের মধ্যবর্তী buffer state-এ পরিণত করিয়াছিলেন। শাহ্ আলমকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা করদানে প্রতিশ্রুত হইয়া এবং কারা ও এলাহাবাদ প্রদান করিয়া বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী তিনি লাভ করিয়াছিলেন। কোম্পানির সেই সময়কার পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া তিনি দেওয়ানীর দায়িত্ব কোম্পানির হস্তে না লইয়া নবাবের উপরই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য এই 'দ্বৈতশাসন' ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলেই তিনি যে-সকল অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন উহার সুফল বিনষ্ট হইয়া পুনরায় দুর্নীতির পথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়বার গবর্ণর হিসাবে কার্যাদি

ক্লাইভের কোন কোন কার্য তাঁহার নিজ চরিত্রে এবং ইংরাজ জাতির নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে সন্দেহ নাই, তথাপি তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ ভারতীয় ইতিহাসে সেজন্য ক্লাইভের নাম অবিস্মরণীয়।

উপসংহার

ভেরেলস্ট্, ১৭৬৭-৬৯ (Verelst) : কার্টিয়ার, ১৭৬৯-৭২ (Cartier) : গবর্ণর ভেরেলস্ট্ ও কার্টিয়ারের শাসনকালে পূর্বেকার দুর্নীতি পুনরায় দেখা দিল। তদুপরি ক্লাইভ-প্রবর্তিত দ্বৈতশাসনের ফলে প্রজাবর্গের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল। দেওয়ানী-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ – যথা রাজস্ব আদায়, দেওয়ানী বিচার প্রভৃতি নবাবের উপর রহিয়া গেল অথচ প্রকৃত ক্ষমতা রহিল কোম্পানির হস্তে। নায়েব সুবা রেজা খাঁ যথেচ্ছভাবে অর্থ আদায় করিয়া আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। ক্লাইভ-গঠিত একচেটিয়া বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপে ও ইংরাজ কর্মচারিবর্গের যথেচ্ছ ব্যবহারে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল। প্রতি বৎসর কোম্পানির লভ্যাংশ বাবদ বাংলাদেশের সোনা-রূপা ইংলন্ডে প্রেরণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বলতর হইতে লাগিল। রাজস্ব নির্ধারণ সম্পর্কে নূতন নূতন ব্যবস্থা চালু করিবার ফলে কৃষিও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এমতাবস্থায় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে (১১৭৬ বাংলা সনে) বাংলাদেশে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বাংলা ১১৭৬ সনে এই দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল বলিয়া ইহা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। এই দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার লোকসংখ্যার মোট এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বারিপাতের স্বল্পতাই ছিল এই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ, কিন্তু দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ামাত্র মহম্মদ রেজা খাঁ প্রমুখ উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্মচারিবৃন্দ এবং কোম্পানির ইংরাজ কর্মচারিগণের অর্থগৃধ্নুতার ফলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ব্যাপক অব্যবস্থা ও দুর্নীতি

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা সন ১১৭৬, ১৭৭০ খ্রীঃ)

বাংলার গ্রামে গ্রামে, পথে-ঘাটে অসংখ্য শিশু, বৃদ্ধ, নরনারী যখন খাদ্যাভাবে প্রতিদিন হাজারে হাজারে প্রাণ হারাইতেছিল, এমন কি, পিতা-মাতা যখন একমুষ্টি অন্নের জন্য সন্তান বিক্রয় করিতেও প্রস্তুত ছিল, মানুষ যখন মৃতের মাংস ভক্ষণ

করিতেছিল* তখনও অধিক মুনাফার আশায় কোম্পানির দেশীয় ও ইংরাজ কর্মচারিগণ খাদ্যশস্য বাজার হইতে ক্রয় করিয়া মজুত করিয়া রাখিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। ইহা ভিন্ন, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চল হইতে সেনা-বাহিনী অপসারিত না করায় যাহা কিছু সামান্য খাদ্যশস্য তখনও পাওয়া যাইত, তাহা তাহাদের জন্যই ক্রয় করিয়া লওয়া হইত। সেই সময়কার পরিবহন-ব্যবস্থার অসুবিধা, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সম্পর্কে ইংরাজগণের অনভিজ্ঞতা এবং কোম্পানির কর্মচারিবর্গের মানুষের দুর্দশার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অর্থলোভের অমানুষিক মনোবৃত্তি, বাংলা-দেশকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, পর বৎসরের (১৭৭০-৭১) রাজস্ব আদায়েও কোনপ্রকার উদারতা প্রদর্শন করা হইল না। দরিদ্র দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনসাধারণের নিকট হইতে সেই বৎসর (১৭৭০-৭১) অপরাপর বৎসর অপেক্ষা দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা অধিক রাজস্ব আদায় করা হইয়াছিল।

বাংলার দুরবস্থা

ইতিমধ্যে ক্লাইভ-প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন ব্যবস্থাও সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এইভাবে বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যখন এক বিপর্যয় দেখা দিয়াছে তখন ডাইরেক্টর সভা ওয়ারেন হেস্টিংস্‌কে বাংলার গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

* বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের অবস্থার এক অতি করুণ বর্ণনা পাওয়া যায়।

"All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husbandmen sold their cattle, they sold their implements of agriculture, they devoured their seed grain, they sold their sons and daughters till at length no buyer of children could be found, they ate leaves of trees and the grass of the field; and in June 1770 the Resident at the durbar affirmed that the living were feeding on the dead." W. W. Hunter : *The Annals of Rural Bengal*, p. 26.

অধ্যায় ৮

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার

(Growth of the British Power in India)

ওয়ারেন হেস্টিংস্, ১৭৭২-৮৫ (Warren Hastings): ক্লাইভ-প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যখন এক দারুণ বিপর্যয় ঘটিয়াছিল সেই সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংস্ কলিকাতার গবর্ণর হইয়া আসিলেন। ইহার পূর্বে তিনি ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে বাংলাদেশে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বাংলাদেশ, কোম্পানির বাণিজ্য ও শাসন-সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তিনি পূর্বেই সঞ্চয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

হেস্টিংসের গবর্ণর-পদ লাভ (১৭৭২)

সীমান্ত-নীতি (Frontier Policy): গবর্ণর-পদে নিযুক্ত হইয়া হেস্টিংস্ যখন কলিকাতায় আসিলেন তখন কোম্পানির আসন্ন সমস্যাগুলি যেমন ছিল জটিলতাপূর্ণ তেমনি ছিল নানাবিধ। হেস্টিংস্ সর্বপ্রথমেই সীমান্ত নীতি (Frontier Policy) সংক্রান্ত কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, কোম্পানি ইতিমধ্যে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় কোম্পানিকে ভারতীয় অপরাপর রাজনৈতিক শক্তির সহিত সুস্পষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে হইবে। বাংলাদেশ ভারতেরই অংশ, সুতরাং বাংলার প্রভুত্ব লাভের ফলে অপরাপর অংশের প্রতি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক নীতি গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তিতে প্রতিহত করিবার মত শক্তি ও ক্ষমতা সেই সময় একমাত্র মারাঠাদেরই ছিল। সুতরাং সীমান্ত-নীতি বা পররাষ্ট্র-নীতি নির্ধারণে এ-কথা স্মরণ করিয়া চলাই ছিল একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পন্থা। ব্রিটিশ অধিকার বিস্তার সম্পর্কে ডাইরেক্টর সভা পুনঃপুনঃ নিষেধাজ্ঞা জারি করিতেছিলেন। তাঁহারা সামরিক ও বে-সামরিক ব্যয় সংক্ষেপের জন্য বারবার কলিকাতাস্থ-গবর্ণর ও কাউন্সিলকে নির্দেশ প্রেরণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করা। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস্ দেখিলেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকার স্থায়ী করিতে হইলে দেশীয় নৃপতিগণকে যথাসম্ভব ব্রিটিশ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করিয়া তোলা প্রয়োজন। এজন্য তিনি 'অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতি' (Subsidiary Alliance)-এর সূচনা করেন। তাঁহার এই নীতিই পরবর্তী কালে ওয়েলেস্‌লী অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পররাষ্ট্রীয় নীতি বা সীমান্ত নীতির মূলমন্ত্র

ক্লাইভের সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়ার (১৭৬৫) পর হইতে শাহ্ আলম কারা ও এলাহাবাদে শান্তিপূর্ণভাবেই কালাতিপাত করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মারাঠাগণ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) পরাজয়ের পর দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুনরায়

দুর্ধর্ষ শক্তি হিসাবে ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছিল। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা দিল্লী অধিকার করিয়া সম্রাট শাহ্ আলমকে মুঘল রাজধানী দিল্লীতে স্থাপনের উদ্দেশ্যে লইয়া গিয়াছিল। ওয়াজীর বা প্রধানমন্ত্রীর হস্তে শাহ্ আলমের পিতা দ্বিতীয় আলমগীর ক্রীড়নকস্বরূপ হইয়া পড়িলে শাহ্ আলম (তখন শাহ্জাদা আলি গৌহর) দিল্লী ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। কিছুকাল পর আলমগীর সেই ওয়াজীরের হস্তেই প্রাণ হারাইলেন। শাহ্ আলম নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন, কিন্তু দিল্লীতে তিনি ফিরিয়া গেলেন না। বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪) মিরকাশিমের পক্ষ গ্রহণ করিয়া পরাজিত হইলে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ তাঁহার নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী আদায় করিলেন। বিনিময়ে আযোধ্যার নবাব হইতে অধিকৃত কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুইটি তিনি শাহ্ আলমকে দান করিলেন এবং বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা করদানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

হেস্টিংস্ ও সম্রাট শাহ্ আলম

১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ শাহ্ আলমকে দিল্লী লইয়া গিয়াছিল। দিল্লী সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে মারাঠা শক্তির প্রসার সাধন করাই ছিল তাহাদের মূল উদ্দেশ্য। মুঘল সম্রাট মারাঠাদের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছেন দেখিয়া হেস্টিংস্ বাণারস-এর সন্ধি দ্বারা (১৭৭৩ আগস্ট) কারা ও এলাহাবাদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পুনরায় অযোধ্যার নবাবকে ফিরাইয়া দিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর জন্য শাহ্ আলমকে প্রতিশ্রুত ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর-দানও বন্ধ করিয়া দিলেন। অযোধ্যা রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া মারাঠা ও ইংরাজদের মধ্যে উহাকে 'মধ্যবর্তী রাজ্য' (buffer state) হিসাবে রক্ষা করাই ছিল হেস্টিংসের অযোধ্যা-নীতির মূলসূত্র। বাণারস-এর সন্ধি দ্বারা ইহাও স্থির হইল যে, প্রয়োজনবোধে অযোধ্যার নবাব কোম্পানির সেনাবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। সেজন্য যাবতীয় ব্যয় অবশ্য তাঁহাকে বহন করিতে হইবে।

অযোধ্যা নীতি : বাণারস-এর সন্ধি (১৭৭৩)

হেস্টিংস্ কর্তৃক কারা ও এলাহাবাদ অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলাকে দান করা এবং সম্রাটের বাৎসরিক প্রাপ্য কর বন্ধ করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। কিন্তু মারাঠাদের সহিত মিলিত হইয়া শাহ্ আলম ইংরাজদের একমাত্র শক্তিশালী শত্রু মারাঠাদের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এ-কথা অনস্বীকার্য। এমতাবস্থায় কারা ও এলাহাবাদ মারাঠাদের হস্তে চলিয়া গেলে ব্রিটিশের মিত্রশক্তি অযোধ্যার নবাবের নিরাপত্তা এবং সেহেতু বাংলার নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হইত। ইহা ভিন্ন, বাৎসরিক কর হিসাবে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা শাহ্ আলমকে দিবার অর্থই ছিল মারাঠাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা। সর্বোপরি সুজা-উদ্-দৌলার নিকট হইতে প্রাপ্ত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং শাহ্ আলমকে বাৎসরিক কর না দিবার ফলে সঞ্চিত ছাব্বিশ লক্ষ টাকা সেই সময় কোম্পানির আর্থিক অনটন কতকাংশে দূর করিয়াছিল। এই সকল যুক্তির উপরই সম্রাটের প্রতি হেস্টিংসের অনুসৃত নীতিকে সমর্থনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

শাহ্ আলমের প্রতি অনুসৃত নীতির যুক্তি

রুহেলা বা রোহিলা যুদ্ধ (Ruhela or Rohilla War): ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে

সম্রাট শাহ্ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিয়া প্রথমেই মারাঠাগণ রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিল। রোহিলা-সর্দার নাজিম-উদ্-দোলার পুত্র জবিতা খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজা-উদ্-দোলার রাজ্যে অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুজা-উদ্-দোলা মারাঠাগণ কর্তৃক রোহিলা রাজ্য আক্রান্ত হওয়ায় অত্যন্ত ভীত হইয়া নিজে রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করিলেন। রোহিলাদের সহিত সুজা-উদ্-দোলার তেমন সম্ভাব ছিল না। যাহা হউক, ব্রিটিশ রেসিডেন্ট সার রবার্ট বার্কারের চেষ্টায় সুজা-উদ্-দোলা ও রোহিলাদের মধ্যে এক মিত্রতা-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (১৭ জুন, ১৭৭২)। সুজা-উদ্-দোলা রোহিলা রাজ্য হইতে মারাঠাগণকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইলে তদানীন্তন রোহিলা-সর্দার হাফিজ খাঁ তাঁহাকে ৪০ লক্ষ টাকা পুরস্কার হিসাবে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই মারাঠাগণ পুনরায় রোহিলা রাজ্য আক্রমণ করিলে হাফিজ রহমৎ খাঁ পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়া মারাঠাদের নিরস্ত করিলেন। সুজা উদ্-দোলা হাফিজ রহমৎ খাঁর এই আচরণকে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অভিহিত করিলেন। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত রোহিলা ও অযোধ্যার নবাবের যুগ্মবাহিনী মারাঠাগণকে রোহিলখণ্ড হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইল। সেই সময়ে পেশওয়া মাধব রাও (১ম)-এর মৃত্যুতে মারাঠা রাজ্যের রাজধানী পুণায় গোলযোগ উপস্থিত হইলে মারাঠাগণ সেখানে চলিয়া গেল। ফলে, সুজা-উদ্-দোলা রোহিলা রাজ্য অধিকার করিবার সুযোগ পাইলেন। রোহিলা রাজ্য অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষা অযোধ্যার নবাবগণ বহু পূর্ব হইতেই পোষণ করিতেছিলেন। উত্তর-ভারতে মারাঠা বাহিনীর অনুপস্থিতির সুযোগে সুজা-উদ্-দোলা রোহিলা রাজ্য দখল করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাণারসের সন্ধির শর্তানুযায়ী হেস্টিংস্ সুজা-উদ্-দোলাকে সামরিক সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন। সুজা-উদ্-দোলা ইংরাজ সেনাবাহিনীর ব্যয় ভিন্ন আরও ৪০ লক্ষ টাকা তাহাদিগকে দিতে স্বীকৃত হইলেন। হেস্টিংস্ কর্ণেল চ্যাম্পিয়ান-এর অধীনে এক ব্রিটিশবাহিনী সুজা-উদ্-দোলার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৭৭৪)। অযোধ্যার ও ব্রিটিশ-বাহিনীর যুগ্ম আক্রমণে মিরণপুর কাটরা-এর হাফিজ রহমৎ খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলেন। রোহিলখণ্ড সুজা-উদ্-দোলার রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইল।

রোহিলা যুদ্ধের সূচনা

রোহিলা যুদ্ধে হেস্টিংস্ কর্তৃক সামরিক সাহায্য দান—রোহিলাদের পরাজয়

পরবর্তী রোহিলা সর্দার ফৈজ-উল্লাহ্ খাঁ বিচ্ছিন্ন রোহিলা সৈন্যের একাংশকে সঙ্গে লইয়া গাড়ওয়াল পর্বতের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘদিনের আলাপ-আলোচনার পর অযোধ্যার নবাব লালডাং-এর সন্ধি দ্বারা ফৈজ-উল্লাহ্ খাঁকে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি রামপুর ফিরাইয়া দিলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা পাঁচ হাজারের অধিক থাকিবে না এবং প্রয়োজন-বোধে এই সৈন্যবাহিনী অযোধ্যার নবাবকে সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকিবে—এই দুইটি শর্তও ফৈজ-উল্লাহ্‌কে মানিয়া লইতে হইল।

পরবর্তী রোহিলা-সর্দার—ফৈজ-উল্লাহ্ খাঁ

রোহিলা যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব ওয়াজীরকে ব্রিটিশ সৈন্য-সাহায্য দানের যৌক্তিকতা

এবং নৈতিকতা সম্পর্কে সমসাময়িক কাল হইতে শুরু করিয়া অদ্যাবধি দুইটি পরস্পর-বিরোধী মত রহিয়াছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের ইম্পীচ্‌মেণ্ট (impeachment)-এর সর্বপ্রথম অভিযোগই ছিল রোহিলা যুদ্ধের অর্থের বিনিময়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে ভাড়াটিয়া সৈন্যের ন্যায় ব্যবহার করা।* বার্ক, ফ্রান্সিস্‌, মিল্‌, ম্যাকলে, লায়েল প্রভৃতি অনেকের-ই মতে রোহিলা যুদ্ধে সৈন্য-সাহায্য দানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অর্থলাভ করা। ৪০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ইংরাজদের সহিত কোনপ্রকার শত্রুতা সাধন করে নাই. এইরূপ একটি স্বাধীন জাতির বিরুদ্ধে হেস্টিংসের সৈন্যপ্রেরণ মানবতা ও নৈতিকতার বিচারে সমর্থনযোগ্য নহে, ইহা-ই হইল সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালের লেখকগণের অভিমত। ফরেস্ট, স্ট্রেচি (Strachey)† প্রভৃতি ঐতিহাসিক, ডাইরেক্টর সভার সহিত হেস্টিংসের পত্রালাপ, ইম্পীচ্‌মেণ্টের সময় হেস্টিংসের জবাব প্রভৃতি বিশদ আলোচনা করিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে রোহিলা যুদ্ধ মূলত ব্রিটিশ অধিকারের নিরাপত্তার যুক্তিতেই সমর্থনযোগ্য। মারাঠাগণের সহিত আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য বা মনোবৃত্তি রোহিলাদের ছিল না। রোহিলখণ্ড মারাঠাগণ কর্তৃক অধিকৃত হইলে শুধু অযোধ্যা নহে বা লাদেশেরও নিরাপত্তা ব্যাহত হইত। তাঁহাদের মতে রোহিলা যুদ্ধের সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ ছিল রোহিলা-নীতি-প্রসূত উদ্‌বৃত্ত সুবিধা। হেস্টিংসের রোহিলা-নীতির বিচারে সেই সময়ে কোম্পানির অর্থাভাব এবং সমসাময়িক নৈতিকতার মান-এর কথাও বিস্মৃত হওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে না—এ-কথাও স্ট্রেচি উল্লেখ করিয়াছেন। হেস্টিংসের রোহিলা-নীতির সমর্থন করিতে গিয়া এ-কথাও বলা হইয়া থাকে যে, সুজা-উদ্‌-দৌলার রাজ্যের সহিত সংযুক্তির পর রোহিলা রাজ্যে আর কোন গোলযোগ দেখা দেয় নাই এবং মারাঠাগণ কর্তৃকও ঐ অঞ্চল আক্রান্ত হয় নাই।

হেস্টিংসের রোহিলা-নীতির সমালোচনা

কিন্তু নৈতিকতার প্রশ্ন বাদ দিলেও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক দিয়ে হেস্টিংসের রোহিলা-নীতি যে ত্রুটিপূর্ণ ছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য। মারাঠাগণ ভবিষ্যতে আর রোহিলখণ্ড আক্রমণ করে নাই, ইহার কারণ ছিল মাধব রাওয়ের মৃত্যুর ফলে মারাঠাদের মধ্যে আত্মকলহ। উত্তর-পশ্চিম দিক হইতেও কোনপ্রকার আক্রমণের ভয় সেই সময় ছিল না, কারণ ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে শিখগণ যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং হেস্টিংসের নীতির ফলে রোহিলখণ্ড তথা অযোধ্যা রাজ্যে শান্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এ-কথা বলা চলে না। উপরন্তু হেস্টিংস্‌ তাঁহার সীমান্ত-নীতি অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্‌-দৌলার আনুগত্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদের সম্ভাবনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুজা-উদ্‌-দৌলার শক্তি বৃদ্ধি করিয়া হেস্টিংস্‌ ব্রিটিশ শক্তির বিপদের সূচনা যে করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় সুজা-উদ্‌-দৌলার ব্রিটিশ প্রভাব

উপসংহার

---

* পরে অবশ্য এই অভিযোগটি বাদ দেওয়া হইয়াছিল।

† Strachey ; *Hastings and the Rohilla War*, pp. 237-54.
Forrest : *Selections from State papers*, vol. I. pp. 79-81.

হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সুজা-উদ্-দৌলা ক্রমেই ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা ছিন্ন করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফরাসীদের সাহায্যে নিজ সেনাবাহিনীকে ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হইতেই সুজা-উদ্-দৌলা বহিঃশক্তির সাহায্য লইয়া ব্রিটিশ প্রাধান্য নাশের চেষ্টা শুরু করিয়াছিলেন—এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুজা-উদ্-দৌলার আকস্মিক মৃত্যু এবং তাঁহার পুত্র আসফ্-উদ্-দৌলার অকর্মণ্যতার ফলে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা পাইয়াছিল।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (The First Anglo-Maratha War) : পেশওয়া প্রথম মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর (১৭৭২) তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই নিজ পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবার ষড়যন্ত্রে তিনি প্রাণ হারাইলেন। রঘুনাথ রাও পেশওয়া বলিয়া স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু নারায়ণ রাও-এর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর পুত্রসন্তান জাত হইলে নানা ফড়নবিশ এই নবজাত পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অপরাপর মারাঠা নেতার সাহায্যে নানা ফড়নবিশ নারায়ণ রাও-এর শিশুপুত্রকে পেশওয়া-পদে স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন। রঘুনাথ রাও বাধ্য হইয়াই পেশওয়া-পদ ত্যাগ করিয়া ইংরাজদের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনি সুরাটের সন্ধি দ্বারা সল্‌সেট্ ও ব্যাসিন নামক দুইটি স্থান ইংরাজদের সমর্পণ করিলেন এবং ভারুচ্ ও সুরাটের রাজস্বের একাংশ দানে স্বীকৃত হইয়া ইংরাজ সেনাবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাউন্সিল রঘুনাথকে পেশওয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। সুরাটের সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার অব্যবহিত পরে ইংরাজগণ সল্‌সেট্ অধিকার করিয়া লইল।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণ

সুরাটের সন্ধি (১৭৭৫)

সল্‌সেট্ অধিকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের সহিত বোম্বাই-এর ইংরাজ সরকারের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইল। আরাস্ (Arras)-এর যুদ্ধে রঘুনাথ রাও এবং ইংরাজদের যুগ্মবাহিনী জয়লাভ করিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কলিকাতাস্থ কাউন্সিল বোম্বাই সরকারের এইরূপ স্বাধীনভাবে যুদ্ধ ঘোষণার তীব্র নিন্দা করিয়া কর্ণেল আপ্টন (Upton)-কে মারাঠাদের সহিত সন্ধি স্থাপনের জন্য প্রেরণ করিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ (Regulating Act) নামে একটি আইন পাস করিয়া বাংলার গবর্ণরকে গবর্ণর-জেনারেল-পদে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলকে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপর যুদ্ধ ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিষয়ে পরিদর্শন-ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন।

বোম্বাই সরকার কর্তৃক রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ অমান্য

কর্ণেল আপ্টন (Colonel Upton) মারাঠাদের সহিত পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন (১৭৭৬)। বোম্বাই-এর কাউন্সিল কর্তৃক রঘুনাথ রাও-এর সহিত সুরাটের সন্ধি স্বাক্ষর হেস্টিংস্ ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন না করিলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী

বোম্বাই-এর কাউন্সিলকে তিনি সাহায্যদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি কলিকাতা কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য বোম্বাই কাউন্সিলকে সুরাটের সন্ধি নাকচ করিয়া পুরন্দরের সন্ধি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী বোম্বাই সরকার রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সলসেট্ অবশ্য ইংরাজ অধিকারেই রহিল। রঘুনাথ রাওকে উপযুক্ত ভাতা দানের ব্যবস্থাও করা হইল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ভারুচ্ এবং বার লক্ষ টাকা মারাঠাদের নিকট হইতে গ্রহণ করাও স্থির হইল। কিন্তু ইংলণ্ডের ডাইরেক্টর সভা (Board of Directors) বোম্বাই কাউন্সিল কর্তৃক স্বাক্ষরিত সুরাটের সন্ধি সমর্থন করিলে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। বোম্বাই সরকার সঙ্গে সঙ্গেই রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ সমর্থন করিয়া মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এইবার তেলেগাঁও-এর যুদ্ধে মারাঠাদের হস্তে ইংরাজ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। ইংরাজপক্ষ ওয়াড়গাঁও (Wargaon)-এর সন্ধি দ্বারা রঘুনাথ রাওকে মারাঠাদের নিকট সমর্পণ করিতে, মারাঠা রাজ্যে অধিকৃত যাবতীয় স্থান প্রত্যর্পণ করিতে এবং মারাঠাদের নিকট প্রতিভূ (hostages) প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইল। ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি ব্রিটিশ মর্যাদায় চরম আঘাত হানিল। হেস্টিংস্ এই চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া সেনাপতি গোডার্ড (Goddard)-কে মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। গোডার্ড মধ্য-ভারতের মধ্য দিয়া তাঁহার বিশাল সেনাবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আহ্মদাবাদ এবং ঐ বৎসরেরই ডিসেম্বর মাসে বাসিন দখল করিলেন কিন্তু পর বৎসর পুণার দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া তিনি পরাজিত হইলেন। ইতিমধ্যে হেস্টিংস্ ইংরাজদের মিত্রপক্ষ এবং সিন্ধিয়ার শত্রু গোহাড়-এর রাণার সাহায্যার্থে ক্যাপ্টেন পোফাম্‌কে (Pophani) প্রেরণ করিলেন। পোফাম্ গোয়ালিওর দুর্গটি দখল করিতে সমর্থ হইলেন। ইহা ভিন্ন, জেনারেল ক্যামাক্ (Camac) সিপ্রির যুদ্ধে সিন্ধিয়াকে পরাজিত করিলেন। এই সকল সাফল্যের ফলে একদিকে যেমন ইংরাজদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল অপরদিকে মাহাদজী সিন্ধিয়া ইংরাজদের সহিত মিত্রতা-স্থাপনে উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ইংরাজ ও মারাঠাদের মধ্যে সল্‌বই (Salbai)-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধির শর্তানুসারে মাধব রাও নারায়ণ পেশওয়া বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, রঘুনাথ রাও বা রাঘোবাকে উপযুক্ত ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হইল। সিন্ধিয়াকে যমুনা নদীর পশ্চিম তীরস্থ যাবতীয় স্থান ফিরাইয়া দেওয়া হইল। হায়দর আলি মারাঠা পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সল্‌বই-এর চুক্তিতে যোগদান করিতে হইল না বটে, কিন্তু তিনি কর্ণাটে যে-সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন সেগুলি ফিরাইয়া দিতে হইল। সলসেটের উপর ইংরাজ অধিকার স্বীকৃত হইল।

পুরন্দরের সন্ধি (১৭৭৬)

ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি (১৭৬৯)

গোডার্ড পোফাম্ ও ক্যামাক্-এর অভিযান

সল্‌বই-এর সন্ধি (১৭৮২)

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ অধিকারের কোন বিস্তার সাধিত না হইলেও

তাহাদের মর্যাদা যে বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধের পর দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরিয়া ইংরাজ ও মারাঠাদের মধ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল বলিয়া ইংরাজদের পক্ষে ফরাসীগণ ও টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধে পূর্ণশক্তি নিয়োগের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, হায়দরাবাদের নিজাম, অযোধ্যার নবাব প্রভৃতিকে ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীনে আনিবার অবকাশও পাওয়া গিয়াছিল।

সলবই-এর সন্ধির গুরুত্ব

হেস্টিংস্ ও মহীশূর রাজ্য : দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ (Hastings & Mysore : Second Mysore War) : হায়দর আলির অভ্যুত্থানকে ব্রিটিশ, মারাঠা ও নিজাম এই তিন শক্তির মধ্যে কোনটিই প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিল না। উদীয়মান ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখে মহীশূর রাজ্য এক বিরাট বাধার সৃষ্টি করিল। মহীশূর রাজ্য আক্রমণে মারাঠাগণই হইল অগ্রণী। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে গুটি, সবনুর নামক স্থান দুইটি এবং ৩২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করিল। পর বৎসর নিজাম উত্তর-সরকার (Northern Circars) মাদ্রাজের ইংরাজ সরকারকে অর্পণের প্রতিশ্রুতিতে মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে ইংরাজ সাহায্য লাভ করিলেন। মারাঠাগণও পশ্চাৎপদ রহিল না। মারাঠা, ব্রিটিশ ও নিজাম মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে হায়দর আলি মারাঠাগণকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিলেন। অল্পকালের মধ্যে নিজামও ইংরাজপক্ষ ত্যাগ করিয়া হায়দরের পক্ষে যোগদান করিলেন। কিন্তু নিজাম নির্ভরযোগ্য মিত্র ছিলেন না। তিনি হায়দরের পক্ষও ত্যাগ করিলেন। হায়দর এককভাবে যুদ্ধ করিয়া বোম্বাই সরকারের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিলেন এবং ম্যাঙ্গালোর পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। মাদ্রাজ সরকারের সেনাবাহিনীকেও পরাজিত করিতে হায়দরের বেগ পাইতে হইল না। তিনি মাদ্রাজের সন্নিকটে সসৈন্যে উপস্থিত হইলে মাদ্রাজ সরকার তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইলেন (১৭৬৯)। ইংরাজ ও হায়দরের মধ্যে পরস্পর সামরিক সাহায্য দানের শর্তে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। উভয়পক্ষে পরস্পর পরস্পরের অধিকৃত স্থান এবং যুদ্ধ-বন্দী প্রত্যর্পণ করিলেন। হায়দরের রাজ্য কোন তৃতীয় শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ইংরাজগণ সামরিক সাহায্য দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ মহীশূর আক্রমণ করিলে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া হায়দরকে কোন সাহায্য দিলেন না। হায়দর আলিও মাদ্রাজ সরকারের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভুলিলেন না।

প্রথম মহীশূর যুদ্ধ

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে ফরাসীগণ মার্কিন বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। এই সূত্রে ভারতে ইংরাজগণ ফরাসী-অধিকৃত মাহে বন্দরটি অধিকার করিয়া লইল। মাহে ছিল মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত। মহীশূর রাজ্যের স্বার্থের দিক দিয়া মাহে বন্দরটি ইংরাজ-অধিকৃত হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। হায়দর আলি স্বভাবতই এইজন্য ইংরাজদের প্রতি অধিকতর বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি নিজাম কর্তৃক সংগঠিত এক শক্তিসংঘে যোগদান করিয়া ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথমে ইংরাজ-

দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ

পক্ষ হায়দরের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে ওয়ারেন হেস্টিংস্ সার আয়ার কূট (Sir Eyre Coote)-কে হায়দরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি কূটকৌশলে নিজাম, বেরারের রাজা ও মাহাদজী সিন্ধিয়াকে ইংরাজ-বিরোধী শক্তিসংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেও সমর্থ হইলেন। মিত্রবর্গ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও হায়দর এককভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পোর্টো-নোভোর যুদ্ধে আয়ার কূট-এর হস্তে পরাজিত হইলেন। পলিলোর ও শলিংগুর (Pollilore and Sholinghur)-এর যুদ্ধেও হায়দর আয়ার-কূট-এর হস্তে পরাজিত হইলেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্ণেল ব্রেইথওয়েট (Braithwaite) তাঞ্জোর এর নিকট হায়দর আলির পুত্র টিপু সুলতানের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। সেই সময়ে ফরাসী অ্যাডমিরাল সাফ্রে হায়দরের সাহায্যে এক নৌবহরসহ উপস্থিত হইলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই দু'সেমিন (Du Chemin) নামে অপর একজন সেনাপতিও এক সেনাবাহিনীসহ উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ফরাসী নৌবহর এবং সেনাবাহিনী হায়দরকে সাহায্য দানের পূর্বেই হায়দরের মৃত্যু হইল (১৭৮২)। হায়দরের মৃত্যুতে ইংরাজগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। কিন্তু হায়দরের সুযোগ্য পুত্র টিপু পিতার মৃত্যুর পরেও যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। এ-দিকে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। কর্ণেল ফুলারটন (Colonel Fullerton) কোইম্বাটুর দখল করিয়া টিপুর রাজধানী আক্রমণ করিবার জন্য যখন প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময়ে মাদ্রাজের নব-নিযুক্ত গভর্ণর লর্ড ম্যাকার্টনি কর্ণেল ফুলারটনকে যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দিলেন। টিপু ও ইংরাজদের মধ্যে ম্যাঙ্গালোর-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (১৭৮৪)। উভয়পক্ষই পরস্পর পরস্পরের অধিকৃত স্থান ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল। এই সকল শর্তে সন্ধিস্থাপন হেস্টিংসের মনঃপূত না হইলেও তিনি ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধি অনুমোদন করিলেন।

হায়দরের মৃত্যু

ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধি (১৭৮৪)

হেস্টিংসের অভ্যন্তরীণ নীতি ও শাসন (Internal Policy & Administration of Hastings) : হেস্টিংস্ যখন গভর্ণর হিসাবে শাসনভার গ্রহণ করেন তখন ক্লাইভ-প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনব্যবস্থার যাবতীয় ত্রুটি ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। হেস্টিংস্ ডাইরেক্টর সভার নির্দেশ অনুসারে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বৈত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া দেওয়ানী পরিচালনার ভার কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত করিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভের সময় হইতে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেওয়ানী পরিচালনার আইনগত দায়িত্ব ছিল কোম্পানির কিন্তু প্রকৃত দায়িত্ব ছিল নবাবের হাতে। বাংলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ'র উপর এবং বিহারের রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল সীতাব রায়ের উপর। এইভাবে নবাব এবং দেশীয় রাজস্ব কর্মচারীরা প্রকৃত কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত থাকা সত্ত্বেও আইনত তাঁহারা ছিলেন ইংরাজদের অধীন। এই দ্বৈত শাসনব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই নানা ধরনের অসুবিধা ও দুর্নীতির পথ প্রস্তুত করিয়াছিল

দ্বৈত শাসনব্যবস্থার অবসান কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানীর দায়িত্ব গ্রহণ

কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ নায়েব-দেওয়ানদের সততায় বিশ্বাস করিতেন না। নায়েব-দেওয়ানরা বিরাট পরিমাণ রাজস্ব আত্মসাৎ করেন এই ধারণা তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস্ সরাসরি কোম্পানির হস্তে দেওয়ানীর যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি নবাবের বাৎসরিক ভাতা ৩২ লক্ষ মুদ্রা হইতে ১৬ লক্ষ মুদ্রায় হ্রাস করিলেন এবং রেজা খাঁ ও সীতাব রায়কে পদচ্যুত করিয়া দেওয়ান পদ দুইটি উঠাইয়া দিলেন।

হেস্টিংসের নীতি ও উদ্দেশ্য

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হেস্টিংসের নীতি ছিল দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা এবং দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা। দ্বৈত শাসনের ফলে যে-অব্যবস্থা এবং অর্থাভাব দেখা দিয়াছিল, তাহা দূর করা এবং বাণিজ্যের প্রসার সাধনও ছিল হেস্টিংসের অন্যতম উদ্দেশ্য।

রেজা খাঁ ও সীতাব রায়ের পদচ্যুতি ও বিচার

প্রথমেই হেস্টিংস্ নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁ ও সীতাব রায়কে পদচ্যুত করিলেন। দুজনকেই দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া বিচারালয়ে প্রেরণ করা হইল। সীতাব রায় নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া সসম্মানে অভিযোগ হইতে মুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইলেন। রেজা খাঁকে প্রথমে না হইলেও শেষ পর্যন্ত নির্দোষ ঘোষণা করিতে হইল। ইহার পর উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হেস্টিংস্ ভ্রাম্যমাণ কমিটি (Committee of Circuit) নামে একটি ক্ষুদ্র সভা গঠন করিলেন। এই কমিটিকে প্রত্যেক জেলায় উপস্থিত হইয়া জমিদারদের সহিত বন্দোবস্ত করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল। জমিদারগণকে একসঙ্গে পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারির বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইল। কোম্পানির রাজস্ব

রাজস্ব আদায়ের নূতন ব্যবস্থা

আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ পূর্বে 'সুপারভাইজর' (Supervisor) বা পরিদর্শক নামে অভিহিত হইতেন। হেস্টিংস্ তাঁহাদিগকে 'কালেক্টর' (Collector) নামকরণ করিলেন। দেওয়ানীর কোষাগার মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল। গবর্ণর এবং তাঁহার কাউন্সিল লইয়া একটি রেভিনউ বোর্ড (Board of Revenue) গঠিত হইল। দেওয়ানী-সংক্রান্ত কার্যাদির সর্বোচ্চ দায়িত্ব এই বোর্ড-এর উপর ন্যস্ত হইল।

হেস্টিংসের রাজস্ব নীতির সমালোচনা

ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব-বন্দোবস্ত সদিচ্ছা-প্রসূত হইলেও উহা সাফল্যলাভ করিয়াছিল, এ-কথা বলা চলে না। কারণ, হেস্টিংস্ ব্যক্তিগতভাবে পূর্বেকার জমিদারগণের সহিত বন্দোবস্তের পক্ষপাতী থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে যে-সকল ব্যক্তি সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল তাহাদিগকেই জমিদারি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল। ফলে, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জমিদারগণ যেমন তাঁহাদের জমিদারি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তেমনি কোম্পানিও এই অভিজ্ঞ রাজস্ব-আদায়কারীদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। হেস্টিংসের পঞ্চবার্ষিক বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারগণ প্রতি বৎসর-ই নূতন করিয়া বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা নিজ জমিদারি হইতে কোন কালেই বঞ্চিত হইতেন না। কিন্তু অভিজ্ঞ জমিদার শ্রেণীর স্থলে অধিক রাজস্বের লোভে যে-কোন ব্যক্তির সহিত রাজস্ব-বন্দোবস্ত এবং অনভিজ্ঞ ইংরাজ কর্মচারিবর্গের

হস্তে রাজস্ব-আদায়ের দায়িত্ব স্থাপন হেস্টিংসের রাজস্ব-ব্যবস্থার অসাফল্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসেই ডাইরেক্টর সভার নির্দেশক্রমে রেভিনিউ বোর্ড ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের জমি-বন্দোবস্তের পরিবর্তনের প্রশ্ন আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংস্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিতে হইলে রাজস্ব-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইবে দেখিয়া অস্থায়ী বন্দোবস্তই চালু রাখা স্থির হইয়াছিল। অবশ্য রাজস্ব আদায়-

রাজস্ব নীতির পরিবর্তন

সংক্রান্ত কতক পরিবর্তন সেই সময়ে করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে ছয়টি অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে একটি করিয়া 'প্রাদেশিক কাউন্সিল' (Provincial Council) স্থাপন করা হইল এবং প্রত্যেক কাউন্সিলের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য একজন করিয়া দেশীয় দেওয়ান নিযুক্ত করা হইল। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি জেলার কালেক্টর-পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল। সুতরাং ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র ইংরাজ কর্মচারিবর্গের হস্তে রাজস্ব আদায়ের যে-ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ও দেশীয় উভয় প্রকার কর্মচারিবর্গের উপর ন্যস্ত করা হইল। এই কারণে হেস্টিংসের আমলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব-ব্যবস্থা প্রধানত পরীক্ষামূলকই ছিল, বলা যাইতে পারে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস্ 'আমিনী কমিশন' (Amini Commission) নিযুক্ত করিয়া রাজস্ব-সংক্রান্ত নানাপ্রকার মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক কাউন্সিল উঠাইয়া দিয়া পুনরায় কালেক্টরদের নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, পূর্বে তিনি জমি ইজারা দিবার যে-ব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন তাহা উঠাইয়া দিয়া সাবেক কালের জমিদারি-প্রথা চালু করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জমিদারি-প্রথার পূর্বেকার ভিত্তি বিধ্বস্ত হইয়া পড়ায় জমিদারি-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন এক দুরূহ কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কারণঃ (১) পূর্বে জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকায় যে ক্ষমতা ভোগ করিতেন এবং তাঁহাদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তাহা ইতিমধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। জমিদারের অধীন প্রজাবর্গের নিরাপত্তা, তাহাদের বিচার প্রভৃতি কাজ বা দায়িত্ব এখন আর ছিল না। তাহারা কেবল রাজস্ব আদায়কারীতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। (২) কোম্পানির হাতে শাসনব্যবস্থা চলিয়া যাইবার ফলে জমিদারদের পূর্বেকার মর্যাদা আর ছিল না। সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিবার শর্তে জমি নির্দিষ্ট-কালের জন্য অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের হাতে কিছুকাল থাকিবার ফলে পূর্বেকার জমিদারি-প্রথার মূল ভিত্তিই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। (৩) কোম্পানি কর্তৃক অত্যধিক পরিমাণ রাজস্ব নির্ধারণের ফলে জমিদারদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। জমিদারি ইহার ফলে অনবরত হস্তান্তরিত হইতেছিল। (৪) চিরাচরিত জমিদারি-ব্যবস্থায় জমিদাররা পূর্বে বিদ্বান, শাস্ত্রজ্ঞ প্রভৃতি ব্যক্তিকে জমি দান করিয়া যে-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাদি করিতেন, তাহাও এখন একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। রাজস্ব আদায় করাই জমিদারদের একমাত্র কর্তব্যে পরিণত হইয়াছিল।

করিয়া দিয়া ব্রজকিশোর নামে জনৈক ব্যক্তিকে সেই স্থলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাণী কাউন্সিলের নিকট (ডিসেম্বর, ১৭৭৪) অভিযোগ করিলেন যে, ব্রজকিশোর যথেচ্ছভাবে বর্ধমান রাজসম্পত্তির অপচয় করিতেছেন এবং এই ব্যাপারে ইংরাজ রেসিডেণ্টও লিপ্ত আছেন। কাউন্সিল হেস্টিংসের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ব্রজকিশোরকে বর্ধমান রাজ-সম্পত্তির আয়ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে বাধ্য করিলেন। এই হিসাবে হেস্টিংস্‌কে পনর হাজার টাকা এবং তাঁহার দেশীয় সেক্রেটারী কানাইলালবাবুকে পাঁচ হাজার এবং কানাইলালবাবুর সহকারীকে পাঁচ শত টাকা ঘুষ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া লিখিত ছিল।* হেস্টিংস্ কাউন্সিলের সদস্যগণ কর্তৃক এ-বিষয়ে তদন্তের তীব্র বিরোধিতা করিয়া নিজের বিরুদ্ধে সন্দেহ গভীরতর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ

(২) **রাণী ভবানীর অভিযোগ (Complaint of Rani Bhavani):** হেস্টিংসের আমলে রাণী ভবানীর ন্যায় পুণ্যশ্লোকা মহীয়সী নারীর সম্পত্তিও যে কোম্পানির স্বার্থপরতা হইতে নিস্তার পায় নাই তাহা কাউন্সিলের নিকট রাণী ভবানীর দরখাস্ত হইতে জানিতে পারা যায়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে যে মন্বন্তর দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তেমনি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থানও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। রাণী ভবানীর জমিদারি ছিল রাজসাহীতে। তাঁহার প্রজাবর্গও মন্বন্তরের প্রকোপ হইতে রক্ষা পায় নাই। তদুপরি ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের প্লাবনে ফসল নষ্ট হইলে রাণী ভবানী প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে খাজনা আদায় করা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের অবস্থার পরিবর্তন হইলে অনাদায়িকৃত খাজনা গ্রহণে তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হওয়ায় সরকারী খাজনা দিতে বিলম্ব হইয়াছিল।† এই কারণে রাণী ভবানীর প্রাসাদ ঘেরাও করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মোট ২২,৫৮,৬৭৪ টাকা লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ইহার পর ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দুলাল রায় নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাজসাহীর জমিদারি দেওয়া হইয়াছিল। রাণী ভবানী কলিকাতা কাউন্সিলের নিকট দরখাস্ত করিলে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে

রাণী ভবানীকে জমিদারি হইতে বিচ্যুত করিবার অভিযোগ

* Vide Beveridge: *Trial of Nan Coomer*, pp. 120-25.

R. C. Dutta: *Economic History of British India*, pp 62-64.

† "I am Zamindar, so was obliged to keep the ryots from ruin and gave what ease to them I could, by giving them time to make up their payments; and requested the gentlemen (English officials) would in same manner give me time......but not crediting me they were pleased to take *cutchery* from my house......Then my house was surrounded, and all my property enquired into; what collections I had made as farmer and zamindar were taken; what money I borrowed and my monthly allowances were taken and made together Rs. 22,58,674 (£ 226,000)." *Rani Bhavani's* letter to *the Council Select Committee's Eleventh Report 1783, Appendix O.*

Also Vide R. C. Dutta, pp. 65-67.

হেস্টিংসের বিরোধিতা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দুলাল রায়কে অপসারিত করিয়া রাণী ভবানীকে তাঁহার জমিদারি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

(৩) **নন্দকুমারের অভিযোগ (Complaint of Nanda Kumar) :** হেস্টিংস্ মিরজাফরের পত্নী মণিবেগমের নিকট হইতে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ লইয়াছেন, এই কথা নন্দকুমার কলিকাতা কাউন্সিলের নিকট এক অভিযোগ-পত্রে জানাইলে কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এই অভিযোগের তদন্ত করিতে চাহিলেন। হেস্টিংস্ কাউন্সিলের সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া বারওয়েল-এর সহিত সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন। এই ব্যাপারে হেস্টিংসের আচরণ সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী নানাপ্রকার মত রহিয়াছে। ঐতিহাসিক মিল, কোম্পানির কৌঁসুলী (Counsel), সেয়ার (Sayer) প্রভৃতি অনেকের মতে হেস্টিংস্ এইরূপ অভিযোগের তদন্তে বাধাদান করিয়া নিজের দোষ প্রমাণিত করিয়াছিলেন। উইলসন্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকের মতে হেস্টিংস্ কাউন্সিলের তদন্তের পদ্ধতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন মাত্র। নন্দকুমারের অভিযোগ সম্পর্কেও মতানৈক্য রহিয়াছে। সার্ জেম্স্ স্টিফেন্ (Sir James Stephen), ফরেস্ট (Ferrest , ট্রটার (Trotter) প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে বার্ক (Burke), ইলিয়ট (Eliot), বেভারিজ (Beveridge) প্রভৃতি সমসাময়িক ও পরবর্তী রাজনীতিক ও ঐতিহাসিকদের মতে নন্দকুমারের অভিযোগ মূলত সত্য ছিল।

হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযোগ

নন্দকুমারের অভিযোগের অব্যবহিত পরেই কামাল-উদ্দিন নামে জনৈক ব্যক্তি যোসেফ ফৌক, ফ্রান্সিস্ ফৌক (Joseph and Francis Fowke)-ও নন্দকুমারের বিরুদ্ধে হেস্টিংসের নিকট এক অভিযোগ করিয়াছিল। এই অভিযোগে বলা হইয়াছিল যে, নন্দকুমার, যোসেফ ও ফ্রান্সিস্ ফৌক কামাল-উদ্দিনকে বলপূর্বক হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ সংবলিত একখানি কাগজে সহি করাইয়া লইয়াছেন। ফলে নন্দকুমার যোসেফ ও ফ্রান্সিস্ ফৌক, তিনজনকেই গ্রেপ্তার করা হইল এবং জামিনে মুক্তি দেওয়া হইল। কামাল-উদ্দিনের অভিযোগের বিচার হইবার পূর্বেই মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি নন্দকুমারকে জাল করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করিল (৬ই মে, ১৭৭৫)। বলাকী দাস নামে জনৈক মহাজন (Native Banker)-এর নিকট নন্দকুমার কতকগুলি মণিমুক্তা বিক্রয়ের জন্য দিয়াছিলেন। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বলাকী দাসের নিকট হইতে তিন লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। এই ঋণ আদায়ের পূর্বেই বলাকী দাসের মৃত্যু আসন্ন হইয়া উঠিলে তিনি রাজা নন্দকুমারের উপর নিজ পরিবারের দায়িত্ব এবং একটি উইল দ্বারা কোম্পানির নিকট হইতে তাঁহার যাবতীয় প্রাপ্য আদায়ের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকালের মধ্যেই বলাকী দাসের মৃত্যু হইলে (১৭৬৯) নন্দকুমার তাঁহার বিপন্ন পরিবারের সুবিধার্থে কোম্পানির নিকট হইতে প্রাপ্য তিন লক্ষ টাকা আদায় করেন। এই টাকা হইতে নন্দকুমার নিজ মণিমুক্তার মূল্য বাবদ ৪৮,০২১ টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই টাকার সংশ্লিষ্ট

নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কামাল-উদ্দিনের অভিযোগ

নন্দকুমার জাল করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত

কাগজ (Bond)-ই জাল বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল এবং বিচারে নন্দকুমার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

নন্দকুমারের প্রাণ-দণ্ডের মূল কারণ

নন্দকুমারের বিচার এমন সন্দেহজনকভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছিল যে, সেই সময় হইতে অদ্যাবধি তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে প্রাণ হারাইয়াছিলেন এই ধারণা সাধারণ্যে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। বেভারিজ (Beveridge), সার আলফ্রেড্ লায়েল (Sir Alfred Lyall) প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে কাউন্সিলের নিকট যখন একের পর এক করিয়া অভিযোগ উপস্থাপিত হইতেছিল তখন সেগুলি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে হেস্টিংস্‌কে নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি যাহাতে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে সাহস না পায় সেইজন্য এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যাপারে হেস্টিংসের দায়িত্ব

নন্দকুমারের প্রতি হেস্টিংসের আচরণ, হেস্টিংসের নিকট নন্দকুমারের মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা, নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ করিবার পর হেস্টিংসের আচরণ এবং হেস্টিংসের কয়েকটি উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলে নন্দকুমারের ফাঁসির জন্য হেস্টিংস্-ই প্রধানত দায়ী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

নন্দকুমারের প্রতি হেস্টিংসের মনোভাব

হেস্টিংসের ব্যক্তিগত পত্রাবলীতে নন্দকুমারের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার পত্রাবলীর দুইটিতে তিনি নন্দকুমারকে ব্যক্তিগত শত্রু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এই দুইখানি পত্রে এইরূপ লেখা হইয়াছিলঃ "*From the year 1759 to the date when I left Bengal in 1764, I was engaged in a continued opposition to the interest and designs of that man (Nanda Kumar) because I judged him to be averse to the interest of my employer*" ; "*I was never the personal enemy of any man but Nanda Kumar whom from my soul I detested, even when I was compelled to countenance him.*"*

হেস্টিংসের নিকট নন্দকুমারের মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা

হেস্টিংসের মর্যাদা ও স্বার্থরক্ষার জন্য নন্দকুমারের মৃত্যু যে একান্ত প্রয়োজন ছিল সে-কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ নন্দকুমার কর্তৃক হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগের অল্পকাল পূর্বে হুগলীর ফৌজদার এবং মণিবেগমের ব্যয়ের হিসাব হইতেও হেস্টিংসের উৎকোচ গ্রহণের কথা কাউন্সিলের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। নন্দকুমারের ন্যায় মর্যাদাশালী ব্যক্তিকে চরম শাস্তি দিতে পারিলে কাউন্সিলের নিকট হেস্টিংসের বিরুদ্ধে আর কেহ অভিযোগ পেশ করিবার সাহস পাইবে না, এই ছিল হেস্টিংসের ধারণা।

হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযোগ কাউন্সিলের সম্মুখে উত্থাপিত হওয়ার পর নিজ মর্যাদা ও সততার খাতিরেও হেস্টিংসের পক্ষে তদন্তে স্বীকৃত হওয়া উচিত

* Gleig quoted by Beveridge : *Trial of Nun Coomer*, pp. 91-100.

ছিল, কিন্তু তিনি প্রথম হইতেই তদন্তের বিরোধিতা শুরু করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, এই অভিযোগের অব্যবহিত পরেই হেস্টিংস্ গবর্ণর-জেনারেল-পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন (২৭ মার্চ, ১৭৭৫) এবং তাঁহার পদত্যাগ কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। অভিযুক্ত হইবার পর অভিযোগের সত্যতা বা অসত্যতা প্রমাণিত হইবার অপেক্ষা না রাখিয়া হেস্টিংসের পদত্যাগ প্রকারান্তরে তদন্ত এড়াইয়া যাইবার পন্থাস্বরূপ বিবেচিত হওয়া অযৌক্তিক নহে। কিন্তু নন্দকুমারকে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াই (১৮ মে, ১৭৭৫) হেস্টিংস্ পদত্যাগপত্র নাকচ করিয়া গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার এক পত্রে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, নন্দকুমারকে 'আপাত-দৃষ্টিতে আইনসম্মতভাবেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে' (*In a fair way to be hanged*)। বলা বাহুল্য, নন্দকুমারের বিচার তখনও শেষ হয় নাই।

নন্দকুমার কর্তৃক হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের ব্যাপারে হেস্টিংসের আচরণ

ইহা ভিন্ন, হেস্টিংস্ তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ সুলিভান (Sulivan)-এর নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, সার এলিজা ইম্পে একদিন তাঁহার নিরাপত্তা, ভাগ্য, সম্মান ও মর্যাদা সবকিছুই রক্ষা করিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন (...Sir Elijah Impey a man *to whose support he was one day indebted for the safety of his fortune, honour and reputation*)। ডানিং (Dunning)-এর নিকট এক পত্রে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইম্পে লিখিয়াছিলেন, 'আমি একদিন হেস্টিংস্কে সাহায্য করিয়াছিলাম ; সেজন্য তিনি এখন আমাকে ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়াই সাহায্য করিতে বাধ্য।' (*I helped Hastings once and therefore he is bound to help me now whether I am right or wrong.*)। এই সকল উক্তি হইতে নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি সার এলিজা ইম্পের অসদাচরণের পরিচয় পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য। কারণ নন্দকুমারের বিচারকালে ইম্পে প্রথম হইতেই পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দানে দ্বিধাবোধ করেন নাই। হেস্টিংসের অনুচর এলিয়ট (Elliot)-কে নন্দকুমারের বিচারের দোভাষী (interpreter) নিয়োগে নন্দকুমার আপত্তি জানাইলেও এলিজা ইম্পে তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ হইলে তাঁহার কৌসুলী ফ্যারার (Farrer) নন্দকুমারের প্রাণভিক্ষার জন্য দরখাস্ত করিলে ইম্পে তাহা ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এমন কি, বাংলার নবাব নন্দকুমারের প্রাণরক্ষার জন্য আবেদন করিয়াও হেস্টিংসের ব্যক্তিগত শত্রু নন্দকুমারের প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। হেস্টিংসের ইম্পীচ্মেণ্টে সাক্ষ্য দিবার কালে ফ্যারার নন্দকুমারের বিচারে ইম্পে এবং অপরাপর বিচারপতিগণ যে নন্দকুমারের পক্ষের সাক্ষীদিগকে অযথা নাজেহাল করিয়াছিলেন, একথা বলিয়াছিলেন। বস্তুত, ইম্পে বিচারকালে, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এমন সব মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, নন্দকুমার স্বপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা অর্থহীন হইবে মনে করিয়া নিজ ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবেন কিনা সে-বিষয়ে ভাবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সার এলিজা ইম্পের সহায়তার প্রমাণ

এলিজা ইম্পের পক্ষপাতিত্ব

সর্বশেষে, বিচারে নন্দকুমারের দোষ যদি প্রমাণিত হইত তবুও তাঁহাকে যে, আইনত ফাঁসি দেওয়া সম্ভব ছিল না, সে-বিষয়ে দ্বিমত নাই। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে বিলাতী আইন প্রযোজ্য ছিল না একথা ইম্পে বা তাঁহার সহকর্মিগণ উপলব্ধি করিলেন না, বা করিলেও হেস্টিংস্‌কে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মাধিকরণের পবিত্রতা বিনষ্ট করিয়াও নন্দকুমারকে ফাঁসি দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। জাল করিবার অপরাধে নন্দকুমারের ফাঁসি দেওয়া আইনবিরুদ্ধ হইয়াছিল একথা ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ স্বীকার করিয়াছিলেন। স্বভাবতই নন্দকুমারের ফাঁসি Judicial murder হিসাবেই বিবেচ্য।

নন্দকুমারের ফাঁসি আইন-বিরোধী Judicial murder

চৈৎ সিংহের প্রতি হেস্টিংসের আচরণ (Hastings' treatment of Chait Singh): ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের সহিত কোম্পানির চুক্তির শর্তানুসারে বাণারস কোম্পানির প্রাধান্যাধীনে স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই চুক্তিতে বাণারসের রাজার উপর কোম্পানির কেবলমাত্র বাৎসরিক কর ভিন্ন অপর কোনপ্রকার দাবি থাকিবে না, এই শর্তটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল। কিন্তু মারাঠা ও ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য অর্থের অনটন ঘটিলে হেস্টিংস্ বাণারসের রাজা চৈৎ সিংহের নিকট পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য চাহিলেন। প্রথমে রাজা চৈৎ সিংহ আপত্তি জানাইলেও শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র একবারের জন্যই অর্থ সাহায্য দিতে রাজী হইলেন (১৭৭৮)। কিন্তু পরবৎসরও (১৭৭৯) চৈৎ সিংহের নিকট পুনরায় অর্থ দাবি করা হইল। রাজা অর্থদানে অক্ষমতা জানাইলে হেস্টিংস্ তাঁহার রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করিয়া মোট দাবির উপরে আরও ২,০০০ পাউণ্ড জরিমানা হিসাবে আদায় করিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দেও হেস্টিংস্ পূর্বের মত অর্থ দাবি করিলেন। চৈৎ সিংহ হেস্টিংস্‌কে দুই লক্ষ টাকা উপহার হিসাবে প্রেরণ করিয়া তাঁহার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হেস্টিংস্ দুই লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াও রাজাকে নিষ্কৃতি দিলেন না। তারপর চৈৎ সিংহকে বাৎসরিক কর ভিন্ন আরও পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে বলা হইল, তদুপরি দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যও কোম্পানির ব্যবহারের জন্য দিতে বলা হইল।* চৈৎ সিংহের আপত্তিতে অবশ্য উহা এক হাজারে নামিল। চৈৎ সিংহ পাঁচ শত অশ্বারোহী এবং পাঁচ শত পদাতিক সৈন্য যোগাড় করিয়া কোম্পানিকে জানাইলেন, কিন্তু ইহার কোন উত্তর তিনি পাইলেন না। হেস্টিংস্ চৈৎ সিংহের অশ্বারোহী সৈন্য যোগাড় করিবার অক্ষমতা ও বিলম্বের অজুহাতে তাঁহাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা করিতে মনস্থ করিলেন। শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলের অনুমতিক্রমে হেস্টিংস্ স্বয়ং বাণারসে উপস্থিত হইয়া রাজা চৈৎ সিংহের নিকট কৈফিয়ত চাহিলেন। রাজার কৈফিয়ত পাইয়া তিনি উহা অগ্রাহ্য

চৈৎ সিংহের উপর হেস্টিংসের দাবি

হেস্টিংস্ কর্তৃক রাজা চৈৎ সিংহের গ্রেপ্তার

* Macaulay says: Hastings was determined to plunder Chait Singh and for that end to fasten a quarrel on him Accordingly the Raja was now required to keep a body of cavalry for the services of Govt." Vide, Forrest vol. iii, p. 783.

করিলেন এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। চৈৎ সিংহ উপযুক্ত বাৎসরিক ভাতার বিনিময়ে বাণারসের জমিদারিও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। রাজাকে এইভাবে অপমান করিলে রামনগর হইতে একদল সশস্ত্র প্রজা হেস্টিংসের সেনাদলকে আক্রমণ করিল। হেস্টিংস্ প্রাণের ভয়ে চুণারে পলায়ন করিলেন। এই গোলযোগে রাজা চৈৎ সিংহ ইংরাজদের হাত হইতে পলাইয়া লতিফগড় নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। ইহার পর তাঁহার ও ইংরাজ সেনাবাহিনীর মধ্যে পতিতা নামক স্থানে এক যুদ্ধ হইল।

চৈৎ সিংহের পদচ্যুতি

এই যুদ্ধে চৈৎ সিংহের সেনাবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। হেস্টিংস্ পুনরায় বাণারসে উপস্থিত হইয়া চৈৎ সিংহের জনৈক আত্মীয় মহীপ নারায়ণকে চৈৎ সিংহ কোম্পানিকে যে পরিমাণ কর দিতেন ইহার দ্বিগুণ বাৎসরিক করদানের শর্তে বাণারসের জমিদারি অর্পণ করিলেন। কলিকাতার কাউন্সিল হেস্টিংসের তৎপরতার প্রশংসা করিয়া চৈৎ সিংহ-সংক্রান্ত তাঁহার যাবতীয় কার্যের অনুমোদন করিলেন।

চৈৎ সিংহ জমিদার হইলেও তাঁহার কতকগুলি বিশেষ অধিকার ছিল। কোম্পানির সহিত করদান ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার সম্পর্ক তাঁহার থাকিবে না, এই শর্ত ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তিতে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। আর এই শর্তের কথা বাদ দিলেও অপরাপর জমিদারগণের নিকট যখন কোনপ্রকার অর্থ বা সামরিক সাহায্য দাবি করা হয় নাই ঠিক সেই সময়ে একমাত্র চৈৎ সিংহের নিকট পুনঃপুনঃ অর্থ দাবির কোন

হেস্টিংসের আক্রোশ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতা

যুক্তি হেস্টিংস্ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। হেস্টিংসের কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যখন প্রকৃত শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়াছিলেন তখন চৈৎ সিংহ তাঁহাদের নিকট এক বার উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই হেস্টিংস্ চৈৎ সিংহকে তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। ব্যক্তিগত আক্রোশবশতই যে হেস্টিংস্ চৈৎ সিংহের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।* ইহা ভিন্ন, আইনত কোম্পানি চৈৎ সিংহের নিকট বাৎসরিক করের অধিক অর্থ দাবি করিতে পারিতেন কিনা সে-বিষয়েও সন্দেহ আছে।

অযোধ্যার বেগমদের প্রতি হেস্টিংসের আচরণ (Hastings' treatment of the Begums of Oudh): বাণারসের রাজা চৈৎ সিংহের উপর অত্যাচার করিয়াও যখন হেস্টিংস্ যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন তিনি অযোধ্যার

বেগমদের পরিচয়

বেগমদের সঞ্চিত অর্থের উপর দৃষ্টি দিলেন। সুজা-উদ্-দৌলার স্ত্রী এবং মাতা, অযোধ্যার বেগমদের নামে অভিহিত। সুজা-উদ্-দৌলার মৃত্যুর পর উভয় বেগম তাঁহাদের নিজেদের ব্যয় সংকুলানের জন্য জায়গীর

* হেস্টিংসের ইম্পীচমেন্ট-এর সময় বার্ক (Burke) হেস্টিংসের নিম্নলিখিত চিঠির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাতেই আক্রোশ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে:

"So long as I conceive Chait Singh's misconduct and contumacy to have me rather than the company for its object, I looked upon a considerable file as sufficient both for his immediate punishment and binding him to future good behaviour." -*Hastings*.

ভোগ করিতেছিলেন। ইহাই ছিল সেই সময়কার রীতি। বেগমদের নিজস্ব প্রচুর পরিমাণ মণিমুক্তা এবং অর্থ সঞ্চিত ছিল। আসফ্-উদ্-দৌলা ক্রমেই যখন কোম্পানির প্রাপ্য অর্থ মিটাইতে না পারিয়া অধিকতর ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলেন তখন তিনি নিজ মাতা ও পিতামহীর অর্থের উপর দৃষ্টি দিলেন। হেস্টিংস্‌ও তাঁহাকে এ-বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে অতিষ্ঠ হইয়া আসফ্-উদ-দৌলার মাতা অর্থাৎ সুজা-উদ্-দৌলার বেগম, তাঁহাকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়া কোম্পানির নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন যে, ভবিষ্যতে কোম্পানি অথবা আসফ্-উদ্ দৌলা তাঁহাকে অর্থের জন্য বিরক্ত করিবেন না। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার বেগমরা চৈৎ সিংহের বিদ্রোহাত্মক আচরণের সমর্থন করিয়াছিলেন, এই অজুহাতে কোম্পানি বেগমদের রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিলেন। তারপর অযোধ্যার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট মিড্‌ল্‌টনের স্থলে অধিকতর অত্যাচারী ব্রিটিশ কর্মচারী ব্রিস্টো (Bristow)-কে নিযুক্ত করা হইল। বেগমদের দেওয়ান ও খোজাদের (Eunuchs) বন্দী করিয়া রাখিয়া নানাভাবে নির্যাতন করা হইল। হেস্টিংস্ আসফ্-উদ্-দৌলার মতের বিরুদ্ধেই একদল ব্রিটিশ সৈন্য অযোধ্যায় প্রেরণ করিয়া বেগমদের ভীতি প্রদর্শন করিলেন। বেগমদ্বয়ের যাবতীয় ধনরত্ন বলপূর্বক আদায় করা হইল। এইভাবে অর্থের জন্য নিরীহ বৃদ্ধা বেগমদের উপর অত্যাচার করিতেও হেস্টিংস্ দ্বিধাবোধ করিলেন না।

বেগমদের উপর অত্যাচার

ওয়ারেন হেস্টিংস্ ও রোহিলা বা রুহেলাগণ (Warren Hastings and the Rohillas or Ruhelas): কোম্পানি অযোধ্যা রাজ্যকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা প্রভৃতি অধিকৃত রাজ্যের বিরুদ্ধে মারাঠা ও আফগান আক্রমণের প্রতিরোধক সীমান্ত শক্তি (buffer state) হিসাবে বিবেচনা করিত। এই কারণে অযোধ্যার সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখা কোম্পানির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই মিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যেই ক্লাইভ অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে কারা ও এলাহাবাদ, যাহা সম্রাট শাহ্ আলমকে দিয়া দিয়াছিলেন, সেই দুইটি স্থান হেস্টিংস্ অযোধ্যার নবাবকে ফিরাইয়া দিলেন। এজন্য অবশ্য তিনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নবাবের নিকট হইতে মূল্য হিসাবে আদায় করিলেন।

কোম্পানি-অযোধ্যা মিত্রতা-নীতি

কারা ও এলাহাবাদ প্রত্যর্পণ

রোহিলখণ্ড হিমালয়ের পাদদেশে, অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এক অতি উর্বর ভূখণ্ড ছিল। উহা ছিল আফগান রোহিলা বা রুহেলাদের অধীন, কিন্তু উহার জনসাধারণ ছিল প্রধানত হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত। রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমৎ খাঁন এবং অপরাপর আফগান দলপতিগণ মারাঠাদের আক্রমণের ভয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতেন। অনুরূপ অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলাও মারাঠা আক্রমণের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। রোহিলা ও অযোধ্যার নবাব উভয়েরই শত্রু মারাঠাগণের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে

মারাঠা আক্রমণের ভীতি

সার রবার্ট বার্কারের উপস্থিতিতে সুজা-উদ্-দৌলা ও হাফিজ রহমৎ খানের মধ্যে বাণারস চুক্তি নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (১৭৭২)। এই চুক্তির শর্তানুসারে মারাঠাগণ রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিলে সুজা-উদ্-দৌলা সেই আক্রমণ প্রতিহত করিবেন এবং সেইজন্য রোহিলা সর্দার তাঁহাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিবেন।

সুজা-উদ্-দৌলা ও হাফিজ রহমৎ খানের মধ্যে বাণারস চুক্তি

ঘটনা এমনই দাঁড়াইল যে, পরবৎসরই অর্থাৎ ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দেই মারাঠাগণ রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিল। কোম্পানি ও অযোধ্যার নবাবের যুগ্ম সেনাবাহিনী মারাঠাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিল। সুজা-উদ্-দৌলা বাণারস চুক্তির শর্তানুসারে হাফিজ রহমৎ খানের নিকট চল্লিশ লক্ষ টাকা দাবি করিলেন। রোহিলা সর্দার সেই অর্থ দিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। সুজা-উদ্-দৌলা কোম্পানির সাহায্যে রোহিলা সর্দারকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য করিতে চাহিলেন। এই উদ্দেশ্যে কোম্পানি ও অযোধ্যার এক যুগ্মবাহিনী রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিল (১৭৭৪, এপ্রিল ১৭)। এইভাবে রোহিলাদের সহিত অযোধ্যা ও ইংরাজ যুগ্মবাহিনীর যুদ্ধ শুরু হইল। যথেষ্ট বীরত্ব ও সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়াও রোহিলাগণ মিরণপুরকাট্রার যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। হাফিজ রহমৎ খান দেশরক্ষার জন্য নির্ভীক সৈন্যের ন্যায় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। পরাজয়ের ফলে বিশ হাজার রোহিলাকে রোহিলখণ্ড হইতে নির্বাসিত করা হইল এবং রোহিলখণ্ডের অধিকাংশ অযোধ্যা রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করা হইল, সামান্য এক খণ্ডে রোহিলা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলি মহম্মদ রোহিলার পুত্র ফৈজ-উল্লা খানকে স্থাপন করা হইল। ফৈজ-উল্লা খানকে মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য রাখিবার অধিকার দেওয়া হইল এবং অযোধ্যার নবাবের প্রয়োজনে এই পাঁচ হাজার সৈন্যকে পাঠাইতে হইবে এই শর্ত আরোপ করা হইল।

মারাঠা আক্রমণ (১৭৭৩)

সুজা-উদ্-দৌলা ও ইংরাজ সৈন্য কর্তৃক প্রতিহত : সুজা-উদ্-দৌলার চল্লিশ লক্ষ টাকা দাবি

রোহিলা যুদ্ধ : রোহিলা পরাজয়

রোহিলা রাজ্যের অধিকাংশ অযোধ্যার সহিত সংযুক্ত : ফৈজ-উল্লা খান

কোম্পানির সেনাবাহিনীকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার শত্রুতায় লিপ্ত নহে এইরূপ এক ক্ষুদ্র উপদলীয় নেতার সহিত অযোধ্যার নবাবের সাহায্যে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হেস্টিংসের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কার্য হইয়াছিল, এই কথা অনেকেই বলিয়াছেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংসের ইম্পীচ্‌মেণ্টের অভিযোগগুলির মধ্যে রোহিলা যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনীকে ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে ব্যবহার করার অভিযোগও তাঁহার বিরুদ্ধে আনা হইয়াছিল। হেস্টিংস্ এজন্য চল্লিশ লক্ষ টাকা অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রোহিলা যুদ্ধে হেস্টিংসের সাহায্য করার সমালোচনা

বার্ক, মেকলে, ফ্রান্সিস্, লায়েল প্রভৃতি এই মত পোষণ করিতেন যে, অর্থ-

লোভেই হেস্টিংস্ অযোধ্যার নবাবকে সামরিক সাহায্য দান করিয়া নিরপরাধ রোহিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ নৈতিকতার উপর হেস্টিংসের এই কাজ যে মানুষের আস্থা হ্রাস করিয়াছিল, সেই কথা সমসাময়িক লেখক, রাজনীতিক, অনেকেই উল্লেখ করিয়াছিলেন।

বার্ক, মেকলে, ফ্রান্সিস্, লায়েল প্রভৃতির মত সমসাময়িক লেখক ও রাজনীতিকদের মত

হেস্টিংসের ইম্পীচ্মেণ্টে বার্ক বলিয়াছিলেন যে, ওয়ারেন হেস্টিংস্ কেবল রোহিলাদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা লইয়াই ছিনিমিনি খেলেন নাই, তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন যখন "villages were burnt, their children butchered and their women violated."

বার্কের উক্তি

ঐতিহাসিক স্ট্রেচি ও ফরেস্ট ইম্পীচ্মেণ্টের সময় ওয়ারেন হেস্টিংস্ তাঁহার অভিযোগগুলির প্রত্যুত্তরে, যে-সব কথা বলিয়াছিলেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, হেস্টিংস্ ব্রিটিশ রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই রোহিলাদের বিরুদ্ধে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উপায় হিসাবে রোহিলখণ্ড অযোধ্যার অঙ্গীভূত না হইলে সেই স্থানে মারাঠাগণ একবার স্থায়িভাবে নিজ অধিকার স্থাপন করিতে পারিলে কোম্পানির রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইত। এই দিক দিয়া রোহিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অযোধ্যার নবাবকে সাহায্য দান এবং রোহিলখণ্ডের অধিকাংশ অযোধ্যার সহিত সংযুক্তকরণ সমর্থনযোগ্য। ইহা ভিন্ন, কোম্পানির সেই সময়কার আর্থিক দুরবস্থায় চল্লিশ লক্ষ টাকা অযোধ্যার নবাব হইতে গ্রহণ করা সমসাময়িক নৈতিকতার বিচারে মোটেই দূষণীয় নহে।

ফরেস্ট ও স্ট্রেচির সমর্থন

রোহিলাদের উপর অত্যাচারের সমর্থনে পেণ্ডেরেল মুন বলেন যে, অত্যাচার যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তেমন সমালোচনার যোগ্য নহে। আর অযোধ্যার নবাব যে-রাজ্যাংশ তাঁহার নিজের রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিতে মনস্থির করিয়াছিলেন সেই স্থানে এমন অত্যাচার নিশ্চয়ই তিনি করিতে প্রস্তুত ছিলেন না যাহাতে তাঁহার নিজেরই ক্ষতি হইতে পারে। বলা বাহুল্য, পেণ্ডেরেল মুনের যুক্তি অপেক্ষা অযৌক্তিক কিছু কল্পনা করা যায় না।

পেণ্ডেরেল মুনের অযৌক্তিক যুক্তি

একথাও রোহিলা যুদ্ধের পক্ষে বলা হইয়া থাকে যে, ইহার পর মারাঠাগণ আর সেই অঞ্চলে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক বিচারে ঠিক বলা চলে না। কারণ মারাঠাগণ আর আক্রমণ না করিবার কারণ ছিল পাঞ্জাবে শিখদের অভ্যুত্থান। সুতরাং ওয়ারেন হেস্টিংসের রোহিলা নীতি অযোধ্যার শান্তি আনয়ন করিয়াছিল একথা তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভ্রান্ত বিশ্লেষণ সন্দেহ নাই। বস্তুত ওয়ারেন হেস্টিংস্ সীমান্ত নীতিকে অযোধ্যার নবাবের কোম্পানির প্রতি আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল রাখিয়া ইহাকে দুর্বল ও বিপজ্জনক করিয়া তুলিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে অযোধ্যার নবাবের কোম্পানির প্রভাবমুক্ত হইবার চেষ্টায় ইহার সত্যতা পরিলক্ষিত হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংসের রোহিলা নীতির ত্রুটি

সার আলফ্রেড্ লায়েলের মতে, "the expedition against the Robillas was wrong in principle, for they had not provoked us and Vezir could only be relied upon to abuse his advantages."

সার আলফ্রেড্ লায়েলের মত

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, ওয়ারেন হেস্টিংসের রোহিলা নীতি কোম্পানির জন্য অর্থ সংগ্রহের আগ্রহ এবং সেইজন্য যে-কোন সৎ বা অসৎ পন্থা অনুসরণের মানসিকতা, রোহিলাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তিনি ব্রিটিশ সৈন্যকে ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া মানবিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক, বিচারে নিজের এবং ব্রিটিশ সরকারের নাম কলঙ্কিত করিয়াছেন।

উপসংহার

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপ (Parliamentary Interference in the Indian Affairs of the E. I. Co.) :

রেগুলেটিং এ্যাক্ট্, ১৭৭৩ (Regulating Act, 1773) : ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির গঠনতন্ত্র ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত চার্টার (Charter)-এর উপর নির্ভরশীল ছিল। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দান করাই ছিল চার্টার-এর উদ্দেশ্য। কিন্তু ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর কোম্পানি ক্রমে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইলে স্বভাবতই পূর্বেকার চার্টার-এর উপর ভিত্তি করিয়া কোম্পানির কার্যাদি পরিচালনার অসুবিধা দেখা দিল। ঠিক সেই সময়ে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠায় কোম্পানি প্রথমে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ড-এর নিকট ঋণের জন্য আবেদন করিল। কিন্তু ব্যাঙ্ক কোম্পানিকে ঋণ দিতে রাজী না হওয়ায় কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের নিকট দশ লক্ষ পাউণ্ড ঋণের জন্য আবেদন করিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এই ঋণ দিবার পূর্বে কোম্পানির পরিস্থিতি কি তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিল। এই কমিটি তদন্ত করিতে গিয়া যে-সকল দুর্নীতির প্রমাণ পাইল তাহা যেমন ছিল বিস্ময়কর তেমন লজ্জাজনক। ১৭৫৭ হইতে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোম্পানির কর্মচারিগণ এক বিশাল পরিমাণ অর্থ উপঢৌকন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, আরও নানাবিধ দুর্নীতির প্রমাণ পাইবার ফলে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির গঠনতন্ত্র পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে বিবেচনা করিয়া এবং কোম্পানির কর্মচারিবর্গের অন্যায় আচরণ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ (Regulating Act) নামে একটি আইন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইল। এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবসানের সূচনা করিয়াছিল।*

রেগুলেটিং এ্যাক্ট্-এর প্রয়োজনীয়তা

* "This (Regulating) Act marked the beginning of the decline of the Company as a trading power." Michael Edwards, *British India*, p. 23.

কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ ডাইরেক্টর সভা (Board of Directors) এবং শেয়ার-হোল্ডারদের সভার (Court of Proprietors) গঠনতন্ত্রের সংস্কার সাধন করা হইল। পূর্বেকার পাঁচশত পাউণ্ডের শেয়ারহোল্ডারদের ভোটদানের ক্ষমতা নাকচ করিয়া অন্তত এক হাজার পাউণ্ডের শেয়ারহোল্ডারগণকে একটি করিয়া ভোট দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। তিন, ছয় ও দশ হাজার পাউণ্ডের শেয়ারহোল্ডারগণকে যথাক্রমে দুই, তিন ও চারিটি ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হইল। এইভাবে কোম্পানিতে যাহার অর্থ জড়িত আছে তাহাকে অধিক ক্ষমতাদানের নীতি স্বীকৃত হইল। ইহা ভিন্ন, ডাইরেক্টর সভাকে শেয়ারহোল্ডারগণের সভা হইতে কতকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইল। ২৪ জন ডাইরেক্টরের মধ্যে ছয়জন প্রতি বৎসর পদত্যাগ করিবেন এবং সেই স্থলে নূতন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। ভবিষ্যতে গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলের সদস্যগণ কোম্পানির ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, কিন্তু সেক্ষেত্রেও ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন হইবে। ডাইরেক্টর সভা কোম্পানির শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এবং প্রতি ছয় মাস অন্তর কোম্পানির হিসাব ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করিতে বাধ্য থাকিবেন। একটি পৃথক আইন পাস করিয়া কোম্পানিকে অর্থ ঋণ দিবার ব্যবস্থা করা হইল।

কোম্পানির গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন

বাংলাদেশের গবর্ণরকে 'গবর্ণর-জেনারেল' আখ্যা দেওয়া হইল এবং ওয়ারেন হেস্টিংস্‌কে বাংলার প্রথম গবর্ণর-জেনারেল নিয়োগ করা হইল। বোম্বাই ও মাদ্রাজের উপরও তাঁহার কর্তৃত্ব দেওয়া হইল। শাসনকার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য চারিজন সদস্যের একটি কাউন্সিল নিযুক্ত করা হইল। কাউন্সিলের সদস্যগণের প্রত্যেককেই সমান অধিকার দেওয়া হইল এবং অধিকাংশের ভোটে সকল বিষয়ের মীমাংসা করা হইবে, এই নীতি গৃহীত হইল। একমাত্র দুই দিকেই সমান সংখ্যক ভোট হইলে গবর্ণর-জেনারেল তাঁহার নিজ মতের প্রাধান্য দিতে পারিতেন। রেগুলেটিং অ্যাক্ট্ অনুযায়ী গঠিত কাউন্সিলের প্রথম চারিজন সদস্যের নাম উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই চারিজন সদস্য ছিলেন ক্ল্যাভারিং (Clavering), মন্‌সন্ (Monson), বারওয়েল (Barwell) ও ফিলিপ ফ্রান্সিস্ (Philip Francis)। এই কাউন্সিল পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু একমাত্র ডাইরেক্টর সভার সুপারিশক্রমে পাঁচ বৎসরের পূর্বেই প্রয়োজনবোধে উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপর গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলকে যুদ্ধ-ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনাদি ব্যাপারে পরিদর্শনের ক্ষমতা দেওয়া হইল।

গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিল নিয়োগ

একজন প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) ও অপর তিনজন সাধারণ বিচারপতি লইয়া ফোর্ট উইলিয়ামে সুপ্রীম কোর্ট নামে একটি বিচারালয় স্থাপিত হইল। এই বিচারালয়কে গবর্ণর ও কাউন্সিল হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখা হইল। গভর্ণর-জেনারেল, কাউন্সিলের সদস্য ও বিচারপতিগণের জন্য উপযুক্ত বেতন ধার্য করা হইল এবং তাঁহাদের পক্ষে কোনপ্রকার পারিতোষিক গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন

রেগ্‌লেটিং এ্যাক্ট-এর প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, (১) ইহা গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিল-এর ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করিয়া দেয় নাই। (২) ইহা ভিন্ন, গভর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিল মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কাউন্সিলের উপর কি প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন তাহাও ইহাতে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। ফলে, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কাউন্সিল কলিকাতার কাউন্সিল ও গবর্ণর-জেনারেল-এর মতামত না লইয়া স্বাধীনভাবে চলিতে দ্বিধাবোধ করিত না। বোম্বাই সরকারের রাঘোবাকে সাহায্য দান এবং দ্বিতীয় মহীশূরের যুদ্ধকালে মাদ্রাজ সরকারের নিজাম ও হায়দর আলির সহিত যুদ্ধ ও সন্ধির বিষয়ে স্বাধীনভাবে চলার দৃষ্টান্ত হইতেই রেগ্‌লেটিং এ্যাক্ট-এর ত্রুটি উপলব্ধি করিতে পারা যায়। (৩) সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা এবং গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলের সহিত সুপ্রীম কোর্টের সম্পর্কও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা না করিবার ফলে অল্পকালের মধ্যেই সুপ্রীম কোর্ট ও কাউন্সিলের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। (৪) সুপ্রীম কোর্টের বিচার-ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত ছিল না বলিয়া জমিদারগণের বিরুদ্ধে যে-কোন ব্যক্তির অভিযোগও সুপ্রীম কোর্ট শুনিতে আরম্ভ করিল। দেশীয় দেওয়ানী বিচারালয়ের বিচার-ক্ষমতায়ও সুপ্রীম কোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল। পাটনা মামলা, ঢাকা মামলা, কাশিজোড়া মামলা প্রভৃতি কয়েকটি মামলায় সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক দেশীয় বিচারালয়-গুলির বিচার-ক্ষমতা উপেক্ষা করিয়া নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। (৫) রেগ্‌লেটিং এ্যাক্ট গবর্ণর-জেনারেলকে নিজ কাউন্সিলের মতামতের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা না দিয়া শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়াছিল। সুতরাং উহা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গঠনতন্ত্র ও কার্যপদ্ধতির উন্নতি সাধন করিতে গিয়া আরও নানাপ্রকার জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। (৬) সর্বশেষে, একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ভারতবর্ষে অধিকৃত অঞ্চলসমূহের উপর সার্বভৌমত্বের (sovereignty) অধিকারী কোম্পানি অথবা ব্রিটিশ সরকার, সেই সম্পর্কে কিছুকাল পূর্ব হইতে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল উহারও মীমাংসা রেগ্‌লেটিং এ্যাক্ট-এ করা হয় নাই।

রেগ্‌লেটিং এ্যাক্ট-এর ত্রুটি : সমালোচনা

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট (Charter Act of 1781) : রেগ্‌লেটিং এ্যাক্ট কোম্পানির শাসনব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় নাই, উপরন্তু উহাতে কতকগুলি ত্রুটি ছিল বলিয়া নূতন নূতন অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতিমধ্যে কলিকাতা কাউন্সিলের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে কোম্পানির ভারতে অধিকৃত রাজ্যের নিরাপত্তা ও শাসন-সম্পর্কে সেখানে এক দারুণ সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইল। কোম্পানির স্বার্থের সহিত ইংরাজ জনসাধারণের অনেকেরই ভাগ্য জড়িত ছিল। এই কারণে লর্ড নর্থ কোম্পানির শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করিলেন। বার্ক ও ফক্স (Burke & Fox)-এর বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার এ্যাক্ট পাস করা ভিন্ন অধিক কিছু সেই সময়ে করা সম্ভব হইল না। এই আইন দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট এবং গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের ক্ষমতা সুস্পষ্ট-ভাবে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল।

রেগ্‌লেটিং এ্যাক্ট-এর ত্রুটিগুলির যৎসামান্য পরিবর্তন

পিট্-এর ভারত আইন, ১৭৮৪ (Pitt's India Act, 1784) : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দলাদলি চরমে পেঁছিয়াছিল। স্বভাবতই ভারতে উদীয়মান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই সকল রাজনৈতিক দলের বাক্‌বিতণ্ডার অতি সুন্দর বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। পার্লামেণ্টের বিরোধী দলের এক প্রস্তাব অনুযায়ী 'সিলেক্ট কমিটি' (Select Committee) নামে একটি সমিতি গঠন করা হইল। উহার কর্তব্য ছিল ভারতীয় শাসনব্যবস্থার উন্নতিকল্পে এমন সুপারিশ করা যাহাতে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় ও ইংরাজ উভয় জাতির পক্ষেই মঙ্গলজনক হইতে পারে। ইহা ভিন্ন, ভারতের বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার ভারও এই কমিটির উপর ছিল। এই কমিটির রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া বাংলাদেশের বিচার-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটি আইন-পাস করা হইয়াছিল।

রাজনৈতিক দলগুলির ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন-সম্পর্কে ঔৎসুক্য

বিচার-ব্যবস্থার উন্নয়ন

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ডাণ্ডাস্ (Dundas)-এর প্রস্তাবক্রমে সার এলিজা ইম্পে'কে ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। অপর প্রস্তাব দ্বারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুসংহত করা স্থির হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই ডাণ্ডাস্ তাঁহার ইণ্ডিয়া বিল পার্লামেণ্টে উপস্থিত করিলে পিট্-এর বিরোধিতায় তাহা অগ্রসর হইতে পারিল না। ইহার পর ফক্স্ তাঁহার ইণ্ডিয়া বিল উপস্থিত করিলেন। এই বিলে শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ভারতীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ইংলণ্ডে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার প্রস্তাব করা হইল। বিলটি কমন্স সভায় গৃহীত হইলেও লর্ড সভা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল। ফক্স্-এর মন্ত্রিসভা পতনের পর পিট্ প্রধানমন্ত্রী হইলেন। তিনি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিখ্যাত ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট্ (Pitt's India Act) পাস করিলেন।

ডাণ্ডাস্-এর প্রস্তাব

ফক্স্-এর ইণ্ডিয়া বিল পরিত্যক্ত

এই আইনের শর্তানুযায়ী ইংলণ্ডে 'বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল' নামে একটি সভা স্থাপিত হইল। এই সভা ব্রিটিশ অর্থসচিব, একজন সেক্রেটারী অব্ স্টেট্ ও রাজা কর্তৃক মনোনীত প্রিভিকাউন্সিলের চারিজন সদস্য লইয়া গঠিত হইল। ইহা ভিন্ন, কোম্পানির তিনজন ডাইরেক্টর লইয়া একটি 'সিক্রেট্ কমিটি' (Secret Committee) গঠিত হইল। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের যাবতীয় আদেশ-নির্দেশ বা মতামত এই সিক্রেট্ কমিটি মারফত ভারতবর্ষে কোম্পানির প্রতিনিধিবর্গের নিকট প্রেরণ করা স্থির হইল। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল সামরিক ও বে-সামরিক উভয় প্রকার বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল এবং 'সিক্রেট্ কমিটি' এই দুই সভার যুগ্ম মতামত বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আর কাহারও ক্ষমতা থাকিবে না স্থির হইল। ভারতের গবর্ণর-জেনারেল প্রধান সেনাপতি এবং অপর দুইজন সদস্য লইয়া গঠিত মোট তিনজনের একটি কাউন্সিলের সাহায্য লইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন স্থির হইল। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী দুইটিকে যুদ্ধ, শান্তি, দেশীয় রাজ্য গুলির সহিত যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার

কাউন্সিলের অধীনে স্থাপন করা হইল। রেগ্‌লেটিং এ্যাক্ট্-এর ত্রুটির অভিজ্ঞতা হইতে এইবার গবর্ণর-জেনারেলকে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কাউন্সিলের মতামত অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। পিট্-এর ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট্-এর আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। কোম্পানির কর্মচারিগণ ভারতবর্ষে চাকরি-জীবন শেষ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার কালে কি পরিমাণ অর্থ লইয়া গেলেন তাহার হিসাব দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। ভারতে চাকরি করিবার কালে কৃত অপরাধের জন্য ইংরাজ কর্মচারিগণের বিচার করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে একটি ট্রাইবুন্যাল (Tribunal) স্থাপনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। অবশ্য এই শর্তটি কোনদিনই কার্যকরী করা হয় নাই। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার করা ইংরাজ জাতির মর্যাদা নীতির বহির্ভূত বলিয়াও এই আইনে ঘোষণা করা হইয়াছিল। অবশ্য এই নীতি ও মর্যাদাবোধ ভারতে আগত ইংরাজদের ছিল না, বলা বাহুল্য। ফলে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দিন-দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

পিট্-এর ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট্-এর শর্তাদি

কোম্পানির ইংরাজ কর্মচারিগণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা

(১) পিট্-এর ভারত আইন ফক্স্ প্রস্তাবিত আইন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিল বলা যায় না। ফক্স্ চাহিয়াছিলেন ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া ব্রিটিশ সরকারের হস্তে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব ন্যস্ত করা। ইহা কার্যকরী হইলে পরবর্তী কালে ভারতে কোম্পানির কর্মচারিগণের অন্যায়-অবিচার অনেকটা হ্রাস পাইত, বলা বাহুল্য। পিট্-এর আইন কোম্পানির ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিল বটে, কিন্তু বোর্ড অব্ কন্ট্রোল যাহাতে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি জানিতে পারে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা তাহাতে ছিল না। (২) বোর্ড অব্ কন্ট্রোল এবং ডাইরেক্টর সভার মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়া এই আইন কোম্পানি পরিচালনার দায়িত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিল। সিক্রেট্ কমিটির পশ্চাতে থাকিয়া বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের কাজ করিবার যে নীতি এই আইনের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা শাসনকার্যের দায়িত্ববোধ-বৃদ্ধির সহায়ক ছিল না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ভারতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে ডাইরেক্টর সভার স্বার্থ জড়িত ছিল, কারণ উহার সভ্যগণ ভারতবর্ষ হইতে অর্থলাভের আশা করিতেন, কিন্তু বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সেইরূপ কোন স্বার্থ ছিল না। (৩) পিট্-এর ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট্ প্রধানত ডাইরেক্টর সভার এবং সমসাময়িক কালের জনমতের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হিসাবে বিবেচ্য। ফলে, ইহাতে মধ্য-পন্থা অনুসরণের আগ্রহ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বোর্ড অব্ কন্ট্রোল যেমন ডাইরেক্টর সভার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল, তেমনি উহাকে স্বাধীনভাবে নীতি প্রবর্তন বা কাজ করিবার কোন ক্ষমতা না দিয়া ডাইরেক্টর সভারও ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টা করা হইয়াছিল। (৪) কোম্পানি কর্তৃক ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতির বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছিল। এই সকল কারণে পিট্-এর ভারত-আইন জটিলতা ও অসংহতিপূর্ণ ছিল একথা অনস্বীকার্য।

সমালোচনা

ওয়ারেন হেস্টিংসের ইম্পীচ্‌মেণ্ট (Impeachment of Warren Hastings): হেস্টিংসের কার্যকালের শেষ দিকে ইংলণ্ডে তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ডাণ্ডাস্ (Lord Melville Dundas) ওয়ারেন হেস্টিংস্, সার এলিজা ইম্পে, লরেন্স সুলিভান প্রভৃতি ইংরাজ কর্মচারিগণকে ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শেষ পর্যন্ত হেস্টিংস্ এবং অপরাপর কয়েকজনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব বাতিল করা হইলেও সার এলিজা ইম্পেকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। ইহার অল্পকাল পরেই পিট্ প্রধানমন্ত্রী হইলেন। তিনি হেস্টিংসের কার্যনীতির সমর্থন করিলেন না।

ইংলণ্ডে হেস্টিংস্-বিরোধী মনোভাব

ইতিমধ্যে *Letters of Junius* বা জুনিয়াসের পত্রাবলী শিরোনামায় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়া কতকগুলি পত্র বাহির হইয়াছিল। এই সকল পত্রের লেখক কে ছিলেন, সে-বিষয়ে কোন কিছুই সঠিকভাবে বলা সম্ভব হয় নাই। তবে ফিলিপ ফ্রান্সিসের রচনা-ভঙ্গীর সহিত জুনিয়াসের পত্রাবলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল বলিয়া তিনি এগুলির রচয়িতা ছিলেন, এই ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত আছে।

জুনিয়াসের পত্রাবলী (Letters of Junius)

এইভাবে হেস্টিংস্-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস্ পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন। পরবর্তী তিন বৎসর ধরিয়া প্রধানত পিট্ এবং ডাণ্ডাসের চেষ্টায়-ই ওয়ারেন হেস্টিংস্‌কে ইম্পীচ্ করা হইল। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া লর্ড সভা কর্তৃক কমন্স সভার অভিযোগে হেস্টিংসের বিচার চলিল। রোহিলা যুদ্ধ প্রথমে অভিযোগের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই অভিযোগ পরিত্যক্ত হইল। প্রধানত, বাণারসের রাজা চৈৎ সিংহ এবং অযোধ্যার বেগমদের প্রতি অসদাচরণ ও অত্যাচারের অভিযোগেই হেস্টিংস্ অভিযুক্ত হইলেন। পার্লামেণ্টের হুইগদল নিজেদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য এই বিচারকে সেই সময়কার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় পরিণত করিলেন। ইংলণ্ডের ডেমোস্থিনিস অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বার্ক কমন্স সভার পক্ষে হেস্টিংস্‌কে অত্যাচার ও অসদাচরণের অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া মানবতা, ইংরাজ জাতি, ভারতবাসী—সকলের নামে হেস্টিংস্‌কে 'মানবজাতির শত্রু' বলিয়া অভিযুক্ত করিলেন।* দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া বিচারের পর হেস্টিংস্ অভিযোগ হইতে মুক্তি

হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

* "Therefore, hath it with all confidence been ordered, by the Commons of Great Britain, that I impeach Warren Hastings of high crimes and misdemeanours I impeach him in the name of the Commons' House of Parliament whose trus he has betrayed. I impeach him in name of English nation, whose ancient honour he has sullied, I impeach him in the name of the people of India, whose right he has trodden under foot, and whose country he has turned into a desert. Lastly, I impeach him in the name of human nature itself, in the name of both sexes, in the name of every age, in the name of every rank. I impeach the common enemy and oppressor of all." (*Burke*) Lord Macaulay : ***The Impeachment of Warren Hastings***

পাইলেন, কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যয়সংকুলান করিতে গিয়া তিনি সর্বস্বান্ত হইলেন। ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত ভাতাও পিট্ এবং ডান্ডাসের আপত্তিতে তাঁহাকে দেওয়া সম্ভব হইল না। তাই দুঃখ করিয়া হেস্টিংস্ বলিয়াছিলেন: *"I gave you all and you have rewarded me with confiscation, disgrace and a life of impeachment."*

বস্তুত, ইংরাজ স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে হেস্টিংসের ইম্পীচ্‌মেণ্ট ব্রিটিশ জাতির অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন ভিন্ন অপর কিছুই যে ছিল না তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বাংলাদেশে ইংরাজ শাসন যখন ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল, অর্থাভাবহেতু যখন ভারতে ইংরাজ প্রভুত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছিল, সেই সময়ে হেস্টিংস্-ই কোম্পানির শাসনে দৃঢ়তা ও সচ্ছলতা আনিয়াছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থাপয়িতা ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস্, সে-বিষয়ে দ্বিমত নাই। তাঁহাকে ইম্পীচ্ করা ইংরাজ জাতির অকৃতজ্ঞতার পরিচয় বটে। কিন্তু মানবতা ও শাসনকার্যে সততার দিক হইতে বিচার করিলে তাঁহাকে ইম্পীচ্ করিয়া ইংরাজ জাতির নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাকে ইম্পীচ্ করিয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ন্যায় এবং সততার সূচনা করা হইয়াছিল। শাসনকার্যে দায়িত্বজ্ঞান-বৃদ্ধি, শাসিতের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাবোধ ওয়ারেন হেস্টিংসের ইম্পীচ্‌মেণ্টের ফলে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ইহা স্বীকার্য। (ক্লাইভ এবং সার্ এলিজা ইম্পেকেও অসদাচরণের অভিযোগে ইম্পীচ্ করা হইয়াছিল।)

হেস্টিংসের ইম্পীচ্‌মেণ্টের সমালোচনা

ওয়ারেন হেস্টিংসের কৃতিত্ব-বিচার (Critical Estimate of Warren Hastings): ভারতের ইংরাজ শাসকবর্গের মধ্যে হেস্টিংসের কার্যনীতি ও কার্য-কলাপ সম্পর্কে যেরূপ পরস্পর-বিরোধী মতামত ব্যক্ত হইয়াছে, সেইরূপ অপর কাহারও ক্ষেত্রে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু হেস্টিংসের কৃতিত্বের সমালোচনায় সর্বপ্রথমেই তাঁহার গবর্ণর-পদ গ্রহণ কালে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত-সংক্রান্ত অব্যবস্থার কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন, রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ পাস হওয়ার পর কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরোধিতার কথাও স্মরণ রাখা উচিত হইবে।

হেস্টিংস্-সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী মতামত

হেস্টিংস্ যখন বাংলার গবর্ণর হইয়া আসিলেন তখন ক্লাইভ-প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসনের ত্রুটি সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। কোম্পানির ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি চরমে পৌঁছিয়াছিল। কোম্পানির কোষাগার তখন প্রায় শূন্য। তদুপরি মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে পুনঃপুনঃ অর্থ সাহায্যের জন্য তাগিদ আসিতেছিল। আবার ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের মন্বন্তরের ফলে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থাও চরমে পৌঁছিয়াছিল। দেশের কৃষি প্রভৃতি সকল প্রকার উৎপাদনমূলক কার্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিচার তখন কেবলমাত্র নামেই পর্যবসিত হইয়াছিল, নিয়মিত রাজস্ব আদায় করাও সম্ভব ছিল না। রাস্তাঘাটও তখন দস্যু-তস্করের উপদ্রবহেতু নিরাপদ ছিল না। পররাষ্ট্রীয় বা সীমান্ত-সমস্যারও তখন অভাব ছিল না। সম্রাট শাহ্ আলম্-

হেস্টিংসের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় সমস্যা

তখন মারাঠাদের হস্তের ক্রীড়নকে পরিণত, মারাঠাগণ তখন কোম্পানির অধিকৃত রাজ্যে হানা দিতে উদ্যত। অযোধ্যা রাজ্যের নিরাপত্তার অভাবহেতু কোম্পানির রাজ্যের নিরাপত্তাও তখন প্রতি মুহূর্তে ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা ছিল।

এইরূপ অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় সমস্যা-সংকুল শাসনভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা যে-কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব হইত না। কিন্তু এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কোম্পানির শাসনে সংহতি আনিবার এবং সম্মুখীন সমস্যাগুলির সমাধানের ক্ষমতা ওয়ারেন হেস্টিংসের ছিল। তিনি ইংরাজ-অধিকৃত রাজ্য ও শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে প্রথম হইতেই দৃঢ়সংকল্পভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। (১) প্রারম্ভেই তিনি ডাইরেক্টর সভার নির্দেশ অনুযায়ী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব-আদায়-সংক্রান্ত কার্যাদি কোম্পানির হস্তে গ্রহণ করিয়া ক্লাইভ-প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসনের (Dual Government) অবসান ঘটাইলেন। রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্যাদির তদারকের ভার তিনি 'বোর্ড অব্ রেভিনিউ' (Board of Revenue) নামে একটি সভার উপর স্থাপন করিলেন এবং রেজা খাঁ ও সীতাব রায়কে দেওয়ানী কাজ হইতে সরাইয়া দিলেন। পাঁচ বৎসরের মেয়াদে জমিদারগণের সহিত জমিদারির বন্দোবস্ত করা হইল এবং প্রত্যেক জেলায় পূর্বেকার 'সুপারভাইজর' (Supervisor)-এর স্থলে একজন করিয়া 'কালেক্টর' (Collector) নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করা হইল। (২) রাজস্ব-সংক্রান্ত বিচারকার্যও দেওয়ানের উপর ছিল। সুতরাং রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হস্তে গ্রহণের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই দেওয়ানী বিচারের ব্যবস্থারও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা দরকার হইল। হেস্টিংস্ প্রতি জেলায় একটি করিয়া মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত স্থাপন করিলেন। ফৌজদারি বিচারকার্যাদি নবাবের অধীনে ছিল বটে, তথাপি ইংরাজ কোম্পানির প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদারি বিচারেও ইংরাজগণ হস্তক্ষেপ করিত। হেস্টিংস্ প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া মফঃস্বল ফৌজদারি আদালত স্থাপন করিলেন। দেওয়ানী বিচারের আপীলের জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত এবং ফৌজদারি বিচারের আপীলের জন্য মুর্শিদাবাদে সদর নিজামত আদালত স্থাপিত হইল। এইভাবে ওয়ারেন হেস্টিংস্ ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। হেস্টিংস্-ই সর্বপ্রথম উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা-মোকদ্দমা হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্রানুসারে বিচারের নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, মহাজন কর্তৃক খাতকের উপর অত্যাচার, নির্দিষ্ট হার অপেক্ষা অধিক সুদ গ্রহণ, বিচারপ্রার্থীদের নিকট হইতে কাজী ও মুফ্তিদের পারিশ্রমিক গ্রহণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, কাজী ও মুফ্তিগণকে বেতন দিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। হেস্টিংস্ মুদ্রানীতির সংস্কার সাধন করিয়া সমসাময়িক কালের মুদ্রানীতির অব্যবস্থা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহার কার্যাদি: (১) রাজস্ব-আদায়-সংক্রান্ত

(২) বিচার-ব্যবস্থা-সংক্রান্ত

অপরাপর সংস্কার

তিব্বত এবং তিব্বতের মধ্য দিয়া নেপাল অঞ্চলের সহিত কোম্পানির বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস্ জর্জ বোগ্‌ল (George Bogle)-কে তাশি লামা (Tashi Lama)-র রাজসভায় দূত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তিব্বত ও নেপালে দূত প্রেরণ

পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হেস্টিংসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি অযোধ্যার নবাবকে কোম্পানির অনুগত মিত্রে পরিণত করিলেন। এ-দিক দিয়া দেখিতে গেলে অধীনতামূলক মিত্রতার (Subsidiary Alliance) নীতি হেস্টিংস্-ই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে লর্ড ওয়েলেস্‌লী এই নীতিই ব্যাপকভাবে কার্যকরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। শাহ্ আলম্ মারাঠাদের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিলেন, এই কারণে হেস্টিংস্ তাঁহার বাৎসরিক প্রাপ্য ২৬ লক্ষ টাকা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তদুপরি কারা ও এলাহাবাদ তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যার নবাবের নিকট পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছিলেন। অযোধ্যা রাজ্যের শক্তি ও নিরাপত্তার মধ্যেই ইংরাজ অধিকৃত রাজ্যের নিরাপত্তা নিহিত, এই কথা উপলব্ধি করিয়া হেস্টিংস্ অযোধ্যার নবাবকে রোহিলখণ্ড জয় করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশ্য এই সাহায্যদানের বিনিময়ে তিনি অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে ৪০ লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছিলেন।

পররাষ্ট্র-নীতি

ওয়ারেন হেস্টিংসের পররাষ্ট্র-নীতির মূল সূত্র ছিল অযোধ্যার নবাবকে অনুগত মিত্র হিসাবে বিবেচনা করা এবং অযোধ্যাকে সীমান্তবর্তী প্রতিরক্ষী রাজ্য (buffer state) হিসাবে ব্যবহার করা। কিন্তু অযোধ্যার উপর এইরূপ নির্ভরশীলতা কেবলমাত্র যে ভ্রান্ত নীতি-প্রসূত ছিল তাহাই নহে, ইহা বিপজ্জনকও ছিল। পরবর্তী কালে অযোধ্যার নবাবের কোম্পানির প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টার মধ্যেই ওয়ারেন হেস্টিংসের অযোধ্যা-নীতির ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ওয়ারেন হেস্টিংসের রোহিলা-নীতি অর্থাৎ রোহিলা যুদ্ধে অযোধ্যাকে সাহায্য করিয়া রোহিলখণ্ডের অধিকাংশ অযোধ্যার সহিত সংযুক্ত হইবার নীতির মধ্যে পরবর্তীকালে মারাঠাদের আক্রমণ বন্ধ হইবার কারণ দেখিতে পান। কিন্তু মারাঠা আক্রমণ বন্ধ হইবার কারণ ছিল অন্যত্র। পাঞ্জাবে শিখদের শক্তি-সঞ্চয় মারাঠাদের অযোধ্যা অভিমুখে অভিযান বন্ধ করিয়াছিল।

সমালোচনা

বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকার সেই সময়ে মারাঠা ও হায়দর আলির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলে হেস্টিংসের চেষ্টায় প্রথম মারাঠা যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ ইংরাজদের অনুকূলেই সমাপ্ত হইয়াছিল। এই দুই প্রেসিডেন্সীকে সাময়িক অর্থ সাহায্য দান করিয়া হেস্টিংস্ সেই সকল অঞ্চলে ইংরাজ-স্বার্থ রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইঙ্গ-মারাঠা ও ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

কোম্পানির আর্থিক অনটন দূর করিবার উদ্দেশ্যে হেস্টিংস্ অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। বারাণসীর রাজা চৈৎ সিংহের ও অযোধ্যার বেগমদের পীড়ন করিয়া অর্থ-সংগ্রহেও তিনি সংকোচ বোধ করেন নাই। এই দুই অভিযোগেই তাঁহাকে পরে ইম্পীচ্ করা হইয়াছিল।

কোম্পানির অর্থাভাব দূরীকরণ

ভারতে হেস্টিংসের কার্যাবলী আমাদিগকে দুইটি দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে হইবে। তদানীন্তন ইংরাজ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থলোলুপতা, কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় সমস্যার সব কিছুর কথা স্মরণ রাখিলে হেস্টিংস্ ইংরাজ জাতির স্বার্থ কি পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা উপলব্ধি করা সহজ হইবে। কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপন, বৈদেশিক সম্পর্ক কোম্পানির স্বার্থের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ, কোম্পানির অর্থাভাব দূরীকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার যথাযথ সমাধান করিয়া হেস্টিংস্ ইংরাজ জাতিকে ভারতের সাম্রাজ্য ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ইম্পীচ্মেণ্টের পর তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন : 'I gave you all and you have rewarded me with confiscation, disgrace and a life of impeachment'—এই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নাই। ব্রিটিশ স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতবর্ষে হেস্টিংসের আচরণ সমর্থনযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবাসীদের স্বার্থ; মর্যাদা, ন্যায়, সততা ও মানবতার দৃষ্টিতে হেস্টিংসের কার্যকলাপের অনেক কিছুই নিন্দনীয় ছিল, সন্দেহ নাই। তাঁহার অত্যাচারী শাসনের কথা তাঁহার ইম্পীচ্মেণ্টের সময়ে বিখ্যাত বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক (Edmund Burke) ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের তথা ইংরাজ জাতির সমক্ষে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

সমালোচনা

তথাপি তাঁহার প্রকৃত গুণাবলীর প্রশংসা না করা অনুচিত হইবে। ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থার গোড়াপত্তন, কোম্পানির শাসনে শৃঙ্খলা আনয়ন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার সাধন—সর্বোপরি কোম্পানির রাজস্বকে আসন্ন পতনের সম্ভাবনা হইতে সংরক্ষণ করিয়া হেস্টিংস্ অনন্যসাধারণ দক্ষতা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

তাঁহার অবদান

সর্বশেষে তাঁহার সাহিত্যানুরাগের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বাংলা ও ফারসী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহ দান করিতেন। কলিকাতা মাদ্রাসা ও 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি' (Royal Asiatic Society) তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে বহুমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ কার্যক্ষমতার দ্বারা হেস্টিংস্ ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থাকে যেমন দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন, তেমনি ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগের ইতিহাসে নিজ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

সাহিত্যানুরাগ

মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুত্থান : মহীশূর রাজ্যের উত্থান
(The Maratha Revival : Rise of Mysore)

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুত্থান (Revival of the Maratha Power after the Third Battle of Panipath) : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া পূর্ব হইতেই পীড়িত বালাজী বাজীরাও-এর মৃত্যু হইল (১৭৬১)। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিল। বালাজী বাজীরাও-এর সপ্তদশবর্ষীয় তরুণ পুত্র মাধব রাও-এর আমলে শক্তি যে দ্রুত পুনঃ-সঞ্জীবিত হইতে পারিবে সেই আশা তখন কেহ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, প্রথমে মাধব রাও পিতৃব্য রঘুনাথ রাও-এর অভিভাবকত্বাধীনে রহিলেন। রঘুনাথ রাও ইতিহাসে রাঘোবা নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা শক্তি একেবারে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া হায়দরাবাদের নিজাম আলি মারাঠা রাজ্য আক্রমণ করিলেন, কিন্তু শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইলেন (১৭৬২)। অতি সহজ শর্তেই নিজাম আলি মারাঠাদের সহিত সন্ধি স্থাপনে সক্ষম হইলেন। ইতিমধ্যে রঘুনাথ রাও ও মাধব রাও-এর মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হইলে পুনরায় হায়দরাবাদের সৈন্য মারাঠা রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাক্ষসভুবন-এর যুদ্ধে পরাজিত হইল। এইবারও অতি সহজ শর্তেই সন্ধি স্থাপন করা হইল। হায়দরাবাদের প্রতি এইরূপ উদারতা প্রদর্শনের পশ্চাতে রাঘোবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে মাধব রাও-এর সহিত দ্বন্দ্বে হায়দরাবাদের নিজামের সাহায্য গ্রহণ করা।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তির দুর্বলতা : নিজাম কর্তৃক মারাঠা রাজ্য আক্রমণ

ইহার অল্পকালের মধ্যেই হায়দর আলির ক্রমবর্ধমান শক্তিতে আশঙ্কিত হইয়া পেশওয়া মাধব রাও মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া (১৭৬৪-৬৫) হায়দর আলিকে পরাজিত করিলেন। রঘুনাথ রাও-এর ন্যায় হায়দর আলিও নিজামের ন্যায় অতি সহজ শর্তেই পেশওয়ার সহিত সন্ধিবদ্ধ হইতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর বৎসরই পুনরায় মারাঠা ও হায়দর আলির মধ্যে যুদ্ধের সৃষ্টি হইল (১৭৬৬-৬৭)। এইবারও হায়দর আলি পরাজিত হইলেন।

হায়দর আলির সহিত মারাঠাদের সংঘর্ষ

মাধব রাও ছিলেন অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহার সামরিক দূরদর্শিতা, মারাঠাদের শক্তি পুনর্গঠনের আকাঙ্ক্ষা এবং সেইজন্য অক্লান্ত চেষ্টা এবং সর্বোপরি তাঁহার চরিত্রের গুণাবলী তাঁহাকে মারাঠা জাতির স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও আনুগত্যলাভে সাহায্য করিয়াছিল। বেরার-এর জানোজী ভোঁসলে মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের (Maratha Confederacy) শত্রু নিজাম ও হায়দর আলির সহিত যোগদান করিবার চেষ্টা করিলে মাধব রাও তাঁহাকে আনুগত্যাধীনে আনিতে সক্ষম হইলেন। তারপর মাধব রাও দক্ষিণ ও উত্তর-ভারতে মারাঠা শক্তিকে অপ্রতিহত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় উভয় দিকেই মারাঠা বাহিনী প্রেরণ করিলেন। উত্তর-ভারতে মারাঠাগণ বুন্দেলখণ্ড, মালব প্রভৃতি রাজ্য পুনরায় মারাঠা সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইল। এমন কি, তাহারা দিল্লী অধিকার

মাধব রাও-এর অধীন মারাঠা শক্তির পুনরভ্যুত্থান

করিয়া সম্রাট শাহ্ আলম্‌কে কারা ও এলাহাবাদ হইতে তথায় লইয়া গেল। সম্রাট মারাঠাদের হস্তে ক্রীড়নক-স্বরূপ হইয়া পড়িলেন। দাক্ষিণাত্যে মারাঠাগণ হায়দরকে শ্রীরঙ্গপত্তম্-এর নিকটে এক যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিল। সেই সময়ে (১৭৭২) পেশওয়া মাধব রাও-এর হঠাৎ মৃত্যু ঘটিলে উত্তর-ভারত হইতে মারাঠা বাহিনী পুণায় ফিরিয়া গেল। ইহার পর মাধব রাও-এর ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া বলিয়া ঘোষিত হইলেন। মাধব রাও-এর অকালমৃত্যু মারাঠা শক্তির পক্ষে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয় অপেক্ষা কম ক্ষতিকর ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মারাঠা শক্তি দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হইয়াছিল।

মাধব রাও-এর ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইবার কয়েক মাসের মধ্যেই রঘুনাথ রাও-এর চক্রান্তে নিহত হইলেন। সেই সময়ে নারায়ণ রাও-এর পত্নী ছিলেন অন্তঃস্বত্ত্বা। এ-দিকে রাঘোবা বা রঘুনাথ রাওকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করা হইল, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই নারায়ণ রাও-এর একটি পুত্রসন্তান জাত হইলে এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল। মারাঠা নেতৃবর্গের মধ্যেই অনেকেই নারায়ণ রাও-এর শিশু পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করিলে রাঘোবা পুণা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। নারায়ণ রাও-এর শিশুপুত্রকেই পেশওয়া-পদে স্থাপন করা হইল। ইহার পরবর্তী কালের ঘটনার সূত্রে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল এবং শেষ পর্যন্ত সলবই-এর সন্ধি দ্বারা ব্রিটিশ ও মারাঠাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল [প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের বিশদ আলোচনা—১০৬-১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]।

মারাঠাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব

মহীশূর রাজ্য : হায়দর আলি (Mysore State : Hyder Ali) : অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে হায়দর আলির উত্থান নিজাম, মারাঠা ও ইংরাজ—এই তিন পক্ষেরই ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। হায়দর আলি ভাগ্যান্বেষী সৈনিক হিসাবেই জীবন শুরু করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি মহীশূর রাজ্যের হিন্দু রাজার "দল-ওয়াই" অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি নঞ্জরাজ (Nanjraj)-এর অধীনে সামান্য 'নায়েক' হিসাবে কার্য গ্রহণ করেন। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের পর যাদব বংশের ক্ষত্রিয়গণ শ্রীরঙ্গপত্তমে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া মহীশূর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে যাদব বংশের অবসান ঘটিলেও মহীশূর রাজ্য হিন্দু রাজবংশের অধীনেই ছিল। কিন্তু রাজা কৃষ্ণরায়-এর অকর্মণ্যতার সুযোগ লইয়া প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি নঞ্জরাজ রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রসাদে হায়দর আলির ক্রমেই পদোন্নতি হইতে লাগিল। নঞ্জরাজের অধীনে হায়দর আলি কর্ণাটে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে যুদ্ধ করিয়া ইওরোপীয়দের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নঞ্জরাজ কর্তৃক তিনি দিন্দিগুল নামক স্থানের ফৌজদার-পদে নিযুক্ত হন। ইহার পর মহীশূর রাজ্য এবং সমগ্র দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া হায়দর আলি তাঁহারই পৃষ্ঠপোষক নঞ্জরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া মহীশূর রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিলেন (১৭৬১)।

হায়দর আলির প্রথম জীবন

মহীশূর রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া হায়দর রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ

করিলেন এবং একে-একে বেদনোর, সুন্দা, কানাড়া, সিরা, গুটি প্রভৃতি স্থান দখল করিয়া মহীশূর রাজ্যের সীমা বিস্তার করিলেন। ইতিমধ্যে মহীশূরের হিন্দুরাজার মৃত্যু হইলে তিনি স্বয়ং মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। হায়দর আলির শক্তিবৃদ্ধিতে মারাঠাগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। হায়দর আলির শক্তিবৃদ্ধি মারাঠা রাজ্যের নিরাপত্তার প্রতিকূল, এই কথা উপলব্ধি করিয়া পেশওয়া মাধব রাও হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। হায়দর মারাঠা বাহিনীর হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া গুটি ও সবনুর নামক দুইটি স্থান এবং ৩২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হইলেন (১৭৬৫)। হায়দরের অভ্যুত্থান হায়দরাবাদের নিজামের ভীতি ও ঈর্ষার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিজাম মাদ্রাজের ইংরাজ কর্তৃপক্ষের সহিত হায়দরের বিরুদ্ধে ইংরাজ সেনাবাহিনীর সাহায্য লাভের জন্য এক চুক্তি সম্পাদন করিলেন (১৭৬৬)। এই সাহায্যের বিনিময়ে নিজাম ইংরাজগণকে নিজ রাজ্যের কতকাংশ দান করিবেন বলিয়াও স্থির হইল। এ-দিকে মারাঠাগণও হায়দর আলিকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। সুতরাং হায়দর আলিকে নিজাম, ইংরাজ ও মারাঠা এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে এককভাবে যুদ্ধ করিতে হইল। মারাঠাগণই সর্বপ্রথম মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করিলে হায়দর আলি প্রভূত পরিমাণে অর্থ দ্বারা তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। এ-দিকে নিজাম ও ইংরাজদের যুগ্মবাহিনীও হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করিল। সুচতুর হায়দর কর্ণাটের নবাবের ভ্রাতা মাহ্‌ফুজ খাঁর মাধ্যমে নিজামকে ইংরাজ পক্ষ ত্যাগ করিতে রাজী করাইলেন। এমতাবস্থায় ইংরাজগণ একাই হায়দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য হইল। এইভাবে বিনা-কারণে হায়দরের ন্যায় ক্ষমতাশালী, দুর্ধর্ষ যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ-সৃষ্টির জন্য দায়ী ছিলেন মাদ্রাজের অদূরদর্শী ইংরাজ কর্তৃপক্ষ। যাহা হউক, যুদ্ধে হায়দর আলি ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল স্মিথের হস্তে চঙ্গম ও ত্রিনোমালির (Changama and Trinomali) যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। হায়দরাবাদের নিজাম মোটেই নির্ভরযোগ্য মিত্র ছিলেন না। তিনি পুনরায় হায়দরের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইংরাজ পক্ষে যোগদান করিলেন এবং হায়দরের বিরুদ্ধে ইংরাজ ও কর্ণাটের নবাব উভয়কেই সাহায্য দানে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু হায়দর পরিস্থিতির এইরূপ পরিবর্তনেও নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি এককভাবে যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত ইংরাজগণকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন। ম্যাঙ্গালোর তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। এমন কি, মাদ্রাজের নিরাপত্তা অবধি ক্ষুন্ন হইতে চলিল। এমতাবস্থায় হায়দরের সহিত ইংরাজদের এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল (১৭৬৯)। এই সন্ধির শর্তানুসারে হায়দরের রাজ্য অপর কোন শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ইংরাজগণ তাঁহাকে সাহায্যদানে স্বীকৃত হইল। ইহা ভিন্ন, উভয় পক্ষই পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ও যুদ্ধ-বন্দী ফিরাইয়া দিল ও এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মারাঠাগণ মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করিলে হায়দর আলি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধির শর্তানুযায়ী ইংরাজদের সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু ইংরাজগণ তাহাদের

হায়দর কর্তৃক মহীশূর রাজ্যের বিস্তার সাধন ও সিংহাসন দখল

মারাঠা-মহীশূর সংঘর্ষ

নিজাম-মারাঠা-ইংরাজ বাহিনীর মহীশূর আক্রমণ

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর-যুদ্ধ

পূর্ব-প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। ইংরাজদের এই বিশ্বাসঘাতকতায় হায়দর স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি নিজাম, বেরারের রাজা ও মাহ্‌দজী সিন্ধিয়াকে লইয়া ইংরাজ-বিরোধী এক শক্তিসংঘ গঠন করিলেন। ইতিমধ্যে ইংরাজগণ মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী-অধিকৃত মাহে বন্দর দখল করিলে হায়দর আলি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ইংরাজগণ তাঁহার প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিলে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর আলি ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ তিনি কর্ণাটে প্রবেশ করিলেন। তুষারস্তূপ-পতনের (avalanche) সম্মুখে যেমন কোন কিছুই টিকিতে পারে না, সেইরূপ হায়দর আলিও সম্মুখের সব কিছু ধ্বংস করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরাজ বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া তিনি আর্কট দখল করিলেন। সার্ আলফ্রেড্ লায়েল (Sir Alfred Lyall)-এর ভাষায় ইংরাজদের ভাগ্য-বিড়ম্বনা তখন চরমে পৌঁছিয়াছিল। এই শোচনীয় অবস্থা হইতে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস্। তিনি আয়ার কূট-এর সেনাপতিত্বে এক বিশাল বাহিনী হায়দরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বেরারের রাজা নিজাম ও সিন্ধিয়াকে তিনি কূটকৌশলে হায়দর আলি-গঠিত শক্তিসংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। হায়দর এককভাবে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিলেন, কিন্তু আয়ার কূট-এর হস্তে পোর্টো-নোভো (Porto-Novo)-এর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। নেগাপত্তম্ ও ত্রিনোমালি ইংরাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল। সেই সময়ে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হইলে ফরাসী সরকার ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা সাফ্রেঁ (Suffrein) নামক নৌ-সেনাপতির অধীনে কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। সাফ্রেঁর নিকট হইতে প্রকৃত কোন সাহায্য লাভের পূর্বেই অকস্মাৎ হায়দর আলির মৃত্যু ঘটিল (১৭৮২)। ইংরাজগণও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

হায়দর আলির মৃত্যু (১৭৮২)

হায়দর আলির চরিত্র ও কৃতিত্ব (**Character and Estimate of Hyder Ali**) **:** সামান্য ভাগ্যান্বেষী সৈনিক হিসাবে জীবন শুরু করিয়া হায়দর আলি নিজ প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা বলে মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার অসীম সাহসিকতা, তীক্ষ্ন অন্তর্দৃষ্টি, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং লৌহ-কঠিন প্রতিজ্ঞা তাঁহাকে জীবনে জয়যুক্ত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। বিপদে তিনি কখনও ধৈর্য হারাইতেন না—অত্যধিক জটিল পরিস্থিতিতেও বিভ্রান্ত হইতেন না। তিনি ছিলেন কূটকৌশলী এবং দূরদর্শী রাজনীতিক। তিনি নিরক্ষর ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্মরণশক্তি ছিল অনন্যসাধারণ। প্রখর স্মরণশক্তির সাহায্যে তিনি তাঁহার নিরক্ষরতা-জনিত অসুবিধা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিভিন্ন পাঁচটি ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। ডক্টর স্মিথ হায়দর আলির চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে বিবেক, দয়া, ধর্ম, নীতিজ্ঞানহীন

হায়দরের চরিত্র

অত্যাচারী শাসক হিসাবে রূপায়িত করিয়াছেন।* ঐতিহাসিক উইলকস্-এর মতে হায়দর ছিলেন মুসলমান সুলতানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্মসহিষ্ণু। বাওরিং (Bowring) হায়দর আলির কৃতিত্ব বিচার করিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, নিজ প্রতিশ্রুতি-রক্ষা, পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা, ব্রিটিশদের সহিত ব্যবহারে অকপটতা প্রভৃতি গুণ তাঁহার চরিত্রকে তদানীন্তন মাদ্রাজ কাউন্সিলের ইংরাজদের চরিত্র অপেক্ষা বহু ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিল।† ডক্টর এন্. কে. সিন্হার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, হায়দর আলি স্বৈরাচারী সৈনিক-শাসক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ, এবং কৃতকার্য শাসক। এই সকল কারণে ডক্টর স্মিথের মন্তব্য যে অযৌক্তিক, এ-কথা বলা ভুল হইবে না। হায়দর তাঁহারই পৃষ্ঠপোষক নঞ্জরাজকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং মহীশূর রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই সত্য, কিন্তু অব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করাই ছিল সেই যুগের রীতি। তথাপি এই ব্যাপারে হায়দর আলি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এ-কথা বলা যাইতে পারে।

কৃতিত্ব

হায়দর আলি কেবল মহীশূর রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলে মারাঠা শক্তির দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তিনি মহীশূর রাজ্যের সীমাও প্রসারিত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ সংগঠক এবং সুনিপুণ ও সমরকুশল সেনাপতি। সুলতান হিসাবে তাঁহার জীবনের প্রায় সকল সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল। অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে একই সঙ্গে একাধিক শত্রুর সহিত যুঝিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কোন সময়েই আত্মপ্রত্যয় বা সাহস হারান নাই। মারাঠা, নিজাম ও ইংরাজ—এই তিন শক্তির সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁহাকে কোন কোন সময়ে এককভাবেই যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যুদ্ধ এবং কূটকৌশল উভয় প্রকার অস্ত্রের দ্বারা ইহাদের সহিত লড়িয়াছিলেন। একাধিকবার তিনি কূটকৌশলে তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তিসংঘকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, রাজদের সহিত যুঝিবার জন্য তিনি নিজেও একাধিকবার মারাঠা, নিজাম প্রভৃতিকে নিজপক্ষে টানিয়া লইয়া শক্তিসংঘ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মিত্র হিসাবে যদি নিজাম দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং বিশ্বাসভাজন হইতেন এবং মারাঠাগণ যদি এতটা স্বার্থপর না হইত তাহা হইলে মহীশূর-নিজাম-মারাঠা মৈত্রী দক্ষিণ-ভারতে ইংরাজ প্রাধান্যের অবসান ঘটাইতে সক্ষম হইত, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। হায়দর আলি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে একক-ভাবে আরকট্-এর যুদ্ধে কর্ণেল বেইলিকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিবার মধ্যেই এই

* "Haidar Ali in the south and Ranjit Sing in the north were the ablest of the fierce adventurers who rose to power during the turmoil of the eighteenth century. Both were illiterate and absolutely unscrupulous. Haidar Ali had no religion, no morals and no compassion."—Smith, *Oxford History of India*, p. 543.

† "He was singularly faithful to his engagements, and straightforward in his policy towards the British." Bowring quoted in *An Advanced History of India*, vide, p. 685.

সম্ভাবনার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ইংরাজদের ভাগ্যরবি প্রায় অস্তমিত হইতে চলিয়াছিল, এ-কথা সার আলফ্রেড্ লায়েল বলিয়াছেন। তাঁহার সাফল্যের পশ্চাতে তাঁহার সামরিক দক্ষতা ভিন্ন তাঁহার কূটকৌশল এবং বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তিসংঘ বিচ্ছিন্ন করিয়া শত্রুকে মিত্রহীন অবস্থায় আক্রমণ করিবার সামরিক দূরদর্শিতা ছিল প্রধান কারণ। শাসন-ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন-পদ্ধতি অবশ্য স্বৈরাচারী ও ব্যক্তিগত ধরনের ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কঠোরতারও পরিচয় দিয়াছিলেন। তথাপি পরধর্মসহিষ্ণুতা, শাসনকার্যের সকল বিষয়ে তৎপরতা এবং সর্বোপরি নিজ রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা ভারত-ইতিহাসে হায়দর আলিকে এক গৌরবোজ্জ্বল আসনের অধিকারী করিয়াছে।

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার (পূর্বানুস্থতি)
(Growth of the British Power in India)

লর্ড কর্ণওয়ালিস, ১৭৮৬-৯৩ (Lord Cornwallis) : ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্ পদত্যাগ করিলে লর্ড জন ম্যাক্‌ফারসন (Lord John Macpherson) এক বৎসর অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেল হিসাবে কাজ করিলেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্য-কলাপে সেই সময় ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, কোম্পানির দুর্নীতিপূর্ণ আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবিত কোন ব্যক্তিকে আর গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত করা সমীচীন হইবে না। উদাহরণস্বরূপ, বারাণসীর রেসিডেণ্ট মাসিক এক হাজার টাকা বেতন পাইতেন, কিন্তু অসদুপায়ে তাঁহার বাৎসরিক আয় ছিল চারি লক্ষ টাকা। কলিকাতায় কোম্পানির মালগুদামগুলি ছিল দুর্নীতির গহ্বর। এই কারণেই বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল-এর সভাপতি হেনরী ডাণ্ডাস্ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিট্-এর অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ লর্ড কর্ণওয়ালিসকে গবর্ণর-জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহাকে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্বও দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং ডাইরেক্টর সভা ও ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন ও সহানুভূতি লর্ড কর্ণওয়ালিসের পশ্চাতে ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এমন নহে। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে নানাবিধ গুণ ছিল এবং তিনি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লর্ড জন ম্যাক্‌ফারসন (১৭৮৫-৮৬)

কর্ণওয়ালিসের গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিয়োগ

লর্ড কর্ণওয়ালিসই ছিলেন ভারতে নিযুক্ত সর্বপ্রথম সৎ এবং সততায় অটল ব্রিটিশ গবর্ণর। তিনি সততার যে-আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার পর অপর কোন গবর্ণর কোনপ্রকার দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণে সাহসী হন নাই।

তাঁহার সততা

পিট্-এর ভারত-আইন (Pitt's India Act)-এর শর্তানুযায়ী কর্ণওয়ালিসকে ভারতে রাজ্যবিস্তার ও যুদ্ধ-নীতি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করা চলিবে, এই নির্দেশও তিনি পাইলেন। রেগুলেটিং এ্যাক্ট্-এর দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া কর্ণওয়ালিসকে প্রয়োজনবোধে কলিকাতা কাউন্সিলের মতামত অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাও দেওয়া হইল। সেই সময়ে কোম্পানির শাসনব্যবস্থার সংস্কার-সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, এইজন্য লর্ড কর্ণওয়ালিসকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধনের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিস ছিলেন সম্মানিত,

পিট্-এর ভারত-আইন অনুসারে কর্ণওয়ালিসের উপর নির্দেশ

ক্ষমতাশীল ব্যক্তি। নিজ কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, সর্বোপরি জনসাধারণের উপকার করিবার ইচ্ছার সহিত তদানীন্তন ভারতীয় শাসনক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ইংরাজ কর্মচারী জন শোর (John Shore), জেমস্ গ্র্যাণ্ট (James Grant), উইলিয়াম জোনস্ (William Jones), জোনাথান্ ডান্কান্ (Jonathan Dancan)—প্রভৃতির অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করিয়া এক সুসংহত শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার সুযোগ কর্ণওয়ালিসের সম্মুখে উপস্থিত ছিল।

কর্ণওয়ালিসের সাফল্য-লাভের সুযোগ

তাঁহার সংস্কার কার্যাদি (His reforms) : লর্ড কর্ণওয়ালিসের সংস্কার-নীতি কোম্পানির শাসনব্যবস্থার কোন দিকই বাদ দেয় নাই।

(১) **কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি মুক্ত করা (Purification of the Company's Servants) :** লর্ড কর্ণওয়ালিস লক্ষ্য করিলেন যে, কোম্পানির কর্ম-চারিদের উপর কোম্পানির কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নাই। ইহার কারণ হিসাবে তিনি সহজেই সিদ্ধান্তে পেঁছিলেন যে, নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের মাস মাহিনা অত্যন্ত কম। ফলে তাহারা নানাপ্রকার দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া তাহাদের মাহিনার স্বল্পতা পোষাইয়া লয়। কোম্পানি এ-বিষয়ে কোন প্রকার বাধা-নিষেধ না করায় স্বাভাবিক কারণেই সেই সকল কর্মচারীদের অর্থগৃধ্নুতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে সীমাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে যাহাদের মাহিনা অপেক্ষাকৃত বেশি তাহারাও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, বারাণসীর রেসিডেন্টের মাস মাহিনা ছিল এক হাজার টাকা, কিন্তু দুর্নীতির মাধ্যমে তাঁহার বাৎসরিক আয় ছিল চারি লক্ষ টাকা।

কোম্পানির কর্ম-চারীদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি

কর্মচারীরা যাহাতে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন না করে সেজন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস **তাহাদের মাহিনা** বাড়াইয়া দিলেন এবং ঘুষ লওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করা প্রভৃতি **দুর্নীতিমূলক** কার্যকলাপ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্রত্যেক কর্মচারীকে শপথ করিয়া নিজ-নিজ সম্পত্তির হিসাব কোম্পানিকে দিতে বলা হইল। যে-সকল কর্মচারী এই আদেশ অমান্য করিল বা আদেশের বিরোধিতা করিল তাহাদিগকে পদচ্যুত করা হইল। কর্ণওয়ালিস কোম্পানির কর্মচারীদের কার্যনীতি ও কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (Indian Civil Services)-এর ঐতিহ্য গঠনে সাহায্য করিয়াছিলেন। কর্মচারীদের সততা, আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণের উপর তিনি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

দুর্নীতি অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার

আই. সি. এস্.-এর ঐতিহ্য গঠনে সহায়তা

(২) **বাণিজ্য-সংক্রান্ত সংস্কার (Commercial reforms) :** তারপর তিনি কোম্পানির বাণিজ্য-পরিচালনা-সংক্রান্ত ব্যবস্থার সংস্কারে মনো-নিবেশ করিলেন। পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে যে-সকল পণ্য ইংলণ্ডে রপ্তানি করা হইত তাহা ক্রয় করিবার জন্য কোম্পানি নিজ কর্মচারীদের সহিতই চুক্তিবদ্ধ হইত। অর্থাৎ ইংরাজ কর্মচারিগণ কোম্পানির প্রয়োজনীয়

বাণিজ্য-সংক্রান্ত সংস্কার (১), (২)

দ্রব্যাদি সরবরাহের ভার গ্রহণ করিত। তাহারা দেশীয় বণিক বা দালালদের নিকট হইতে মালপত্র ক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ রাখিয়া তাহা কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিত। ফলে কোম্পানি এক বিরাট পরিমাণ মুনাফা হইতে বঞ্চিত হইত। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্ বোর্ড অব্ ট্রেড্ স্থাপন করিবার সময় হইতেই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। কলিকাতায় কোম্পানির গুদামগুলি ছিল দুর্নীতির গহ্বরস্বরূপ। বোর্ড অব্ ট্রেড্-এর সদস্যগণ বাণিজ্যের উন্নতির দিকে নজর না দিয়া এবং জিনিসপত্রের গুণগত উৎকর্ষ এবং মূল্য প্রভৃতি যাহাতে ন্যায্যভাবে স্থিরিকৃত হয় সেই দিকে মনোনিবেশ না করিয়া নিজেরাই অসদুপায়ে অর্থ রোজগারে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিম্নমানের জিনিসপত্র বেশি দামে ক্রয় করিবার সুযোগ দান করিয়া তাঁহারা ঘুষ হিসাবে বিরাট পরিমাণ অর্থ রোজগার করিতেন। কর্ণওয়ালিস সরাসরি দেশীয় বণিকদের সহিত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের জন্য চুক্তি-বদ্ধ হওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করিলেন। পূর্বে কোম্পানির বাণিজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য পরিচালনার জন্য এগারজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি বাণিজ্যসংস্থা (Board of Trade) ছিল। কর্ণওয়ালিস দুর্নীতিগ্রস্ত সদস্যদের বাদ দিয়া কাজের সুবিধার জন্য উহার সদস্য-সংখ্যা করিলেন পাঁচ। পূর্বে দেশীয় তাঁতীদিগকে বলপূর্বক তাহাদের যাবতীয় বস্ত্র কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হইত। কর্ণওয়ালিস কেবলমাত্র যে-পরিমাণ দাদন তাঁতীরা কোম্পানি হইতে লইত সেই পরিমাণ বস্ত্র কোম্পানিকে দিয়া উদ্বৃত্ত বস্ত্র যাহাকে খুশী বিক্রয়ের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

বোর্ড অব্ ট্রেডের দুর্নীতি

(৩) **বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার** (Judicial reforms): কর্ণওয়ালিস বিচার-ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করিলেন। তাঁহার বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার প্রধানত ফৌজদারী ও দেওয়ানী—এই দুইভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা-ই সঙ্গত হইবে। (১) হেস্টিংস্ মুর্শিদাবাদে সদর নিজামত আদালত নামে সর্বোচ্চ ফৌজদারী বিচারালয় স্থাপন করিয়া-ছিলেন। এই বিচারালয়ে সভাপতিত্ব করিতেন বাংলার নবাব। কর্ণওয়ালিস সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিলেন এবং নবাবের স্থলে গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলকে উহার পরিচালনার ভার দিলেন (১৭৯০)। গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলকে দেশীয় আইন-কানুন ও রীতি-নীতি সম্পর্কে উপদেশ দিবার জন্য কাজী ও মুফ্‌তি নিযুক্ত করা হইল। (২) সদর নিজামত আদালতের অধীনে কর্ণওয়ালিস চারিটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় (Circuit Courts) স্থাপন করিলেন। এগুলির প্রত্যেকটি দুইজন করিয়া ইংরাজ বিচারক লইয়া গঠিত ছিল। বিচারকদিগকে দেশীয় আইনের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার জন্য কাজী ও মুফ্‌তি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ভ্রাম্যমাণ বিচারালয়ের বিচারকগণ বৎসরে দুইবার করিয়া বিভিন্ন জেলায় যাইতেন এবং স্থানীয় ফৌজদারী বিচারকার্য সম্পাদন করিতেন। (৩) পূর্বে কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর দণ্ড-দানের রীতি ছিল। কর্ণওয়ালিস এই সকল নিষ্ঠুর দণ্ডদানের প্রথা উঠাইয়া দিলেন। (৪) পূর্বে নরহত্যা রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধ অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত না। ফলে, হত্যাকারী ভীতি প্রদর্শন করিয়া বা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ দিয়া মামলা মিটাইয়া লইতে পারিত। কর্ণওয়ালিস হত্যার অপরাধকে সমাজ-বিরোধী

ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার: (১), (২), (৩), (৪), (৫)

বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর হত্যাকারীর বিচার নির্ভর করিবে না, এই আইন প্রবর্তন করিলেন। সমাজের উপকারের জন্যই হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার রীতি তিনি প্রবর্তন করেন। (৫) মুসলমান আইন অনুসারে পূর্বে অ-মুসলমান সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া চলিত না। আবার, কোন কোন অপরাধের বিচারে দুইজন অ-মুসলমান সাক্ষীকে একজন মুসলমান সাক্ষীর সমান বলিয়া ধরা হইত। কর্ণওয়ালিস বিচার-ব্যাপারে এই সকল বৈষম্যমূলক ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া আইনের চক্ষে সকলকে সমান অধিকার দান করিলেন।

পূর্বে রাজস্ব অর্থাৎ দেওয়ানীর সহিত দেওয়ানী মামলা-মোকদ্দমা বিচারের ব্যবস্থা জড়িত ছিল বলিয়া রাজস্ব-ব্যবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটিলে দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন হইত। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণওয়ালিস দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থাকে রাজস্ব বিভাগ হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিয়া লইয়া নিম্নতম স্তর হইতে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে সাজাইয়াছিলেন। (১) দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থার সর্বনিম্নে তিনি সদর আমিন ও মুনসেফী বিচারালয়গুলিকে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল বিচারালয়ে সাধারণ ধরনের দেওয়ানী মামলা বিচারের ব্যবস্থা ছিল। (২) সদর আমিন ও মুনসেফী বিচারালয়ের উপর প্রতি জেলায় একটি করিয়া জেলা-বিচারালয় (District Court) স্থাপন করা হয়। জেলা-বিচারালয়গুলি এক-একজন ইংরাজ জেলা-জজের অধীনে ছিল। ভারতীয় আইনজ্ঞদের সাহায্য লইয়া ইংরাজ জজগণ বিচারকার্য সম্পাদন করিতেন। (৩) জেলা-বিচারালয়ের উপর চারিটি প্রাদেশিক বিচারালয় (Provincial Court) স্থাপন করা হইয়াছিল। কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনা—এই চারিস্থানে চারিটি প্রাদেশিক বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এইগুলি পরিচালনার ভারও ছিল ইংরাজ জজদের উপর। জেলা-জজের বিচারের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক বিচারালয়ে আপীল করা চলিত। (৪) সমগ্র দেওয়ানী বিচারের সর্বোচ্চ ছিল সদর দেওয়ানী আদালত। গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিল এই বিচারালয়ের বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন। (৫) পূর্বে জেলা-কালেক্টরগণ দেওয়ানী মামলা-মোকদ্দমার বিচার করিতেন। কর্ণওয়ালিস তাঁহাদের বিচার-ক্ষমতা নাকচ করিয়া তাঁহাদের শাসন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সাধারণ ধরনের ফৌজদারী মামলার বিচার অবশ্য তাঁহারা করিতেন।

দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার: (১), (২), (৩), (৪), (৫)

(৪) **পুলিস-ব্যবস্থার সংস্কার (Reform of the Police System):** লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত সংস্কারের অধিকাংশই তাঁহার শাসনকালের পূর্বেই প্রাথমিকভাবে চালু হইয়াছিল। কিন্তু যে-সকল সংস্কার কার্য সর্বপ্রথম তিনি নিজে প্রবর্তন করেন সেইগুলির অন্যতম প্রধান ছিল পুলিস-ব্যবস্থার সংস্কার। তিনি পুলিস প্রশাসন যে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ নানাভাবে এবং নানা দিকে দেখিতে পাইলেন। কলিকাতা শহর দুষ্ট প্রকৃতির লোকের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়াছে এবং আইন-কানুন প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যার পর কলিকাতা শহরে চলাফেরা করিতে কেহ সাহস পাইত না।

কলিকাতা শহর দুষ্ট লোকের স্বর্গরাজ্য

কলিকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকায় জঙ্গলের রাজত্ব বিরাজ করিতেছে। পুলিস বাহিনী এমন কি পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ পর্যন্ত সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ। মফঃস্বল অঞ্চলে জমিদারগণ ছিলেন শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত। এজন্য তাঁহারা কিছু পুলিস নিজ-নিজ অধীনে রাখিতেন।

পুলিস বাহিনী দুর্নীতিগ্রস্ত

কর্ণওয়ালিস ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি রেগুলেশন অর্থাৎ আইন পাস করিয়া পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্টদের কর্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। আইন-কানুন লোকে যাহাতে মানিয়া চলে সেই ব্যবস্থা করা, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করা প্রভৃতি দায়িত্ব পালন তাহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হইল। পুলিস যাহাতে অসদুপায়ে অর্থ রোজগার না করে সেজন্য তাহাদের মাহিনা কর্ণওয়ালিস বাড়াইয়া দিলেন। যে-সকল পুলিস কর্মচারী খুনী, চোর এবং নানাপ্রকার বে-আইনী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে তাহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা তিনি করিলেন।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেশন

কর্ণওয়ালিস জমিদারদের পুলিস বাহিনী রাখিবার এবং উহার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব কাড়িয়া লইলেন। প্রত্যেক জেলার এক-একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল লইয়া এক-একটি থানা গঠন করিয়া প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া ইওরোপীয় দারোগা নিয়োগ করিলেন। শান্তিরক্ষার দায়িত্ব জমিদারদের স্থলে দারোগাদের উপর ন্যস্ত হইল। কলিকাতায় একজন পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিয়োগ করিয়া তাঁহার উপর শান্তিরক্ষার দায়িত্ব দিলেন।

জমিদারদের পুলিসী-ক্ষমতা বিলোপ

থানা : ইওরোপীয় দারোগা

কলিকাতায় পুলিস সুপার

(৫) **রাজস্ব সংস্কার (Revenue Reforms) :** ম্যাক্ফারসন আমলে কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য মোট পঁয়ত্রিশটি রাজস্ব-জেলা (revenue district) গঠন করেন। প্রত্যেকটি জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার এক-এক জন ইওরোপীয় রাজস্ব কালেক্টরের উপর ন্যস্ত ছিল। কর্ণওয়ালিস দেখিতে পাইলেন যে, প্রত্যেক কালেক্টরই স্বনামে এবং বেনামে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিয়া অবৈধভাবে অর্থ রোজগারে ব্যস্ত। রেভিনিউ বোর্ড অর্থাৎ রাজস্ব আদায় পরিদর্শনের জন্য যে-বোর্ড ছিল উহার প্রেসিডেন্ট ছিলেন জন শোর নামে জনৈক সুদক্ষ, সৎ কর্মচারী। এই বোর্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজস্ব-জেলার সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হইতে কমাইয়া তেইশ করা হইল। বোর্ড অব্ রেভিনিউ-এর নূতন নাম দেওয়া হইল কমিটি অব্ রেভিনিউ। কর্ণওয়ালিসের গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিবার পর হইতে ১৭৯০ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭৮৬-১৭৯০ পর্যন্ত রাজস্ব-বন্দোবস্ত পূর্বের ন্যায় বাৎসরিক ভিত্তিতে নির্ধারিত হইল। কিন্তু ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে বন্দোবস্ত দশ বৎসরের জন্য দেওয়া হইল এবং কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরের অনুমোদন লাভ করিলে উহা স্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করা হইবে সেই আশ্বাস দেওয়া হইল।

রাজস্ব-জেলা

কালেক্টরদের দুর্নীতি-পরায়ণতা

বোর্ড অব্ রেভিনিউ —কমিটি অব্ রেভিনিউ

দশশালা বন্দোবস্ত

কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরের অনুমোদন যথা সময়ে পাওয়া গেলে এই দশশালা বন্দোবস্ত স্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল। কর্ণওয়ালিসের আমলে সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য সংস্কার

হইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন। এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারগণ রাজস্ব-আদায়কারী হইতে জমির মালিকে পরিণত হইয়াছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিবার শর্তে জমিদারগণ জমি ভোগদখল করিতে পারিতেন। সময়মত কোম্পানির খাজনা দিলে জমিদারগণের জমিদারি হইতে অপসারিত হইবার কোন আশংকা ছিল না।

রাজস্ব-ব্যবস্থার সংস্কার—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে কোম্পানি প্রতিবৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিল এবং তাহাতে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থাৎ বাজেট্ (Budget) প্রস্তুতেরও সুবিধা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, জমিদারি প্রথা প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত ভূম্যধিকারী শ্রেণীর সাহায্যে ও সহানুভূতিতে বিদেশী শাসন দৃঢ়তর হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।*

কর্ণওয়ালিসের সংস্কার-কার্যাদির সমালোচনা (Criticism of Cornwallis' Reforms): কর্ণওয়ালিসের সংস্কার-কার্যাদি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ছিল এ-কথা বলা যায় না। (১) তিনি দেশীয় বণিকদের সহিত কোম্পানিকে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ করিয়া একদিকে যেমন কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই কোম্পানির কর্মচারিবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পথও বন্ধ করিয়াছিলেন। বাণিজ্য-সংক্রান্ত তাঁহার সংস্কার-কার্যাদি কোম্পানির ও দেশীয় বণিকদের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

বাণিজ্য-সংক্রান্ত সংস্কার-ত্রুটিহীন

(২) বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার করিতে গিয়া তিনি নবাব ও অপরাপর দেশীয় বিচারকদের বিচার-ক্ষমতার বিলোপ সাধন করিয়া বিচার-কার্যাদি সম্পূর্ণভাবে ইংরাজ করায়ত্ত করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিচার-ব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে ভাগ করিয়া তিনি উহাকে অধিকতর দৃঢ় ও যুক্তিসম্মত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিচার-ব্যাপারে মুসলমান-অ-মুসলমানকে সম-পর্যায়ে স্থাপন করিয়া, হত্যা অপরাধের বিচার-সংক্রান্ত আইনের সংস্কার-সাধন করিয়া এবং নিষ্ঠুর দণ্ডদান বন্ধ করিয়া তিনি বিচার-ব্যবস্থাকে উন্নত করিয়াছিলেন, এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিচার-ব্যবস্থার সংস্কারে কর্ণওয়ালিস হেস্টিংসের অনুসরণ করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবন ছিল, একথা বলা চলে না।

বিচার-ব্যবস্থায় অত্যধিক বিদেশীয়-করণ

ইংরাজ কর্মচারিগণের নীতিবোধ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুপলব্ধ

(৩) ইংরাজ কর্মচারিবর্গের দক্ষতা, সততা-বৃদ্ধি এবং তাহাদের কর্মপদ্ধতির উন্নতি সাধন করিতে গিয়া তিনি কেবলমাত্র বেতনের উপরই জোর দিয়াছিলেন। অধিক বেতন দিলেই কর্মচারীদের নৈতিকতা বৃদ্ধি পাইবে এই ছিল তাঁহার ধারণা। অধিক বেতন দিবার ফলে তাহাদের উৎকোচ-গ্রহণের আগ্রহ কতক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল বটে, কিন্তু শাসনকার্যে তাহাদের নীতিবোধ যে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এ-কথা বলা চলে না।

পুলিস-ব্যবস্থার বিদেশীকরণ

(৪) পুলিস-ব্যবস্থার সংস্কার করিতে গিয়াও কর্ণওয়ালিস ভারতীয়দের অর্থাৎ

* চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিশেষ আলোচনা ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জমিদারগণের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া সেই ক্ষমতা ইংরাজ কর্মচারীদের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন।

(৫) কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নানা দিক দিয়া উন্নতিমূলক ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার ত্রুটিও ছিল যথেষ্ট। রাজস্ব-আদায়ের ব্যাপারে সময়ের কড়াকড়ি, জমিদারের হস্তে 'রায়ত' (ryot) অর্থাৎ প্রজাবর্গকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দেওয়া প্রভৃতি জমিদার এবং প্রজা উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক হইয়াছিল। রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণেও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-জনিত তৎকালীন দুরবস্থার কথা বিবেচনা করা হয় নাই। ফলে, বহু জমিদার যেমন জমিদারি হারাইয়াছিল তেমনি জমিদারগণের অত্যাচারে বহু প্রজাও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি ক্রমেই প্রকাশ পাইয়াছিল।*

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটিসমূহ

(৬) সর্বশেষে এই কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কর্ণওয়ালিসের সংস্কার-কার্যাদির আলোচনা করিলে ভারতীয়দের প্রতি তাঁহার প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয়দের শাসনব্যবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া কর্ণওয়ালিস শাসক ও শাসিতের পরস্পর প্রীতি ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভারতীয় শাসনব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ইংরাজ কর্মচারিবর্গের উপর শাসনকার্যের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তিনি একদিকে যেমন তাহাদের দায়িত্ব ভারাক্রান্ত করিয়াছিলেন, অপরদিকে তাহাদের অত্যধিক ক্ষমতা-জনিত ঔদ্ধত্যবৃদ্ধির পথও প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ভারতীয়দের প্রতি অবিচার

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৯৩ (The Permanent Settlement): লর্ড কর্ণওয়ালিসের সংস্কার-কার্যাদির মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধারণা লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক উদ্ভাবিত, এ-কথা সত্য নহে। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য সার্ ফিলিপ ফ্রান্সিস্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নের প্রতি ডাইরেক্টর সভা ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দৃষ্টি প্রধানত সার্ ফিলিপ ফ্রান্সিস্-এর চেষ্টাই আকৃষ্ট হইয়াছিল। পিট্-এর ভারত-আইন (Pitt's India Act, 1784)-এর ৩৯নং বিধানেও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব স্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারণের নির্দেশ ছিল।† লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন তখন ইংরাজ কর্মচারিগণ বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জনে সমর্থ হন নাই। এই কারণেই ১৭৮৭, ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে—এই দুই বৎসরের রাজস্ব বাৎসরিক ভিত্তিতেই বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস জেলা কালেক্টরগণকে (১) রাজস্বের পরিমাণ, (২) কাহাদের নিকট জমি বন্দোবস্ত দেওয়া উচিত, (৩) জমিদারগণের

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্ণওয়ালিস কর্তৃক উদ্ভাবিত নহে

কর্ণওয়ালিস কর্তৃক রাজস্ব-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ

---

* চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণাগুণের বিশদ আলোচনা ১৪৭-১৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† "For settling and establishing upon principles of moderation and justice according to the laws and constitution of India, the permanent rule by which their respective tributes, rents and services shall be in future rendered and paid." Sec. 39. *Pitt's India Act.*

অত্যাচার হইতে 'রায়ত' (ryot) অর্থাৎ প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন প্রভৃতি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার আদেশ দিলেন।

জেলা কালেক্টরগণ কর্ণওয়ালিসের নির্দেশানুসারে দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন। এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া কর্ণওয়ালিস ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারগণের সহিত দশ বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিতে প্রস্তুত হইলেন। অবশ্য ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দশ বৎসরের বন্দোবস্ত দেওয়া সম্ভব হইল না। যাহা হউক, এই বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও তিনি দিতে চাহিলেন যে, কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন লাভ করা সম্ভব হইলে এই দশ বৎসরের বন্দোবস্তকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করা হইবে। ঠিক সেই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস এবং জন শোর-এর মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া-না-দেওয়া সম্পর্কে যে-বিতর্ক হইয়াছিল উহা তদানীন্তন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজস্ব-নীতির এক অতি সুন্দর এবং মনোজ্ঞ আলোচনা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

দশ বৎসরের বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিশ্রুতিদানের প্রশ্ন-সংক্রান্ত বিতর্ক

শোর-কর্ণওয়ালিস বিতর্ক (Shore-Cornwallis Controversy)* : (১) জন শোর এবং কর্ণওয়ালিসের বিতর্কের প্রধান প্রশ্ন-ই ছিল বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করা হইবে কি না। শোর-এর মতে কোম্পানি তখনও রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করে নাই, এমতাবস্থায় বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিবার পূর্বে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রয়োজন। সুতরাং দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যতে উহা-ই চিরস্থায়ী করা হইবে, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া সমীচীন হইবে না। কর্ণওয়ালিসের মতে কোম্পানি রাজস্ব-সম্পর্কে যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিল তাহাই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিবার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। (২) ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের মন্বন্তরের ফলে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা এমন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাংলাদেশের কৃষি-জমির এক-তৃতীয়াংশ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। কর্ণওয়ালিস মনে করিতেন যে, জমিদারগণ চিরস্থায়িভাবে এই সকল জমির অধিকার না পাইলে এই সকল জমিকে পুনরায় চাষ-আবাদের যোগ্য করিয়া তুলিবার ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত হইবে না। দশ বৎসর পরে জমিদারি হস্তান্তরিত হইবার কোন আশঙ্কা থাকিলে জমি-উন্নয়নের কোন চেষ্টা-ই জমিদারগণ করিবেন না। পক্ষান্তরে, শোর-এর মতে জমিদারগণ ইতিপূর্বে এক বৎসর, অধিক হইলে পাঁচ বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত পাইয়াছে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে দশ বৎসরের জন্য জমির বন্দোবস্ত পাওয়া-ই জমি-উন্নয়নের প্রেরণাস্বরূপ হইবে। (৩) জন শোর এ-কথাও বলিয়াছিলেন যে, দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দিবার কালেই ভবিষ্যতে বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করা হইবে, এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত

অভিজ্ঞতার প্রশ্ন

জঙ্গলাকীর্ণ কৃষি-জমি আবাদের প্রশ্ন

* Forminger, vol. II, pp. 515, 516-18, 532-33.

হইবে না। কারণ, ডাইরেক্টর সভা যদি দশ বৎসরের বন্দোবস্তের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুমোদন না করেন তাহা হইলে কোম্পানির উপর জমিদারগণের আর আস্থা থাকিবে না। ইহার উত্তরে কর্ণওয়ালিস ডাইরেক্টর সভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করিবার যে-নির্দেশ দিয়াছিলেন উহার উল্লেখ করেন এবং দশ বৎসরের বন্দোবস্ত যে ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক স্থায়িভাবে অনুমোদিত হইবেই এ-কথা তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করেন। (৪) শোর আরও একটি কারণে ঠিক সেই সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মতে ১৭৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে যে-রাজস্ব জমিদারগণের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইতেছিল, উহা ন্যায্য রাজস্ব অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। সেজন্য জমিদারির জরিপ না করিয়া খাজনা নির্ধারণ অন্যায়মূলক হইবে, এই কথার উপর জন শোর জোর দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, জমিদারগণকে যদি জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে রায়তের ও জমিদারগণের পরস্পর সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কোম্পানির আর থাকিবে না। ফলে, রায়তদের দুর্দশার সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজস্ব-ব্যবস্থা ও জমিদারির অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন লর্ড কর্ণওয়ালিস এ-দেশের জমিদারগণকেই জমির মালিক বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং প্রজা ও জমিদারগণের পরস্পর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কোম্পানির হস্তে রাখা হইবে বলিয়া স্থির করিলেন।

দশ বৎসরের বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিশ্রুতিদানের প্রশ্ন

রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ, রায়তদের জমিদারগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা এবং জমির মালিকানার প্রশ্ন

কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের নির্দেশ ডাইরেক্টর সভার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং এ-বিষয়ে তিনি শোর-এর মতামত অগ্রাহ্য করিয়া ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারি প্রচলিত বাৎসরিক বন্দোবস্ত দশ বৎসরের জন্য চালু থাকিবে এবং ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে উহাই চিরস্থায়ী করা হইবে, এই ঘোষণা করিলেন। ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯- সেপ্টেম্বর আসিয়া পেঁৗছিলে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ প্রচলিত বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী [illegible] ঘোষিত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন (মার্চ ২২, ১৭৯০)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণাগুণ (Merits and defects of the Permanent Settlement): (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্ভাব্য অপগুণ সম্পর্কে কর্ণওয়ালিস বা ডাইরেক্টর সভা অবহিত ছিলেন না, এমন নহে। কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার সহিত কর্ণওয়ালিসের পত্রালাপ এবং শোর-কর্ণওয়ালিস বিতর্ক হইতে এ-কথা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু কোম্পানির রাজস্ব-আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং বাৎসরিক বাজেট্ প্রস্তুতের সুবিধার জন্যই প্রধানত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং ইহাই ছিল এই বন্দোবস্তের প্রধান গুণ। (২) জমিদারগণ জমির মালিক বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে যে জমির এবং প্রজাবর্গের উন্নতি সাধিত না হইয়াছিল, এমন নহে। বাংলাদেশে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে জমিদারগণ প্রজাবর্গের উপকারার্থে পুষ্করিণী খনন, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপনের জন্য অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ, মহামারীর সময়েও

গুণ

জমিদারগণ প্রজাবর্গকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এইরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। (৩) গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। (৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়াছিল, উহা স্বভাবতই কোম্পানির নির্ভরযোগ্য সমর্থক শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল। (৫) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোম্পানির কর্মচারীদের উপর হইতে রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে দেওয়ানি বিচারের যুগ্ম দায়িত্বের বোঝা লাঘব করিয়া তাহাদের কর্মদক্ষতা বাড়াইয়া দিতে সাহায্য করিয়াছিল।

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণ অপেক্ষা অপগুণের পরিমাণই যে বেশি ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। খ্যাতনামা ইতিহাস-সাহিত্য রচয়িতা হান্টার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপগুণগুলির সুযৌক্তিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অপগুণ

প্রথমত, এই বন্দোবস্তে জমিদারদের অধীনে জমি জরিপ না করিয়া, কি পরিমাণ নিষ্কর ভূমি ছিল এবং কি পরিমাণ ভূমি পশুচারণ হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছিল সে-সকল বিষয়ে কোনপ্রকার খোঁজ-খবর না লইয়া-ই রাজস্ব নির্ধারিত হইয়াছিল। ফলে, রাজস্বের হার অত্যধিক বেশি হইয়াছিল। জমিদারগণের নিকট হইতে মোটামুটিভাবে যে-ধারণা পাওয়া গিয়াছিল উহাই ছিল রাজস্ব-নির্ধারণের ভিত্তি। জন শোর ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে ডিসেম্বরের পত্রে জমিদারগণের ভূসম্পত্তির সঠিক জরিপ না করিয়া রাজস্ব-নির্ধারণের অযৌক্তিকতার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এইভাবে জমিদারির প্রকৃত সীমা নির্দেশিত না হওয়ার ফলে অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমা এবং নানাপ্রকার অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল।

(১) জরিপ না করিয়া রাজস্ব নির্ধারণের ত্রুটি

দ্বিতীয়ত, প্রথম কয়েক বৎসর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হইল। অল্পকালের মধ্যেই সান্ধ্য-আইন (Sun Set Law)-এর প্রয়োগে নির্দিষ্ট দিনের সন্ধ্যার পূর্বে রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারি নিলাম করিয়া অনাদায়িকৃত রাজস্ব আদায় করিয়া লইবার ব্যবস্থা থাকায় বহু প্রাচীন জমিদার পরিবার তাঁহাদের জমিদারি হারাইয়াছিলেন। আরাম-প্রিয় জমিদার শ্রেণীর নিকট হইতে নিয়মিতভাবে এবং সময়মত রাজস্ব পাইবার আশা সফল হয় নাই। তদুপরি রাজস্বের হার অত্যধিক হওয়ায় সময়মত রাজস্ব দেওয়া জমিদারদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, ফলে মাত্র ২২ বৎসরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জমিদারি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যে-সকল জমিদার সামন্ত প্রথার অনুকরণে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিবার শর্তে তালুকদার, ইজারাদার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের নিকট জমি বন্দোবস্ত দিতে পারিয়াছিলেন কেবলমাত্র সেই সকল জমিদারই টিকিয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(২) নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা অনাদায়ে জমিদারি নিলাম

তৃতীয়ত, লর্ড কর্ণওয়ালিস আশা করিয়াছিলেন যে, জমিদারগণ যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিবার শর্তে জমি ভোগদখলের স্থায়ী অধিকার কোম্পানির নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন ঠিক অনুরূপ শর্তে তাঁহারাও নিজ-নিজ রায়তদের জমি বন্দোবস্ত দিবেন। কিন্তু তাঁহার এই আশা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছিল। অতি সামান্য কারণে, এমন কি, বিনা-কারণেও জমিদারগণ রায়তদের জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না।

(৩) রায়তদের উপর জমিদারদের অত্যাচার

চতুর্থত, জমির মালিকানা চিরস্থায়ী হইবার ফলে সকলেই যে-কোন উপায়ে জমি ক্রয় করিবার বা অধিকার করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলে জমির উপর ক্রমেই চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহা ভিন্ন, জমি-সংক্রান্ত অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমা বিচারালয়গুলিতে আসিতে থাকে।

(৪) জমির উপর চাপ বৃদ্ধি : অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমা

পঞ্চমত, অতি উচ্চহারে রাজস্ব নির্ধারিত হওয়ায় জমিদারগণ রায়তদের নিকট হইতে উচ্চহারে খাজনা আদায় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে, রায়তদের আর্থিক দুর্দশা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(৫) রায়তদের দুর্দশা

ষষ্ঠত, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জমির যে মূল্য ছিল, পরবর্তী কালে উহা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইলেও রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইবার কোন অবকাশ ছিল না। ফলে, সরকার সেই বর্ধিত মূল্যজনিত লাভের (unearned increment) অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

(৬) জমির মূল্যবৃদ্ধিজনিত লাভের অংশ হইতে সরকার বঞ্চিত

সপ্তমত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতি বিঘ্নিত করিয়াছিল। ১১৭৬ সালের (১৭৭০ খ্রীঃ) মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছিল। জমিদারগণকে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে এই সকল জমি আবার তাহাদের চেষ্টায় কৃষির আওতায় আসিবে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমির উন্নয়নে সচেষ্ট হইবেন বলিয়াই কর্ণওয়ালিস আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে জমিদারগণ জমির উন্নতি সাধনে সচেষ্ট না হইলেও জমি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইবার কোন আশঙ্কা নাই, এজন্য এ-বিষয়ে মোটেই মনোযোগী হইলেন না। অপর পক্ষে রায়তগণ জমিতে তাহাদের কোন অধিকার না থাকায় স্বভাবতই জমির উন্নয়নের কোন চেষ্টা করিল না।

(৭) জমির উন্নয়ন ব্যাহত

অষ্টমত, পরবর্তী কালে জমিদারগণ যখন গ্রাম ত্যাগ করিয়া শহরে বসবাস করিতে লাগিলেন এবং নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন তখন রায়তদের দুর্দশা চরমে পৌঁছিল। নায়েব-গোমস্তাগণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য রায়তগণকে উৎপীড়ন করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। সেটোন কার (Seton Karr)-এর মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজনৈতিক সুবিধা উহার অর্থনৈতিক অসুবিধা পোষাইয়া দিয়াছিল : "Political benefits of the settlement balanced its economic defects." কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই ভারসাম্য বা balance বিনষ্ট হইয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটি অত্যাচারের যন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই রাজস্ব-ব্যবস্থা এক সামন্ত প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার সর্বোপরি ছিল জমিদার সম্প্রদায় এবং সর্বনিম্নে রায়তগণ, যাহারা ভূমিদাস ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না।

(৮) নায়েব-গোমস্তার অত্যাচার

নবমত, ইহা ভিন্ন, গ্রামের কৃষকদের শ্রমে উৎপন্ন আয় হইতে খাজনা আদায় করিয়া আনিয়া উহা শহর এলাকায় ব্যয় করিবার ফলে গ্রামের আর্থিক সমৃদ্ধিও দিন-দিন হ্রাস পাইতে লাগিল।

(৯) গ্রামের আর্থিক সমৃদ্ধি হ্রাস

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমসাময়িক বাংলার রাজস্ব সমস্যার সমাধানের কোন সুযৌক্তিক পদক্ষেপ ছিল না। বস্তুত, লর্ড

কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনকালে ইংলণ্ডের রাজস্ব-ব্যবস্থার কথাই স্মরণ রাখিয়া চলিয়াছিলেন। তিনি বাংলাদেশের জমিদারদিগকে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার না করিয়াও তাহাদিগকে বংশপরম্পরায় জমি বন্দোবস্ত দিবার রীতির দীর্ঘ ইতিহাস অনুধাবন করেন নাই। এ-কথা স্মরণ রাখিলে পরবর্তী কালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটিগুলি অনেক কিছু হইতেই রক্ষা পাওয়া যাইত। এজন্য বলা হইয়া থাকে যে, সদিচ্ছাপ্রসূত হইলেও কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করিয়া এক মারাত্মক ভুল করিয়াছিলেন।

উপসংহার

কোম্পানির রাজস্ব আয়ের স্থিতিশীলতা এবং বাজেট প্রস্তুতের সুবিধার প্রশ্নই ছিল তাঁহার প্রধান যুক্তি। এই সকল কারণে কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও ত্রুটিপূর্ণ ছিল (benevolent blunder), এ-কথা বলা হইয়া থাকে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-ত্রুটি দূরীকরণের চেষ্টা (Remedial Measures) : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-ত্রুটি যখন ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল তখন সরকার সেগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি আইন প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। (১) ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজস্ব আইন' (Rent Act) পাস করিয়া লর্ড ক্যানিং অন্যায়ভাবে রায়তদের উচ্ছেদ করা বা অন্যায়ভাবে খাজনা বৃদ্ধি করা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। (২) ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে প্রজাস্বত্ব আইন (Tenancy Act) পাস করিয়া কয়েকটি বিশেষ কারণ ভিন্ন রায়তগণকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা নিষিদ্ধ হইল। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইনের দ্বারা রায়তগণের অধিকার রক্ষার চেষ্টা করা হইল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'রায়ত স্থিতিবান' স্বত্ব বিক্রয়ের অধিকার রায়তগণকে দেওয়া হইল। কিন্তু রায়ত জমির স্বত্ব বিক্রয় করিয়া যাহা পাইবে উহার এক-পঞ্চমাংশ জমিদারকে হস্তান্তর মূল্য (Transfer fee) হিসাবে দিতে হইত। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই 'হস্তান্তর মূল্য' দেওয়ার নিয়ম রহিত করা হইল। স্বাধীনতার পর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিয়া রায়তদের সঙ্গে সরাসরি জমি বন্দোবস্ত দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রাজস্ব আইন (Rent act) (১৮৫৯)

প্রজাস্বত্ব আইন (Tenancy Act) (১৮৮৫, ১৯২৮, ১৯৩৮)

জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ

লর্ড কর্ণওয়ালিস ও মারাঠাগণ (Lord Cornwallis & the Marathas) : ওয়ারেন হেস্টিংস্ মারাঠাগণ ও হায়দর আলির শত্রুতা হইতে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ স্বার্থের নিরাপত্তা বিধান করিতে পারেন নাই। সলবেই-এর সন্ধির পর মারাঠাদের সহিত দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরিয়া মোটামুটিভাবে ইংরাজদের পক্ষে শান্তি রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হইলেও মারাঠাগণ যে ইংরাজদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন রহিয়া গিয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কর্ণওয়ালিস যখন গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন তখন পিট্-এর ভারত-আইন (Pitt's India Act)-এর শর্তানুযায়ী তাঁহাকে দেশীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হইবার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এজন্য তিনি শাহ্ আলমের পুত্রকে দিল্লীর সিংহাসন লাভে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থায় নিরপেক্ষ-নীতি (Policy of non-intervention) অনুসরণ করা সম্ভব হইল না। কর্ণওয়ালিস মারাঠা

ইঙ্গ-মারাঠা-নিজাম মৈত্রী

ও নিজামের সহিত টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে এক শক্তিসংঘ স্থাপন করিলেন। মারাঠাদের সহিত কর্ণওয়ালিস মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিলেও ব্রিটিশের অধীন মিত্রশক্তি অযোধ্যা রাজ্যে মাহ্‌দজী সিন্ধিয়া যাহাতে কোনরূপ গোলযোগের সৃষ্টি না করিতে পারেন সেজন্য তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ১৭৯০-'৯২ (**The Third Anglo-Mysore War, 1790-'92**)**:** ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধি (১৭৮৪) দ্বারা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা ইঙ্গ-মহীশূর বিরোধিতার কোন স্থায়ী মীমাংসা হয় নাই। এই কারণে ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধি নামেমাত্রই শান্তি আনিয়াছিল। টিপু সুলতান এবং ইংরাজগণেরও এ-কথা জানা ছিল যে, অনতিবিলম্বেই উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। টিপু সুলতান এবং ইংরাজদের মধ্যে একপক্ষ দাক্ষিণাত্য হইতে উৎখাত না হইলে এই দুইয়ের যুদ্ধ চলিবেই, এ-কথা কাহারও অবিদিত ছিল না। দুর্ধর্ষ স্বাধীনচেতা বীর টিপু দাক্ষিণাত্য হইতে ইংরাজ প্রাধান্য বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি এইজন্য গোপনে ফ্রান্স ও কনস্টান্টিনোপল্‌, মরিশাস, কাবুল প্রভৃতি স্থানে সামরিক সাহায্য চাহিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পরোক্ষ কারণ

যাহা হউক, ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধির পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণ-ওয়ালিস নিজামের নিকট হইতে গুন্টুর নামক স্থানটি প্রাপ্তির বিনিময়ে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের বিস্মৃত-প্রায় মসুলিপত্তমের সন্ধির শর্তগুলি পুনরায় অনুমোদন করিয়া প্রয়োজনবোধে নিজামকে সামরিক সাহায্যদানে স্বীকৃত হইলেন। পর বৎসর (১৭৮৯) কর্ণওয়ালিস নিজামের নিকট এক শক্তিসংঘ গঠনের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু ইহাতে টিপুকে গ্রহণ করিবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করা হইল না। টিপুকে এ-বিষয়ে কোন সংবাদও দেওয়া হইল না। ঐতিহাসিক উইলক্‌স্ (Wilks) ও সার্ জন ম্যাল্‌কম্ (Sir John Malcolm) কর্ণওয়ালিসের এই আচরণ টিপুর সহিত মিত্রতা-চুক্তির বিরোধী এবং টিপুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাব সামিল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।* এমতাবস্থায় টিপু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করিলে (১৭৮৯) তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হইল। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী ইংরাজদের নিকট সামরিক সাহায্য দাবি করিতে পারিতেন। সেই অনুসারে তিনি মাদ্রাজ সরকারের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াও কোন সাহায্য পাইলেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিস মাদ্রাজ সরকারের তীব্র নিন্দা করিলেন এবং মারাঠা ও নিজামের সহিত এক 'ত্রয়ী-শক্তি-মৈত্রী' (Triple Alliance) স্বাক্ষর করিয়া টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কর্ণওয়ালিস স্বয়ং ইংরাজ বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রথমে তিনি টিপুর বিরুদ্ধে সাফল্যলাভে সমর্থ না হইলেও শেষ পর্যন্ত টিপুকে পরাজিত করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তম-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিলেন (মার্চ, ১৭৯২)। এই সন্ধি দ্বারা

প্রত্যক্ষ কারণ

ত্রয়ী-শক্তি-মৈত্রী (Triple Alliance)

* Vide, *An Advanced History of India*, pp. 656-57.

ইংরাজগণ মালাবার, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসহ দিন্দিগলে ও বড়মহল দখল করিল। ইহা ভিন্ন, কুর্গ-এর রাজার উপর মহীশূরের সুলতানের স্থলে ইংরাজদের প্রভুত্ব স্বীকৃত হইল। কৃষ্ণা হইতে পেনার নদী পর্যন্ত রাজ্যাংশ নিজামকে এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল মারাঠাগণকে ছাড়িয়া দিতে হইল। এইভাবে টিপুর রাজ্যের অর্ধেকাংশ ইংরাজ-মারাঠা-নিজাম মিত্রসংঘ কর্তৃক অধিকৃত হইল।

শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি (১৭৯২)

ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস কিভাবে টিপু সুলতানকে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন সে-বিষয়ে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির পর কর্ণওয়ালিস সমগ্র মহীশূর রাজ্য দখল করেন নাই বলিয়া ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকে, যথা, মানরো (Munro), থর্ণটন (Thornton) প্রভৃতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের যুদ্ধ তখন আসন্নপ্রায়। এমতাবস্থায় টিপুর সহিত ফরাসীদের মিত্রতাস্থাপনের যথেষ্ট আশংকা ছিল। তদুপরি শান্তিস্থাপনের জন্য ডাইরেক্টর সভার পুনঃপুনঃ নির্দেশ, ইংরাজ সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক অসুস্থতা প্রভৃতি কারণেও কর্ণওয়ালিস শান্তিস্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন। অব্যবস্থিতচিত্ত নিজাম এবং দুর্ধর্ষ মারাঠাদের মন হইতে মহীশূর রাজ্যের ভীতি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হওয়া ইংরাজ স্বার্থের দিক দিয়াও বাঞ্ছনীয় ছিল না। ইহা ভিন্ন, সমগ্র মহীশূর রাজ্য ইংরাজ অধিকারভুক্ত হইলে নিজাম ও মারাঠাগণের ঈর্ষা ও বিদ্বেষের উদ্রেক হইত। সুতরাং ব্রিটিশ স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলেও শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধিস্থাপনে কর্ণওয়ালিসের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা করা যাইতে পারে না।

কর্ণওয়ালিসের মহীশূর নীতির সমালোচনা

কর্ণওয়ালিস বিধি (Cornwallis Code): গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিল (Supreme Council) কর্তৃক ১৭৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত গৃহীত আইন-কানুন একত্রে 'কর্ণওয়ালিস বিধি' বা Cornwallis Code নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল আইন-কানুন পূর্বে পাস করা সংস্কার, সেগুলির পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংযোজন সব কিছুর সমষ্টি।

'কর্ণওয়ালিস বিধি' (Cornwallis Code)

কর্ণওয়ালিস বিধির প্রধান সংস্কার ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ইহা ভিন্ন, পুলিস-ব্যবস্থার সংস্কার, বাণিজ্য বিষয়ক সংস্কার, বিচার-সংক্রান্ত সংস্কার প্রভৃতি লইয়া কর্ণওয়ালিস বিধির কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

কর্ণওয়ালিসের সংস্কারসমূহ লইয়া কর্ণওয়ালিস বিধি গঠিত

কর্ণওয়ালিস বিধি সম্পূর্ণ হওয়ার অর্থই ছিল কর্ণওয়ালিসের যাবতীয় সংস্কার কার্যের পরিসমাপ্তি। এই বিধি গঠনের ফলে যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা মোটামুটি পরবর্তী কুড়ি বৎসর কাল অপরিবর্তিত অবস্থায়ই চালু ছিল।

কর্ণওয়ালিস বিধি পরবর্তী বিশ বৎসর অপরিবর্তিত

কর্ণওয়ালিস কোডের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ইহার ভারতবাসীর সততায় অবিশ্বাস, ভারতীয় কর্মচারীদের কর্মদক্ষতার উপর অনাস্থা এবং সেই অনুপাতে ইওরোপীয় ও ইওরোপীয় কর্মচারীদের সততায় বিশ্বাস এবং তাহাদের কর্মদক্ষতায় আস্থা। প্রশাসনের যে-কোন বিভাগেই ইওরোপীয়দের দক্ষতা, কর্ণওয়ালিসের মতে ছিল অবিসংবাদিত।

ভারতবাসীর সততা ও কর্মদক্ষতায় অবিশ্বাস কর্ণওয়ালিস কোডের প্রধান বৈশিষ্ট্য

কর্ণওয়ালিসের সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল মিতব্যয়িতা প্রবর্তন, প্রশাসনিক জটিলতা দূরীকরণ এবং প্রশাসনকে দুর্নীতি-মুক্তকরণ। কর্ণওয়ালিস মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, কোম্পানির কর্মচারী-পদে ইংরাজদের নিয়োগ করা এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত বেতন দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কর্ণওয়ালিস-কোডের ফলে বাংলার সরকারী এবং বেসরকারী কর্মচারী-পদে বিরাট সংখ্যক ইংরাজ চাকরিতে নিযুক্ত হইল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজ তথা ইওরোপীয় কর্মচারীদের, পুলিস বিভাগে নিযুক্ত ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি-পরায়ণতা ব্যাপকভাবে দেখা দিলে কর্ণওয়ালিসের ইওরোপীয়দের সততায় অটুট বিশ্বাস টলিতে লাগিল। ইংরাজ কর্মচারীদিগকেও আইনের আওতায় আনা একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া তিনি ইংরাজ, এবং ইওরোপীয় মাত্রকেই আইন এবং বিচারালয়ের অধীনে আনিলেন এবং রাজস্ব ও বিচারবিভাগকে পৃথকীকৃত করিলেন। কিন্তু ইহাতেও ইওরোপীয় কর্মচারীদের দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

কর্ণওয়ালিসের সংস্কারের উদ্দেশ্য

ইওরোপীয় কর্মচারীদের দুর্নীতি-পরায়ণতা

ইওরোপীয় কর্মচারীদিগকে আইন ও বিচারালয়ের অধীনে আনয়ন

লর্ড কর্ণওয়ালিসের কৃতিত্ব বিচার (Estimate of the Achievements of Lord Cornwallis) : লর্ড কর্ণওয়ালিসের কৃতিত্ব বিচারে সকল ঐতিহাসিক সম-মত পোষণ করেন না। মিঃ পেন্‌সন্‌ লর্ড কর্ণওয়ালিসকে কোন মৌলিক প্রতিভার অধিকারী বলিয়া মনে করেন না। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী শাসনকর্তাদের কাজের উপর ভিত্তি করিয়া নিজের সংস্কার-নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কারের প্রতি বিষয়েরই পূর্বাভাস ওয়ারেন হেস্টিংস্‌-এর কার্যাবলীতে পাওয়া যায়। লর্ড কর্ণওয়ালিস ওয়ারেন হেস্টিংসের সংস্কারগুলিকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন, এই মাত্র। টমসন ও গ্যারেট্‌-এর মতে কর্ণওয়ালিস ব্রিটিশ মর্যাদা যাহা বহুলাংশে ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল তাহা পুনরুদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেই কাজে তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে কর্ণওয়ালিস ছিলেন ভারতের সর্বপ্রথম সৎ এবং সততায় অটল গবর্ণর। তিনি যে-আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন তাহার ফলে পরবর্তী কালে অপর কোন গবর্ণর সেই সততার আদর্শচ্যুত হইতে সাহসী হন নাই।

পেন্‌সন্‌-এর মত —মৌলিক প্রতিভাহীন

টমসন-গ্যারেট্‌ : হেস্টিংসের কাজকে স্থায়িত্বদান

সততার আদর্শ স্থাপন

সেটোন কার-এর মতে যদিও কর্ণওয়ালিস ওয়েলেসলী বা ডালহৌসীর সহিত সম-পর্যায়ভুক্ত হইবার মত প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন না, তথাপি প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করিবার জন্য তাঁহার

সেটোন কার-এর মত —বণিকদের প্রশাসনিক রূপান্তর

চেষ্টা এবং সাফল্য কোম্পানির বণিকদিগকে প্রকৃত প্রশাসকে রূপান্তরিত করিয়াছিল।

আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, অধ্যবসায় প্রভৃতি

তাঁহার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, আদর্শ সফল করিবার জন্য অদম্য চেষ্টা এবং অধ্যবসায়, সর্বোপরি লোকের অধিকার রক্ষার জন্য তাঁহার আগ্রহ তাঁহাকে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসকদের খ্যাতি-সম্পন্ন অনেকের সহিতই সম-মর্যাদাসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

নানাবিধ গুণের আধার

ঐতিহাসিক এস্পিন্যালের মতে কর্ণওয়ালিস নানাবিধ গুণের যথা আত্মপ্রত্যয়, কর্তব্য-নিষ্ঠা, নম্রতা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, অপরের সহিত মিত্রসুলভ ব্যবহার, অপরের যুক্তিসম্মত মতামত গ্রহণের মত উদারতা, অপরের অন্তরে আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিবার ক্ষমতা প্রভৃতির আধার ছিলেন।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয়

কোম্পানির কর্মচারীদের তিনি দুর্নীতিমুক্ত করিয়া এবং কোম্পানির প্রশাসনে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া তিনি ব্রিটিশ ভারত শাসনের ইতিহাসে নিজের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। এ-কথা অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহার রাজস্ব সংস্কার, বিচার-বিভাগীয় সংস্কার এবং পুলিস-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্যই প্রধানত ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয়। তিনি তাঁহার সংস্কার-কার্যে সর্বদাই ইংলণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া চলিয়াছিলেন এবং এ-কথা তিনি কখনও মনে স্থান দেন নাই যে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড কোন ক্ষেত্রেই সমতুল্য ছিল না। এখানেই তাঁহার সংস্কারের সর্বাপেক্ষা কঠোর সমালোচনা করা হইয়া থাকে। তিনি ইওরোপীয়-দিগকে কোম্পানির পদস্থ কর্মচারী-পদে নিয়োগ করিয়া, জমিদারদের হাত হইতে পুলিসী-ব্যবস্থার দায়িত্ব কাড়িয়া লইয়া ভারতীয়দের প্রতি তাঁহার অবিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে ইওরোপীয় কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ নহে। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে তাঁহার এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছিল।

ইংরাজ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সকল সংস্কার প্রবর্তন

ভারতীয়দের সততায় অবিশ্বাস : ইওরোপীয়দের সততায় অন্ধবিশ্বাস

কার্যক্ষেত্রে তাঁহার মত ভ্রান্ত প্রমাণিত

ইংলিশ আইন ভারতবর্ষে প্রবর্তন

বিচার-সংক্রান্ত সংস্কারে ভারতীয় আইন-কানুনের প্রয়োগ তিনি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। ইংলিশ আইন-কানুন তিনি ভারতবর্ষে প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলিশ সামাজিক স্বাধীনতা বা ব্যক্তি-স্বাধীনতা অবশ্য তিনি ভারতবর্ষে প্রবর্তন করেন নাই।

ভারতীয়দের মর্যাদা আঘাতপ্রাপ্ত

তাঁহার শাসনকালে ভারতবাসীর মর্যাদা ও পদ উভয়ই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিচে নামিয়া আসিয়াছিল। তিনি একজন ভারত-বাসীকেও কোন মর্যাদাপূর্ণ কর্মচারী-পদে নিযুক্ত করেন নাই বা রাখেন নাই।

জন্ শোর, জেমস্ গ্রাণ্ট, জর্জ বার্লো কর্ণওয়ালিসের কৃতিত্বের অংশীদার

এ-কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কর্ণওয়ালিসের সংস্কারের কৃতিত্ব জন-শোর, জেমস্ গ্রাণ্ট, জর্জ বার্লো প্রভৃতি কর্মচারীও আংশিকভাবে দাবি করিতে পারেন।

সনন্দ বা চার্টার এ্যাক্ট, ১৭৯৩ (Charter Act, 1793) : ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ অনুসারে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে আরও বিশ বৎসর বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় কোম্পানিকে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে এক তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি হয়। ভারতীয় বাণিজ্য সকল ইংরাজ বণিক এবং বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের নিকট-ই সমভাবে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া-ই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার উঠাইয়া দিলে স্বার্থলোলুপ ইংরাজ বণিকদের পরস্পর প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের ভারতীয় বাণিজ্যের সর্বনাশ ঘটিবে এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখিতে সমর্থ হইলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট্ দ্বারা আরও বিশ বৎসরের জন্য ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য-পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হইল। অবশ্য বৎসরে মোট তিন হাজার টন পণ্যদ্রব্যাদি সাধারণ বণিকগণের ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিবার অতি নগণ্য অধিকারও ঐ চার্টার দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছিল। কোম্পানির গঠনতন্ত্র-সম্পর্কিত কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই চার্টারে করা হয় নাই।

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বিশ বৎসরের জন্য পুনরায় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ

সার্ জন শোর, ১৭৯৩-'৯৮ (Sir John Shore, 1793-'98) : ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর-জেনারেল-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে সার্ জন শোর গবর্ণর-জেনারেল-পদে উন্নীত হইলেন। সার্ জন শোর বাংলা দেশের রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে তৎকালীন ইংরাজ কর্মচারিগণের মধ্যে সর্বাধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সহিত তাঁহার আলোচনামূলক বিতর্কের ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

সার্ জন শোর-এর পূর্ব-পরিচয়

শোর ছিলেন নিরপেক্ষ-নীতির (non-intervention policy) সমর্থক। গবর্ণর-জেনারেল-পদে উন্নীত হইয়াই তিনি দেশীয় শক্তিগুলির পরস্পর দ্বন্দ্ব হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিতে কৃতসংকল্প হইলেন। জন শোর-এর এই 'নিরপেক্ষ-নীতি' বহু ঐতিহাসিক কর্তৃক কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছে। সেই সময়ে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি হ্রাসের জন্য শোরকে দায়ী করা হইয়া থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে শোর কর্তৃক অনুসৃত নীতির যৌক্তিকতা পরিস্ফুট হইবে।

তাঁহার নিরপেক্ষ-নীতি

মারাঠাগণ ছিল ইংরাজদের সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ এবং শক্তিশালী শত্রু। সাময়িকভাবে মারাঠাদিগকে ইংরাজদের পক্ষে আনা অসম্ভব না হইলেও তাহাদের পক্ষে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যাইতে অধিক বিলম্ব লাগিবে না, এ-কথা জন শোর ভালভাবেই জানিতেন। মারাঠা-মহীশূর মৈত্রীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার মত শক্তি সেই সময়ে ইংরাজদের ছিল না। উপযুক্ত সেনানায়কের অভাব, ইংরাজ সেনাবাহিনীর মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্য, সর্বোপরি তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের ফলে ঋণগ্রস্ততা সেই সময়ে ইংরাজদের

দুর্বলতার কারণ ছিল। সার্ জন শোর মনে করিতেন যে, মারাঠাদিগকে যদি বহিরাক্রমণের ভীতি হইতে মুক্ত রাখা যায় তাহা হইলে মারাঠাদের রাজ্যপঞ্চক—পেশওয়া, সিন্ধিয়া, হোলকার, ভোঁসলে, গাইকোয়াড় —আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। অথচ ইংরাজদের সহিত শত্রুতার কোন কারণ ঘটিলে তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া ইংরাজদের বিরোধিতা করিবে। এ-বিষয়ে শোর কর্ণওয়ালিসের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিতেছিলেন মাত্র। জন শোর-এর সপক্ষে এ-কথাও বলা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশ শক্তির প্রসার সাধনের জন্য মাঝে মাঝে যুদ্ধ-বিরতির প্রয়োজন ছিল। জন শোর-এর শাসনকালের শান্তি-নীতি এই প্রয়োজনও কতকাংশে মিটাইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

জন শোর-এর 'নিরপেক্ষ-নীতি'র সমালোচনা

জন শোর তাঁহার নিরপেক্ষ-নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া ব্রিটিশদের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ নিজাম রাজ্য আক্রমণ করিলে নিজাম ইংরাজদের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তানুসারে সামরিক সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু জন শোর তাঁহার নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া কোন সাহায্য প্রেরণ করিলেন না। ফলে খর্দা (Kharda)-এর যুদ্ধে মারাঠা-হস্তে নিজামের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল (১৭৯৫)। ইংরাজদের প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গে নিজাম স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হইলেন। সুতরাং তিনি আত্মরক্ষার্থ ফরাসীদের সহায়তালাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

খর্দা-এর যুদ্ধ (১৭৯৫): মারাঠা হস্তে নিজামের পরাজয়

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সার্ জন শোরকে নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আসফ-উদ্-দৌলার মৃত্যু হইলে অযোধ্যায় এক উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। অযোধ্যা কোম্পানির আশ্রিত রাজ্য এই কারণে উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্বে জন শোর হস্তক্ষেপ করিলেন। তিনি আসফ্-উদ্-দৌলার ভ্রাতা সাদাত আলি এবং আসফ্-উদ্-দৌলার অবৈধ সন্তান ওয়াজীর আলির মধ্যে ওয়াজীর আলিকেই প্রথমে সমর্থন করিলেন। কিন্তু পরে ওয়াজীর আলির দাবি অবৈধ বিবেচনা করিয়া শোর সাদাত আলিকে অযোধ্যার নবাব-পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। বিনিময়ে তিনি এলাহাবাদ কোম্পানির রাজ্যভুক্ত করিলেন এবং বাৎসরিক ৭৬ লক্ষ টাকা অর্থ-সাহায্য কোম্পানিকে দেওয়া হইবে এই শর্তে অযোধ্যার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। অবশ্য জন শোর কর্তৃক নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগের পশ্চাতে কাবুল-অধিপতি জামান শাহের ভারত-আক্রমণের ভীতি অন্যতম কারণ ছিল, এ-কথা মনে করা অনুচিত হইবে না।

শোর-এর অযোধ্যা-নীতি

শোর-এর কার্যকালের শেষভাগে ইংরাজ কর্মচারিবর্গের মধ্যে এক প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি বাধ্য হইয়াই তাহাদের কতকগুলি দাবি মানিয়া লইলেন। ইংরাজ কর্মচারিবর্গের কার্য-নীতি ও নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত নিয়ম (Cornwallis Code)-এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবেই এই বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা হউক, এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই জন শোরকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। ইংলণ্ডে পৌঁছিবার পর তাঁহাকে লর্ড টেন্‌মাউথ (Lord Teignmouth) উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল।

ইংরাজ কর্মচারিগণের বিদ্রোহ: শোর-এর প্রতি প্রত্যাবর্তনের আদেশ

অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি (Society, Economy and Culture in Eighteenth century India) : অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় সমাজ উহার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য লইয়া চলিতেছিল। দীর্ঘকাল মুসলমানদের পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দুদের পূর্বেকার রক্ষণশীলতা সামান্য দূর হইলেও হিন্দু সমাজ তখনও জাতিপ্রথা, খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে বাছবিচার ত্যাগ করিতে পারে নাই। হিন্দু সমাজ উহার মৌল রক্ষণশীলতা, জাতিভেদ প্রথাজনিত ছুৎমার্গ তখনও ত্যাগ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার অনুপস্থিতি হিন্দু সমাজের সর্বনিম্ন, উপেক্ষিত, অবহেলিত শ্রেণী মুসলমান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। এইভাবে সমাজ তখন হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজ—এই প্রধান দুই সমাজে বিভক্ত ছিল।

হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা

মুসলমান সমাজের জাতিপ্রথা-বিহীনতা

সামাজিক কার্যকলাপের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম। গ্রামে বসবাস করা, পরিবার-পরিজন প্রতিপালন করা, নিজ ধর্মমত অনুসরণ করিয়া চলা সবই গ্রাম্য-জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই চলিতেছিল। গ্রাম হইতেই খাদ্য, বস্ত্র, গৃহের সরঞ্জাম প্রভৃতি সংগ্রহ করা চলিত, গ্রামই ছিল তখনকার সমাজ জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনের কর্মকেন্দ্র।

সামাজিক জীবনের ও কার্যকলাপের ভিত্তি গ্রাম

গ্রামবাসী তখন প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা, কৃষক তথা শ্রমিক শ্রেণী, উচ্চজাতি-সম্মিলিত উচ্চ শ্রেণী ও শাসনকার্যে সংযুক্ত অল্প সংখ্যক ব্যক্তি। উচ্চ জাতি বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তথা জমি-মালিক শ্রেণীকে বুঝাইত। মুসলমানদের মধ্যেও অনুরূপ উচ্চ শ্রেণী (শরিফ) এবং সাধারণ শ্রেণী অর্থাৎ, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি ছিল।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণী বিদ্যমান

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রাম্য জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষি। তখনকার অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা। খাদ্য-শস্য ভিন্ন দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যেমন, তেল, কাপড়-চোপড়, লোহার জিনিসপত্র, ফল, শাকসবজি সব কিছুই গ্রামে উৎপন্ন হইত। জনসংখ্যার তুলনায় কৃষিজমির প্রাচুর্য থাকায় কৃষিযোগ্য জমির একাংশ এমনি পতিত থাকিয়া যাইত। গৃহপালিত পশু, গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতির চারণভূমি হিসাবে প্রত্যেক গ্রামেই বিস্তীর্ণ চারণভূমি থাকিত। মুঘল আমলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ কৃষিজমি চাষের অধীনে আনা হইয়াছিল। কৃষিজমি সম্পর্কে অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, খুব অল্প পরিমাণ জমিই তখন বিক্রয় করা হইত। ব্রিটিশ অধিকারের পূর্বাবধি পাঞ্জাবে কৃষিজমি বিক্রয়ের কথা কেহ ভাবিতে পারিত না।*

সাংস্কৃতিক জীবন

গ্রামে গ্রামে কৃষিজমি ভিন্ন চারণভূমি : জমি বিক্রয় অভাবনীয়

* "We are apt to forget that propo ty in land as a transferable marketable commodity, absolutely owned and passing fr m hand to hand like any chattel, is not an ancient institution but a modern development." Sir George Campbell, Vide, *History of the Freedom Movement in India :* Tarachand p. 98.

ভূমিদাস প্রথা ভারতে জানা ছিল না। জমিদার বা ঊর্ধ্বতন মালিকের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিকারের পথ ছিল গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া। স্বভাবিকভাবেই ইওরোপে যেমন ভূমিদাস প্রথা ছিল যাহাতে কোন কৃষক জমি ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত না বা গেলেও তাহাকে ধরিয়া আনা চলিত, সেই ধরনের ভূমিদাসত্ব ভারতে দেখা দেয় নাই।

ভূমিদাসত্ব অবিদিত

গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনের প্রথম এবং সর্বপ্রধান ভিত্তি কৃষি হইলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনে নানা ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। এগুলির মধ্যে তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, স্বর্ণশিল্প, চর্মশিল্প প্রভৃতি নানাপ্রকার শিল্প স্বাভাবিকভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কারিগরি শিল্পীদের মধ্যে কামার, কুমার, স্বর্ণকার, তাঁতী, ছুতোর মিস্ত্রী, গুড় ও অপরাপর মিষ্টি প্রস্তুতকারক, নৌকা প্রস্তুতকারক প্রভৃতি নানা ধরনের দক্ষতাসম্পন্ন লোক ছিল।

বিভিন্ন শিল্প ও কারিগর

গ্রামের অভ্যন্তরে এবং এক গ্রামের সহিত অপর গ্রামের ব্যবসায়-বাণিজ্য গ্রামের হাট, বাজারের মাধ্যমে চলিত। গৃহপালিত পশু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যও হাট বসিত। গ্রামের উদ্বৃত্ত ফসল ও সামগ্রী ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিয়া শহরাঞ্চলে চালান দিত। বাহির হইতে গ্রামাঞ্চলে আমদানি একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে। গ্রামের উদ্বৃত্ত সামগ্রী, শস্য ইত্যাদি ব্যবসায়ীরা অতি সামান্য দামে কিনিয়া লইয়া শহরাঞ্চলে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিত। সেই লাভের অর্থ গ্রামে বিনিয়োগ করা হইত না। ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক যে-সমৃদ্ধি আশা করা যাইত সেইরূপ কোন কিছু হইত না। রাজস্ব অর্থ দ্বারা দিতে হইত।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের শান্তি বজায় রাখা, অপরাধের বিচার করা, সালিশী করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অপরাধের শাস্তি বিধান করা হইত। মকদ্দম নামক রাজকর্মচারী গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল। পঞ্চায়েতের উপর কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বা প্রভাব বিস্তারের সুযোগ মকদ্দমের ছিল না।

গ্রাম পঞ্চায়েত

পাশ্চাত্য দেশের মত ভারতবর্ষের শহরগুলি শিল্পকেন্দ্র এবং গ্রামগুলি কৃষিকেন্দ্র এইভাবে বিভক্ত ছিল না। গ্রাম ও শহরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাদ্যশস্য সব কিছু প্রধানত গ্রামেই উৎপন্ন হইত। নবাব, বাদশাহ্ বা স্থানীয় রাজ-পরিবারের রুচিসম্মত জিনিসপত্র প্রস্তুতের জন্য দিল্লী, আগ্রা এবং ভারতের অপরাপর শহরে কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভারতের অর্থনীতির কাঠামো গ্রামের উপরই নির্ভরশীল ছিল। শহরে, নগরে প্রস্তুত সামগ্রীর অতি সামান্যই গ্রামাঞ্চলে প্রেরিত হইত। শহর এবং গ্রামাঞ্চলের শিল্পীদের দাদন দিয়া দালালরা নিজে অথবা তাহাদের গোমস্তাদের মাধ্যমে উৎপন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করিত।

গ্রাম ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি : শহরাঞ্চলে অতি সামান্য ধরনের শিল্পোৎপাদন

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম প্রধান রপ্তানিকারী দেশ হিসাবে পরিগণিত ছিল। সপ্তদশ শতক এবং অষ্টাদশ শতকের

প্রথম ভাগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভারতবর্ষ হইতে সূতী ও রেশমবস্ত্র, মসলা, নীল, চিনি, ঔষধ, দামী পাথর এবং অন্যান্য সুন্দর সুন্দর জিনিস আমদানি করিত। পরিবর্তে রেশমের কাঁচামাল, সোনা, রূপা, টিন, প্রবাল, জিঙ্ক, গন্ধক, সীসা, তামা প্রভৃতি আমদানি করিত।* ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় অর্থ ধনবান বণিক-সম্প্রদায়ই বিনিয়োগ করিত। শেঠ পরিবার এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

বৈদেশিক বাণিজ্য

শিল্প ও সংস্কৃতির দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, গ্রামে টোল ও মক্তব্ থাকিলেও রাজকার্যে যোগদানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শহরাঞ্চলে শিক্ষা গ্রহণের রীতি তখনও চালু ছিল। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল শাস্ত্র—হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক—সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিয়া গ্রামের ধর্ম-জীবনকে সাহায্য করা। শহরের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যরূপ। সেখানকার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজকর্মচারী-পদ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের যাবতীয় জটিলতা, আদালতে বিচারের সময় বাদী বা বিবাদী পক্ষ সমর্থন করা—অর্থাৎ উকিল-মোক্তারের কাজ শিক্ষা করা। গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবন অনেকটা ধর্মাশ্রয়ী ছিল। উৎসব, পূজাপার্বণ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সময়ে সঙ্গীত, কীর্তন, মাফেল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইত। সূক্ষ্ম কারিগরি শিল্প যেমন, হাতীর দাঁতের কাজ, তামা, রূপা বা সোনা প্রভৃতি ধাতুর উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য প্রভৃতি প্রধানত শহরাঞ্চলে অর্থাৎ নবাব-বাদশাহ্, রাজা-মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায়ই গড়িয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যাপারে প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা পৃথিবীর অপরাপর অঞ্চলের অগ্রগতির সহিত পা ফেলিয়া চলিতে পারে নাই। ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় আধুনিকতা এবং আধুনিক প্রয়োজনের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। অবশ্য হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থায় দর্শনের স্থান ছিল খুবই উচ্চে। ব্যাকরণ, আইন, ন্যায়, কাব্য, বেদান্ত, সাংখ্য, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি শিক্ষার মান খুবই উচ্চ ছিল। মুসলমানদের মধ্যেও আদব (সাহিত্য), হিক্‌মত (দর্শন), হাদিস (ইতিহাস ও ঐতিহ্য), তিব্ (ঔষধ), রিয়াজী ও হৈয়ত (অংকশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার) চর্চা তখন ছিল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

স্থাপত্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দী সপ্তদশ শতাব্দীর তুলনায় অনেক পশ্চাৎপদ ছিল, বলা বাহুল্য। ঔরংজেবের সংকীর্ণ ধর্মমত এজন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

স্থাপত্য ও চিত্রকলা

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ হইতে ইংরাজদের রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের ফলশ্রুতি হিসাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। তাহাদের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্প আঘাতপ্রাপ্ত হইল। কাঁচামাল রপ্তানি করিয়া তৈরী সামগ্রী আমদানি তাহারা করিতে লাগিল। অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের ফল হিসাবে উৎপাদনের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহার ফলে ভারতের নিজস্ব শিল্পজাত সামগ্রীর

ইংরাজ প্রাধান্যের ফলে অর্থনৈতিক পরিবর্তন

* Balkrishna : *Commercial relations*, p. 31. Tarachand : *History of Freedom Movement in India* vol. i. pp. 155-57.

সহিত অসম প্রতিযোগিতায় ক্রমেই ভারতীয় শিল্প বিনাশপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ইংরাজদের রাজস্ব-নীতিও ভারতের চিরাচরিত রাজস্ব-নীতির অবসান ঘটাইয়া ভারতবাসীর কৃষি-পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনিল। একদিকে ক্ষুদ্রশিল্পের বিনাশ অপর দিকে জমি মালিকানার স্থায়িত্ব (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) লোককে কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল করিয়া তুলিল। কৃষি-পদ্ধতির কোন উন্নতি সাধন না করিয়া কৃষিজমির উপর অত্যধিক চাপ দিবার ফলে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। দারিদ্র্য ও নিম্নমানের জীবনধারণ ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ইংরাজদের প্রয়োজনের তাগিদে নূতন শিক্ষাক্রম শুরু হইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এ-বিষয়ে তেমন পরিবর্তন সাধিত না হইলেও ইংরাজদের অধীনে চাকুরি গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই ইংরাজী শিক্ষার দিকে ক্রমে ঝুঁকিতে লাগিল।

অধ্যায় ১১

লর্ড ওয়েলেস্‌লী : অধীনতামূলক মিত্রতা : মহীশূর রাজ্যের পতন

(Lord Wellesley : Subsidiary Alliance : Fall of Mysore)

লর্ড ওয়েলেস্‌লীর নিয়োগ (১৭৯৮-১৮০৫) : তাঁহার সমস্যা (Appointment of Lord Wellesley : His difficulties) : সার্ জন শোর-এর পর লর্ড ওয়েলেস্‌লী, আর্ল অব্ মর্ণিংটন (Lord Wellesley, Earl of Mornington) গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলেন। কোম্পানির ইংল্যণ্ডস্থ বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল (Board of Control)-এর কমিশনার হিসাবে লর্ড ওয়েলেস্‌লী কোম্পানির ভারতীয় রাজ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতালাভের যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। বস্তুত, একমাত্র লর্ড কার্জন ভিন্ন অপর কোন গবর্ণর-জেনারেল ভারতীয় শাসনব্যবস্থা বা কোম্পানির সমস্যা সম্পর্কে এইরূপ সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া ভারতবর্ষে আসেন নাই। তিনি ছিলেন বিদ্বান, প্রতিভাবান ও অভিজাতসুলভ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। তিনি যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতি কার্যকরী করিবার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সুযোগের আনুষঙ্গিক জটিলতারও সীমা ছিল না।

কোম্পানির রাজ্য সম্পর্কে ওয়েলেস্‌লীর পূর্ব-অভিজ্ঞতা

সার্ জন শোর-এর নিরপেক্ষতার নীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া টিপু সুলতান শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিতেছিলেন। ফরাসী, তুর্কী প্রভৃতি জাতির সাহায্যলাভের জন্য টিপু তখন সচেষ্ট। খরদা-এর যুদ্ধে ইংরাজদের প্রতিশ্রুত সাহায্য না পাওয়ায় নিজাম স্বভাবতই ইংরাজদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া ফরাসী সহায়তা গ্রহণে উদ্‌গ্রীব। এ-দিকে সিন্ধিয়ার শক্তিও ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাবুলের অধিপতি জামান শাহ্ ভারত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এই সংবাদও তখন ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। সর্বোপরি ব্রিটিশ জাতির উপর পরোক্ষভাবে আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি মিশরের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এইরূপ অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে যখন ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক পরিস্থিতি সমস্যাসংকুল হইয়া উঠিয়াছে তখন প্রয়োজন ছিল একজন বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও নির্ভীক শাসকের। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর নিয়োগ এই প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মিটাইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

ওয়েলেস্‌লীর সমস্যা

ওয়েলেস্‌লীর উদ্দেশ্য ও নীতি (Wellesley's Aims and Policy) : ওয়েলেস্‌লী চাহিয়াছিলেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তিকে সর্বাত্মক করিয়া তুলিতে। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য একটি ক্ষুদ্র অংশ জুড়িয়া থাকুক ইহা তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষী মন কখনও সমর্থন করিত না। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত করাই ছিল তাঁহার অন্তরের বাসনা। ইহা ভিন্ন, ভারতবর্ষ হইতে ফরাসী প্রভাব দূর করিয়া ফরাসীদের পক্ষে সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা বিফল করাও ছিল তাঁহার অন্যতম ইচ্ছা।

তাঁহার উদ্দেশ্য

উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিবার জন্য স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করিবার প্রয়োজন হইল। পরস্পর-বিবদমান ভারতীয় নৃপতিগণকে ইওরোপীয় সামরিক সাহায্য গ্রহণে উদ্‌গ্রীব দেখিয়া ওয়েলেস্‌লী তাঁহাদিগকে ব্রিটিশ সামরিক সাহায্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই নীতি ওয়েলেস্‌লীর পূর্বে লর্ড ক্লাইভ এবং বিশেষভাবে ওয়ারেন হেস্টিংস্ কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছিল। ওয়েলেস্‌লী এই নীতিকে ব্যাপকভাবে এবং চরম নিপুণতার সহিত কার্যকরী করিয়াছিলেন। সামরিক অধীনতার ভিত্তিতে গঠিত বলিয়া ওয়েলস্‌লী তাঁহার প্রবর্তিত নীতির নামকরণ করিলেন 'অধীনতামূলক মিত্রতা' (Subsidiary Alliance)। (১) যে-সকল দেশীয় নৃপতি অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইবেন তাঁহারা ইংরাজদের বিনা অনুমতিতে অপর কোন রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বা কোনপ্রকার আলাপ-আলোচনা চালাইতে পারিবেন না। (২) দেশীয় নৃপতিবর্গের মধ্যে যাঁহারা শক্তিশালী তাঁহারা নিজ সেনাবাহিনী রাখিতে পারিবেন, কিন্তু সেই সেনাবাহিনীর সেনাপতি হিসাবে একজন ইংরাজকে নিযুক্ত করিতে হইবে। (৩) অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তিতে আবদ্ধ নৃপতিগণের রাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্ব কোম্পানি গ্রহণ করিবে, কিন্তু সেইজন্য যে-সেনাবাহিনী পোষণ করিতে হইবে উহার ব্যয় সংকুলানের জন্য তাঁহাদিগকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজ্যাংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে। সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রিটিশ প্রাধান্য এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া ওয়েলেস্‌লী তাঁহার অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই নীতি সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিতে পারিলে ফরাসীদের পক্ষে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করা সম্ভব হইবে না, ইহাও ওয়েলেস্‌লী উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

তাঁহার নীতি : 'অধীনতামূলক মিত্রতা'

অধীনতামূলক মিত্রতার শর্তাদি

তদানীন্তন ভারতের সর্বাপেক্ষা হীনচেতা দুর্বলচিত্ত ও আত্মমর্যাদাহীন হায়দরাবাদের নিজাম সর্বপ্রথমেই কোম্পানির সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। জন শোর নিজামকে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে খরদা-এর যুদ্ধের কালে সাহায্য না দেওয়ার ফলে নিজাম ব্রিটিশের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। ওয়েলেস্‌লীর চেষ্টায় নিজাম পুনরায় ব্রিটিশের পক্ষেই শুধু আসিলেন না, ব্রিটিশের অধীনে মিত্রে পরিণত হইলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয় বাবদ নগদ অর্থের পরিবর্তে তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ রাজ্যাংশ

অধীনতামূলক মিত্ররাজ্যসমূহ

হায়দরাবাদ

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্রম-বিস্তার
(লর্ড ওয়েলেসলীর কালে)

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ

১৮০২ – ৪ খ্রীঃ

অধীনতামূলক মিত্র-রাজ্য

কোম্পানিকে ছাড়িয়া দিলেন। এই সকল অঞ্চল হস্তান্তরিত জেলা নামে অভিহিত হইত।*

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকাল হইতেই অযোধ্যায় সামরিক নিরাপত্তার ভার প্রধানত কোম্পানির উপর ন্যস্ত ছিল। কোম্পানির সাহায্যের বিনিময়ে অযোধ্যার নবাবকে বাৎসরিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হইত। জন শোর-এর আমলে উহা বাৎসরিক ৭৬ লক্ষ টাকায় স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ওয়েলেসলী ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের সহিত এক নূতন চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তির দ্বারা পূর্বেকার বাৎসরিক অর্থপ্রদানের পরিবর্তে নবাব রোহিলখণ্ড, গোরক্ষপুর এবং দোয়াব-এর একাংশ কোম্পানির নিকট হস্তান্তরিত করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে অযোধ্যার নবাব নিজের শৃঙ্খলাহীন, সামরিক কার্যে অনিপুণ সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিলেন। উহার পরিবর্তে অধিক সংখ্যক কোম্পানির সৈন্য অযোধ্যায় মোতায়েন করা হইল। এইভাবে অযোধ্যা রাজ্যও অধীনতামূলক মিত্ররাজ্যে পরিণত হইল।

অযোধ্যা

মারাঠা-নেতা নানা ফড়নবীশ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের (Maratha Confederacy) কেহই ইংরাজদের অধীনতামূলক কোন শর্ত গ্রহণ করিয়া মিত্রতা স্থাপনের কথা কল্পনাও করে নাই। কিন্তু ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের মৃত্যু হইলে সুযোগ্য নেতার অভাবহেতু মারাঠা-রাজ্যপঞ্চকের মধ্যে আর একতা বলিয়া কিছুই রহিল না। তাহাদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিলে পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর রাজ্য যশোবন্ত রাও হোলকার কর্তৃক আক্রান্ত হইল। যশোবন্ত রাও পেশওয়া ও সিন্ধিয়ার যুগ্ম-বাহিনীকে পুণার সন্নিকটে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন। দ্বিতীয় বাজীরাও পলাইয়া গিয়া ব্রিটিশের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধ হইলেন (১৮০২)। পেশওয়া কর্তৃক ব্রিটিশের অধীনতা স্বীকার মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের একতার মূলে চরম আঘাত হানিল। ইহার পর বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরায় ভোঁসলে ও সিন্ধিয়াও অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন।

মারাঠারাজ্য : পেশওয়া, ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া

ইতিমধ্যে (১৭৯৯) তাঞ্জোর রাজ্যে এক উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব দেখা দিলে ওয়েলেসলী তাঞ্জোর-এর রাজাকে ব্রিটিশ অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণে রাজী করাইয়াছিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা প্রাপ্তির বিনিময়ে তাঞ্জোরের রাজা নিজ রাজ্যের শাসনভার ইংরাজদের নিকট ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অনুরূপ পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া ওয়েলেসলী সুরাট রাজ্যটি ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। সুরাটের নবাব অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার ভ্রাতার দাবি অস্বীকার করিয়া ওয়েলেসলী সুরাট অধিকার করিয়া লইলেন। নবাবের ভ্রাতাকে অবশ্য সামান্য ভাতা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-সম্পর্কের প্রারম্ভ-কাল হইতেই সুরাটে ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল।

অধিকৃত রাজ্যসমূহ :

তাঞ্জোর

সুরাট

* These were known as the 'Ceded Districts'.

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাহায্যে মহম্মদ আলি নবাব-পদ লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে কর্ণাটের শাসনব্যবস্থায় ইংরাজদের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। কর্ণাটেও একপ্রকার দ্বৈত-শাসন প্রচলিত ছিল এবং উহার ফলে কর্ণাটে এক ব্যাপক অব্যবস্থা স্বভাবতই দেখা দিয়াছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলির মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পুত্র উম্‌দাত-উল্‌-উমরা কর্ণাটের নবাব হইলেন। কিন্তু মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হইতেই মহম্মদ আলি এবং তাঁহার পুত্র উম্‌দাত টিপু সুলতানের সহিত মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে গোপনে পত্রালাপ করিতেছিলেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গেলে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উম্‌দাত-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলেস্‌লী কর্ণাট রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন, উম্‌দাত-এর পুত্রের দাবি উপেক্ষা করিয়া অপর একজনকে তিনি নবাব-পদে স্থাপন করিলেন।

কর্ণাট

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ১৭৯৯ (**The Fourth Anglo-Mysore War**): শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির (১৭৯২) পর কর্ণওয়ালিসের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, টিপু সুলতান আর কোনদিন ইংরাজদের বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হইবেন না। কিন্তু টিপুর ন্যায় স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমিক সুলতানের পক্ষে শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির অপমানজনক শর্ত মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। তিনি ফ্রান্স, মরিশাস, কাবুল, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে দূত পাঠাইয়া সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে মহীশূরের যে-সকল দুর্গ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তিনি সেগুলির সংস্কার-সাধন করিলেন। দেশের কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেনাবাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং উহাকে উন্নত ধরনের সামরিক শিক্ষাদান করিয়া টিপু নিজ রাজ্যকে পুনরায় সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন।

টিপু সুলতানের যুদ্ধ প্রস্তুতি

টিপু ফরাসী বিপ্লবীদল 'জেকোবিন' ক্লাব (Jacobin Club)-এর সদস্য হইলেন। ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদে টিপুকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ফরাসী স্বেচ্ছাসেবকও ম্যাঙ্গালোর-এ আসিয়া উপস্থিত হইল (১৭৯৮)। ওয়েলেস্‌লী ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াই টিপুর সামরিক প্রস্তুতির উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিলেন এবং অনতিবিলম্বে টিপুর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-মারাঠা-নিজাম মৈত্রী (Triple Alliance) পুনঃ-সঞ্জীবিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। নিজামকে স্বপক্ষে আনিতে ওয়েলেস্‌লীকে বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু মারাঠাগণ ব্রিটিশ পক্ষে যোগদান করিল না। কেবল ব্রিটিশ স্বার্থের উদ্দেশ্যেই ওয়েলেস্‌লী টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেছেন না, এইরূপ ধারণা সৃষ্টির জন্য ওয়েলেস্‌লী জয়লাভের পর টিপুর রাজ্যের একাংশ মারাঠা-দিগকে অর্পণ করিবেন ঘোষণা করিলেন।

ফরাসী সাহায্যলাভ

অতঃপর ওয়েলেস্‌লী টিপুর নিকট তাঁহার ফরাসী মৈত্রী সম্পর্কে কৈফিয়ত চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু টিপুর জবাব সন্তোষজনক নহে বিবেচনা করিয়া ওয়েলেস্‌লী তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই টিপু ব্রিটিশ সেনাপতি স্টুয়ার্টের (Stuart) হস্তে সদাশির-এর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। ইহার পর সেনাপতি হ্যারিস

সদাশির, মলভেলী ও শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধ

(Harris)-এর নিকট মলভেলী (Malvelly)-এর যুদ্ধে তিনি পুনরায় পরাজিত হইলেন। টিপু নিজ রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষার উদ্দেশ্যে তথায় সৈন্যাপসারণ করিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষার্থে যুদ্ধ করিবার কালে দুঃসাহসী বীর টিপু প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইংরাজগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

টিপুর মৃত্যু

টিপুর পরাজয় ও মৃত্যুর পর ওয়েলেস্‌লী মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। নিজামকেও এক ক্ষুদ্রাংশ দেওয়া হইল। মারাঠাগণকে কতকগুলি শর্তাধীনে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে একাংশ দেওয়া হইলে তাহারা উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইল। এইভাবে ব্যবচ্ছেদের পর মহীশূর রাজ্যের যে-ক্ষুদ্র অংশ রহিল, উহা হায়দর আলি কর্তৃক যে হিন্দু রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিল সেই বংশের জনৈক উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, এই রাজবংশ ব্রিটিশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন রহিল। টিপুর দুই পুত্র ও পরিবার-পরিজনদের প্রথমে ভেলোর-এ বন্দী করিয়া রাখা হইল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদিগকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। মহীশূর রাজ্যের পতনে ভারতে ইংরাজ-বিদ্বেষী সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির বিলোপ ঘটিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ফরাসীপ্রভাব বিস্তারের পথও সেই সঙ্গে বন্ধ হইয়াছিল।

মহীশূর রাজ্য-ব্যবচ্ছেদ

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, ১৮০৩-'০৫ (The Second Anglo-Maratha War, 1803-'05): লর্ড ওয়েলেস্‌লী যখন গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন তখন মারাঠাজাতির ইতিহাসে এক ভীষণ দুর্দিন দেখা দিয়াছে। নিয়তির পরিহাসে-ই যেন মারাঠাজাতির নেতৃবৃন্দ প্রায় একই সময়ে কালের করালগ্রাসে পতিত হইলেন। মাহদ্‌জী সিন্ধিয়া, অহল্যাবাঈ, নানা ফড়নবীশ—সকলেই একে-একে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মারাঠাদের মধ্যে এক অতি সংকীর্ণ স্বার্থপরতার দ্বন্দ্ব শুরু হইল। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও যশোবন্ত রাও হোল্‌কার প্রভৃতি এক আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। বাজীরাও সিন্ধিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিয়া হোল্‌কার যশোবন্ত রাও-এর পুণা অধিকারের চেষ্টা প্রতিহত করিতে গিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন (১৮০২)। বাজীরাও আত্মরক্ষার্থ পলাইয়া গিয়া ইংরাজদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। এই মিত্রতা-চুক্তি ব্যাসিন (Bassein)-এর সন্ধি নামে পরিচিত। এ-দিকে যশোবন্ত রাও বাজীরাওকে পরাজিত করিবার পর তাঁহার স্থলে তাঁহার ভ্রাতা অমৃতরাওকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ব্যাসিনের সন্ধির শর্তানুসারে ইংরাজ সৈন্য দ্বিতীয় বাজীরাওকে পুনরায় পেশওয়া-পদে স্থাপন করিল। ইংরাজ-সহায়তায় বাজীরাও পেশওয়া-পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হইবার ফলে পেশওয়াতন্ত্র তথা সমগ্র মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ব্রিটিশের তাঁবেদারে পরিণত হইলেন, স্বাধীনতা বলিয়া তাঁহার আর কিছু রহিল না।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণ

ব্যাসিনের সন্ধি

ভোঁসলে, সিন্ধিয়া প্রভৃতি কর্তৃক প্রতিকারের চেষ্টা

ভোঁসলে এবং সিন্ধিয়া ব্যাসিনের সন্ধির অপমানজনক শর্তের কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। নামেমাত্র হইলেও মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের প্রধান নেতা পেশওয়ার এইরূপ আত্মবিক্রয়ে মারাঠা-জাতির অপমান তাঁহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন না। তাঁহারা পেশওয়া কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যাসিনের সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অব্যবস্থিতচিত্ত পেশওয়া বাজীরাও গোপনে মারাঠা নেতৃবর্গকে সমর্থন করিলেন। বরোদার গাইকোয়াড় অবশ্য এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রহিলেন। মারাঠা বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া নিজামের রাজ্যের সীমান্তদেশে উপস্থিত হইলে ইংরাজগণ প্রমাদ গণিল। মারাঠা সেনাবাহিনীকে অপসারণের জন্য তাঁহারা মারাঠা নেতৃবর্গকে জানাইল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া ইংরাজগণ যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৮০৩)।

যুদ্ধ ঘোষণা (১৮০৩)

আর্থার ওয়েলেস্‌লী ও সেনাপতি লেক্

লর্ড ওয়েলেস্‌লীর ভ্রাতা সার্ আর্থার ওয়েলেস্‌লী (পরবর্তী কালে নেপোলিয়ন-বিজেতা ডিউক-অব্-ওয়েলিংটন) এবং সেনাপতি লেক্ (General Lake) ব্রিটিশ সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে সার্ আর্থার ওয়েলেস্‌লী আহম্মদনগর অধিকার করিলেন এবং অসই (Assaye)-এর যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের যুগ্মবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন (১৮০৩)। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিন্ধিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত রহিলেন। ভোঁসলের সেনাবাহিনী তখনও প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া চলিল। অরগাঁও (Argaon)-এর যুদ্ধে ভোঁসলের সেনাবাহিনী চূড়ান্ত-ভাবে পরাজিত হইলে ভোঁসলে ইংরাজদের সহিত দেওগাঁও (Deogaon)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। তিনিও ইংরাজদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রোবন্ধ হইয়া ওয়ার্দা নদীর পশ্চিম-তীরস্থ রাজ্যাংশ, কটক, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

অসই-এর যুদ্ধ

অরগাঁও-এর যুদ্ধ দেওগাঁও-এর সন্ধি

এ-দিকে সেনাপতি লেক্ আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করিয়া সম্রাট শাহ্ আলমকে মারাঠাদের অধীনতা-মুক্ত করিয়া ব্রিটিশের রক্ষণাধীনে আনিলেন। অতঃপর সিন্ধিয়াকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। লস্ওয়ারী (Laswari)-এর যুদ্ধে সিন্ধিয়া লেক্ কর্তৃক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া সুরজী-অর্জুনগাঁও (Surji-Arjangaon)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধির শর্তানুসারে সিন্ধিয়াকে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল, আহম্মদনগর, ভারুচ, অজান্তা পাহাড়ের পশ্চিমস্থ যাবতীয় স্থান, জয়পুর, যোধপুর ও গোয়াড়-এর উত্তরে সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত যাবতীয় স্থান ও দুর্গাদি ইংরাজদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইল। ইহা ভিন্ন, মুঘল সম্রাটের উপর সিন্ধিয়ার কোন প্রকার প্রভাব থাকিবে না এবং সিন্ধিয়ার রাজধানীতে একজন ব্রিটিশ 'রেসিডেন্ট' (Resident) উপস্থিত থাকিবেন এই সকল শর্তও সিন্ধিয়াকে মানিয়া লইতে হইল। এই পৃথক চুক্তি দ্বারা (২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮০৪) সিন্ধিয়া ব্রিটিশের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধ হইলেন।

লস্ওয়ারী-এর যুদ্ধ : সুরজী-অর্জুনগাঁও-এর সন্ধি

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে একদিকে যেমন মারাঠা শক্তি চিরতরে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বলীকৃত হইল, তেমনি অপর দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমাও যথেষ্ট বিস্তারলাভ করিল। ইহা ভিন্ন, এই যুদ্ধের ফলে মাদ্রাজ ও বাংলাদেশে ব্রিটিশ অধিকৃত স্থান সংযোজিত হইল। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জয়পুর প্রভৃতি রাজপুত রাজ্যগুলির উত্তর দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ফলে, এই সকল রাজ্যের সহিত ব্রিটিশের মিত্রতা স্থাপনের সুযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কারণ, এই সকল রাজ্য নিজ-নিজ নিরাপত্তার জন্যও ব্রিটিশের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন তখন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। ভরতপুর, বুন্দী, যোধপুর, জয়পুর, প্রভৃতি রাজ্য স্বভাবতই ব্রিটিশের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলাফল

হোল্‌কার ও ওয়েলেস্‌লী (Holker & Wellesley): দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলেস্‌লীকে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে হোল্‌কার সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু এইবার তিনি ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতা শুরু করিলেন। ব্রিটিশের মিত্রতাবদ্ধ রাজপুত রাজ্যগুলি আক্রমণ করিয়া তিনি চৌথ আদায়ের চেষ্টা করিলে ওয়েলেস্‌লী হোল্‌কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে প্রথমে হোল্‌কারেরই জয় হইল। তিনি কর্ণেল মন্‌সন্‌কে মুকুন্দদারার যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। হোল্‌কারের সাফল্যে ভরতপুরের রাজা ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া হোল্‌কারের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু উভয়ে দিল্লী অধিকার করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইলেন। ইহার পর 'দীগ' নামক স্থানে হোল্‌কার ও ইংরাজদের মধ্যে এক যুদ্ধ হইল। কিন্তু কোন পক্ষই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে পারিল না। এ-দিকে সেনাপতি লেক্ ভরতপুর পর পর চারিবার আক্রমণ করিয়াও অকৃতকার্য হইলেন। যাহা হউক, ভরতপুরের রাজা আর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুঝিতে চাহিলেন না। তিনি ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া ব্রিটিশের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। হোল্‌কারের বিরুদ্ধে ইংরাজগণ যুদ্ধে পুনরায় অগ্রসর হইবার পূর্বেই ওয়েলেস্‌লীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। এই কারণে হোল্‌কার আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন।

ব্রিটিশের পরাজয়

টিপু সুলতান, ১৭৮২-'৯৯ (Tipu Sultan, 1782-'99): হায়দর আলির পুত্র টিপু পিতার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও ইংরাজদের দুর্দমনীয় শত্রু ছিলেন। ভারত-ইতিহাসে টিপু তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের বলে এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়াছেন। টিপুর চরিত্র বর্ণনায় ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ কটূক্তি করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। পি. ই. রবার্টস (P. E. Roberts) টিপুকে 'নিষ্ঠুর বর্বর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গভর্ণর-জেনারেল কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে 'অসভ্য উন্মাদ' আখ্যা দিয়াছিলেন। স্যার্ আল্‌ফ্রেড্ লায়েল (Sir Alfred Lyall) টিপুকে 'দুর্ধর্ষ ধর্মোন্মত্ত, অশিক্ষিত মুসলমান' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মন্তব্য কেবল পক্ষপাত দোষে দুষ্ট নহে, সংকীর্ণ অনুদার মনোবৃত্তিরও পরিচায়ক। বস্তুত-পক্ষে টিপু যথেষ্ট শিক্ষিত, ধর্মভীরু ও দেশপ্রেমিক সুলতান ছিলেন। ফারসী,

উর্দু, কানাড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তাঁহার একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। সমসাময়িক কলুষতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। রাজনীতিক হিসাবেও তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইওরোপীয় মহাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁহার ব্রিটিশ-বিরোধী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। সমসাময়িক দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক। হায়দরের ন্যায় তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজগণই ছিল মহীশূর তথা অপরাপর ভারতীয় রাজ্যগুলির একমাত্র শত্রু। এই কারণে তিনি কোন অবস্থায়ই ইংরাজগণের সাহায্যপ্রার্থী হন নাই। নিজাম ও মারাঠাদের সহিত দ্বন্দ্বে টিপু ব্রিটিশ সাহায্য গ্রহণের কথা কল্পনায়ও আনেন নাই।* কূটকৌশলেও টিপু কম বিচক্ষণ ছিলেন না। তিনি ফ্রান্স, তুরস্ক, মরিশাস, কাবুল, আরব প্রভৃতি দেশে দূত প্রেরণ করিয়া ইংরাজ বিতাড়নের জন্য সাহায্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। টিপু ধর্মোন্মত্ত, অত্যাচারী শাসক ছিলেন এই অভিযোগ যে সত্য নহে, তাহা সমসাময়িক ইংরাজ লেখকদেরই বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হইবে। এডওয়ার্ড মোর (Edward More), মেজর ডিরোম (Major Dirom) প্রমুখ সমসাময়িক লেখকগণ টিপুর শাসনের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সার্ জন শোর টিপুর রাজ্যে কৃষক ও শ্রমিক-উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উইল্‌কস্ টিপুকে ধর্মান্ধ হিন্দু-বিদ্বেষী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে টিপুর যে-সকল চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে উইল্‌কসের মত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এ-কথা প্রমাণিত হইয়াছে। শাসনকার্যে টিপু স্বমত-পোষক ও স্বৈরাচারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মান্ধতার বা অত্যাচারী শাসনের অপবাদ ইংরাজ ঐতিহাসিকদের সংকীর্ণতা-প্রসূত, এ-কথা বলা যাইতে পারে।

টিপুর চরিত্র – ইংরাজ ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতিত্ব

টিপুর কার্যকলাপ (His Career and Achievements): টিপু তাঁহার পিতা হায়দর আলির সহিত দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সেনাপতি ব্রেইথ্‌ওয়েট্ (Braithwaite)-কে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন (১৭৮২)। হায়দর আলির মৃত্যুর পর টিপু তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সমাপনে অগ্রসর হইলেন। তিনিও হায়দর আলির ন্যায় দাক্ষিণাত্য হইতে ব্রিটিশ বিতাড়নের নীতি গ্রহণ করিলেন। টিপুর হস্তে পরাজয়ের ফলে বাধ্য হইয়াই ইংরাজগণকে ম্যাঙ্গালোর-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল (১৭৮৪)। এই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজামের নিকট এক শক্তিসংঘ গঠনের প্রস্তাব করেন। ইহাতে টিপুকে গ্রহণের কোন উল্লেখ ছিল না। ইংরাজ পক্ষের এইরূপ আচরণে টিপু ক্রুদ্ধ হইলেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ : ম্যাঙ্গালোর এর সন্ধি (১৭৮৪)

* "He, like his father, understood that Great Britain rather than any native power was the enemy, and he never leagued himself with her (Great Britain) against his neighbours". Roberts, p. 247.

ফলে, তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। এই যুদ্ধে অবশ্য তিনি সাফল্যলাভে সমর্থ হইলেন না। পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়া টিপু শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি দ্বারা নিজ রাজ্যের অধিকাংশ ইংরাজদের নিকট ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৯২)। কিন্তু টিপু শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির অপমান ভুলিলেন না। তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে ব্রিটিশ শক্তি নির্মূল করিবার উদ্দেশ্যে মরিশাস, ফ্রান্স, তুরস্ক, আরব, কাবুল প্রভৃতি দেশে সাহায্য চাহিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। সেই সময়ে ইওরোপে ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত যুদ্ধ চলিতেছিল। টিপুর সাহায্যার্থে কয়েকজন ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া উপস্থিত হইল। ওয়েলেস্‌লী গবর্ণর-জেনারেল হিসাবে ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াই টিপুর যুদ্ধ-প্রস্তুতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। এ-বিষয়ে তিনি টিপুর সহিত পত্রালাপ করিলেন, কিন্তু টিপুর জবাব অসন্তোষজনক এই অজুহাতে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ওয়েলেস্‌লী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রথম হইতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। টিপুর জবাবের যৌক্তিকতা বিচার না করিয়াই তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হইল। সদাশির, মলভেলী ও শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে টিপু পরাজিত হইলেন। শেষোক্ত যুদ্ধে টিপু যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইলেন (১৭৯৯)। চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে টিপু নিহত হইলে ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্রিটিশ-বিদ্বেষী রাজ্যের পতন ঘটিল। ইংরাজগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। টিপুর রাজ্যের একাংশ হায়দর আলির উত্থানের পূর্বে যে-হিন্দু রাজবংশ মহীশূরে রাজত্ব করিত সেই বংশের জনৈক উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইল। অবশিষ্টাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। নিজাম ইংরাজপক্ষে ছিলেন। সেইজন্য তিনিও মহীশূর রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশ লাভ করিলেন।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ—শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি (১৭৯২)

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ—টিপুর পরাজয় ও মৃত্যু (১৭৯৯)

[প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের বিশদ বিবরণ ক্রমান্বয়ে ১০৩-১০৫, ১০৫-১০৬ ১৫১-৫২ ও ১৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

টিপুর পতনের কারণ (**Causes of the Fall of Tipu**)**:** মহীশূর রাজ্যে অদ্যাপি একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, হায়দর-এর গঠিত রাজ্য তাঁহার পুত্র টিপুর হস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমেই এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, টিপুর পতন ও বিফলতাকে 'মহান পতন' বা *Magnificent failure* বলিয়া বর্ণনা করা অনুচিত হইবে না। তাঁহার পতনের পশ্চাতে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, টিপু হায়দর আলির নীতি অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র শ্রীরঙ্গপত্তমের নিরাপত্তার উপরই অধিক জোর দিয়াছিলেন। ইংরাজদের সহিত বিরোধিতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং নিজাম ও মারাঠাগণ ইংরাজদের পক্ষে চলিয়া যাইবার ফলে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে যে-পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, উহার পরিপ্রেক্ষিতে মহীশূর রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য

'মহান পতন' (Magnificent failure)

ব্যাপক ব্যবস্থা তিনি করেন নাই। হায়দর আলির জীবদ্দশায় শ্রীরঙ্গপত্তম শত্রুর অবরোধ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। টিপুও শ্রীরঙ্গপত্তমের নিরাপত্তার উপরই অত্যধিক জোর দিয়াছিলেন। রাজ্যের অপরাপর প্রতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া তিনি ভুল করিয়াছিলেন।

কারণ ঃ (১) রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি

দ্বিতীয়ত, টিপুর শাসনব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ধরনের স্বৈরাচার (Personal and autocratic)। তিনি সামরিক ও শাসন-সংক্রান্ত কার্যের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের উপরও দৃষ্টি রাখিতেন বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে সামরিক বা শাসনব্যবস্থা কতদূর কার্যকরী হইতেছিল সে-বিষয়ে তিনি তেমন অবহিত ছিলেন না।

(২) ব্যক্তিগত ও স্বৈরাচারী শাসনের ত্রুটি

তৃতীয়ত, টিপু সুলতান সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেন বটে, কিন্তু সংস্কার-কার্যের ক্ষিপ্রতা তাঁহার সংস্কারগুলির বিফলতা ডাকিয়া আনিয়াছিল। তাঁহার সংস্কার-কার্যাদি এই কারণে জনসাধারণের মঙ্গলসাধনে সমর্থ হয় নাই।

(৩) জনকল্যাণকর সংস্কারের অভাব

চতুর্থত, টিপুর আমলে হায়দর আলির গঠিত অশ্বারোহী বাহিনীর দক্ষতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। টিপু অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির বা তাহাদের দক্ষতার দিকে তেমন মনোযোগী ছিলেন না।

(৪) অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর সংখ্যা ও ক্ষমতা হ্রাস

পঞ্চমত, টিপু দেশীয় নৃপতিগণের সহায়তালাভে সমর্থ হন নাই। মারাঠাগণ ও টিপু সম্মিলিতভাবে ইংরাজদের বিরোধিতা করিলে দাক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ প্রাধান্য বিলুপ্ত হইত সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন, বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরণ করিয়া টিপু কেবলমাত্র মৌখিক সহানুভূতিই লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কেহই তাঁহাকে সাহায্যদানে অগ্রসর হয় নাই। অল্পসংখ্যক ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক টিপুকে সাহায্য করিতে আসিয়া তাঁহার প্রতি ওয়েলেস্‌লীর সন্দেহ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি করিয়াছিল মাত্র।

(৫) বহিরাগত সাহায্যের অভাব

টিপুর কৃতিত্ব-বিচার (Tipu's Estimate) ঃ ভারত-ইতিহাসে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে যাঁহারা আমরণ চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে টিপু ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমিক, বীর যোদ্ধা। আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া ইংরাজদের সহিত মিত্রতা স্থাপনের কথা তাঁহার অন্তরে স্থান পায় নাই। ব্রিটিশের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধ হইয়া টিপু অনায়াসে নিজ রাজ্য ভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্বদেশপ্রীতি, তাঁহার আত্মমর্যাদাবোধ তাঁহাকে এই অধীনতামূলক মিত্রতা প্রত্যাখ্যানে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল। কূটনীতি ক্ষেত্রেও টিপু বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বহিরাগত সাহায্যে ব্রিটিশ শক্তি নাশ করিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সাহায্য তিনি পান নাই। তথাপি পরাধীনতা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াই তিনি শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শক্তির সহিত এককভাবে যুদ্ধ করিয়া

টিপুর স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনচিত্ততা

চলিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে শত্রুহস্তে তাঁহার মৃত্যু তাঁহার অপরিসীম স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনচিত্ততার সাক্ষ্য বহন করিবে সন্দেহ নাই। তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। সমসাময়িককালের ব্যভিচার, নীচতার ঊর্ধ্বে থাকিয়া এবং ভগবানের প্রতি স্থির বিশ্বাস রাখিয়া টিপু সুলতান ভারতবর্ষের দেশপ্রেমিক শাসকদের শ্রেষ্ঠ কয়েকজনের অন্যতম হিসাবে স্থান করিয়া লইয়াছেন। দেশ রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

সমসাময়িক শিক্ষার মান অনুযায়ী টিপু শিক্ষিত-ই ছিলেন বলা যাইতে পারে। তিনি কানাড়ী, উর্দু ও ফারসী ভাষায় অনর্গলভাবে কথা বলিতে পারিতেন। তিনি একটি ভাল গ্রন্থাগারও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি এ-কথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার এবং দেশের প্রকৃত শত্রু হইল ইংরাজগণ। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ইওরোপে ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত যুদ্ধ শুরু হইলে দূরদর্শী টিপু ইংরাজদের শত্রু ফরাসীদের সাহায্য লাভের জন্য ফ্রান্সে দূত পাঠাইয়াছিলেন। অনুরূপ কাবুলের জামান শাহের সাহায্য চাহিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন। টিপু তাঁহার শাসনকালের প্রায় সব সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটাইয়াছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যেও তিনি প্রজাবর্গের অবস্থার উন্নতিকল্পে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ত্রুটি করেন নাই। এডোয়ার্ড মুর, মেজর ডিরোম প্রভৃতি টিপুর শাসনকার্যে দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। জন শোর টিপু কর্তৃক তাঁহার অধীন কৃষক প্রজাবর্গের স্বার্থ রক্ষা ও তাহাদের উন্নতি সাধনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উইলক্স, কিরক্প্যাট্রিক, রেনেল প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী এবং বাওরিং, রবার্টস্ ও হার্টন প্রভৃতি আধুনিক ঐতিহাসিকগণ টিপুকে স্বৈরাচারী, নৃশংস, ধর্মোন্মত্ত, অত্যাচারী শাসক বলিয়া অপবাদ দিয়াছেন। মেজর ডিরোমের মতে টিপু তাঁহার শত্রু, যথা ইংরাজদের প্রতি নৃশংস ছিলেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি সহিষ্ণু নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। এই সকল বৈশিষ্ট্যের কথা টিপুর শ্রীঙ্গেরী পত্রাদি (Shringheri Letters) হইতে জানা যায়। টমাস মানরো তাঁহার নূতন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণের অদম্য উৎসাহের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কর্মক্ষমতা ছিল অসাধারণ এবং নিজ দেশকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

শিক্ষা ও নানা ভাষায় পারদর্শিতা

ইংরাজদের বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও কাবুলের সাহায্য প্রার্থনা

তাঁহার কৃতিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের ভিন্ন ভিন্ন মত

ওয়েলেসলীর কৃতিত্ব-বিচার (Critical Estimate of Lord Wellesley): ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য গঠনে যে-সকল গবর্ণর-জেনারেল অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, ওয়েলেসলী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

(১) কোম্পানির ইতিহাসের এক সমস্যা-সংকুল মুহূর্তে ওয়েলেসলী গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন এবং একে-একে সেই সকল সমস্যার সমাধান করিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য-সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

কোম্পানির সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা

(২) ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে সর্বাধিক দৃঢ়চেতা ব্রিটিশ-বিরোধী টিপু সুলতানকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া দাক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ শক্তিকে অপ্রতিহত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ওয়েলেস্‌লীর অন্যতম কীর্তি হইল মারাঠা শক্তির ধ্বংস-সাধন।

মহীশূর রাজ্যের পতন

(৩) পেশওয়া, সিন্ধিয়া, ভোঁসলে প্রভৃতিকে তিনি ব্রিটিশ শক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অনুসৃত নীতিই পরবর্তী কালে লর্ড ডালহৌসী অনুসরণ করিয়াছিলেন।

মারাঠা-শক্তি বিনাশ

(৪) ওয়েলেস্‌লী যখন ভারতের গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছিল। হায়দরাবাদ ও মহীশূর রাজ্যে ফরাসী প্রভাব যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছে দেখিয়া তিনি তাঁহার 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' (Subsidiary Alliance) দ্বারা নিজামকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ শক্তির উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন। মহীশূর রাজ্যের পতন, অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ রাজ্যগুলি হইতে ফরাসীদের বিতাড়ন প্রভৃতির ফলে ভারতবর্ষে ফরাসী প্রভাব বিস্তারের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল।

ফরাসী প্রভাব দূরীকরণ

(৫) ভারতবর্ষ হইতে ফরাসীদের বিতাড়িত করিবার পরোক্ষ উপায় হিসাবে ওয়েলেস্‌লী ফরাসী বাণিজ্য-ঘাটি মরিশাস আক্রমণের সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অভাবে তিনি উহা কার্যকরী করিতে পারেন নাই। সিংহল ও বাটাভিয়া হইতে ফরাসীদের মিত্রপক্ষ ওলন্দাজগণকে বিতাড়নের পরিকল্পনাও কর্তৃপক্ষের অনুমতির অভাবে তিনি কার্যকরী করিতে পারেন নাই।

মরিশাস সিংহল ও বাটাভিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা

(৬) নেপোলিয়ন বোনাপার্টি মিশরের মধ্য দিয়া ভারতে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে মিশরে যুদ্ধ শুরু করিলে ওয়েলেস্‌লী মিশরের সাহায্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অবশ্য এই সৈন্যদলকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে হয় নাই, কারণ ইতিপূর্বেই নেপোলিয়ন মিশর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

মিশরে সামরিক সাহায্য প্রেরণ

(৭) পারস্যে ফরাসী প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনাশের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষভাবে পারস্যের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতিতে বাধাদানের জন্য জন ম্যালকম্ (John Malcolm)-এর নেতৃত্বে পারস্যের রাজসভায় একটি মিশন (Mission) প্রেরণ করেন। এই মিশন পারস্যদেশে ব্রিটিশের পক্ষে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক উভয় প্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ম্যালকম্ মিশন

(৮) ওয়েলেস্‌লী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। অযোধ্যা, সুরাট, কর্ণাট প্রভৃতি রাজ্যের প্রতি তাঁহার আচরণ ত্রুটিপূর্ণ হইলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি যে তাঁহার

আমলে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইজন্য তাঁহাকে একজন 'Stout annexationist' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁহার অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়া দেশীয় নৃপতিগণের স্বেচ্ছাচারিতার পথ প্রস্তুত করিয়াছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তৃতি

(৯) ডক্টর স্মিথ্ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ, অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়েলেস্‌লী সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু ওয়েলেস্‌লী সুদৃঢ় অভ্যন্তরীণ শাসনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেন না, এ-কথা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। বিচার-ব্যবস্থা, রাজস্ব-নীতি প্রভৃতি যথাযথ পরিচালনার উপরই শাসন-ব্যবস্থার দক্ষতা ও দৃঢ়তা নির্ভরশীল, এ-কথা তিনি নিজে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

শাসনব্যবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা

(১০) ইংলণ্ড হইতে নবাগত ইংরাজ কর্মচারিবর্গের ভারতীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি ফোর্ট উইলিয়ামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। ডাইরেক্টর সভা অবশ্য ওয়েলেস্‌লীর এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন নাই। তাঁহারা এই কলেজটিকে ভারতীয় ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন

(১১) ব্যক্তি-চরিত্র বুঝিবার মত অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার ছিল। মেট্‌কাফ (Metcalfe), মানরো (Munro), এল্‌ফিন্‌স্টোন্ (Elphinstone), ম্যাল্‌কম্ (Malcolm) প্রভৃতি ক্ষমতাবান শাসকবৃন্দকে ওয়েলেস্‌লীই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি

(১২) ওয়েলস্‌লীর রাজ্যবিস্তার নীতি ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষের ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। ওয়েলেস্‌লী অনেক ক্ষেত্রে এমন স্বাধীনভাবে চলিতেন যে, সেই স্বাধীনতা কর্তৃপক্ষের অবমাননার সমতুল্য হইয়া পড়িত। বিশেষত তাঁহার যুদ্ধ-নীতির ফলে কোম্পানির ঋণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ ঋণগ্রস্ততা স্বভাবতই বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিল। এমন সময়ে হোল্‌কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া কর্ণেল মন্‌সন্ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে ওয়েলেস্‌লীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। তথাপি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে ওয়েলেস্‌লীর নিকট অশেষ ঋণী ছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য।

তাঁহার উপর প্রত্যাবর্তনের আদেশ

ওয়েলেস্‌লীর সংস্কার (Reforms of Wellesley): ওয়েলেস্‌লী ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তাঁহার কার্যকালের সকল সময়েই বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন। মহীশূরের যে-রাজ্যাংশ ব্রিটিশ অধিকারে আসিয়াছিল এবং মালাবারের যে-অংশ লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানির রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন সেই সকল স্থানের জমি জরিপ করিবার জন্য তিনি ডক্টর ফ্রান্সিস্ বুকানন-কে নিযুক্ত করেন। শুধু

তাহাই নহে, ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়েলেস্‌লী স্বয়ং নানাপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল তথ্য হইতে দেশের কৃষি, কৃষি-ব্যবস্থা, কৃষি-পরিস্থিতি সব-কিছু সম্পর্কে পরবর্তী কালে ভারত সরকার সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অপরাপর তথ্য, যেমন, নানা ধরনের কৃষিকার্যে সহায়ক পশু, বিভিন্ন ধরনের কৃষিজমি, কি কি ধরনের ফসল উৎপন্ন হয় প্রভৃতি তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন। দেশের জলবায়ু, নানা ধরনের শিল্প, নানা ধরনের উৎপন্ন সামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের ঔষধ, নানাপ্রকার খনি ও খনিজ সম্পদ, বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে তথ্য, সবকিছু সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রাখিয়া পরবর্তী কালে সরকারের পক্ষে উন্নয়নকার্যে অগ্রসর হইবার ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছিলেন।

কৃষি

বিচারকার্যে অযথা বিলম্ব এবং বিভিন্ন বিচারালয়ে অত্যধিক সংখ্যক মামলা-মকদ্দমা সঞ্চিত হইবার ফলে যে-অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্য প্রথমে তিনি মকদ্দমা যাহাতে অযথা কেহ করিতে না আসে সেইজন্য মকদ্দমা চালু করিতে (১) কোর্ট ফি পুনরায় চালু করেন। পূর্বে ইহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। (২) আপীল করিবার আইন-কানুনও পূর্বাপেক্ষা কঠোর করা হইল। (৩) সহকারী জজের (Assistant Judges) সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইল। (৪) সদর দেওয়ানী আদালতের মকদ্দমার সংখ্যাও অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় লর্ড ওয়েলেস্‌লী স্থির করিলেন যে, গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিল সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারের কাজ আর করিবেন না। এজন্য ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনজন জজের উপর এই দায়িত্ব দেওয়া হইল। পরে (১৮০৭) এই সংখ্যা চারিজন করা হয়।

বিচার-সংক্রান্ত সংস্কার

লর্ড ওয়েলেস্‌লী জমিদারদের রায়তদের উচ্ছেদ করিবার, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। জমিদারি যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয় অথবা রাজস্ব আদায়ের অসুবিধায় নিলাম না হয় সেই সুবিধার জন্য তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি

লর্ড ওয়েলেস্‌লী ভারতে নবাগত ইংরাজ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ফোর্ট উইলিয়ামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। ডাইরেক্টর সভা অবশ্য এই কলেজটিকে ভারতীয় ভাষা শিক্ষার কলেজে রূপান্তরিত করেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্যের পরিপূর্ণতা : মারাঠা শক্তির পতন

(Completion of British Ascendancy in India : Downfall of the Marathas)

না-হস্তক্ষেপ নীতি (Policy of Non-intervention)**: লর্ড কর্ণওয়ালিস** (**দ্বিতীয়বার**), ১৮০৫ (**Lord Cornwallis Again**) **:** লর্ড ওয়েলেসলীর অগ্রসর-নীতি কোম্পানির কর্তৃপক্ষের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল, এ-কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ওয়েলেসলীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়া তাঁহার স্থলে পূর্ব-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শান্তিনীতির সমর্থক লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পুনরায় গবর্ণর-জেনরেল-পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করা হইল। ভারতে পৌঁছিয়াই তিনি সিন্ধিয়া ও হোল্‌কারের সহিত শান্তিস্থাপনে সচেষ্ট হইলেন। এজন্য তিনি সিন্ধিয়াকে গোয়ালিয়র, গোয়াড়, আগ্রা ব্যতীত যমুনা নদীর পশ্চিমতীরস্থ যাবতীয় স্থান ফিরাইয়া দিতে রাজী হইলেন। এমন কি, দিল্লীও তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে তিনি প্রস্তুত হইলেন। হোল্‌কারের সহিতও তিনি বলিতে গেলে যে-কোন শর্তে মিটমাট করিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন। সেনাপতি লেক্‌-কে এ-বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হইলে তিনি লর্ড কর্ণওয়ালিসের এই দুর্বলনীতির বিরোধিতা করেন। কিন্তু এ-বিষয়ে কোন কিছু সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই, ভারতে দ্বিতীয়বার গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিবামাত্র তিন মাসের মধ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিসের মৃত্যু ঘটে।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের দ্বিতীয়বার নিয়োগ (১৮০৫)

স্যার্ জর্জ বার্লো, ১৮০৫-'০৭ (**Sir George Barlow, 1805-'07**) **:** লর্ড কর্ণওয়ালিসের আকস্মিক মৃত্যুতে কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য স্যার্ জর্জ বার্লো অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। তিনিও লর্ড কর্ণওয়ালিসের না-হস্তক্ষেপ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিন্ধিয়ার সহিত এক নূতন চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। ইহার দ্বারা সুরুজী অর্জুনগাঁও-এর সন্ধির শর্তাবলীর কতক পরিবর্তন সাধিত হইল। চম্বল নদী ব্রিটিশ এবং সিন্ধিয়ার রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমারেখা বলিয়া স্বীকৃত হইল। ব্রিটিশ ও সিন্ধিয়ার মধ্যে পরস্পর সামরিক সাহায্যের শর্ত নাকচ করা হইল এবং রাজপুতনার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ না করিবার প্রতিশ্রুতি দান করা হইল। ইতিমধ্যে সেনাপতি লেক্ হোল্‌কারকে পরাজিত করিয়া পাঞ্জাবে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বার্লো ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে হোল্-

না-হস্তক্ষেপ নীতি : সিন্ধিয়া ও হোল্-কারের সহিত সন্ধি

কারকে তাঁহার স্বতরাজ্য ফিরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার সহিত মিটমাট করিয়া লইলেন।

নিজাম ও পেশওয়ার সম্পর্কে না-হস্তক্ষেপ নীতির ব্যতিক্রম

বার্লো জয়পুরের রাজার সহিত কোম্পানির মৈত্রী-চুক্তি নাকচ করিলেন, কারণ জয়পুর-রাজ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শর্তাবলী লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। না-হস্তক্ষেপ নীতির (Policy of non-intervention) সমর্থক হইলেও হায়দরাবাদের নিজাম যখন অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন করিতে সচেষ্ট হইলেন তখন তাঁহাকে বাধাদানে ত্রুটি করিলেন না। এমন কি, ডাইরেক্টর সভার নির্দেশ সত্ত্বেও পেশওয়ার সহিত স্বাক্ষরিত ব্যাসিনের সন্ধির শর্তাবলী নাকচ করিতে তিনি রাজী হইলেন না। কারণ, দেশীয় নৃপতিগণের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলেই ব্রিটিশ শক্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিতে পারিবে, এ-কথা তিনিও বিশ্বাস করিতেন। জর্জ বার্লো-এর সামান্য দুই বৎসরের শাসনকালে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আর্থিক ঘাটতি উদ্বৃত্তে পরিণত হইয়াছিল।

কোম্পানির ঘাটতি উদ্বৃত্তে পরিণত

জর্জ বার্লো-এর শাসনকালে ভেলোর নামক স্থানে এক সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। ভেলোরের সেনানায়ক সার্ জন ক্র্যাডক্ (Sir John Cradock) মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড বেণ্টিঙ্ক (Lord William Bentinck)-এর অনুমতিক্রমে সেনাবাহিনীর পোশাক সম্পর্কে কতকগুলি পরিবর্তনের আদেশ দিয়াছিলেন। এই আদেশ অনুসারে সেনাবাহিনীকে একপ্রকার নূতন পাগড়ী (turban) ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, তাহাদের সকলকেই দাড়ি কামাইয়া ফেলিতে এবং কপালে তিলক না কাটিতে বা অপর কোনপ্রকার ধর্ম-সংক্রান্ত চিহ্ন ধারণ না করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল; সিপাহীদের মনে স্বভাবতই ধারণা জন্মিল যে, ইংরাজগণ তাহাদিগকে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার ফন্দি করিয়াছে। সেই সময়ে টিপুর পরিবার-পরিজনও ভেলোরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও সেনাবাহিনীর অসন্তোষ-বৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। যাহা হউক, সিপাহীরা ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই আকস্মিকভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং মোট ১১৩ জন ব্রিটিশ সৈন্য ও দুইজন অফিসার বা উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীকে হত্যা করিল। ইহার পর আর্কটের সৈন্যের সাহায্যে অমানুষিক অত্যাচার দ্বারা এই বিদ্রোহ দমন করা হইল এবং মাদ্রাজের গবর্ণর উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ও সেনাপতি ক্র্যাডক্‌কে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল।

ভেলোর-এর সিপাহী বিদ্রোহ

বিদ্রোহ দমন : বেণ্টিঙ্ক ও ক্র্যাডক্‌কে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দান

লর্ড মিণ্টো, ১৮০৭-১২ (Lord Minto 1807-'13) : ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। ইতিপূর্বে বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল (Board of Control)-এর সদস্য হিসাবে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন। পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস্ ও সার্ এলিজা ইম্পে'র ইম্পীচ্‌মেণ্ট-এর সময়ে কমন্স সভার প্রতিনিধি বা 'ম্যানেজার' (Manager) হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন।

লর্ড মিণ্টোর পূর্ব-অভিজ্ঞতা

লর্ড মিণ্টো না-হস্তক্ষেপ নীতি (Policy of non-intervention) অনুসরণ করিয়া চলিলেন বটে, কিন্তু প্রয়োজনবোধে উহা ত্যাগ করিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করিলেন না। বস্তুতপক্ষে প্রকৃত শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কোম্পানি সেই সময়ে ভারতবর্ষে যে পরিস্থিতিতে উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা চলিবে না।

না-হস্তক্ষেপ নীতি অনুসরণ—প্রয়োজন-বোধে উহার ব্যতিক্রম

লর্ড মিণ্টো যখন ভারতে গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন তখন ইওরোপে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র ইংরাজ-বিরোধী কার্যাদির প্রশ্রয় দেওয়া-ই ছিল নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পারস্যে দূত প্রেরণ করিয়া সেখানে ব্রিটিশ প্রভাব নাশের চেষ্টা শুরু করিলেন। লর্ড মিণ্টোও ব্রিটিশ স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাল্‌কম্‌কে পারস্যে প্রেরণ করিলেন। অবশ্য সেই সময়ে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের নিকট হইতে পরিচয়পত্রসহ সার্‌ হারফোর্ড জোন্‌স্‌ (Sir Harford Jones)-কে পারস্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। হারফোর্ড জোন্‌স্‌ পারস্য সম্রাটের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে সমর্থ হন। এই চুক্তি অবশ্য গবর্ণর-জেনারেলকে মানিয়া লইতে হইয়াছিল। এই চুক্তির শর্তানুসারে পারস্য সম্রাট নিজ রাজসভা হইতে ফরাসী দূতকে বিতাড়িত করিতে এবং পারস্যের মধ্য দিয়া কোন ফরাসী সৈন্যকে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে না-দিতে স্বীকৃত হইলেন। মিণ্টো এল্‌ফিন্‌স্টোন্‌ (Elphinstone)-কে কাবুলের আমীর শাহ্‌-সুজার রাজসভায় দূত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে শাহ্‌-সুজা নিজ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইবার ফলে এল্‌ফিন্‌স্টোন্‌ কাবুল পর্যন্ত আর অগ্রসর হইলেন না।

পারস্যে ম্যাল্‌কম্‌ মিশন

কাবুলে এল্‌ফিন্‌স্টোন্‌ মিশনের অসাফল্য

লর্ড মিণ্টো সিন্ধুর মুসলমান আমীরগণের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া সিন্দুদেশে ফরাসীগণ যাহাতে কোনপ্রকার স্থান না পাইতে পারে সেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো চার্লস্‌ মেট্‌কাফ্‌ (Charles Metcalfe)-কে রঞ্জিৎ সিংহের রাজসভায় দূত হিসাবে প্রেরণ করিলেন। মেট্‌কাফ্‌ রঞ্জিৎ সিংহের সহিত একটি চুক্তি-সম্পাদনে সমর্থ হইলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে শতদ্রু নদী ব্রিটিশ ও শিখ রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমারেখা বলিয়া বিবেচিত হইল। ফলে, ব্রিটিশ অধিকার শতদ্রু নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল।

সিন্ধুদেশের আমীরগণ ও পাঞ্জাবের রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মৈত্রী

নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধের কালে ইওরোপে টিল্‌জিট্‌ (Tilsit)-এর সন্ধি (১৮০৭) দ্বারা ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইলে স্বভাবতই ভারতবর্ষে ইংরাজগণের মনে ফ্রান্স ও রাশিয়ার যুগ্ম আক্রমণের ভীতির সঞ্চার হইল। কিন্তু ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মৈত্রী বিনষ্ট হইলে এই ভয় দূরীভূত হইল। ইহার পর লর্ড মিণ্টো ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ফরাসী-অধিকৃত বুর্‌বোঁ, মরিশাস প্রভৃতি দখল করিয়া

রুশ-ফরাসী আক্রমণের ভীতি

লইলেন। নেপোলিয়ন-কর্তৃক পোর্তুগাল অধিকৃত হইবার পর ভারতে পোর্তুগীজ-অধিকৃত স্থানগুলির প্রধান কেন্দ্র গোয়া ইংরাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল। হল্যাণ্ড নেপোলিয়ন কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, এই কারণে লর্ড মিণ্টো ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে জাভা দখল করিলেন। এইভাবে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে অল্পকালের জন্য হইলেও ফরাসী প্রাধান্যের কোন অস্তিত্ব রহিল না। লর্ড মিণ্টোর পররাষ্ট্র-নীতির প্রধান গুরুত্বই এই যে, উহা এশিয়ায় ফরাসী প্রভাব সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ভারত মহাসাগর অঞ্চলের ফরাসী-অধিকৃত স্থান দখল

লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের যে-কোন অজুহাতে হস্তক্ষেপ করিবার ফলে এক ব্যাপক অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশেষে অতিষ্ঠ হইয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান রেসিডেণ্টের বাসস্থান আক্রমণ করেন। তিনি ত্রিবাঙ্কুরের জনসাধারণকে বিধর্মী ব্রিটিশদের হাত হইতে জাতি ও ধর্ম রক্ষা করিতে আহ্বান জানাইলে রাজ্যের জনসাধারণ ব্রিটিশ সৈন্য ও কর্মচারিবর্গকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে হত্যা করে। অবশেষে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাহায্যে যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করা হইল। বিদ্রোহী দেওয়ান ভেলু তাম্পী (Velu Tampi) আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

ত্রিবাঙ্কুর বিদ্রোহ

এই বিদ্রোহ ভিন্ন মাদ্রাজের সেনাবাহিনীর কতকগুলি আর্থিক সুযোগ-সুবিধা উঠাইয়া দিলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। অবশ্য এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত হইবার পূর্বেই দমন করা হয়।

মাদ্রাজের সৈনিক বিদ্রোহ

চার্টার এ্যাক্ট্, ১৮১৩ (Charter Act of 1813) : ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট্-এর মেয়াদ শেষ হইলে নূতন চার্টার এ্যাক্ট্ পাস করা প্রয়োজন হইল। সেই সময়ে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ইওরোপের বাণিজ্য বন্দরগুলিতে ইংরাজ বাণিজ্য জাহাজের তথা ইংরাজ বণিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে, ইংরাজ বণিকদের মধ্যে ভারতীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিবার এক ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়াছিল। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরোধিতা পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে তীব্র আকার ধারণ করিলে কতকগুলি শর্তাধীনে ভারতীয় বাণিজ্য অপরাপর বণিক ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের নিকটও উন্মুক্ত করা হইল। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্বভাবতই এক তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইল। লর্ড গ্রেন্‌ভিল্ (Lord Grenville) ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসনব্যবস্থার স্থলে ব্রিটিশ সরকারের শাসন প্রবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসনের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী (Civil Servants) নিয়োগের প্রস্তাবও তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন প্রস্তাব-ই তখন পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইল না। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত

লর্ড গ্রেন্‌ভিল্-এর প্রস্তাব

চার্টার বা সনন্দে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষে বাণিজ্য পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার নাকচ করা হইল। এই চার্টারে 'শিক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব' এই নীতির স্বীকৃতির সর্বপ্রথম পদক্ষেপ। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অবশ্য আরও বিশ বৎসরের জন্য কেবলমাত্র চীনদেশীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। কোম্পানির অংশীদারগণ বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার নাকচের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইলে শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে, যদি কোম্পানি চীনদেশীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ও অপরাপর বাণিজ্যের মাধ্যমে ১০½ শতাংশ লভ্যাংশ অংশীদারদের দিতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে কোম্পানি উহার রাজস্ব আয় হইতে সেই পরিমাণ লভ্যাংশ যাহাতে তাহারা পায় সেই অর্থ যোগাইতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল এই যে, কোম্পানি ভারতীয়দের সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতির জন্য এবং দেশীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের উৎসাহদান এবং ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা (তখনকার দশ হাজার পাউণ্ড অপেক্ষা সামান্য অধিক) ব্যয় করিবে। কলিকাতার একজন বিশপ (Bishop) এবং তিনজন আর্ক-ডেকন্ (Arch-deacon) অর্থাৎ বিশপের নিম্ন-পর্যায়ের যাজক নিযুক্ত করিবার এবং কোম্পানির সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারিবর্গকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও এই চার্টারে করা হইল।

ভারতীয়দের শিক্ষা ও সাহিত্যে উৎসাহদান

কলিকাতার বিশপ নিয়োগ

লর্ড ময়রা বা লর্ড হেস্টিংস্, ১৮১৩-'২৩ (**Lord Moira or Lord Hastings, 1813-'23**)**:** লর্ড মিণ্টোর পর উনষাট বৎসর বয়সে লর্ড ময়রা যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন তখন অনেকের মনেই এই সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, তিনি হয়ত এই গুরুদায়িত্ব-পালনে সক্ষম হইবেন না। বস্তুত সেই সময়ে কোম্পানির সম্মুখীন সমস্যাগুলিও যেমন ছিল জটিল তেমনি ছিল বিভিন্ন ধরনের।

লর্ড ময়রার নিয়োগ

লর্ড ময়রা ও নেপাল (**Lord Moira & Nepal**)**:** ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব গোরক্ষপুর অঞ্চলটি কোম্পানিকে ছাড়িয়া দিলে কোম্পানি রাজ্যসীমা নেপালের সীমা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। নেওয়ারী বংশের রাজাকে পরাজিত করিয়া গুর্খা-নেতা পৃথ্বীনারায়ণ সমগ্র নেপাল দখল করিয়াছিলেন (১৭৬৮)। পার্বত্য অঞ্চলে স্বভাবতই সুনির্দিষ্ট সীমারেখা বলিয়া কিছু ছিল না। ফলে গুর্খা ও ব্রিটিশের মধ্যে সীমান্তরেখা-সংক্রান্ত সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল। এই ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ ঘটে। লর্ড ময়রা জেনারেল অক্টারলনী (General Ochterlony)-কে নেপালের সহিত যুদ্ধে সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে পরাজয় স্বীকার করিলেও শেষ পর্যন্ত অক্টারলনী নেপালের সেনাপতি অমর সিংহকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পরও কিছুকাল যুদ্ধ চলিল। শেষ পর্যন্ত সগৌলি (Sagauli)-এর সন্ধি (১৮১৬) দ্বারা উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। নেপালের রাজা

গুর্খা যুদ্ধ (১৮১৪-১৬)

সগৌলির সন্ধি :

কাঠমাণ্ডুতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট্ (Resident) রাখিতে স্বীকৃত হইলেন ইহা ভিন্ন, সিমলা, মুসৌরী, আলমোড়া, নৈনিতাল ও ল্যাণ্ডোর প্রভৃতি স্থানও ইংরাজদের অধিকারভুক্ত হইল। নেপালের রাজা সিকিম হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ময়রা সিকিম (Sikim)-এর সহিত মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। এই চুক্তি দ্বারা নেপাল হইতে সগৌলি সন্ধি দ্বারা প্রাপ্ত স্থানগুলির ক্ষুদ্র একাংশ সিকিম রাজ্যকে দেওয়া হইয়াছিল। গুর্খাদের সহিত যুদ্ধে সাফল্য লাভের পুরস্কারস্বরূপ লর্ড ময়রাকে মারকুয়েস-অব্-হেস্টিংস্ (Marquess of Hastings) উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল (১৮১৭)।

সিকিম রাজ্যের সহিত সন্ধি

লর্ড ময়রার 'লর্ড হেস্টিংস' উপাধি লাভ

পিণ্ডারি দমন (Suppression of the Pindaris) : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পিণ্ডারি নামক এক দুর্ধর্ষ লুণ্ঠনকারী দল মালব, মেবার, মাড়বার, বেরার এবং ক্রমে নিজাম ও পেশওয়ার রাজ্যে হানা দিতে আরম্ভ করে। ইহারা প্রথমে মারাঠা বাহিনীতে যোদ্ধা হিসাবেই কার্য গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু মারাঠা শক্তি বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়িলে পিণ্ডারিগণ নিজেরা-ই দলবদ্ধ হইয়া ভারতের বিভিন্ন অংশে লুটতরাজ শুরু করে। সামরিক বাহিনী হইতে কর্মচ্যুত সৈনিক, অবলম্বনহীন বেকার প্রভৃতি যাবতীয় সামাজিক বন্ধনহীন লোকের পক্ষে পিণ্ডারি দলভুক্ত হইবার অপূর্ব সুযোগ ছিল। মুসলমান সম্প্রদায় হইতেই এই প্রকারের লোক অধিক সংখ্যায় পিণ্ডারিদলভুক্ত হইত। ম্যাল্‌কম্ (Malcolm)-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, পিণ্ডারিদের মধ্যে যাহারা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল তাহাদের স্ত্রীলোকেরা হিন্দু স্ত্রীলোকের মত হিন্দু আচার-আচরণ মানিয়া চলিত। বস্তুত পিণ্ডারিদের মধ্যে ধর্মের কোন ভেদাভেদ ছিল না। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকও পিণ্ডারিদলভুক্ত ছিল। লুটতরাজ, হত্যাকাণ্ড, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার প্রভৃতিতে পিণ্ডারিগণ ছিল সিদ্ধহস্ত।

পিণ্ডারিদের প্রকৃতি ও কার্যপদ্ধতি

কোম্পানির রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিণ্ডারিগণ লুটতরাজ আরম্ভ না করা পর্যন্ত ইংরাজগণ পিণ্ডারিদের অত্যাচার সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করে নাই। কিন্তু ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে পিণ্ডারিগণ কোম্পানির রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ-বিহার ও মির্জাপুর শ্মশানে পরিণত করে। ইহার পর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে পিণ্ডারিগণ উত্তর-সরকার (Northern Sircars) আক্রমণ করিয়া বহু সংখ্যক গ্রাম লুণ্ঠন করে এবং ১৮২ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। তখন কলিকাতা কাউন্সিল ও ডাইরেক্টর সভা পিণ্ডারি দমনের প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই উপলব্ধি করিলেন। লর্ড হেস্টিংস্ পিণ্ডারি দস্যুদের দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ইতিমধ্যে ডাইরেক্টর সভার নিকট হইতেও পিণ্ডারি দমনের নির্দেশ আসিয়া পৌঁছিল। এক বৎসরেরও অল্প সময়ের মধ্যেই পিণ্ডারি-নেতা করিম খাঁ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর

কোম্পানির রাজ্যে পিণ্ডারি আক্রমণ (১৮১২-১৮১৬)

নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। তাহার ভরণ-পোষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা কোম্পানি হইতে করিয়া দেওয়া হইল। পিণ্ডারিদলের প্রধান নেতা আমীর খাঁ ব্রিটিশের সহিত কোনপ্রকার সংঘর্ষের পূর্বেই এক চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাজপুতনায় টংক নামক স্থানে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিল। অপরাপর পিণ্ডারি নেতার মধ্যে চিতু আত্মরক্ষার্থ অসীরগড়ের অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইল এবং ওয়াসিল মহম্মদ আত্মহত্যা করিয়া ব্রিটিশ কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। লর্ড হেস্টিংসের আমলে এইভাবে পিণ্ডারি দস্যুদলকে দমন করা হইয়াছিল।

লর্ড হেস্টিংস্ কর্তৃক পিণ্ডারি দমনের ব্যবস্থা

লর্ড হেস্টিংস্ ও মারাঠাগণ: তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ: (Lord Hastings and the Marathas: Third anglo-Maratha War): ব্যাসিনের সন্ধির পর হইতেই পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরাজের প্রভাবমুক্ত হইতে সচেষ্ট ছিলেন। ইংরাজ প্রাধান্য দিন-দিনই তাঁহার নিকট অধিক হইতে অধিকতর অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। রাজ্যের অভ্যন্তরে জায়গীরদারগণের স্ব-স্ব প্রাধান্য দমন করিয়া বাজীরাও শক্তিসঞ্চয় করিতে সমর্থ হইলে স্বভাবতই ব্রিটিশ প্রাধান্য নাশের ইচ্ছা তাঁহার আরও বৃদ্ধি পাইল। ত্রিম্বকজী দাংলিয়া নামে জনৈক কূটকৌশলী ব্যক্তিকে তিনি তাঁহার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। ত্রিম্বকজী যেমন ছিলেন নীতিজ্ঞানহীন তেমনি ছিলেন ষড়যন্ত্রপ্রিয়। কিন্তু ব্রিটিশ প্রাধান্য নাশ করিয়া পেশওয়াকে পুনরায় স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার মত দেশাত্মবোধও তাঁহার ছিল। ত্রিম্বকজীর প্রেরণায় বাজীরাও ব্রিটিশ বিতাড়নের উদ্দেশ্যে হোল্‌কার, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সহিত গোপনে আলাপ-আলোচনা চালাইতে লাগিলেন।

পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর ইংরাজ বিদ্বেষ

বরোদা রাজ্যের উপর পেশওয়ার দাবি-সংক্রান্ত হিসাবের মীমাংসার জন্য ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে গাইকোয়াড়-এর দেওয়ান গঙ্গাধর শাস্ত্রী ব্রিটিশ নিরাপত্তাধীনে পুণায় আসিলে ত্রিম্বকজী তাঁহাকে গোপনে হত্যা করাইলেন। এজন্য পুণার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট্ এল্‌ফিন্‌স্টোন্ পেশওয়ার নিকট ত্রিম্বকজীর সমর্পণ দাবি করিলেন। পেশওয়া এই দাবি অস্বীকার করায় এল্‌ফিন্‌স্টোন্ ত্রিম্বকজীকে বন্দী করিলে পেশওয়া বাজীরাও-এর পরোক্ষ সাহায্যে ত্রিম্বকজী বন্দিদশা হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন। ইহার পর পেশওয়ার অর্থসাহায্যে তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। পেশওয়া বাজীরাও নিজেও যুদ্ধের জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পুণার রেসিডেন্ট্ এল্‌ফিন্‌স্টোন্ পেশওয়ার এই সকল ব্রিটিশ-বিরোধী ষড়যন্ত্র ও সামরিক প্রস্তুতির প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে কতকগুলি অপমানজনক শর্ত মানিয়া লইয়া চুক্তিবদ্ধ হইতে বাধ্য করিলেন (জুন, ১৮১৭)। এই চুক্তির শর্তানুসারে বাজীরাও পেশওয়া মারাঠা রাষ্ট্রসংঘ (Maratha Confederacy)-এর নেতৃত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রিটিশ রেসিডেন্টের অজ্ঞাতে তিনি অপর কোন দেশীয় বা বিদেশীয় শক্তির সহিত কোনপ্রকার যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিবেন না এই শর্তও তাঁহাকে মানিয়া

ইংরাজ প্রাধান্য বিলোপের জন্য সামরিক প্রস্তুতি

পেশওয়া বাজীরাও-এর সহিত নূতন চুক্তি (জুন, ১৮১৭)

লইতে হইল। ব্রিটিশ সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে অর্থদানের পরিবর্তে মালব, বুন্দেলখণ্ড, হিন্দুস্তান প্রভৃতি অঞ্চল তিনি কোম্পানিকে ছাড়িয়া দিলেন। এই সকল স্থানের বাৎসরিক আয় ছিল ৩৪ লক্ষ টাকা। গাইকোয়াড়-এর নিকট হইতে বাৎসরিক চারি লক্ষ টাকা করিয়া পাইবার শর্তে বরোদা রাজ্যের উপর তাঁহার যাবতীয় দাবি তিনি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

চুক্তির শর্তাদি

দ্বিতীয় বাজীরাও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্তাদি কেবলমাত্র পরিস্থিতির চাপেই মানিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে ইংরাজদের প্রতি বিদ্বেষ তাঁহার বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পিণ্ডারি-দমনে যখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ব্যস্ত তখন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া পেশওয়ার নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী গোক্‌লা তাঁহাকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে উৎসাহিত করিলেন। সেই বৎসরই (১৮১৭) নভেম্বর মাসে পেশওয়া পুণা হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের দাবি জানাইলেন।

পেশওয়ার মন্ত্রী গোক্‌লার ইংরাজ-বিদ্বেষ

এ-দিকে রঘুজী ভোঁসলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (১৮১৬) তাঁহার রাজ্যে এক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। রঘুজীর পুত্র পার্শ্বজী ছিলেন দুর্বলচিত্ত এবং অকর্মণ্য। তাঁহার আমলে আপ্পা সাহেব শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। ভোঁসলে রাজ্যের এই অব্যবস্থার সুযোগে ইংরাজগণ আপ্পা সাহেবকে ব্রিটিশের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধ হইতে বাধ্য করিল (১৮১৬)। এইভাবে নাগপুরেও ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। এই চুক্তি আপ্পা সাহেব অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নাগপুরে অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধ : আপ্পা সাহেব

পর বৎসর (১৮১৭) পিণ্ডারি দমন করিবার পূর্বে লর্ড হেস্টিংস্ এ-কথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মারাঠাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া পিণ্ডারিদের আক্রমণ করিলে ইংরাজদের সহিত মারাঠাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। এজন্য তিনি দৌলত রাও-এর সহিত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে দৌলত রাও সিন্ধিয়া কাম্পানিকে পিণ্ডারি দমনের এবং রাজপুত রাজ্যগুলির সহিত চুক্তি সম্পাদনের অধিকার দান করিয়াছিলেন।

সিন্ধিয়ার সহিত কোম্পানির চুক্তি (১৮১৭)

কিন্তু পেশওয়া বাজীরাও এবং তাঁহার মন্ত্রী গোক্‌লার চেষ্টায় হোল্‌কার, ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া—সকলেই মারাঠা জাতির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে সংঘবদ্ধ হইলেন। পেশওয়া বাজীরাও সর্বপ্রথম ব্রিটিশ-বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়া পুণার ব্রিটিশ রেসিডেন্টের আবাসগৃহে আগুন লাগাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এল্‌ফিন্‌স্টোন্ কোনক্রমে প্রাণ লইয়া কির্‌কি নামক স্থানে পলাইয়া গেলেন। কির্‌কিতে সেই সময় একটি ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি ছিল। পেশওয়া পর পর দুইবার কির্‌কি আক্রমণ করিয়া বিফল হইলেন এবং পুণা ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন। পুণা ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইল। আপ্পা সাহেব সীতাবল্‌দী ও নাগপুর-এর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। তিনিও আত্মরক্ষার্থে পলাইয়া যোধপুরে আশ্রয় লইলেন। মল্‌হর রাও হোল্‌কার-এর সেনাবাহিনীও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না।

গোক্‌লার চেষ্টায় ইংরাজ বিরোধিতা : তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ

মাহিদপুর-এর যুদ্ধে তাহারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল (ডিসেম্বর, ১৮১৭)। পেশওয়া বাজীরাও-এর সেনাবাহিনী পুণা রক্ষা করিতে না পারিলেও তাঁহার মন্ত্রী গোক্‌লার নেতৃত্বে যুদ্ধ করিয়া চলিল। কোরগাঁও এবং অশ্‌তির (Koregaon and Ashti) যুদ্ধে ব্রিটিশ হস্তে পরাজিত হইলে পেশওয়ার আত্মসমর্পণ ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। পেশওয়ার অনুগত মন্ত্রী গোক্‌লা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে অনন্যোপায় হইয়া বাজীরাও সার্ জন ম্যাল্‌কম্-এর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

কোরগাঁও ও অশ্‌তির যুদ্ধে বাজীরাও-এর পরাজয়

লর্ড হেস্টিংস্ পেশওয়া-পরিবার হইতে ভবিষ্যতে যাহাতে আর কোন বিপদ না আসিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বাজীরাওকে বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা ভাতা দানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে কানপুরের নিকট বিঠুর নামক স্থানে ব্রিটিশ প্রহরাধীনে রাখা হইল। বাজীরাও-এর ভূতপূর্ব মন্ত্রী ত্রিম্বকজীকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। লর্ড হেস্টিংস্ দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন। তিনি পেশওয়ার রাজ্যের একাংশ শিবাজীর জনৈক বংশধর প্রতাপ সিংহকে অর্পণ করিয়া মারাঠা জাতির সন্তুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন। প্রতাপ সিংহ সাতারা নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। পেশওয়ার রাজ্যের অবশিষ্টাংশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইল। এল্‌ফিন্‌স্টোন্ ও গ্রাণ্ট ডাফ্ এই নব-অধিকৃত রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সংগঠনের কাজ করিয়াছিলেন। উভয়েই ঐতিহাসিক হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

পেশওয়া-তন্ত্রের অবসান

আপ্পা সাহেবের বিরোধিতার শাস্তিস্বরূপ ভোঁসলে রাজ্যের একাংশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করা হইল এবং অপরাংশ ব্রিটিশের এক তাঁবেদার রাজ্যের অধীনে স্থাপন করা হইল।

আপ্পা সাহেবের পরাজয়

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে নাবালক হোল্‌কারের মন্ত্রী তাঁতিয়া জোগ (Tantia Jog)-এর সহিত ইংরাজদের সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি দ্বারা হোল্‌কার রাজপুত রাজ্যগুলি এবং আমীর খাঁর রাজ্যের উপর সর্বপ্রকার দাবি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি নিজ খরচে একদল ব্রিটিশ সৈন্য পোষণ করিতে এবং ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অজ্ঞাতে অপর কোন রাজ্যের সহিত কোনপ্রকার সংযোগ স্থাপন না করিতে স্বীকৃত হইলেন।

হোল্‌কারের সহিত সন্ধিস্থাপন

লর্ড হেস্টিংস্ ও রাজপুত রাজ্যসমূহ (Lord Hastings and the Rajput States): একদা-শক্তিশালী রাজপুত জাতি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ক্রমাগত মারাঠা আক্রমণের ফলে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কোম্পানির কর্মকর্তাগণ রাজপুত রাজ্যগুলিকে উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছিলেন। একমাত্র লর্ড ওয়েলেস্‌লী জয়পুর ও যোধপুর রাজ্যের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইংরাজদের সহায়তা লাভ করিতে পারিলে রাজপুত জাতি হয়ত মারাঠা হানাদারদের প্রতিহত করিতে সক্ষম হইত। পিণ্ডারি আক্রমণেও রাজপুত রাজ্যগুলি শ্মশানভূমিতে পরিণত

হইতে চলিয়াছিল। দৌলত রাও সিন্ধিয়া এবং পিণ্ডারি-নেতা আমীর খাঁ রাজপুতনাকে তাঁহাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময়ে লর্ড হেস্টিংস্ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার সহিত যে-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন উহার শর্তানুযায়ী কোম্পানির পক্ষে রাজাগুলির সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের আর বাধা রহিল না। ইহার পর লর্ড হেস্টিংস্ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চুক্তির দ্বারা রাজপুতনার বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র—সকল রাজাকেই কোম্পানির অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ করিলেন। রাজপুত রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ রেসিডেন্টের অজ্ঞাতে অপর কোন তৃতীয় পক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন না—এই শর্ত মানিয়া লইলেন এবং কোম্পানির সামরিক সাহায্যের জন্য বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হইলেন। এইভাবে লর্ড হেস্টিংসের আমলে কোম্পানির রাজ্যসীমা, প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

রাজপুত রাজ্যগুলির কোম্পানির অধীন মিত্ররাজ্যে পরিণত

মারাঠা শক্তির পতন (The Fall of the Maratha Power) : সল্‌বই-এর সন্ধির পর মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের (Maratha Confederacy) মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদ ও স্বার্থ-দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কিন্তু এইরূপ পরিস্থিতিতে নানা ফড়নবিশ, মাহ্‌দজী সিন্ধিয়া, অহল্যাবাঈ প্রভৃতি কয়েকজন শক্তিশালী শাসকের উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের দুর্বলতা

হোল্‌কার রাজা (ইন্দোর) (Holkars of Indore) : ইন্দোর-এর অহল্যাবাঈ শাসনকার্যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মারাঠা ইতিহাস-বিশারদ্ সার্ জন ম্যাল্‌কম্ (Sir John Malcolm) অহল্যাবাঈ-এর শাসনব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অহল্যাবাঈ-এর মৃত্যুর পর (১৭৯৫) তুকোজী হোল্‌কার ইন্দোরের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে হোল্‌কার রাজ্যে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিল। তুকোজীর পুত্র যশোবন্ত রাও হোল্‌কারের আমলে মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিলে স্বভাবতই মারাঠা জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইল। ইংরাজগণ কর্তৃক অনুসৃত না-হস্তক্ষেপ নীতির সুযোগ গ্রহণ করা মারাঠাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। ফলে, নানা ফড়নবিশের মৃত্যুর পর যশোবন্ত রাও হোল্‌কার ও দৌলত রাও সিন্ধিয়া পুণায় পেশওয়া-পদ দখলের জন্য এক আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলেন। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও অবশ্য দৌলত রাও সিন্ধিয়াকে স্বপক্ষে আনিতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু যশোবন্ত রাও-এর হস্তে পেশওয়া ও সিন্ধিয়ার যুগ্ম-বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। যশোবন্ত রাও হোল্‌কার রাঘোবার জনৈক বংশধর বিনায়ক রাওকে পেশওয়া-পদে স্থাপন করিয়া নিজেই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী রহিলেন। বাজীরাও এই সময়েই (১৮০২) ব্যাসিনের সন্ধি দ্বারা পেশওয়া-তন্ত্রের স্বাধীনতা ব্রিটিশ সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দিলেন এবং ব্রিটিশ সাহায্যে নিজ-রাজ্যে পুনঃস্থাপিত হইলেন। অপরাপর মারাঠা নেতৃবর্গ পেশওয়ার এইরূপ আত্ম-বিক্রয় জাতীয় অপমান বলিয়া মনে করিলেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে

অহল্যাবাঈ

যশোবন্ত রাও হোল্‌কার

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যুগ্মভাবে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু হোল্‌কার এই জাতীয় বিপদেও তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন না। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে পরাজিত হইয়া ব্রিটিশকে নিজ-নিজ রাজ্যের একাংশ ছাড়িয়া দিতে এবং ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণে বাধ্য হইলেন।*

ব্রিটিশের সহিত সংঘর্ষ : সন্ধি (১৮০৬)

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে অবশ্য হোল্‌কার এককভাবে ব্রিটিশের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং ব্রিটিশ সেনাপতি কর্ণেল মন্‌সন্‌কে মুকুন্দরা গিরিশংকটের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। ভরতপুরের রাজাও হোল্‌কারের সহিত যুগ্মভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জেনারেল লেক্ ভরতপুর আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য হইলেও ভরতপুরের রাজা ব্রিটিশের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। ইতিমধ্যে হোল্‌কার দিল্লী অবরোধ করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, জেনারেল লেক্-এর হস্তেও তাঁহার পরাজয় ঘটিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে ওয়েলেস্‌লীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইলে হোল্‌কার রক্ষা পাইলেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রিটিশের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন।†

পেশওয়া (পুণা) : নানা ফড়নবিশ (The Peshwas of Poona : Nana Fadnavish) : রাঘোবা বা রঘুনাথ রাও-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পেশওয়া মাধব রাও নারায়ণকে পেশওয়া-পদে স্থাপনের জন্য নানা ফড়নবিশের অক্লান্ত চেষ্টার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে (১০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পেশওয়া মাধব রাও নারায়ণের আমলে মারাঠা প্রধানমন্ত্রী নানা ফড়নবিশ-ই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মারাঠা-শক্তির পতন পর্যন্ত মারাঠা-ইতিহাসের অন্যতম দূরদর্শী ক্ষমতাবান শাসক ছিলেন নানা ফড়নবিশ। তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা এবং মৌলিক প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা সমসাময়িক ইওরোপীয়দের রচনায়ও পাওয়া যায়।

নানা ফড়নবিশ মারাঠা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত

তাঁহার কার্যকলাপ—টিপুর সহিত যুদ্ধ

নানা ফড়নবিশ কেবল রাঘোবার বিরুদ্ধে মাধব রাও নারায়ণকে জয়যুক্ত করিতে সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি টিপু কর্তৃক অধিকৃত নর্মদা নদীর দক্ষিণতীরস্থ মারাঠা রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে হায়দরাবাদের নিজামের সহিত সংঘবদ্ধ হইলেন। টিপু মারাঠা-নিজাম আক্রমণ প্রতিহত করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ৪৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং বাদামী, কিটুর ও নারগুন্দ্ মারাঠাদের ফিরাইয়া দিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই টিপু ও মারাঠাদের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে মারাঠা, নিজাম ও ব্রিটিশের মধ্যে এক 'ত্রি-শক্তি-চুক্তি' (Triple Alliance) সম্পাদিত হইল। কিন্তু এই চুক্তি কেবলমাত্র টিপুর ক্ষমতা খর্ব করিবার উদ্দেশ্যেই স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

---

* দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের বিশদ বিবরণ ১৬৬-১৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† ১৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বস্তুত মারাঠাগণ নিজাম অথবা ব্রিটিশের সহিত আন্তরিক মিত্রতা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল না। মারাঠা নেতৃবর্গ এইবার নিজামের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিলেন। ইংরাজদের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও নিজাম কোন সাহায্য পাইলেন না। ফলে খরদা (Kharda)-এর যুদ্ধে নিজাম মারাঠা বাহিনী কর্তৃক শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন (১৭৯৫)।

খরদার যুদ্ধে নিজামের পরাজয় (১৭৯৫)

খরদার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যের সীমা এবং প্রতিপত্তি উভয়ই বৃদ্ধি পাইল। নানা ফড়নবিশ পুণা তথা সমগ্র মারাঠা রাষ্ট্রসংঘে এক অভূতপূর্ব মর্যাদা লাভ করিলেন। সেই বৎসরই পেশওয়া মাধব রাও নারায়ণ নানা ফড়নবিশের প্রভুত্ব হইতে মুক্ত হইবার কোন আশা নাই দেখিয়া আত্মহত্যা করিলেন। ফলে দ্বিতীয় বাজীরাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। বাজীরাও এবং নানা ফড়নবিশের মধ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল, এই কারণে নানা ফড়নবিশ বাজীরাও এর পেশওয়া-পদ লাভের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই সূত্রে পুণায় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে স্বভাবতই মারাঠা ঐক্য ব্যাহত হইল। সুযোগ বুঝিয়া নিজাম খরদার যুদ্ধের ফলে যে-সকল স্থান হারাইয়াছিলেন সেগুলি পুনর্দখল করিতে সমর্থ হইলেন। বাজীরাও-এর আমলে মারাঠা ঐক্য বিনাশপ্রাপ্ত হইল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফড়নবিশের মৃত্যু ঘটিলে বাজীরাও-এর আত্মঘাতী নীতি অনুসরণের কোন বাধা রহিল না। নানা ফড়নবিশের মৃত্যুর পর মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের ঐক্য বজায় রাখিবার মত ক্ষমতা ও বিচক্ষণতা অপর কাহারও ছিল না।

দ্বিতীয় বাজীরাও এবং নানা ফড়নবিশের বিবাদ—মারাঠা শক্তির দুর্বলতা

ইংরাজদের বিরুদ্ধে মারাঠা শক্তিকে দৃঢ়তর করিবার উপায় হিসাবে ফরাসী সাহায্য ও সহানুভূতিলাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবার মত দূরদৃষ্টি নানা ফড়নবিশের ছিল। এইজন্য ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লাবুলিন (Chavalier de Lublin) নামে জনৈক ফরাসী ভাগ্যান্বেষীকে তিনি নানাপ্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, দেশাত্মবোধ, মারাঠা জাতীয় ঐক্য বজায় রাখিবার ঐকান্তিকতা প্রভৃতি গুণের জন্য নানা ফড়নবিশ ম্যালকম্, গ্রাণ্ট্ ডাফ্ প্রভৃতি সমসাময়িক ইংরাজ পদস্থ কর্মচারী ও ঐতিহাসিকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় পুণা ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়াছিল। তাঁহার কূটকৌশলের প্রশংসা করিতে গিয়া ব্রিটিশ লেখকগণ তাঁহাকে মেকিয়াভেলি (Machiavelli)-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ নানা ফড়নবিশ উত্তর-ভারতের দিকে মারাঠা শক্তি বিস্তারের কোন চেষ্টা করেন নাই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই অভিযোগের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও মারাঠা-ইতিহাসে নানা ফড়নবিশের অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

নানা ফড়নবিশের চরিত্র

সিন্ধিয়া (গোয়ালিওর) : মাহদ্জী সিন্ধিয়া (Sindhias of Gwalior : Mahadji Sindhia) : রণজী সিন্ধিয়া ছিলেন গোয়ালিওর-এর সিন্ধিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা। রণজী ছিলেন প্রথম বাজীরাও পেশওয়ার বিশ্বস্ত অনুচর। সিন্ধিয়া বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী

মাহদ্জী সিন্ধিয়া বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক

এবং বিচক্ষণ শাসক ছিলেন মাহ্‌দজী সিন্ধিয়া। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মারাঠা-ইতিহাসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মাহ্‌দজী অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে আহত হইয়া তিনি খঞ্জ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) পর হইতে অতি অল্পকালের মধ্যে মারাঠা শক্তির আশ্চর্যজনক পুনরুজ্জীবনের পশ্চাতে মাহ্‌দজী সিন্ধিয়ার কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মাহ্‌দজী সিন্ধিয়া সম্রাট শাহ্‌ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ হইতে দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিজের হাতের পুতুলে পরিণত করিয়াছিলেন। এইভাবে সিন্ধিয়া মারাঠাদের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া ইংরাজদের মনে এক দারুণ ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মিত্রতা-লাভের গুরুত্ব ইংরাজগণ উপলব্ধি করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, মাহ্‌দজী সিন্ধিয়া মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের নেতা হইবার আকাঙ্ক্ষাও পোষণ পরিতেন। এজন্য ইংরাজদের সাহায্যলাভ করিবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। সুতরাং তিনি ইংরাজদের সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু করিলেন এবং মারাঠা রাষ্ট্রসংঘ এবং ইংরাজদের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার চেষ্টায়ই সলবৃই-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তির পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে মাহ্‌দজীর দান

মাহ্‌দজী সিন্ধিয়া মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের নেতা পেশওয়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন। তিনি পেশওয়াকে নিজ করতলগত সম্রাট শাহ্‌ আলম যাহাতে তাঁহার ভকিল-ই-মুলতুক' (*Vakil-i-Multuk*) বা প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেন, সেই ব্যবস্থা রিয়াছিলেন। পেশওয়ার সহকারিপপদ অবশ্য তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু তাহা নহে, তিনি সম্রাটের সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া সেই সেনাবাহিনী-পোষণের ব্যয়-সংকুলান বাবদ দিল্লী ও আগ্রা নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এইভাবে মাহ্‌দজী সিন্ধিয়া আগ্রা হইতে শতদ্রু নদী পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে এক অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে এবং মালবদেশেও তাঁহার রাজ্য বিস্তারলাভ রিয়াছিল। মাহ্‌দজী ইওরোপীয় পদ্ধতিতে নিজ সেনাবাহিনীকে গঠন করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ডি বোয়েন (De Boigne) নামে জনৈক স্যাভয়বাসীর উপর তাঁহার সেনাবাহিনীর শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

দিল্লীর সম্রাটের উপর তাঁহার প্রভাব

মাহ্‌দজী সিন্ধিয়া রাজপুত রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুত নেতৃবর্গের সম্মিলিত শক্তির নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইলেও (১৭৮৬) রাজপুতনায় তাঁহার প্রতিপত্তি বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তিনি গোলাম কাদের নামক রোহিলা-নেতা কর্তৃক দিল্লী হইতে সাময়িকভাবে ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই পুনরায় দিল্লী অধিকারিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দূরদর্শী মাহ্‌দজী সিন্ধিয়া টিপুর সহিত সম্মিলিতভাবে ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া পেশওয়ার সহিত এ-বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছিলেন। সেই

তাঁহার দূরদর্শিতা

সময়ে আকস্মিকভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে মারাঠা জাতি তাহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দূরদর্শী রাজনীতিক এবং এক অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন নেতা হারাইয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে মারাঠা-ইতিহাসের এক অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছিল। মাহদজীর পর দৌলত রাও সিন্ধিয়া-পদ লাভ করিলেন।*

গাইকোয়াড় (বরোদা) : ভোঁসলে (নাগপুর) (**The Gaikawad of Baroda : Bhonsle of Nagpur**) : বরোদার গাইকোয়াড় অথবা নাগপুরের ভোঁসলে বংশ হইতে নানা ফড়নবিশ বা মাহদজী সিন্ধিয়া প্রভৃতির ন্যায় ক্ষমতাবান ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে নাই। গাইকোয়াড় ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি এই সন্ধি লঙ্ঘন করেন নাই। ভোঁসলে অবশ্য তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে যোগদান করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন এবং ভোঁসলে রাজ্যের অধিকাংশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই মারাঠা শক্তির পতন ঘটিয়াছিল।

গাইকোয়াড়-এর ব্রিটিশের অধীনতা-মূলক মিত্রতা গ্রহণ

ভোঁসলের পরাজয়

মারাঠাদের পতনের কারণ (**Causes of the Downfall of the Marathas**) : মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর সেইস্থলে নূতন সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার শক্তি ও সামর্থ্য একমাত্র মারাঠাদেরই ছিল। কিন্তু মারাঠাগণ সেই সুযোগ গ্রহণে সক্ষম না হওয়াতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিবার পূর্ণ সুযোগ ঘটিল এবং ক্রমে মারাঠা শক্তি বিস্মৃতির অন্তরালে অন্তর্হিত হইল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর মারাঠা সাম্রাজ্য-গঠনের সুযোগ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মারাঠা শক্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। কিন্তু পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) পর হইতেই তাহাদের পতন শুরু হয়। সাময়িকভাবে মারাঠা শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইলেও সেই সময় হইতেই মারাঠা শক্তির পতনের ইতিহাস অনুধাবন করা উচিত হইবে। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তির সংহতি যেমন বিনষ্ট হইয়াছিল, পেশওয়ার মর্যাদাও তেমনি বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। অবশ্য পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যেই মারাঠাগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া উত্তর-ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল. তথাপি তাহাদের এই পুনরুজ্জীবন স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে নাই। ফলে, মারাঠাগণ শুধু সাম্রাজ্য-গঠনেই অকৃতকার্য হইয়াছিল এমন নহে, তাহারা আত্মরক্ষার ক্ষমতাও শেষ পর্যন্ত হারাইয়াছিল। মারাঠাদের পতনের তথা ভারতে স্থায়ী মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের অসামর্থ্যের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ : মারাঠা শক্তির সংহতি বিনষ্ট

মারাঠা শক্তি পুনঃসঞ্জীবিত

(১) সর্বপ্রথমেই ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মারাঠা সাম্রাজ্যের কাঠামো শিবাজীর ব্যক্তিগত প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। আবার পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পরও মাধব রাও-এর ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভাবলে পতনোন্মুখ মারাঠা শক্তি

* দৌলত রাও-এর কার্যাবলী তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের বিবরণ দ্রষ্টব্য : ১৮২-৮৪ পৃষ্ঠা।

পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা বা নীতির উপর গঠিত ছিল না বলিয়াই পরবর্তী কালে ব্যক্তিগত প্রতিভার অভাবে মারাঠা সাম্রাজ্যের কাঠামো ধসিয়া পড়িয়াছিল। জাতীয় ঐক্য, একই প্রকারের শিক্ষা অথবা কোনপ্রকার উদার এবং সর্বজনীন মঙ্গলসাধনের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া মারাঠা শক্তি ইংরাজদের আক্রমণের বিরুদ্ধে টিকিতে পারে নাই। সার্ যদুনাথ বলিয়াছেন: 'মারাঠাদের ঐক্য ছিল যেমন কৃত্রিম তেমনি আকস্মিক এবং সেই কারণেই অনিশ্চিত।' এই মৌলিক ত্রুটির জন্যই মারাঠা শক্তি প্রকৃত শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় নাই।

(১) মারাঠা শক্তি ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও প্রতিভা-আশ্রয়ী: মারাঠা-ঐক্য কৃত্রিম ও আকস্মিক

(২) মহারাষ্ট্রদেশ পর্বতসংকুল। কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্য গড়িয়া তুলিবার সুযোগ স্বভাবতই সেখানে ছিল না। এই কারণে মারাঠা রাষ্ট্রকে চৌথ, সরদেশমুখী প্রভৃতি অনিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করিতে হইত। স্থায়ী রাষ্ট্রগঠনের পক্ষে এইরূপ জবরদস্তিমূলক ও অনিশ্চিত আয় মোটেই সহায়ক ছিল না, এ-কথা বলা বাহুল্য। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা মারাঠা রাষ্ট্রে মোটেই ছিল না।

(২) মারাঠা রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো স্থায়ী রাষ্ট্রগঠনের প্রতিকূল

(৩) শিবাজীর পরবর্তী কালে মারাঠা রাজ্যে জায়গীর প্রথা পুনঃ-প্রবর্তিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট হইয়াছিল। জায়গীরদারগণের স্বার্থপরতা রাষ্ট্রের স্বার্থ-বিরোধী ছিল। তাহাদের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ ক্রমেই মারাঠা ঐক্য বিনষ্ট করিয়া রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল করিয়া দিয়াছিল।

(৩) জায়গীর প্রথার পুনঃ-প্রবর্তন

(৪) প্রথম মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর মারাঠাদের মধ্যে যে-আত্মকলহ ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা দেখা দিয়াছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই মারাঠাগণ ইংরাজদের মত প্রবল শত্রুর সহিত যুঝিবার প্রয়োজনীয় ঐক্যবোধ, দৃঢ়তা ও মর্যাদাবোধ হারাইয়াছিল। ব্রিটিশ শক্তির সহিত ঐক্যবদ্ধভাবে যুঝিবার প্রয়োজন উপলব্ধি না করিয়া তাহারা আত্মকলহে নিজেদের দুর্বলতা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

(৪) মারাঠাদের আত্ম-কলহ-প্রসূত দুর্বলতা

(৫) ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও প্রতিভা-আশ্রয়ী মারাঠা রাষ্ট্রে শিবাজী, বাজীরাও, মাধব রাও, মাহদজী সিন্ধিয়া, নানা ফড়নবিশ—এই কয়েকজন নেতা ভিন্ন অপর কোন সুযোগ্য নেতার উদ্ভব ঘটে নাই। পরবর্তী কালের নেতৃবর্গের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব হেতু তাঁহাদের প্রধান শত্রু ইংরাজদের সহিত কূটকৌশলে তাঁহারা আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। সাম্রাজ্য-গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় একতা, জাতীয়তাবোধ, আদর্শে পৌঁছিবার একনিষ্ঠ চেষ্টা, সমরকুশলতা—প্রভৃতি পরবর্তী মারাঠা নেতৃবর্গের মধ্যে ছিল না। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজগণ যখন না-হস্তক্ষেপ-নীতি (Policy of non-intervention) অনুসরণ করিতেছিল তখনও মারাঠাগণ উহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। মারাঠাদের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় মারাঠা রাষ্ট্রসংঘের সর্বত্র অব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল।

(৫) পরবর্তী কালে সুযোগ্য নেতার অভাব

(৬) মারাঠাদের 'হিন্দুপাদ-পাদশাহী' আদর্শ ত্যাগ এবং মুসলমান সৈন্য নিয়োগ তাহাদের জাতীয়তাবোধ হ্রাস করিয়াছিল। অপরাপর জাতির লোক হইতে ভাড়া-করা সৈন্য নিয়োগের রীতি মারাঠাদের সামরিক দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাও তাহাদের পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

(৬) হিন্দুপাদ-পাদশাহী আদর্শ ত্যাগ

(৭) মারাঠা শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী। জনসাধারণের স্বাভাবিক আনুগত্য উহার পশ্চাতে ছিল না। শিবাজী বা বাজীরাও-এর ন্যায় নেতৃবর্গের ব্যক্তিত্বই ছিল মারাঠা শাসনের মূলশক্তি। সাম্রাজ্য-গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় উম্মাদনা সৃষ্টি করিবার মত আদর্শ এবং জনসাধারণের অকপট আনুগত্য ক্রমেই যখন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল, তখন মারাঠা রাষ্ট্রের তথা মারাঠা শাসনের মূলনীতি বলপূর্বক অপরের সম্পত্তি দখল এবং অত্যাচারের দ্বারা অর্থ আদায়ে পর্যবসিত হইয়াছিল।

(৭) মারাঠা শাসন-নীতি পরসম্পদ হরণ ও অত্যাচারে পর্যবসিত

(৮) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে মারাঠাগণ তাহাদের চিরাচরিত 'গরিলা-যুদ্ধ'-পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া ভীষণ ভুল করিয়াছিল। যে গরিলা যুদ্ধ-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মারাঠাগণ দুর্ধর্ষ মুঘল বাহিনীর মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল, সেই যুদ্ধকৌশল ত্যাগ করিয়া তাহারা পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য সামরিক পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার দূরদর্শিতা নানা ফড়নবিশ বা মাহদজী সিন্ধিয়াও প্রদর্শন করেন নাই।

(৮) 'গরিলা যুদ্ধ'-পদ্ধতি পরিত্যাগ

(৯) সর্বশেষে, এ-কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ও ইওরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা মারাঠাদের পক্ষে স্বভাবতই সম্ভব ছিল না।

(৯) আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব

উপরি-উক্ত কারণে মারাঠাগণ মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর মারাঠা সাম্রাজ্য-গঠনের সুযোগ গ্রহণে সক্ষম হয় নাই; সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায়।

উপসংহার

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইঙ্গ-মারাঠা সম্পর্ক (Anglo-Maratha Relations during the last half of the 18th and early years of the 19th Centuries) : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি এমনভাবে পর্যুদস্ত হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে উহা পুনঃ-সঞ্জীবিত হইতে পারিবে সেই আশা কেহ করে নাই। কিন্তু মারাঠাগণ অতি আশ্চর্যজনক দ্রুতগতিতে তাহাদের শক্তি পুনর্গঠিত করিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ-ভারতে এক অদম্য শক্তি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তির দ্রুত পুনঃসঞ্জীবন

তাহারা সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ হইতে দিল্লীতে লইয়া গিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিল। সম্রাট মারাঠাদের হাতের পুতুলে পরিণত হইলেন।

(১) **ওয়ারেন হেস্টিংস্ ও মারাঠাগণ (Warren Hastings & the Marathas) :** ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্ গবর্ণর হইয়া আসিয়া মারাঠাদের শক্তি-বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হইতে চলিয়াছে উপলব্ধি করিয়া অযোধ্যার নবাবের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। মারাঠাদের করতলগত সম্রাটের প্রাপ্য বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা মারাঠাদেরই হস্তে পড়িবে আশঙ্কা করিয়া হেস্টিংস্ বাংলার দেওয়ানীর জন্য তাঁহাকে বাৎসরিক কর দেওয়া বন্ধ করিলেন। এ-দিকে পেশওয়া মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইলে রাঘোবা পেশওয়া-পদ দখলের জন্য নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন। দুর্বলচিত্ত, অনভিজ্ঞ নারায়ণ রাও রাঘোবা বা রঘুনাথ রাও-এর চক্রান্তের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহার সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের সুযোগ লইয়া রাঘোবা নারায়ণ রাওকে হত্যা করাইলেন এবং স্বয়ং পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার পেশওয়া-পদ লাভ স্থায়ী হইল না।

মারাঠাদের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে হেস্টিংসের ব্যবস্থা অবলম্বন

নানা ফড়নবিশ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক নারায়ণ রাও-এর শিশুপুত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অপরাপর মারাঠা নেতৃবর্গ এই শিশুকে পেশওয়া বলিয়া গ্রহণ করিলে রাঘোবা পুণা ত্যাগ করিয়া ইংরাজদের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সুরাটের সন্ধি দ্বারা (১৭৭৫) বোম্বাই কাউন্সিল রাঘোবাকে সাহায্যদানে স্বীকৃত হইলেন। ব্রিটিশ সৈন্য-সাহায্যের বিনিময়ে রাঘোবা ব্যাসিন, সল্‌সেট এবং ভারুচ্ ও সুরাটের রাজস্বের একাংশ কোম্পানিকে দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। আড়াই হাজার ব্রিটিশ সৈন্য রাঘোবার সাহায্যার্থে দেওয়া হইবে স্থির হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে রাঘোবা কোন তৃতীয় শক্তির সহিত কোন-প্রকার আদান-প্রদান বা আলাপ-আলোচনা করিতে পারিবেন না বলিয়া স্থির হইল। চুক্তি স্বাক্ষরের পরই ব্রিটিশ সৈন্য মারাঠাগণকে আরাস-এর যুদ্ধে পরাজিত করিল এবং সল্‌সেট দখল করিয়া লইল। এ-দিকে কলিকাতা কাউন্সিল বোম্বাই কাউন্সিল স্বাক্ষরিত সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে গভর্ণর-জেনারেল হেস্টিংস্ অবশ্য বোম্বাই কাউন্সিলের প্রতিশ্রুতি রক্ষারই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিলের মত তাঁহার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হইল না। সুতরাং কলিকাতা কাউন্সিলের নির্দেশ অনুযায়ী বোম্বাই কাউন্সিল রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ ত্যাগ করিয়া পুণা সরকার অর্থাৎ পেশওয়ার সহিত পুরন্দরের চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে ইংরাজগণ মাধব রাও নারায়ণকে পেশওয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। অবশ্য সল্‌সেট তাহাদের অধিকারেই রহিয়া গেল। তদুপরি ভারুচ্-এর রাজস্ব আদায়ের অধিকার ইংরাজদের দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে বিলাতে ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক সুরাটের সন্ধি অনুমোদিত হইলে বোম্বাই কাউন্সিল পুরন্দরের সন্ধি উপেক্ষা করিয়া পুনরায় রঘুনাথের পক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু তেলেগাঁও-এর যুদ্ধে ইংরাজগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। এই সন্ধির শর্তানুসারে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে

পেশওয়া-পদের জন্য উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব

সুরাটের সন্ধি

পুরন্দরের সন্ধি

ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি

ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যের যে-সকল স্থান অধিকার করিয়াছিল সেগুলি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। ভারুচের রাজস্বের একাংশ সিন্ধিয়াকে দেওয়া হইবে—ইহাও স্থির হইল। কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিল এই সন্ধির শর্তাদি মানিতে রাজী হইলেন না।

কলিকাতা কাউন্সিল ওয়াড়গাঁও-এর সন্ধি অনুমোদন করিলেন না। ফলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল। মারাঠাগণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সলবই-এর সন্ধি (১৭৮২) স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইল। এই সন্ধি দ্বারা ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থায় পুনঃস্থাপন হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এই সন্ধির প্রধান গুরুত্ব ছিল এই যে, ইহার ফলে ইংরাজ ও মারাঠাদের মধ্যে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের শান্তি বজায় থাকিবার ফলে ইংরাজগণ টিপুকে পরাজিত করিবার এবং দাক্ষিণাত্য হইতে ফরাসী প্রভাব দূর করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। এই সময়ে মারাঠাদের সহিত শান্তির সুযোগ লইয়া ইংরাজগণ নিজাম ও অযোধ্যার নবাবকে ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণে বাধ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্য-স্থাপনের ইতিহাসে সলবই-এর সন্ধির গুরুত্ব অত্যধিক ইহা অনস্বীকার্য।

সলবই-এর সন্ধি

(২) লর্ড কর্ণওয়ালিস ও মারাঠাগণ (Lord Cornwallis & the Marathas) : লর্ড কর্ণওয়ালিস মারাঠাগণকে স্বপক্ষে আনিয়া টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অবশ্য নিজামের বিরুদ্ধে মারাঠাদের যুদ্ধে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু অযোধ্যা রাজ্যে সিন্ধিয়াকে কোনরূপ গোলযোগ সৃষ্টি করিবার সুযোগও তিনি দেন নাই।

না-হস্তক্ষেপ-নীতি

(৩) সার্ জন শোর ও মারাঠাগণ (Sir John Shore & the Marathas) : সার্ জন শোর না-হস্তক্ষেপ-নীতি অনুসরণ করিয়া মারাঠা শক্তিকে অধিকতর দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে খরদা-এর যুদ্ধে তিনি নিজামকে কোনপ্রকার সাহায্য প্রেরণ না করিয়া মারাঠাদের জয়ের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মারাঠাদের শক্তি ও মর্যাদা উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মারাঠাদের মধ্যে স্বার্থজনিত আত্মকলহ শুরু না হইলে সেই সময়ে ব্রিটিশ-অনুসৃত না-হস্তক্ষেপ-নীতির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত। কিন্তু তাহাদের আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্ব সেই আশা বিনষ্ট করিয়াছিল। অবশ্য এ-কথা স্বীকার্য যে, জন শোর-এর না-হস্তক্ষেপ-নীতি মারাঠাগণকে নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ দান করিয়াছিল। ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের ভীতি থাকিলে সেই সময়ে মারাঠাগণ একতাবদ্ধ থাকিত। এ-দিক দিয়া জন শোর-এর নীতি সমর্থনযোগ্য।

না-হস্তক্ষেপ-নীতি—খরদা-এর যুদ্ধ

(৪) লর্ড ওয়েলেসলী ও মারাঠাগণ (Lord Wellesley & the Marathas) : মারাঠাদের আত্মকলহের সুযোগে লর্ড ওয়েলেসলী তাহাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করিলেন। তিনি পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাওকে ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা (Subsidiary Alliance) গ্রহণে স্বীকৃত করাইয়াছিলেন। সেই সূত্রে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে এবং পরে হোলকার ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে তাহারা

অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতি

শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধ হইতে বাধ্য হন। এইভাবে মারাঠাশক্তি পতনের দিকে দ্রুত ধাবিত হইতেছিল।

(৫) **সার্ জর্জ বার্লো, লর্ড মিণ্টো, লর্ড ময়রা (হেস্টিংস্) ও মারাঠাগণ (Sir George Barlow, Lord Minto, Lord Moira [Hastings] and the Marathas):** সার্ জর্জ বার্লোর শাসনকালে ইংরাজগণ মারাঠাদের সহিত না-হস্তক্ষেপ-নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। সিন্ধিয়া ও হোল্কারের সহিত জর্জ বার্লো মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। সেই শান্তিরক্ষা করিয়া চলিবার নীতি পরবর্তী শাসক লর্ড মিণ্টোর আমলেও অনুসৃত হইয়াছিল। অবশ্য বেরারের রাজা পাঠান-নেতা আমীর খাঁ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে লর্ড মিণ্টো সাহায্য দান করিয়াছিলেন। মারাঠাদের সন্তুষ্টি বিধান করিয়া চলাই ছিল তাঁহার নীতি। এজন্য তিনি আমীর খাঁকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিতে বা পিণ্ডারি দমন করিতে অগ্রসর হন নাই, কারণ এই সূত্রে মারাঠাদের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার আশংকা ছিল।

বার্লো এবং মিণ্টোর না-হস্তক্ষেপ-নীতি

লর্ড হেস্টিংসের আমলে মারাঠা শক্তি চিরতরে খর্ব হইয়াছিল। তিনি পিণ্ডারি-দমনের জন্য সিন্ধিয়াকে ইংরাজপক্ষে যোগদান করিতে রাজী করাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, হোল্কার ও আপ্পা সাহেবকে পরাজিত করিয়া তিনি মারাঠা শক্তির সম্পূর্ণ পতন ঘটাইয়াছিলেন। সেই সময়েই পেশওয়া-পদ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং শিবাজীর জনৈক বংশধরকে পেশওয়া রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশ—সাতারার সিংহাসনে স্থাপন করা হইয়াছিল। হোল্কার ও ভোঁসলেও ইংরাজদের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। লর্ড হেস্টিংসের আমলেই মারাঠাগণ ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মারাঠা শক্তির পতন

অধ্যায় ১৩

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার : শিখদের উত্থান ও পতন

(Expansion of the British Empire in India : Rise and Fall of the Sikha)

লর্ড আমহার্স্ট, ১৮২৩-২৮ (Lord Amherst) : লর্ড হেস্টিংসের শাসনকালে ভারতের অধিকাংশ স্থানেই ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে তখনও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন করিবার মত শক্তি বিদ্যমান ছিল। উত্তর-পশ্চিমে শিখ, সিন্ধী, বেলুচ, পাঠান ও আফগান জাতি এবং পূর্ব সীমান্তে আসাম ও ব্রহ্মদেশবাসীদের তখনও যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তি ছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা-বিধান করিবার পক্ষে এই সকল জাতির সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা

লর্ড হেস্টিংস্-এর ভারত পরিত্যাগ এবং লর্ড আমহার্স্ট-এর ভারতে আসিয়া পৌঁছিবার অন্তর্বর্তী কালে জন এ্যাডাম্ নামে কলিকাতা কাউন্সিলের জনৈক সদস্য অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেলের কাজ করিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে লর্ড আমহার্স্ট শাসনভার গ্রহণ করিবার অল্প-কালের মধ্যেই ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইল।

লর্ড আমহার্স্টের নিয়োগ

প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ, ১৮২৪-'২৬ (The First Anglo-Burmese War, 1824-'26) : সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরাজদের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে তখনও ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরাজদের রাজনৈতিক সংঘর্ষের কোন প্রশ্নই ছিল না, কারণ সেই সময়ে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-গঠনেই সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মদেশের রাজা বোদোপয়া (Bodowpa) (১৭৭৯-১৮১৯) এবং তাঁহার পুত্র পাগিদোয়া (Pagydoa)-এর আমলে ব্রহ্ম রাজ্যে সীমা বিস্তারলাভ করিলে ব্রিটিশ রাজ্যসীমা ও ব্রহ্মদেশের সীমা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া পড়ায় দুই পক্ষে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। বোদোপয়া ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান অধিকার করেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই (১৮১৩) তিনি মণিপুর দখল করেন। ব্রহ্মদেশের সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পক্ষ ১৭৯৫ হইতে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ছয়বার তথায় দূত প্রেরণ করেন। ক্যাপ্টেন সাইমস্ (Capt. Symes), ক্যাপ্টেন কক্স্ (Capt. Cox) এবং ক্যাপ্টেন ক্যানিং (Capt. Canning) দূত হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন।*

লর্ড হেস্টিংস্ যখন পিণ্ডারি-দমনের কাজ শেষ করিয়াছেন সেই সময়ে বোদোপয়া, মধ্যযুগের আরাকান-রাজা চট্টগ্রাম, ঢাকা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থান হইতে কর আদায় করিতেন এই অজুহাতে [illegible] ান দাবি করিয়া এক পত্র প্রেরণ করিলেন। তাঁহার এই দাবির পশ্চাতে মূল

প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ

* Capt. Symes, 1795, 1802, Capt. Cox, 1797, Capt. Canning, 1803, 1809, 1811, Vide, *An Advanced History of India*, p. 731.

যুক্তি ছিল এই যে, তিনি তখন আরাকান রাজ্য জয় করিয়া আরাকান রাজ্যের যাবতীয় অধিকারের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। এই পত্রের কোন ফল হইল না, বলা বাহুল্য। এ-দিকে বোদোপয়ার পুত্র পাগিদোয়া রাজা হইলেন। তাঁহার সেনাবাহিনী ১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে আসাম অধিকার করিতে সমর্থ হইল। লর্ড আমহার্স্ট ভারতে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরে পাগিদোয়ার সেনাপতি চট্টগ্রামের সন্নিকটে ব্রিটিশ অধিকৃত শাহপুরী (Shahpuri) দ্বীপটি দখল করিলেন এবং বাংলাদেশ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। লর্ড আমহার্স্ট ব্রহ্ম সরকারের সহিত বিনাযুদ্ধে এ-বিষয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টা যখন করিতেছিলেন, সেই সময়ে দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারীকে ব্রহ্ম সরকারের কর্মচারিগণ বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গেলে লর্ড আমহার্স্ট ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৮২৪)। সমুদ্রপথে রেঙ্গুন আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার আর্চিবল্ড ক্যাম্পবেল (Sir Archibald Campbell) ও ক্যাপ্টেন ম্যারিয়ট (Capt. Marryat)-এর নেতৃত্বে এক নৌবাহিনী প্রেরণ করিলেন। এদিকে আসামের সীমান্ত হইতে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যগণ ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত গ্রাম আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সূত্রে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই সিলেট বা শ্রীহট্টের নিকটে ইংরাজ ও ব্রহ্মদেশীয় সৈনিকদের মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আসামের দিকেও যুদ্ধ শুরু হইল। ইহা ভিন্ন, আরাকান এবং ব্রহ্মদেশেও যুদ্ধ চলিল। আসাম অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্য সাফল্যলাভ করিলেও বর্মী সেনাপতি বান্দুলা (Bandula) চট্টগ্রামের সন্নিকটে এক ব্রিটিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। সার্ ক্যাম্পবেল এ-দিকে রেঙ্গুন দখল করিতে সমর্থ হইলেন। এমতাবস্থায় সেনাপতি বান্দুলা স্বদেশ-রক্ষার্থে বাংলাদেশে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া সসৈন্যে রেঙ্গুন পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রেঙ্গুনের সন্নিকটে ব্রিটিশ বাহিনীর হস্তে তাঁহার শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। ইহার পর তিনি ডোনাবিউ (Donabew) নামক স্থান রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। বান্দুলার ন্যায় সুদক্ষ সেনাপতির আকস্মিক মৃত্যু বর্মী সেনাবাহিনীকে হীনবল করিয়া ফেলিল। এ-দিকে তখন সার্ ক্যাম্পবেল প্রোম দখল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এইভাবে পরাজিত হইয়া ব্রহ্মরাজ ব্রিটিশের সহিত সন্ধিবন্ধ হইতে বাধ্য হইলেন। যান্দাবু (Yandaboo)-এর সন্ধি দ্বারা (১৮২৬) ব্রহ্মদেশের রাজা টেনাসেরিম ও আরাকান প্রদেশ দুইটি ব্রিটিশদের ছাড়িয়া দিতে এবং এক কোটি মুদ্রা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে বাধ্য হইলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি আসাম, জন্তিয়া, কাছাড় প্রভৃতি অঞ্চলে ভবিষ্যতে হস্তক্ষেপ না করিতে এবং মণিপুর রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিতেও বাধ্য হইলেন। দুইপক্ষের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তিও সম্পাদিত হইল। কিন্তু ব্রহ্মরাজ তাঁহার রাজ্যে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিয়োগে সম্মত হইলেন না। অবশ্য কয়েক বৎসর পর (১৮৩০) এই শর্তও তাঁহাকে মানিয়া লইতে হইয়াছিল। প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে আসাম, জন্তিয়া, কাছাড় ও মণিপুর ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত না হইলেও ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

আসাম, আরাকান ও ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের বিস্তৃতি

যান্দাবু-এর সন্ধি (১৮২৬)

ভরতপুর অধিকার (Occupation of Bharatpur) ঃ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুর আক্রমণ করিতে গিয়া ব্রিটিশ বাহিনীর যে-শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছিল, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরের রাজার নাবালক পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দুর্জন সাল নামে তাঁহারই জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। দিল্লীর তদানীন্তন রেসিডেন্ট ডেভিড্ অক্টারলোনি নাবালক রাজার পক্ষ অবলম্বন করিলে লর্ড আমহার্স্ট তাঁহার এই হস্তক্ষেপ নীতির তীব্র নিন্দা করিলেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া অক্টারলোনি পদত্যাগ করিলে সেই স্থলে সার্ চার্লস্ মেটকাফ্‌কে নিযুক্ত করা হইল। সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ অবশ্য ডেভিড্ অক্টারলোনি-অনুসৃত নীতি গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া লর্ড আমহার্স্টের মত পরিবর্তন করাইতে সমর্থ হইলেন। লর্ড কোম্বারমিয়ার (Lord Combermere)-এর নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী দুর্জন সালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল (১৮২৬)। লর্ড কোম্বারমিয়ার সহজেই ভরতপুর দখল করিয়া নাবালক রাজাকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

ভরতপুর আক্রমণ ও অধিকার

ভরতপুর রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের সম্পূর্ণ আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইল।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুর সিপাহী বিদ্রোহ (Barrackpore Sepoy Mutiny, 1824) ঃ বারাকপুরের সিপাহীদিগকে ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার আদেশ দেওয়া হইলে তাহাদের মধ্যে এক বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। তদুপরি তাহাদের বেতনও ছিল খুব কম। প্রধানত এই দুই কারণের জন্যই সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইলে তাহারা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার দাবি করিয়া আবেদন জানাইল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই আবেদন অগ্রাহ্য করিলে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর অমানুষিক বর্বরতার সাহায্যে বহুসংখ্যক সিপাহীর প্রাণনাশ করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইয়াছিল।

কঠোরহস্তে বারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহ দমন

লর্ড আমহার্স্ট গবর্ণর জেনারেল-পদের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে বিচক্ষণতাসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁহার শাসনকালের বিভিন্ন কার্যকলাপ ডাইরেক্টর সভার মনঃপূত হইল না। যাহা হউক, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলে তাঁহার স্থলে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন।

লর্ড আমহার্স্ট-এর পদত্যাগ

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, ১৮২৮-'৩৫ (Lord William Bentinck 1828-'35) ঃ লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেণ্ডিশ বেন্টিঙ্ক প্রথম জীবনে মাদ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শাসনকালে (১৮০৩-'০৭) ভেলোরে সিপাহী বিদ্রোহ (১৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) দেখা দিলে তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন এই ছিল তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণা। এ-বিষয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের সহিত বোঝাপড়া করিতেও ত্রুটি করেন নাই। বস্তুত, এই কারণেই ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বেন্টিঙ্ককে গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইয়াছিল।

মাদ্রাজের গবর্ণর হিসাবে বেন্টিঙ্ক (১৮০৩-১৮০৭)

বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল: শান্তি ও সংস্কারের যুগ

গবর্ণর-জেনারেল হিসাবে উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল যুদ্ধ-বিগ্রহ বা কূট-কৌশলের সাফল্য প্রভৃতি আক্রমণাত্মক রাজনীতির জন্য বিখ্যাত নহে। শান্তি ও সংস্কারের জন্যই তাঁহার শাসনকাল ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

তাঁহার চরিত্র—ম্যাকলের বর্ণনা

বেণ্টিঙ্ক যৌবনে নেপোলিয়ান-বিজেতা ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের অধীনে সৈনিক হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু সামরিক কূটচাল বা অপর কোনপ্রকার উল্লেখযোগ্য সামরিক প্রতিভার পরিচয় তিনি দিতে পারেন নাই। লর্ড ম্যাকলে বেণ্টিঙ্কের চরিত্রের দয়াপ্রবণতা, বিচক্ষণতা, আনুগত্য ও জনকল্যাণের ইচ্ছা প্রভৃতি গুণাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। বেণ্টিঙ্কের সুহৃদ্ হিসাবে ম্যাকলে তাঁহার চরিত্র-বর্ণনায় হয়ত কতক পরিমাণে অতিশয়োক্তি করিয়া থাকিবেন, কিন্তু মূলত তাঁহার বর্ণনার সত্যতা অনস্বীকার্য।

তিন প্রকারের সংস্কার: অর্থনৈতিক, শাসন-সংক্রান্ত ও সামাজিক

তাঁহার সংস্কার-কার্যাদি (His Reforms): উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সংস্কার-কার্যাদি প্রধানত অর্থনৈতিক, শাসন-সংক্রান্ত এবং সামাজিক এই তিনভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে।

অর্থনৈতিক সংস্কার

ব্রহ্মযুদ্ধে ব্যয়বাহুল্যের ফলে সেই সময়ে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং বেণ্টিঙ্ক সর্বপ্রথমেই কোম্পানিকে সেই আর্থিক দুর্দশা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। সামরিক ও বেসামরিক ব্যয়সংকোচ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ডাইরেক্টর সভা হইতেও তাঁহার উপর এইরূপ নির্দেশই ছিল।

সামরিক ও বেসামরিক ব্যয়সংকোচ

তিনি সেনাবাহিনীর 'অর্ধেক ভাতা' (half-batta) উঠাইয়া দিলেন। সামরিক কর্মচারিগণ শান্তির কালেও 'অর্ধেক ভাতা' পাইতেন। বেণ্টিঙ্ক উহা উঠাইয়া দিলে সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু বেণ্টিঙ্ক দমিবার পাত্র ছিলেন না। ইহার পরই তিনি বেসামরিক ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চশ্রেণীর বেসামরিক কর্মচারিবর্গের বেতন হ্রাস করিয়াছিলেন। কোম্পানির কর্মচারি-বর্গের দক্ষতা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মচারীদের নিকট হইতে গোপনে রিপোর্ট (confidential report) গ্রহণের নিয়মও তিনি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে স্বভাবতই তিনি সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

কর্মচারিবর্গের কাজ সম্পর্কে গোপনে রিপোর্ট গ্রহণের ব্যবস্থা

রাজস্ব-বৃদ্ধির ব্যবস্থা

যে-সকল জমি অবৈধভাবে নিষ্কর বলিয়া দেখান হইয়াছিল সেগুলির উপযুক্ত রাজস্ব তিনি ধার্য করিলেন। আগ্রা অঞ্চলের জমিবণ্টন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া তিনি নূতন হারে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। ইহা ভিন্ন, অপরাপর নানা দিক দিয়া বেণ্টিঙ্ক ব্যয়সংকোচ ও রাজস্ব-বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এগুলির মধ্যে আফিং-এর একচেটিয়া কারবারে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল ব্যবস্থার ফলে তাঁহার গবর্ণর-জেনারেল-পদ গ্রহণকালে বাৎসরিক যে দশ লক্ষ টাকা ঘাটতি ছিল উহা পূরণ হইয়া বাৎসরিক আয় পনর লক্ষ টাকা উদ্‌বৃত্তে পরিণত হইল।

আফিং-এর একচেটিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন

শাসন-সংক্রান্ত সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রথমেই তিনি বিচার বিভাগের উন্নতি সাধন করিলেন। কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় (Circuit court) এবং আপীল আদালতগুলি তুলিয়া দিয়া তিনি বিচারকার্যে অযথা বিলম্বের পথ বন্ধ করিলেন। এলাহাবাদে তিনি একটি রেভিনিউ বোর্ড স্থাপন করিলেন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটদের কার্য পরিদর্শনের জন্য তিনি কমিশনার নামে কয়েকটি নূতন কর্মচারি-পদ সৃষ্টি করিলেন। তিনি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের দায়িত্ব একই হস্তে অর্পণ করিলেন। কর্ণওয়ালিসের বিচার-ব্যবস্থায় কোন দায়িত্ব-মূলক কর্মচারি-পদে ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হইত না। বেণ্টিঙ্ক এই নিয়মের পরিবর্তন করিয়া ভারতীয় বিচারপতিদের বিচার-ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও বেতন বাড়াইয়া দিলেন। বিচারালয়গুলিতে পূর্বে ফারসী ভাষা প্রচলিত ছিল। বেণ্টিঙ্ক স্থানীয় ভাষায় বিচারালয়ের কাজ চালাইবার নিয়ম প্রবর্তন করিয়া বিচার-ব্যবস্থাকে জাতীয় চরিত্র দান করিয়াছিলেন। বেণ্টিঙ্কের শাসন-সংস্কারের ফলে কোম্পানির শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল।*

শাসন-সংক্রান্ত সংস্কার : বিচার বিভাগের সংস্কার

এলাহাবাদে রেভিনিউ বোর্ড স্থাপন

ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের দায়িত্ব একই হস্তে অর্পণ ; বিচার-বিভাগে ভারতীয়দের অধিকতর দায়িত্ব অর্পণ

বেণ্টিঙ্কের সংস্কার-কার্যাদির মধ্যে সামাজিক সংস্কারগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সামাজিক সংস্কারের জন্যই বেণ্টিঙ্ক ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সতীদাহ-প্রথা† নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। স্বামীর মৃত্যু হইলে হিন্দু বিধবাগণ স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়া সহমৃতা হইতেন। এইভাবে তাঁহারা 'সতী' হইতেন। কোন কোন মুসলমান রমণীও সতী হইয়াছেন এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, ক্রমে সতীদাহ-প্রথা বিধবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে স্বামীর চিতায় বলপূর্বক নিক্ষেপ করিবার রীতিতে পর্যবসিত হইয়াছিল। প্রগতিশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই বীভৎস ও অমানুষিক অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল হইতেই কোম্পানি সতীদাহ-প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য ইংরাজ কর্মচারিগণকে এ-বিষয়ে

সামাজিক সংস্কার

সতীদাহ নিবারণ (১৮২৯)

* "Lord William Bentinck......deserves credit for the clear vision which enabled him to construct for the first time a really workable, efficient administration ; offering to the natives of the country reasonable opportunities for the exercise of their abilities, and capabilities of the expansion still in progress." Smith, *Oxford History of India*, p. 663.

† "*Suttee* probably was a Scythian rite introduced from Central Asia." Smith, p. 62.

মনোযোগী হইতে বলা হইয়াছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লী সতীদাহ-প্রথা নিবারণার্থে সদর নিজামত আদালতের জজদের অভিমত জানিতে চাহিলে, তাঁহারা এই প্রথা একেবারে উঠাইয়া না দিয়া কতকগুলি কঠোর নিয়ম-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করিয়াছিলেন। লর্ড মিন্টোর শাসনকালে এই সুপারিশ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিস কর্মচারীর বিনা-অনুমতিতে সতীদাহ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল (১৮১৩)। লর্ড হেস্টিংসের আমলে ডাইরেক্টর সভা এই অমানুষিক প্রথা বিলোপের নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতীয়দের ধর্মে আঘাত দেওয়া সমীচীন হইবে না মনে করিয়া লর্ড আমহার্স্ট সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা করিতে সাহসী হন নাই। লর্ড বেণ্টিঙ্ক অবশ্য সতীদাহ-প্রথা নিবারণের জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন। তিনি শিক্ষিত উদারপন্থী হিন্দু নেতৃবর্গ এবং সদর নিজামত আদালতের জজদের অকুণ্ঠ সাহায্যলাভে সমর্থ হইলেন। প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামমোহন রায়ের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্কের আদেশে নৃশংস সতীদাহ-প্রথার বিলোপ ঘটিয়াছিল।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সমাজ-সংস্কারমূলক কার্য হইল ঠগী দমন। ঠগীদের অত্যাচার বহু পূর্ব হইতেই নিরাপদে পথ চলার অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছিল। মুঘল সম্রাট আকবর এটোয়া জেলার পাঁচশত ঠগীকে হত্যা করাইয়াছিলেন। ফরাসী পর্যটক থেভেনো (Thevenot) এর বর্ণনা হইতে ঔরংজেবের আমলে ঠগীদের অত্যাচারের কথা পাওয়া যায়। ইংরাজ শাসনের প্রথম দিকেও ঠগীদের অত্যাচারে একস্থান হইতে অপরস্থানে যাতায়াত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। অতর্কিত আক্রমণে পথিকদের গলায় ফাঁস লাগাইয়া হত্যা করিয়া তাহাদের অর্থ ও জিনিসপত্রাদি আত্মসাৎ করাই ছিল ঠগীদের উপজীবিকা। বেণ্টিঙ্ক কর্ণেল শ্লীম্যান (Col. Sleeman)-এর উপর ঠগী দমনের ভার অর্পণ করিলেন। শ্লীম্যান ফেরিঙ্গিয়া (Feringhia) নামে জনৈক ঠগীর নিকট হইতে ঠগীদের গোপন ঘাঁটিগুলির সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কঠোর হস্তে তাহাদিগকে দমন করিলেন (১৮৩০)।

ঠগী দমন—কর্ণেল শ্লীম্যান (১৮২৯-'৩০)

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট্ অনুসারে কোম্পানি ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বাৎসরিক অন্তত এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য ছিল। এই অর্থ কেবলমাত্র সংস্কৃত, ফার্‌সী প্রভৃতি প্রাচ্যভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্ক ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য অর্থ ব্যয়িত হইবে স্থির করিলে এই সূত্রে এক তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। তদানীন্তন ব্রিটিশ সেক্রেটারী প্রিন্সেপ্ (H. T. Princep) ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলসন (Wilson) প্রাচ্যভাষা শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য লর্ড ম্যাকলে (Lord Macaulay) ছিলেন ইংরাজী শিক্ষাদানের পক্ষপাতী।* রাজা রামমোহন রায়

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন (১৮৩৫)

* এই সূত্রে লর্ড ম্যাকলে প্রাচ্যের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞানের অভাবহেতু নিম্নলিখিত উদ্ভট মন্তব্য করিয়াছিলেন: "A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia.—Quoted in Sinha & Banerjee, p. 589.

প্রমুখ কলিকাতার শিক্ষিত হিন্দুসমাজ পশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ বেণ্টিঙ্ক ও তাঁহার কাউন্সিল ইংরাজী শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়িত হইবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। সেই বৎসরেই (১৮৩৫) লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের চেষ্টায় কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও বোম্বাই-এর এল্‌ফিন্‌স্টোন্‌ ইনস্টিটিউশন স্থাপিত হইয়াছিল।

কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও বোম্বাই-এর এল্‌ফিন্‌স্টোন্‌ ইনস্টিটিউশন স্থাপন

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy of Lord Bentinck) : পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে বেণ্টিঙ্ক নিরপেক্ষ-নীতি (Policy of non-intervention) অনুসরণ করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য প্রয়োজনবোধে এই নীতি পরিত্যাগ করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার নিরপেক্ষ-নীতির সুযোগ লইয়া বরোদার গাইকোয়াড় ইংরাজদের বিরোধিতা করিতে শুরু করিলেন। ভোপাল, জয়পুর এবং গোয়ালিওর রাজ্যেও নানাপ্রকার অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিল, কিন্তু এই সকল রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বেণ্টিঙ্ক হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু চরম ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করিতেও তিনি অবশ্য পশ্চাৎপদ হইলেন না। কাছাড়ের রাজা কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সেই রাজ্যের জনসাধারণের অনুরোধে বেণ্টিঙ্ক কাছাড় রাজ্যটি কোম্পানির শাসনভুক্ত করিয়াছিলেন। কুর্গের রাজার অত্যাচারে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলে বেণ্টিঙ্ক কুর্গ রাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। আসামের জয়ন্তিয়া পরগণার অধিবাসিগণ নরবলি দিবার জন্য কয়েকজন ইংরাজকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও তাহাদের মুক্তি না দেওয়ায় বেণ্টিঙ্ক জয়ন্তিয়া পরগণা দখল করিয়া লইয়াছিলেন। মহীশুর রাজ্যে সেই সময় চরম অব্যবস্থা দেখা দিলে বেণ্টিঙ্ক মহীশুরের শাসনব্যবস্থা কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। অবশ্য ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূরের শাসনভার ব্রিটিশ সরকার পুনরায় মহীশুর রাজবংশের হস্তে ফিরাইয়া দিয়াছিল।

নিরপেক্ষতার নীতি

নিরপেক্ষতার নীতির ব্যতিক্রম : কাছাড়, কুর্গ, জয়ন্তিয়া রাজ্য অধিকার

মহীশূরের শাসনভার কোম্পানির হস্তে গ্রহণ

বেণ্টিঙ্কের রাজত্বকাল হইতেই ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা অহেতুক রুশ-ভীতিতে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। হিরাট ও কান্দাহারের পথে রাশিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে উদ্যত এই ভয়ে ভীত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা লর্ড বেণ্টিঙ্ককে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রতি মনোযোগী হইতে নির্দেশ দিলেন। ১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অব্‌ কন্ট্রোল (Board of control)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আলেকজাণ্ডার বার্ণেস্‌ পাঞ্জাবের মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের নিকট নানাবিধ উপঢৌকনসহ উপস্থিত হইলেন। সেই বৎসরেরই (১৮৩১) শেষভাগে লর্ড বেণ্টিঙ্ক শতদ্রু নদীর তীরে রূপার নামক স্থানে রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। রঞ্জিৎ সিংহের সহিত "চিরস্থায়ী মিত্রতা' (Perpetual friendship) স্থাপন করিয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ ইংরাজ বণিকগণকে সিন্ধু

রঞ্জিৎ সিংহ ও সিন্ধুর আমীরগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন

ও শতদ্রু নদীপথে বাণিজ্য চালনার সুযোগ-সুবিধা দান করিতে এবং ব্রিটিশ রাজ্যসীমা মানিয়া চলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বেণ্টিঙ্ক সিন্ধু প্রদেশের আমীরগণের সহিতও মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিলেন।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের কৃতিত্ব (Estimate of Lord William Bentinck) : ভারতের ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার কৃতিত্বের আলোচনায় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। থর্ণটন (Thornton)-এর মতে লর্ড বেণ্টিঙ্ক নিজের যশ ও খ্যাতির দিকেই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। অপর পক্ষে তাঁহার কার্যকলাপের প্রশংসা করিতে গিয়া লর্ড ম্যাকলে বেণ্টিঙ্ককে জনহিতৈষী শাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেণ্টিঙ্ক তাঁহার শাসনকালে মুহূর্তের জন্যও জনকল্যাণের কথা বিস্মৃত হন নাই। ভারতীয় সমাজে কুসংস্কার দূরীকরণ, ভারতীয় ও ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, ভারতীয়দের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি সাধন প্রভৃতির জন্য লর্ড ম্যাকলে উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তিনিই সর্বপ্রথম প্রাচ্যদেশীয় অত্যাচারী শাসনের (Oriental despotism) স্থলে ব্রিটিশ স্বাধীনতার আস্বাদ ভারতবাসীকে দিয়াছিলেন ("who infused into Oriental despotism the spirit of British freedom")। লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে জনকল্যাণমূলক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু লর্ড ম্যাকলের ভাষায় আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাধান্য যে রহিয়াছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারত-ইতিহাসে লর্ড বেণ্টিঙ্কের স্থান

তথাপি নিরপেক্ষ বিচারে এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি কোম্পানির আর্থিক অনটন দূর করিয়া কোম্পানির বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের ঘাট্‌তি পূরণ করিয়া প্রতিবৎসর যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব উদ্‌বৃত্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষা-সংক্রান্ত সংস্কার সাধনের পশ্চাতে জনকল্যাণের ইচ্ছাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সকল কারণে লর্ড বেণ্টিঙ্ক ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, এবং তাঁহার নাম ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে।

ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয়

চার্টার এ্যাক্ট্, ১৮৩৩ (Charter Act, 1833) : ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট্-এর মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় চার্টার এ্যাক্ট্ পাস করিবার প্রশ্ন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হইলে ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ হইতে নানাপ্রকার দাবি পেশ করা হইল। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির চীনদেশের সহিত বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার উঠাইয়া দিয়া চীনদেশের বাণিজ্যে সকল বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানবেই সমান অধিকার দেওয়া হউক, এই দাবি তাহারা করিল। এ-দিকে পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত (১৮২৯) সিলেক্ট কমিটি ভারতবর্ষে কোম্পানির কার্যাদি সম্পর্কে এক বিরাট রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন (১৮৩২)। ভারতবর্ষের কোম্পানির রাজ্যের শাসনভার ব্রিটিশ সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিবার জন্য পার্লামেণ্টে সরকারের বিরোধী

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির চীনদেশীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার বিলোপ

দল দাবি উত্থাপন করিলেও শেষ পর্যন্ত ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকেই পুনরায় কুড়ি বৎসরের জন্য ভারতে বাণিজ্য করিবার এবং ভারতবর্ষে কোম্পানি কর্তৃক রাজ্য "ইংলণ্ড-রাজের পক্ষে" পরিচালনা করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। চীনদেশীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার অবশ্য কোম্পানিকে এইবার আর দেওয়া হইল না। ফলে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল।

বাংলার গবর্ণর-জেনারেল 'ভারতের গবর্ণর-জেনারেল' নামে অভিহিত

কোম্পানির ভারতীয় শাসন-কর্তৃপক্ষকে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইল। পূর্বে তাহারা কেবলমাত্র 'রেগুলেশন' (Regulation) পাস করিতে পারিত। বাংলার গবর্ণর-জেনারেলকে 'ভারতের গবর্ণর-জেনারেল' নাম দেওয়া হইল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর কাউন্সিলের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। ইওরোপীয় নাগরিকগণকে ভারতবর্ষে জমিদারি ক্রয় করিবার অধিকার দেওয়া হইল। নীল চাষের এবং অনুন্নত অঞ্চলের জন্য জমি ক্রয় করিবার অধিকারও তাহারা পাইল। দীনবন্ধু

নীল চাষ—নীলদর্পণ : নীল চাষের সুযোগ

মিত্রের 'নীলদর্পণ' গ্রন্থে এই নীলকর ইওরোপীয়দের অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৫৯ ও ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথাও নীলদর্পণে আছে। গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা চার হইতে পাঁচ করা হইল এবং আইন সচিব

আইন সচিব বা Law Member-এর পদ সৃষ্টি

(Law member)-এর একটি নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে পদাধিকারবলে কাউন্সিলের পঞ্চম সদস্য নিযুক্ত করা হইল। আগ্রা অঞ্চল লইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠনের অনুমতিও এই চার্টার-এ দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য এই শর্তটি কখনও কার্যকরী করা হয় নাই।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্ম প্রভৃতির ভেদাভেদ দূরীকরণ

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্ম প্রভৃতির জন্য কোন ভারতীয়কে অথবা ব্রিটিশ নাগরিককে কোম্পানির অধীনে চাকরি দানে আপত্তি করা চলিবে না—এই নীতিও ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার-এ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

সার্ চার্লস্ মেটকাফ্, ১৮৩৫-'৩৬ (Sir Charles Metcalfe 1835-'36) : লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক-এর পর সার্ চার্লস্ মেটকাফ্ অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে হয়ত গবর্ণর-জেনারেল-পদে স্থায়িভাবে বহাল করা হইত। কিন্তু চার্লস্ মেটকাফ্ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন বলিয়া ডাইরেক্টর সভা তাঁহার এই কার্যের তীব্র নিন্দা করিলে তিনি পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড, ১৮৩৬-'৪২ (Lord Auckland, 1836-'42) : লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াই উন্নয়নমূলক কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ডাক্তারী, সাধারণ শিক্ষা

জনকল্যাণমূলক সংস্কার

প্রভৃতির উন্নতি বিধান করিয়া তিনি প্রথমে তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিলেন। পূর্বে ইংরাজী স্কুল-কলেজের ছাত্র ভিন্ন অপর কাহাকেও সরকারী বৃত্তি দেওয়া হইত না। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষাশিক্ষার্থীদেরও সরকারী বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা

ভিন্ন, তিনি তীর্থকর, বিভিন্ন জনপ্রিয় ধর্মানুষ্ঠানে কোম্পানির সৈন্যদের যোগদানের রীতি, ধর্মাধিষ্ঠানগুলির সম্পত্তির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য বৃহৎ সেচ-পরিকল্পনার প্রাথমিক কার্যাদিও তিনি করাইয়াছিলেন। শান্তিমূলক নীতি অনুসরণে এবং জনকল্যাণকর কার্যাদিতে নিযুক্ত থাকিলে লর্ড অকল্যাণ্ড হয়ত সাফল্যলাভে সমর্থ হইতেন। কিন্তু সেই রুশ-ভীতিজনিত আফগান-নীতি পরিচালনায় তিনি অব্যবস্থিতচিত্ততা, অদূরদর্শিতা ও সামরিক অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়া নিজের এবং ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। দেশীয় নৃপতিগণের সহিত ব্যবহারেও তিনি গবর্ণর-জেনারেল-সুলভ মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই।

পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে অকল্যাণ্ডের দুর্বলতা

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের মৃত্যু ঘটিলে নাসির-উদ্দিন হায়দর নবাব-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। নাসির-উদ্দিন ছিলেন যেমন অকর্মণ্য তেমনি অত্যাচারী। তাঁহার রাজত্বকালের প্রারম্ভেই অযোধ্যার বিধবা বেগম (পাদশা বেগম) বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যের সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমনে বিলম্ব হইল না বটে, কিন্তু তাহাতে অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার কোন উন্নতি ঘটিল না। সুযোগ বুঝিয়া লর্ড অকল্যাণ্ড নাসির উদ্দিনের নিকট হইতে অযোধ্যায় অবস্থিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর খরচ-বাবদ পূর্বাপেক্ষা অধিক অর্থসাহায্য চাহিলেন এবং এক নূতন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। ডাইরেক্টর সভা তাঁহার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে তিনি এই সংবাদটি অযোধ্যার নবাবের নিকট গোপন রাখিলেন। পূর্বাপেক্ষা অধিক অর্থসাহায্য তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না এ-কথা অবশ্য তিনি তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। অযোধ্যার নবাব উহা অকল্যাণ্ডের উদারতা বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন।

অযোধ্যার নবাবের প্রতি ব্যবহার

সেই বৎসরই (১৮৩৭-৩৮) উত্তর-ভারতে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। মোট আট লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষের ফলে প্রাণ হারাইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের সাহায্যের জন্য মোট ৩৮ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভব হয় নাই।

উত্তর-ভারতে দুর্ভিক্ষ

শিবাজীর বংশধর সাতারা (Satara)-এর রাজা পোর্তুগীজদের সহিত ষড়যন্ত্র শুরু করিলে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে সিংহাসনে স্থাপন করা হয় (১৮৩৯)। অনুরূপভাবে, কার্নুল (Karnul)-এর নবাব ব্রিটিশ-বিরোধী ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করা হয়। ইন্দোর-এর হোলকার ব্রিটিশের বিরোধিতা শুরু করিলে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সাতারা, কার্নুল ও ইন্দোর রাজ্যের সহিত সম্পর্ক

প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ (The First Anglo-Afghan War): লর্ড অকল্যাণ্ড যখন ভারতের গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন তখন ভারতীয় রাজনীতির সর্বপ্রধান সমস্যা ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান করা। ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্র-নীতি সম্পূর্ণভাবে রুশ-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী লর্ড পামারস্টোন (Palmerston)-এর অহেতুক

রুশ-ভীতি এজন্য প্রধানত দায়ী ছিল। ১৮৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সমর্থনে পারস্য আফগানিস্তানের হিরাট্ প্রদেশটি আক্রমণ করিলে পামারস্টোন অধিকতর সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ছিলেন পামারস্টোনের অন্ধ অনুসরণকারী। তিনিও রাশিয়া কর্তৃক হিরাট্-জয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন এবং রাশিয়ার সাহায্য লইয়া পারস্য যাহাতে আফগানিস্তানের দিকে অগ্রসর হইতে না পারে সেইজন্য ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার বার্ণেস্ (Capt. Alexander Burnes)-এর নেতৃত্বে আফগানিস্তানে একটি বাণিজ্য-মিশন প্রেরণ করিলেন। ডাইরেক্টর সভাও অক্‌ল্যাণ্ডকে আফগানিস্তানের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। নামে বাণিজ্য-কমিশন হইলেও বস্তুত এই কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা।

রুশ-ভীতি

আলেকজাণ্ডার বার্ণেস-এর মিশন

যাহা হউক, আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদও ইংরাজদের সহিত মিত্রতাবন্ধ হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কিন্তু ইংরাজদের সহিত মিত্রতার বিনিময়ে তিনি রঞ্জিৎ সিংহ কর্তৃক অধিকৃত পেশওয়ার প্রত্যর্পণ দাবি করিলেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদের মিত্রতার বিনিময়ে পাঞ্জাব-কেশরী রঞ্জিৎ সিংহকে অসন্তুষ্ট করিতে চাহিলেন না। তিনি রঞ্জিৎ সিংহকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী মিত্র বলিয়া মনে করিলেন। দোস্ত মহম্মদকে পেশওয়ার ফিরাইয়া দিবার জন্য রঞ্জিৎ সিংহের উপর কোন-প্রকার চাপ দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ইংরাজদের সহিত দোস্ত মহম্মদ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হইলেন। উপরন্তু তিনি রাশিয়ার সহিত পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার শুরু করিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড দোস্ত মহম্মদের মিত্রতালাভের বিনিময়ে রঞ্জিৎ সিংহকে পেশওয়ার ফিরাইয়া দিবার জন্য চাপ দিতে অস্বীকৃত হইয়া নির্বুদ্ধিতার কাজ করিয়াছিলেন। কারণ, দোস্ত মহম্মদের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে খাইবার গিরিপথের উপর ব্রিটিশ প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ তিনি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। তাঁহার আফগান-নীতি অহেতুক রুশ-ভীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। পারস্য দেশের সীমা ও কোম্পানির রাজ্যসীমার মধ্যে যে হিরাট ব্যবধান ছিল এ-কথা লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড বুঝিতে পারেন নাই। পারস্যের সেনাবাহিনীর পক্ষে আফগানিস্তান অতিক্রম করিয়া ভারত সীমান্তে উপস্থিত হওয়া তেমন সহজ ছিল না। এমতাবস্থায় পাঞ্জাবের রঞ্জিৎ সিংহের মিত্রতার উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা অক্‌ল্যাণ্ডের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করা হয়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে রঞ্জিৎ সিংহকে পেশওয়ার ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত করাও অসম্ভব ছিল না।

আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদের সহিত ব্রিটিশ মৈত্রীর চেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত

যাহা হউক, দোস্ত মহম্মদের সহিত মিত্রতা-স্থাপনের পরিকল্পনার অসাফল্য এবং তাঁহার রুশ-প্রীতি, অক্‌ল্যাণ্ডের মনে দারুণ ভীতির সঞ্চার করিল। তিনি আফগানিস্তানের আমীর-পদ হইতে দোস্ত মহম্মদকে অপসারণের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। দোস্ত মহম্মদের স্থলে তিনি আহম্মদ শাহ্ দুর্‌রাণীর জনৈক বংশধর—শাহ্ সুজাকে স্থাপন করিতে চাহিলেন। শাহ্ সুজা আফগানিস্তানের

সিংহাসনচ্যুত হইয়া ইংরাজদের রক্ষণাধীনে লুধিয়ানায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। শাহ্ সুজার পক্ষ গ্রহণ করিয়া অক্ল্যাণ্ড আফগানিস্তানের সিংহাসন উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইলেন। শাহ্ সুজাকে আফগানিস্তানের সিংহাসনে স্থাপন করিতে পারিলে সেখানে ইংরাজ প্রভাব বিস্তারের সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইবে, এই ছিল লর্ড অক্ল্যাণ্ডের ধারণা। তিনি শাহ্ সুজা ও রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। এই ত্রিশক্তি-চুক্তি (Triple Alliance) সম্পাদন করিয়া অক্ল্যাণ্ড আফগানিস্তান আক্রমণের পরিকল্পনা-গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু কোম্পানির সেনাধ্যক্ষ তাঁহার এই আক্রমণমূলক পরিকল্পনা সমর্থন করিলেন না। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা অবশ্য লর্ড অক্ল্যাণ্ডের আফগান-নীতি সমর্থন করিলেন। কিন্তু ডাইরেক্টর সভা উহার তীব্র বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। নীতির দিক দিয়া বিচার করিলেও দোস্ত মহম্মদের রুশ-প্রীতি অথবা ইংরাজদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হওয়া যুদ্ধের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। স্বাধীন আমীর দোস্ত মহম্মদ কোন্ শক্তির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবেন তাহা ব্রিটিশের অনুমোদনসাপেক্ষ নিশ্চয়ই ছিল না। সুতরাং অক্ল্যাণ্ডের আফগান-নীতির পশ্চাতে কোনপ্রকার নৈতিকতা যে ছিল না, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের কারণ

শাহ্ সুজা, রঞ্জিৎ সিংহ ও ব্রিটিশের মধ্যে 'ত্রিশক্তি-চুক্তি'

ঠিক সেই সময়ে আফগানিস্তানের দুরুরাণী ও বারাক্জাইস্ নামক দুইটি রাজ-পরিবারের মধ্যে এক তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়। দোস্ত মহম্মদ ছিলেন বারাক্জাইস্ বংশসম্ভূত। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড অক্ল্যাণ্ড আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এইভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া লর্ড অক্ল্যাণ্ড ব্রিটিশ ভারতীয় ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভুল করিয়াছিলেন।

অক্ল্যাণ্ড্ কর্তৃক আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

যুদ্ধের প্রারম্ভেই দোস্ত মহম্মদ পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হইলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হইল। শাহ্ সুজা ব্রিটিশ সহায়তায় আফগানিস্তানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু শাহ্ সুজার ইংরাজ পদলেহন এবং ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন বার্ণেস্-এর ব্যভিচার আফগান জাতির মনে এক দারুণ ঘৃণার সৃষ্টি করিল। তাহারা কাবুলে প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করিয়া ক্যাপ্টেন বার্ণেস্‌কে ধরিয়া লইয়া গিয়া নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া তাহার ব্যভিচারিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট্ মেক্নাটেন (Macnaghten) আফগানদের সহিত অপমানজনক শর্তে এক চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে দোস্ত মহম্মদকে মুক্তিদানে ও আফগানিস্তান হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণে ব্রিটিশ পক্ষকে রাজী হইতে হইল। মেক্নাটেন পরিস্থিতির চাপে পড়িয়া এইরূপ শর্ত-সংবলিত চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই চুক্তির শর্তাদি মানিয়া চলা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আফগানরাও সন্দিহান হইয়া উঠিল

দোস্ত মহম্মদের পরাজয়

আফগানদের বিদ্রোহ —'মেক্নাটেন চুক্তি'

এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেও হত্যা করিল। ইহার পর পুনরায় আফগানদের সহিত অধিকতর অপমানজনক শর্ত মানিয়া লইয়া ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র আফগানদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আফগানিস্তান পরিত্যাগ করিতে হইল। নিরস্ত্রভাবে আফগানিস্তান পরিত্যাগের কালে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর অনেকেই আফগানদের গুলিতে প্রাণ হারাইল। জালালাবাদ ও কান্দাহারে তখনও অবশ্য ইংরাজ প্রাধান্য বজায় ছিল। কিন্তু কাবুলে ব্রিটিশ সৈন্য বা রেসিডেণ্টের কোন চিহ্ন আর রহিল না। ব্রিটিশ সৈন্যক্ষয় এবং ব্রিটিশ মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁহার আফগান-নীতির চরম বিফলতার পরিচয় দিলেন। এইভাবে হৃতমর্যাদা ও অপদস্থ হইয়া তিনি পদত্যাগপূর্বক স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়: ব্রিটিশ সৈন্যক্ষয় ও মর্যাদাহানি

লর্ড অকল্যাণ্ডের পদত্যাগের পর লর্ড এলেনবরা (Lord Ellenborough) ভারতের গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াই তিনি লর্ড অকল্যাণ্ড কর্তৃক আরব্ধ প্রথম আফগান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে চাহিলেন। ইহা ভিন্ন, ব্রিটিশ মর্যাদা পুনরুদ্ধার করাও ছিল তাঁহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি সেনাপতি পোলককে জালালাবাদে অবরুদ্ধ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি নট্ (Nott)-ও পোলককে সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন। কাবুলে পৌঁছিবার পূর্বেই সেনাপতি পোলক্ জালালাবাদের ব্রিটিশ বাহিনীকে অবরোধমুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন। সেনাপতি নট্ গজনী শহরে প্রবেশ করিয়া শহরটিকে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিলেন। তাহার পর পোলক্ ও নট-এর যুগ্মবাহিনী কাবুলে প্রবেশ করিয়া এক পৈশাচিক ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিল। কাবুলের বাজারটি বিস্ফোরকের সাহায্যে ধূলিসাৎ করা হইল। এইভাবে আফগানিস্তানের সহিত যুদ্ধে পরাজয়ের অপমান দূর করিতে গিয়া ইংরাজগণ নিজ নাম অধিকতর মসিলিপ্ত করিয়াছিল মাত্র। ইতিপূর্বেই দোস্ত মহম্মদ ব্রিটিশের কবলমুক্ত হইয়াছিলেন। কাবুল ও গজনীতে ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিয়া ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অপসরণ করি[illegible] আফগানগণ ব্রিটিশ পদলেহী আমীর শাহ সুজাকে হত্যা করিয়া দোস্ত মহম্মদকে পুনরায় আমীর-পদে স্থাপন করিল। এইভাবে প্রথম আফগান যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষের চূড়ান্ত অপমান ও পরাজয় ঘটিয়াছিল।

লর্ড এলেনবরা-এর শাসনকাল

প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

লর্ড অকল্যাণ্ডের আফগান নীতির সমালোচনা (Criticism of Lord Auckland's Afghan Policy) ঃ প্রথম আফগান যুদ্ধের কারণ, গতি এবং ফলাফল নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে লর্ড অকল্যাণ্ড তথা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার অদূরদর্শিতা ও নীতিজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী লর্ড পামারস্টোনের অহেতুক রুশ-ভীতিই যে অকল্যাণ্ডের আফগান-নীতির মূল ভিত্তি ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। লর্ড অকল্যাণ্ড ছিলেন লর্ড পামারস্টোনের অন্ধ অনুসরণকারী। সুতরাং আফগানিস্তান আক্রমণের সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ছিল কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিবার মত ধৈর্য, স্থৈর্য বা দূরদৃষ্টি তিনি প্রদর্শন করেন নাই। রাশিয়া ভারতে

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে, এই ভীতি তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তদানীন্তন ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে পারস্য বা রাশিয়ার রাজ্যসীমা কতদূর সেই ভৌগোলিক জ্ঞানও অকল্যাণ্ড বা লর্ড পামারস্টোনের ছিল না। পামারস্টোনকে এই অঞ্চলের একখানি বৃহৎ মানচিত্র আলোচনা করিয়া দেখিবার উপদেশও কেহ কেহ দিয়াছিলেন। কিন্তু রুশ-ভীতি পামারস্টোন ও তাঁহার শিষ্য অকল্যাণ্ডের মনে এমন এক বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল যে, তদানীন্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা এবং রুশ প্রভাবাধীন পারস্যের সীমা উভয়ই যে মধ্যবর্তী পাঞ্জাব, সিন্ধু, ভাওয়ালপুর ও রাজপুতনার বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চলের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল, এই কথা উপলব্ধি করিবার মত অনুধাবনশক্তি তাঁহাদের লোপ পাইয়াছিল। ব্রিটিশের মিত্রপক্ষ পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিৎ সিংহকে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা আফগানিস্তানের আমীরকে পেশওয়ার ফিরাইয়া দিতে রাজী করাইবার কোন চেষ্টা-ই অকল্যাণ্ড করেন নাই। এই উপায়ে রঞ্জিৎ সিংহের নিকট হইতে পেশওয়ার দোস্ত মহম্মদকে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও হয়ত দোস্ত মহম্মদ ব্রিটিশের সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারই করিতেন।

লর্ড পামারস্টোন ও লর্ড অকল্যাণ্ডের অহেতুক রুশ-ভীতি

তদানীন্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব

স্বাধীন আমীর দোস্ত মহম্মদের ইংরাজ-মৈত্রী প্রত্যাখ্যান তথা রুশ-মৈত্রী গ্রহণের স্বাধীনতা যে ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু লর্ড অকল্যাণ্ড আন্তর্জাতিক নৈতিকতায় জলাঞ্জলি দিয়া দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মানবতা বা নৈতিকতার বিচারে তাঁহার এই আচরণ সমর্থনযোগ্য নহে।

স্বাধীন আমীর দোস্ত মহম্মদের রুশ-প্রীতি যুদ্ধের কারণ হিসাবে অগ্রাহ্য

রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিক দিয়াও এই আচরণ সমর্থনযোগ্য নহে। রুশ সাহায্যপুষ্ট পারস্য হিরাট্ জয় করিলে রুশ প্রভাব বিস্তৃত হইবার যে-আশঙ্কা ছিল, তাহা ইংরাজ ও আফগান বাহিনীর যুগ্ম চেষ্টায় ব্যাহত হইয়াছিল এবং ইতিপূর্বেই পারস্য হিরাটের অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং রুশ প্রভাব বিস্তারের যুক্তিও প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সমর্থনে প্রদর্শন করা সম্ভব নহে।

রাজনৈতিক যুক্তির অভাব

আমীর দোস্ত মহম্মদ ব্রিটিশদের কোনপ্রকার বিরোধিতা বা শত্রুতাসাধন করেন নাই। এমতাবস্থায় দোস্ত মহম্মদের রুশ-মৈত্রীর অজুহাতে আফগানিস্তান আক্রমণ করিয়া অকল্যাণ্ড ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিলেন। তদুপরি আফগানিস্তান আক্রমণকালে সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া ব্রিটিশ সৈন্য প্রেরণ এবং সিন্ধুর আমীরদের নিকট হইতে জবরদস্তিমূলকভাবে অর্থসংগ্রহ সিন্ধুর আমীরগণের সহিত বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তভঙ্গ করিয়াছিল। আফগান যুদ্ধ তথা সিন্ধুর আমীরদের প্রতি ব্যবহারের অনৈতিকতা ও অদূরদর্শিতা সম্পর্কে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই।

ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক লেপন

ব্রিটিশ সৈন্যক্ষয়, অপমানকর শর্ত মানিয়া লইয়া আফগানদের হস্তে অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করিয়া ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর আফগানিস্তান পরিত্যাগ, কাবুলে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের অপসরণ, সকল কিছু লর্ড অকল্যান্ডের আফগান-নীতির ব্যর্থতা যেমন প্রমাণ করিয়াছিল, তেমনি ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত করিয়াছিল।

অকল্যান্ডের আফগান-নীতির ব্যর্থতা ও ব্রিটিশ মর্যাদা নাশ

লর্ড এলেনবরা, ১৮৪২-৪৪ (Lord Ellenborough) : লর্ড অকল্যান্ড পদত্যাগ করিলে লর্ড এলেনবরা গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। প্রথমেই তিনি লর্ড অকল্যান্ড-এর আরব্ধ প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের অবসান এবং ব্রিটিশ মর্যাদা পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এ-বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে (২০৪-২০৭ পৃষ্ঠা)। কিন্তু তিনি আফগানদের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। ব্রিটিশের মর্যাদা বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক গজনী ও কাবুল শহরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বর্বরতা এবং শেষ পর্যন্ত দোস্ত মহম্মদের আফগানিস্তানের সিংহাসনে পুনর্বার আরোহণ এলেনবরা-র কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে।

প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ - ব্রিটিশ অসাফল্য

সিন্ধুবিজয় (Conquest of Sind) : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সিন্ধুর আমীরগণ আফগানিস্তানের মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন। খইরাপুর, মীরপুর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের আমীরগণ ছিলেন সিন্ধুর প্রকৃত শাসক. ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড মিন্টো সিন্ধুদেশে ফরাসী প্রভাব বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে সিন্ধুর আমীরদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে আমীরগণ কোন ফরাসীকে সিন্ধুদেশে অবস্থান করিতে দিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এই চুক্তি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্বার স্বাক্ষরিত হইল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন . লকজা ডার বার্ণেস্ সিন্ধুনদের পথ ধরিয়া লাহোরে পৌঁছিবার কালে সিন্ধু উপত্যকার বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন এবং এ-কথা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করিলেন। ইহার এক বৎসর পর (১৮৩২) লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক হায়দ্রাবাদের (সিন্ধু) আমীরের সহিত এক মিত্রতা-চুক্তি দ্বারা সিন্ধুনদ-পথে এবং স্থলপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিলেন। সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী বা কোনপ্রকার সামরিক সরঞ্জাম সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হইবে না এই প্রতিশ্রুতি লর্ড বেণ্টিঙ্ককে দিতে হইয়াছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অকল্যান্ড হায়দ্রাবাদে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট্ স্থাপনের শর্তে আমীরদের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন. কিন্তু প্রথম ইঙ্গ আফগান যুদ্ধের কালে লর্ড অকল্যান্ড ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করিয়া সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদুপরি আমীরদের নিকট হইতেও অর্থ আদায় করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। অকল্যান্ডের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করা সিন্ধুর আমীরগণের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। বিশেষত প্রথম ইঙ্গ-আফগান

১৮০৯ ও ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে আমীরগণের সহিত ইংরাজ কোম্পানির চুক্তি

লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও আমীরদের সহিত চুক্তি (১৮৩২)

যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইচ্ছা করিলে সিন্ধুর আমীরগণ ব্রিটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া পর্যুদস্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্য সংঘর্ষে অগ্রসর হইলেন না। তথাপি লর্ড এলেনবরা সার্ চার্লস্ নেপিয়ার (Sir Charles Napier) নামে জনৈক নীতিজ্ঞানহীন দুর্ধর্ষ ইংরাজকে সিন্ধুদেশের আমীরগণের সহিত যে-কোন উপায়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া সিন্ধুদেশ অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। চার্লস্ নেপিয়ার খাইরাপুরের আমীর পরিবারের উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্বে পক্ষ গ্রহণ করিয়া ক্রমে সিন্ধুর আমীরদের এক নূতন চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করিলেন। এই চুক্তি দ্বারা তিনি তাঁহাদিগকে স্ব-স্ব রাজ্যের এক বিরাট অংশ ইংরাজদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিলেন। আমীরদের মুদ্রা প্রচলনের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। কিন্তু আমীরগণকে ভীতিপ্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে ইমামগড় নামক দুর্গটি ধূলিসাৎ করিলে এবং অবশেষে বেলুচ জাতিকে নানাভাবে উত্যক্ত করিয়া তুলিলে তাহারা ব্রিটিশ রেসিডেন্সী আক্রমণ করিতে বাধ্য হইল। চার্লস্ নেপিয়ার বহুকাল হইতেই যুদ্ধের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। বেলুচগণ ব্রিটিশ রেসিডেন্সী আক্রমণ করিলে সার্ চার্লস্ নেপিয়ার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতে আর বিলম্ব করিলেন না। মিয়ানী ও দাবো-এর যুদ্ধে আমীরগণ অধিকতর শক্তিশালী ব্রিটিশ বাহিনীর হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলে সিন্ধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল (১৮৪৩)। আমীরগণকে তাঁহার স্ব-স্ব দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়া সার্ চার্লস্ নেপিয়ার সিন্ধুদেশের শাসক হিসাবে দীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচার চালাইলেন।

অকল্যাণ্ড কর্তৃক চুক্তির শর্তভঙ্গ

সার্ চার্লস্ নেপিয়ারের ঔদ্ধত্য

মিয়ানী ও দাবো-এর যুদ্ধে জয়লাভ

এলেনবরা ও সার্ চার্লস্ নেপিয়ারের সিন্ধুবিজয়-সংক্রান্ত যাবতীয় আচরণ তাঁহাদের নীচ স্বার্থপরতা ও নীতিজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের আচরণের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। ঔদ্ধত্য ও নীচ স্বার্থপরতাদোষে দুষ্ট সিন্ধুবিজয় নীতি ডাইরেক্টর সভাও অনুমোদন করিলেন না। অবশ্য সেজন্য সিন্ধুদেশ আমীরদের ফিরাইয়া দিবার মত উদারতা-প্রদর্শনেও তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না।

ব্রিটিশের নীচ স্বার্থপর নীতি

লর্ড এলেনবরা ও গোয়ালিওর রাজ্য (Lord Ellenborough and Gwalior): এলেনবরার শাসনকালে গোয়ালিওর রাজ্যের সহিত ইংরাজদের এক তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জানকী সিন্ধিয়া অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে গোয়ালিওর রাজ্যে এক দারুণ অব্যবস্থা দেখা দেয়। এই অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া সিন্ধিয়ার বিশাল সেনাবাহিনী প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইতে সমর্থ হয়। এ দিকে শিখগণও এক বিশাল বাহিনীসহ ইংরাজদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে প্রায় প্রস্তুত ছিল। এমতাবস্থায় সিন্ধিয়ার সেনাবাহিনীর শিখদের সহিত যোগদান করিবার সম্ভাবনা স্বভাবতই লর্ড এলেনবরার অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠিল। এলেনবরা ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার

গোয়ালিওর রাজ্যে অব্যবস্থা

জন্য সেনাপতি স্যার্ হিউ গাফ (Sir Hugh Gough)-এর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনীকে চম্বল নদীর অপর তীরে প্রেরণ করিলে গোয়ালিওর রাজ্যের সেনাবাহিনী এলেনবরার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া যুদ্ধ শুরু করিল। কিন্তু মহারাজপুর ও পানিয়ার-এর যুদ্ধে গোয়ালিওর-এর সেনাবাহিনী ব্রিটিশ হস্তে পরাজিত হইলে এলেনবরা গোয়ালিওর রাজ্য কোম্পানির সাম্রাজ্যভুক্ত না করিলেও তথাকার শাসনব্যবস্থা একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্টের নির্দেশানুক্রমে যাহাতে চলিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিলেন।

মহারাজপুরে ও পানিয়ার-এর যুদ্ধ— ব্রিটিশ জয়

এলেনবরার সংস্কার-কার্যাদি (**Ellenborough's Reforms**) : ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এলেনবরা দাসপ্রথা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। লটারী দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর স্থানীয় উন্নতি বিধানের যে-রীতি ছিল, তাহাও তিনি নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন।* তাঁহার আমলেই সর্বপ্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দারোগাদের মাহিনা ও তাহাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করিয়া তিনি পুলিস ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

দাসপ্রথার উচ্ছেদ, লটারী নিষিদ্ধ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ, পুলিস ব্যবস্থার উন্নতি বিধান

লর্ড এলেনবরা স্বভাবতই উদ্ধত ছিলেন। তাঁহার যুদ্ধনীতি, ডাইরেক্টর সভার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের প্রতি অবহেলা প্রভৃতি কারণে তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

এলেনবরার প্রতি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ

রঞ্জিৎ সিংহ (**Ranjit Singh**) : রঞ্জিৎ সিংহ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র বারো বৎসর বয়সে সুকারচুকিয়া 'মিসল'-এর নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। সেই সময়ে পাঞ্জাব কয়েকটি সামন্ত রাজ্যে* বিভক্ত ছিল। এগুলিকে 'মিসল' বলা হইত। কানহেয়া মিসল, ভাঙ্গী মিসল, সুকারচুকিয়া মিসল—এই কয়টি সামন্ত রাজ্যই ছিল বিশেষ শক্তিশালী। কাবুলের জামান শাহ্ পাঞ্জাব আক্রমণ করিলে (১৭৯৮) রঞ্জিৎ তাঁহাকে বাধা দান করেন। মুষ্টিমেয় অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি জামান শাহের শিবির পুনঃপুনঃ আক্রমণ দ্বারা তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলে জামান শাহ্ রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মিত্রতা স্থাপনে সচেষ্ট হইলেন। উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। জামান শাহ্ রঞ্জিৎ সিংহকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করিলেন। জামান শাহ্ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর পরিত্যাগ করিয়া গেলে রঞ্জিৎ সিংহ লাহোর অধিকার করিয়া লইলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রঞ্জিৎ সিংহ জামান শাহ্-প্রদত্ত এক ফারমানের বলে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ কর্তৃক

কাবুলের জামান শাহের সহিত রঞ্জিৎ সিংহের মিত্রতা

---

* The Sikh *Misls* : The Bhangis, the Kanhoyas, the Sukerchakias, the Nakkais, the Fyzulapurias, the Ahluwalias, the Dallewalas, the Ramgarhias, the Nishanwallas, the Kavora Singhias, the Sahids, Nihangs and the Phulkias Dr. N. K. Sinha, *Ranjit Singh*, p. 2.

লাহোর অধিকারে জামান শাহের সমর্থন থাকিলেও এইরূপ কোন ফারমান দেওয়া হইয়াছিল, এ-কথা আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কেহ কেহ স্বীকার করেন না।* জামান শাহ্ রঞ্জিৎ সিংহকে তাঁহার মিত্র বলিয়া মনে করিতেন, এই কারণে নিজাম-উদ্দিন কাসুর নামে জনৈক ব্যক্তি অমৃতসরের ভাঙ্গীদের সহিত সংঘবদ্ধ হইয়া জামান শাহ্কে বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকা করদানের শর্তে সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করিবার অনুমতি চাহিলে জামান শাহ্ উহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ইহার পর রঞ্জিৎ সিংহ জম্মু জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তিনি মীরওয়াল ও নারওয়াল নামক দুইটি স্থান অধিকার করিলেন। জম্মুর রাজা ক্ষতিপূরণ হিসাবে নগদ কুড়ি হাজার টাকা দান করিয়া এবং রঞ্জিৎ সিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া রক্ষা পাইলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে রঞ্জিৎ সিংহ অমৃতসর অধিকার করিয়া তাঁহার শক্তি ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করিলেন। তারপর তিনি একে-একে শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরস্থ শিখ মিস্‌লগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। রঞ্জিৎ সিংহ সমগ্র শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক বৃহত্তর জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ শিখ মিস্‌লগুলি জয় করাও তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল। ঠিক সেই সময়ে শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ মিস্‌লগুলির নেতৃবর্গের মধ্যে এক দারুণ আত্মকলহ দেখা দিলে কেহ কেহ রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ এই সুযোগে লুধিয়ানা অধিকার করিয়া লইলেন। এমতাবস্থায় শিখ নেতৃবর্গ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য চাহিয়া অত্যন্ত ভুল করিয়াছেন। রঞ্জিৎ সিংহ সাহায্যকারী মিত্র হিসাবে আসিয়া নিজেই প্রভু সাজিয়া বসিয়াছেন। এমতাবস্থায় শতদ্রু নদীর পূর্বতীরের মিস্‌লগুলির নেতৃগণ ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে লর্ড মিণ্টো চার্লস্ মেট্‌কাফ্‌কে রঞ্জিৎ সিংহের সভায় প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত এ-বিষয়ে মীমাংসা করিতে চাহিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া উভয়পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরের সন্ধির দ্বারা শতদ্রু নদী রঞ্জিৎ সিংহের রাজ্যের পূর্বদিকের সীমারেখা বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ শিখ মিস্‌লগুলিতে রঞ্জিৎ সিংহ হস্তক্ষেপ করিবেন না এই প্রতিশ্রুতি দান করিলেন।

মীরওয়াল ও নারওয়াল অধিকার : জম্মুর আনুগত্য লাভ

অমৃতসর অধিকার (১৮০৫)

অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯)

অমৃতসরের সন্ধির পর রঞ্জিৎ সিংহ পাঞ্জাবের পার্বত্য রাজ্যগুলি, কাশ্মীর, মুলতান, কোহাট, বান্নু, টঙ্ক্, দেরা ইসমাইল খাঁ, দেরা গাজী খাঁ, পেশওয়ার প্রভৃতি স্থান জয় করিলেন। এইভাবে তাঁহার রাজ্য পাঞ্জাব হইতে খাইবার গিরিপথ এবং সিন্ধুদেশের সীমা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিল। হিদারু-এর যুদ্ধে আফগানদের পরাজিত করিয়া তিনি এটক জয় করিলেন। কয়েক বৎসর পরে নওসেরা-এর যুদ্ধে তিনি আফগান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া শতদ্রু নদীর বামতীরে নিজ অধিকার অক্ষুন্ন রাখিলেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলের দোস্ত

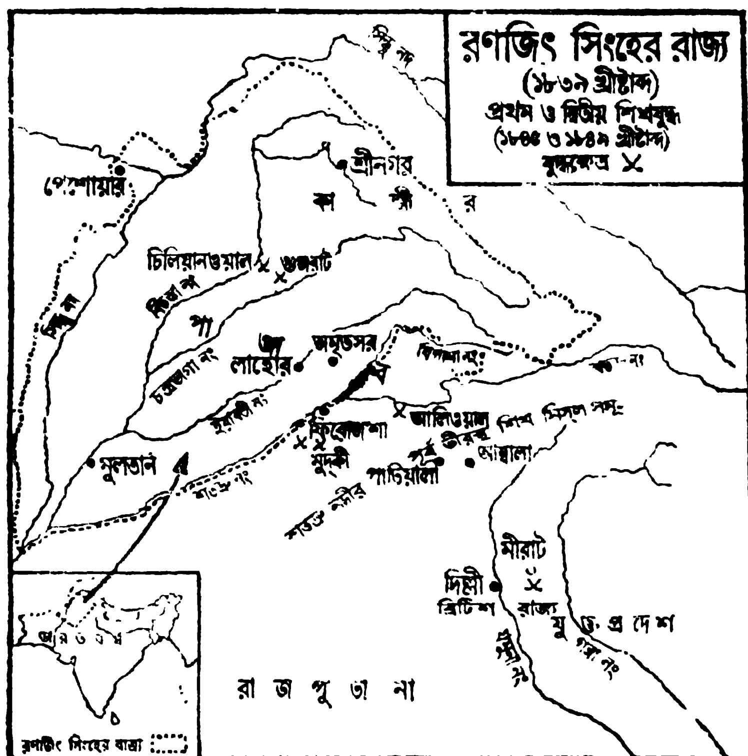
রঞ্জিৎ সিংহের রাজ্যবিস্তার

* Ibid, p. 12.

মহম্মদ জামরুদ ও সাব কাদের নামক দুইটি দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুর্গ দুইটি শেষ পর্যন্ত দখল করিতে সমর্থ হন নাই।

রঞ্জিৎ সিংহ কেবলমাত্র সমরবিজয়ী নেতা ছিলেন না, শাসনকার্যেও তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করাই ছিল তাঁহার নব-বিজিত রাজ্যের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার সেনাবাহিনীকে আধুনিক সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আফগানিস্তানে তদানীন্তন আমীর শাহ্-সুজার মৃত্যুর পর অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিবে এ-কথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আধুনিক যুদ্ধ-পদ্ধতিতে শিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে সেই সময়ে আফগানিস্তানে অধিকার-বিস্তার করাও অসম্ভব হইবে না, এ-কথা মনে করিয়া তিনি ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টির দুইজন

তাঁহার শাসন ও সামাজিক সংগঠন



প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীকে নিজ সেনাবাহিনীর শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাবাহিনী সামরিক দক্ষতায় যে-কোন ইওরোপীয় সেনাবাহিনীর সমতুল্য ছিল।

শাসনব্যবস্থায়ও রঞ্জিৎ সিংহ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রচলিত রীতি-নীতির উপর নির্ভর করিয়া তিনি দেশ শাসন করিতেন।

ইংরাজগণ রঞ্জিৎ সিংহের মৈত্রীর মূল্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকায় রঞ্জিৎ সিংহ রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর হইলে ইংরাজগণ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল। সেই সময়ে রুশ আক্রমণের ভয়ে ভীত ইংরাজগণ রঞ্জিৎ সিংহকে কোনভাবে অসন্তুষ্ট করিতে চাহিল না। লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্বয়ং রঞ্জিৎ সিংহের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দোস্ত মহম্মদ ইংরাজদের সহিত মিত্রতার বিনিময়ে রঞ্জিৎ সিংহ কর্তৃক অধিকৃত পেশোয়ার-প্রত্যর্পণ দাবি করিলে ইংরাজগণ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ইহা হইতে তাহারা রঞ্জিৎ সিংহের সহিত মিত্রতার উপর কতদূর গুরুত্ব আরোপ করিত তাহা উপলব্ধি করা যায়। রঞ্জিৎ সিংহের জীবদ্দশায় ইংরাজদের সহিত তাঁহার মিত্রতা সম্পূর্ণভাবে বজায় ছিল। ইংরাজগণ শাহ্ সুজাকে আফগানিস্তানের আমীর-পদে স্থাপন ব্যাপারে রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য পাইয়াছিল।

ইংরাজদের সহিত মৈত্রী

তাঁহার চরিত্র ও কৃতিত্ব (His Character and Estimate) : রঞ্জিৎ সিংহ একাধারে দুর্ধর্ষ সৈনিক, সুদক্ষ জননায়ক এবং গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিক ছিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ দেখিতে তেমন সুশ্রী ছিলেন না, তদুপরি বসন্তরোগে আক্রান্ত হইবার ফলে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত আমোদ-প্রিয় ব্যক্তি। ঐতিহাসিক কানিংহাম তাঁহার চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং নিজ কাজের সাফল্য তিনি ভগবানের দয়া বলিয়া মনে করিতেন। দয়াপ্রবণ ব্যক্তিমাত্রকেই তিনি আন্তরিক-ভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি নিজেকে এবং নিজ প্রজাবৃন্দকে সমষ্টিগতভাবে "খালসা" নামে অভিহিত করিতেন। "He styled himself and his people collectively the *Khalsa* or common wealth of Govind." বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত শিখজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তিনি এক বৃহৎ শিখশক্তি-গঠনে কৃতসংকল্প ছিলেন। শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ শিখ মিসলগুলির নেতৃবর্গের বাধার ফলে এই বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে না পারিলেও তিনি শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীরস্থ শিখ মিসলগুলি জয় করিয়া ঐক্যবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিজ প্রতিভা, সংগঠনী শক্তি ও সামরিক দক্ষতার বলে তিনি অতি অল্প বয়সে সামান্য এক দলপতি হইতে ক্রমে শিখ রাজ্যের রাজপদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল পরস্পর বিবদমান শিখ মিসলগুলিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক রাষ্ট্রবন্ধনে আবদ্ধ করিবার কার্যে সাফল্য লাভ। দুর্ধর্ষ আফগান উপজাতিদের আক্রমণ হইতে নিজ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন।

চরিত্র

সংগঠনী শক্তি ও সামরিক দক্ষতা

তাঁহার শাসনব্যবস্থা স্বৈরাচারী ছিল বটে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী ছিল না। প্রচলিত রীতি-নীতি মানিয়া চলিয়া তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

ছিল তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে রাজকর্মচারি-পদে নিযুক্ত করিয়া তিনি শাসনব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং নিজ মানসিক উৎকর্ষেরও পরিচয় দিয়াছিলেন।

পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

রঞ্জিৎ সিংহ নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি হায়দার আলির মতই তাঁহারও শিক্ষার অভাবজনিত অসুবিধা বহুলাংশে হ্রাস করিয়াছিল। চার্লস্ মেট্‌কাফ্ রঞ্জিৎ সিংহের শাসনকার্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। সার্ লেপেল গ্রিফিন (Sir Lepel Griffin) রঞ্জিৎ সিংহের জীবনী লেখকের মতে, আমরা যদি নিরপেক্ষ বিচারের মনোভাব লইয়া রঞ্জিৎ সিংহের দিকে দৃক্‌পাত করি তাহা হইলে তাঁহাকে বীর, সুদক্ষ শাসক, মহানুভব ব্যক্তি এবং সমসাময়িক শাসকদের অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে দেখিতে পাইব। বিদেশী পর্যটক মাত্রেই রঞ্জিৎ সিংহের সমর-নিপুণতা ও শাসনকার্যে পারদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পর্যটক জ্যাকেমো (Jaquemont) তাঁহাকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক এবং নেপোলিয়ন বোনাপার্টির ক্ষুদ্র সংস্করণ (Little Napoleon) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। দয়া, কোমলতা, বিজিতের প্রতি অনুকম্পা, সৌজন্য ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। জার্মান পর্যটক ফন্ হিউগেলও রঞ্জিৎ সিংহের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। হিউগেল বলিয়াছেন যে, রঞ্জিৎ সিংহ নিজ হস্ত কখনও রক্ত-রঞ্জিত করেন নাই।

বিদেশী পর্যটকদের প্রশংসা

রঞ্জিৎ সিংহ এক শক্তিশালী এবং সুদক্ষ সেনাবাহিনী গঠন করিবার এবং পূর্বেকার সামন্তপ্রথা-ভিত্তিক সামরিক বাহিনীর স্থলে জাতীয় স্থায়ী সেনাবাহিনী রাখিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। পূর্বে প্রয়োজনমত সামন্তদিগকে সৈন্যসহ রাজাকে যুদ্ধের কালে সাহায্য করিবার রীতি ছিল। রঞ্জিৎ সিংহ উহার পরিবর্তন সাধন করিয়া ৭৫০০০ সৈন্যের এক জাতীয় সামরিক বাহিনী গঠন করিলেন। এ্যালার্ড, ভেন্টুরা, এভিটাবাইল, কোর্ট প্রভৃতি ইওরোপীয় সামরিক কর্মচারীদের নিয়োগ করিয়া তিনি তাঁহার সেনাবাহিনী আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

স্থায়ী জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন

যে-যুগে স্বৈরাচার-ই ছিল রাষ্ট্র-শাসনের নীতি, সেই যুগে রঞ্জিৎ সিংহ জনসাধারণের সেবক হিসাবে নিজেকে মনে করিতেন। তিনি একটি মন্ত্রিসভার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজ্যকে প্রদেশে, প্রদেশকে জেলায় এবং জেলাকে গ্রামে ভাগ করিয়াছিলেন। জেলায় একজন করিয়া সর্দার নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং গ্রামের শাসন ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর।

রঞ্জিৎ সিংহের জীবনী লেখক গ্রিফিন তাঁহাকে "আদর্শ সৈনিক, নির্ভীক, সুদক্ষ, অধ্যবসায়ী, কর্মঠ এবং উদার" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত সমসাময়িক কালের শাসকদের মধ্যে রঞ্জিৎ সিংহ ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক। তিনি জনসাধারণের কল্যাণের কথা মনে রাখিয়া সরকারী কর্মচারিগণ যাহাতে তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করে সেই দিকে নজর রাখিতেন। তাঁহার সুদক্ষ শাসনে দেশের হিন্দু, মুসলমান সকলেই শান্তিতে বসবাস করিত।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক

ইংরাজ ঐতিহাসিকদের অনেকেই রঞ্জিৎ সিংহের দূরদর্শিতার প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে, ইংরাজদের সহিত ব্যবহারে তিনি নির্ভীক, বলিষ্ঠ দূরদর্শী নীতি অনুসরণ করিতে পারেন নাই। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসার রোধ করা সম্ভব হইবে না, এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই হয়ত তিনি ব্রিটিশদের সহিত কোনপ্রকার দ্বন্দ্ব যাহাতে না ঘটে সেই ভাবে চলিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় অমৃতসরের সন্ধির কোনপ্রকার বিরোধিতা বা লঙ্ঘন তাঁহার দিক হইতে ঘটে নাই। অপর একটি বিষয়েও রঞ্জিৎ সিংহের গঠনমূলক দূরদর্শিতার অভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অবর্তমানে, রাজ্যভার গ্রহণ করিবার মত প্রশিক্ষণ তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীকে দিয়া যান নাই। তথাপি ভারত-ইতিহাসে রঞ্জিৎ সিংহ এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দূরদর্শিতার অভাব

উপসংহার

রঞ্জিৎ সিংহের উত্তরাধিকারিগণ (Successors of Ranjit Singh) : মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হইতে রঞ্জিৎ সিংহের অসুস্থতাহেতু তাঁহার পুত্র খড়ক সিংহ শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। খড়ক সিংহ পিতার ন্যায় দক্ষ বা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না। ফলে, রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব হইতেই শিখরাজ্যে নানাপ্রকার গোলযোগের সূচনা হইল। রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর (১৮৩৯) পর ক্রমেই এই অবস্থা বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। খড়ক সিংহ অবশ্য পিতার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। নৌ-নিহল সিংহ নামে খড়ক সিংহের পুত্রও আকস্মিকভাবে পিতার মৃত্যুর পরদিনই এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইলেন। ফলে, রঞ্জিৎ সিংহের অপর এক পুত্র শের সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তিনিও ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। এইভাবে শিখরাজ্যে ক্রমেই অব্যবস্থা বাড়িয়া চলিলে শিখ সেনাবাহিনী —খাল্‌সা, রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইল। রঞ্জিৎ সিংহের সর্বকনিষ্ঠ নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া তাহারা নিজেরাই শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিল। রাজা লালসিংহ হইলেন ওয়াজীর বা মন্ত্রী এবং সর্দার তেজসিংহ হইলেন সেনাপতি। রাণীমাতা ঝিন্দন নামেমাত্রই দলীপ সিংহের অভিভাবিকা হইলেন।

পরবর্তী রাজগণের দুর্বলতা—খাল্‌সার প্রাধান্যলাভ

লর্ড হার্ডিঞ্জ*, ১৮৪৪-'৪৮ (Lord Hardinge, 1844-'48) : লর্ড এলেনবরার পর লর্ড হার্ডিঞ্জ গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি ছিলেন সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সাহসী ব্যক্তি। শাসনভার গ্রহণের অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে প্রথম শিখযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। রাণীমাতা ঝিন্দন শিখ সেনাবাহিনীর ঔদ্ধত্য হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার একমাত্র পথ হিসাবে তাহাদিগকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে শিখ সেনাবাহিনীর শক্তি যেমন হ্রাস পাইবে, তেমনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলে তাহাদিগকে পুনরায়

রাণীমাতা ঝিন্দনের কূটকৌশল

* সাধারণত Lord Hardinge 'লর্ড হার্ডিঞ্জ' বলা হইয়া থাকে, কিন্তু শুদ্ধ উচ্চারণ হইল লর্ড হার্ডিং।

ব্রিটিশ শক্তির সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে প্ররোচিত করা চলিবে। উভয় ক্ষেত্রেই শাসনব্যবস্থাকে সেনাবাহিনীর প্রভাবমুক্ত করা সম্ভব হইবে।

রাণী ঝিন্দনের প্ররোচনায় শিখ সেনাবাহিনী অমৃতসরের সন্ধির (১৮০৯) শর্ত ভঙ্গ করিয়া শতদ্রু নদীর পূর্বতীরে উপস্থিত হইল (১৮৪৫)। লর্ড হার্ডিঞ্জ স্বভাবতই শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মুদ্‌কী ফিরোজশাহ্‌, আলিওয়াল এবং

প্রথম শিখযুদ্ধ

সুব্রাঁও— এই চারিটি যুদ্ধে শিখদের পরাজিত করিয়া ব্রিটিশ সৈন্য লাহোর অধিকার করিলে উভয়পক্ষের মধ্যে লাহোর-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে শিখগণ শতদ্রু নদীর পূর্বতীরে অধিকৃত সকল স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্রিটিশ পক্ষ পনর লক্ষ টাকা অথবা উহার পরিবর্তে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা ও কাশ্মীর রাজ্য দাবি করিলে শিখগণ শেষোক্ত শর্ত মানিয়া লইল। ইংরাজগণ গোলাব সিংহ নামে জম্মুর জনৈক ডোগ্‌রা দলপতির নিকট দশ লক্ষ টাকায় কাশ্মীর রাজ্যটি বিক্রয় করিয়া দিল। শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরস্থ স্থান-

লাহোরের সন্ধি

সমূহে শিখ অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট্ এবং এক বৎসরের জন্য লাহোরে এক ব্রিটিশ বাহিনী রাখিতে স্বীকৃত হইতে হইল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন চুক্তি দ্বারা আটজন শিখ সর্দার লইয়া গঠিত এক অভিভাবক সভার হস্তে নাবালক রাজা দলীপ সিংহের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হইল। অবশ্য এই অভিভাবক সভাকে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে হইত। তদুপরি লাহোরে একদল ব্রিটিশ সৈনা মোতায়েন ছিল এবং সেজন্য শিখগণ বাৎসরিক বাইশ লক্ষ টাকা খরচ বহন করিত। এইভাবে প্রথম শিখযুদ্ধে পাঞ্জাব সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িল।

লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর সংস্কার-কার্যাদি (Lord Hardinge's Reforms) : শাসনভার গ্রহণ করিয়াই লর্ড হার্ডিঞ্জ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার-কার্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে দেশীয় রাজগণের রাজ্যসীমার মধ্যে সতীদাহ-প্রথা অবাধভাবে প্রচলিত ছিল। লর্ড বেণ্টিংকের 'সতীদাহ-প্রথা নিবারণ আইন' কেবলমাত্র

সতীদাহ, শিশুহত্যা ও নরবলি নিবারণ, রেলপথ, গঙ্গাখাল প্রভৃতি নানাবিধ কার্য

ব্রিটিশ-অধিকৃত রাজ্যের মধ্যেই কার্যকরী ছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জ দেশীয় রাজ্যে সতীদাহ-প্রথা এবং শিশুহত্যা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতীয় রেলপথ নির্মাণ-পরিকল্পনার প্রাথমিক কার্যাদি তিনি শুরু করাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, গঙ্গার খাল-খনন, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি কার্যের পৃষ্ঠপোষকতাও তিনি করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলে খোন্দ্ জাতির মধ্যে সেই সময়ে নরবলি প্রচলিত ছিল। হার্ডিঞ্জ এই বর্বরোচিত প্রথা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

লর্ড ডালহৌসী, ১৮৪৮-'৫৬ (Lord Dalhousie, 1848-'56) : ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে লর্ড ডালহৌসীর কার্যকাল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় অধ্যায়। গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইবার পূর্বে ডালহৌসী বোর্ড অব্ ট্রেড-এর সভাপতি হিসাবে

তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সময়েই কঠোর শ্রমের ফলে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। তদুপরি ভারতের গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইবার পর দীর্ঘ আট বৎসর কর্তব্য পালন করিতে গিয়া

অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি অকালমৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। লর্ড ডালহৌসী অনন্যসাধারণ সংগঠনী ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী ছিলেন।

স্থিতিশীলতা ও সংহতির যুগ হইলেও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কম্পনের অনুভূতি

লর্ড ডালহৌসীর শাসনকাল ভারত-ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায়, বলা যাইতে পারে। এই সময় একদিকে যেমন স্থিতিশীলতা ও সংহতির যুগ হিসাবে চিহ্নিত হইতে পারে, তেমনি এই সময়েই ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যে এক মৃদু কম্পন অনুভূত হইতে থাকে, যাহা অল্পকালের মধ্যেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের আকারে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ

ভারত-ইতিহাসে ডালহৌসী তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার-নীতির জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার অন্তরে প্রজার হিতসাধনের ইচ্ছা যে না ছিল, এমন নহে। ঘোর সাম্রাজ্যবাদী হইলেও ভারতে ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেলগণের মধ্যে ডালহৌসী ছিলেন যেমন কর্মনিষ্ঠ তেমনি কর্তব্যপরায়ণ।

সাম্রাজ্য-বিস্তার-নীতির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পন্থা

ডালহৌসীর সাম্রাজ্য-বিস্তার-নীতির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিক ছিল, যথা, (১) যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য-বিস্তার, (২) স্বত্ব-বিলোপ-নীতির প্রয়োগ দ্বারা রাজ্য দখল ও (৩) অরাজকতার অভিযোগে দেশীয় রাজ্য অধিকার।

(১) যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য-বিস্তার (Expansion through War of Annexation): যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য-বিস্তার-নীতির প্রয়োগ ডালহৌসী কর্তৃক পাঞ্জাব ও পেগু অধিকারে পরিলক্ষিত হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ শিখদের সহিত যে-চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, উহার ফলে পাঞ্জাবের নাবালক মহারাজা দলীপ সিংহ সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশ প্রভুত্ব শিখদের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিলে পাঞ্জাবে পুনরায় গোলযোগের সৃষ্টি হইল।

ব্রিটিশ প্রভাবাধীন পাঞ্জাব

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ (The Second Sikh War): দেওয়ান মুলরাজ ছিলেন মুলতানের শাসনকর্তা। আইনত পাঞ্জাবের মহারাজার অধীন হইলেও তিনি একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেছিলেন। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট্-প্রভাবিত লাহোরের অভিভাবক সভা তাঁহাকে মুলতানের শাসন-সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতে আদেশ করায় মুলরাজ শাসনকর্তা-পদ ত্যাগ করিবেন বলিয়া জানাইলে তাঁহার স্থলে একজন নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল। লাহোরের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট্ ভ্যান্স এগ্‌নিউ (Vans Agnew) ও এণ্ডারসন্ (Anderson) নামে দুইজন ইংরাজ কর্মচারীকে একদল সৈন্যসহ মুলতানের নব-নিযুক্ত শাসনকর্তাকে নির্বিঘ্নে তাঁহার কর্মস্থলে স্থাপনের জন্য প্রেরণ করিলেন। মুলরাজ এই দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারীকে হত্যা করাইয়া পুনরায় মুলতানে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করিলে (১৮৪৮, এপ্রিল) পাঞ্জাবের শিখ সৈন্যগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পেশওয়ার পুনরুদ্ধারের আশায় আফগান জাতিও এই বিদ্রোহে যোগদান করিল। তখন

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের কারণ

লর্ড ডালহৌসী যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সেনাপতি লর্ড হিউ গাফ্ (Lord Hugh Gough) কুড়ি হাজার সৈন্য এবং একশত কামান সহ পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইলেন। বোম্বাই হইতে একদল সৈন্য আনাইয়া প্রয়োজনবোধে লর্ড গাফ্‌কে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত রাখা হইল। ইতিমধ্যে লেফ্‌টেনান্ট হারবার্ট এড্‌ওয়ার্ডস্ (Lieutenant Herbert Edwards) স্থানীয় লোক লইয়া গঠিত এক সেনাবাহিনী গঠন করিয়া মুলতান আক্রমণ করিলে, মুলরাজ মুলতানের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। লাহোর হইতে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট্ সার্ হেনরী লরেন্স শের্ সিংহের নেতৃত্বে একদল সৈন্য মুলরাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। শের্ সিংহ মুলরাজের পক্ষে যোগদান করিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

মুলতান অবরোধ

লর্ড গাফ্ প্রথমে শের্ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু রামনগরের নিকট তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াও পরাজিত করিতে পারিলেন না। অতঃপর ঝিলাম নদীর তীরে চিলিয়ানওয়ালায় শিখদের সহিত তাঁহার এক ভীষণ যুদ্ধ হইল (১৮৪৯)। যুদ্ধের প্রথম দিকে ব্রিটিশ সৈন্য সাময়িকভাবে সাফল্যলাভ করিলেও শেষদিকে শিখ সৈন্যের হস্তে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হইল। এক বিরাট সংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্য এই যুদ্ধে হতাহত হইল। কিন্তু শিখবাহিনী এই সাফল্য শেষ পর্যন্ত বজায় রাখিতে পারিল না। একপ্রকার অমীমাংসিত অবস্থায়ই যুদ্ধের অবসান ঘটিল। ইহার অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ সৈন্য মুলতান অধিকার করিতে সমর্থ হইলে তথাকার ব্রিটিশ বাহিনীও লর্ড গাফ্-এর সৈন্যদের সহিত যোগদান করিল। তারপর চীনাব নদীর তীরে গুজরাট নামক এক শহরের উপকণ্ঠে লর্ড গাফ্ ও শিখদের মধ্যে যুদ্ধ হয় (১৮৪৯, ফেব্রুয়ারি)। এই যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া আফগানিস্তানের দিকে পলায়ন করিল। লর্ড গাফ্ চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে পরাজয়ের অপমান গুজরাটের যুদ্ধে জয়লাভের দ্বারা দূর করিলেন। পেশওয়ার দখলে এবং শের্ সিংহের আত্মসমর্পণে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অবসান ঘটিল।

চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ (১৮৪৯)

গুজরাটের যুদ্ধ (১৮৪৯)

লর্ড ডালহৌসী কলিকাতা কাউন্সিল বা ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষের মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লইলেন। নাবালক মহারাজা দলীপ সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সামান্য ভাতা (বাৎসরিক ৫০ হাজার পাউণ্ড) গ্রহণে বাধ্য করা হইল। শিখ খাল্‌সা সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং শিখজাতিকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র করা হইল। পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার ফলে উত্তর-পশ্চিমদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিল।

পাঞ্জাব অধিকার

ডালহৌসী জন লরেন্স, হারবার্ট লরেন্স, এডওয়ার্ডস্, রিচার্ড টেম্পল, নিকোলসন প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্রিটিশ কর্মচারিগণের হস্তে পাঞ্জাব শাসনকার্যের ভার অর্পণ করিলেন। পাঞ্জাবকে একজন চীফ্ কমিশনারের অধীনে স্থাপন করা হইল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এক সারি দুর্গ ও সেনানিবাস নির্মাণ করিয়া পাঞ্জাব তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। দস্যুতা, দাস-প্রথা প্রভৃতি দমন

করিয়া এবং কৃষির উন্নতি, খাল খনন, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া যাহাতে পাঞ্জাবের অভ্যন্তরীণ শাসনে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে পারে সেই ব্যবস্থাও ডালহৌসী করিলেন। গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করিয়া এবং বিচার-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া জনসাধারণকে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন-যাপনে উৎসাহিত করা হইল। ব্রিটিশ শাসনাধীনে পাঞ্জাবে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল তাহার ফলে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ শিখজাতি দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে ও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশদের সাহায্য দান করিয়াছিল।

অভ্যন্তরীণ শাসনের উন্নতি : সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (The Second Anglo-Burmese War): প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের (১৮২৬) পর ব্রহ্মদেশে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট্ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বর্মীগণ ব্রিটিশদের প্রতি স্বভাবতই বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। তাহারা ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তথা ব্রিটিশ রেসিডেন্টের প্রতি প্রকাশ্যভাবে ঘৃণা প্রদর্শন করিতে শুরু করিলে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট্‌কে ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে (১৮৫১) কয়েকজন ব্রিটিশ বণিক বর্মীদের হস্তে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সেই সংবাদ লর্ড **ডালহৌসী**র নিকট পৌঁছিবামাত্র তিনি সেইজন্য উপযুক্ত ক্ষতি-পূরণ দাবি করিলেন। ব্রহ্ম সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে গিয়া কমোডোর ল্যাম্বার্ট (Commodore Lambert) ব্রহ্ম সরকারের একটি জাহাজ দখল করিয়া লইলেন। এই সূত্রে বর্মী সৈনা কমোডোর ল্যাম্বার্টের জাহাজের উপর গুলি বর্ষণ করিলে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই এপ্রিল রেঙ্গুন ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইল। সেই বৎসরই অক্টোবর মাসে জেনারেল গড্‌উইন (General Godwin) প্রোম দখল করিলেন। ব্রহ্মরাজ ব্রিটিশের সহিত সন্ধিস্থাপনে অস্বীকৃত হইলে লর্ড ডালহৌসী সমগ্র পেগু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইভাবে ব্রহ্মদেশের উপকূল অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমগ্র উপকূল অঞ্চল যেমন ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইল তেমনি ব্রহ্মদেশ সমুদ্রের সহিত সংযোগ-পথের জন্য ব্রিটিশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ

পেগু অধিকার

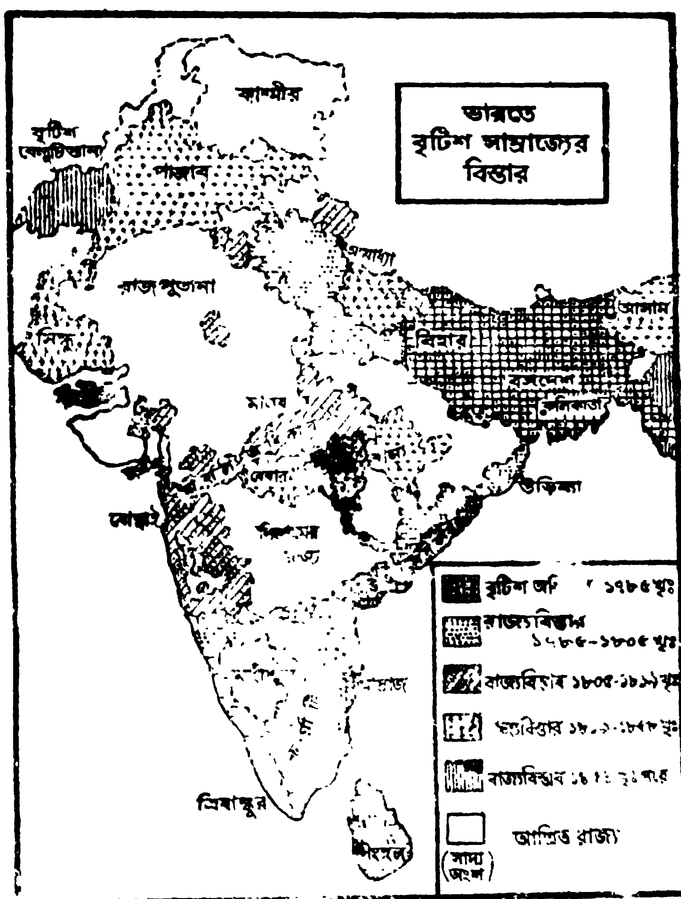
সিকিম রাজ্যের একাংশ অধিকার (Occupation of a part of Sikkim): কোম্পানির সাম্রাজ্যের উত্তরে অবস্থিত নেপাল ও ভুটানের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র সিকিম রাজ্যের রাজা ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর ক্যাম্পবেল (Dr Campbell) নামে জনৈক ইংরাজ কর্মচারী ও ডক্টর হুকার (Dr Hooker) নামে অপর একজন ইংরাজকে বন্দী করিলে লর্ড ডালহৌসী সিকিম রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করিয়া উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন (১৮৫০)।

সিকিমের একাংশ অধিকার

(২) স্বত্ব-বিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা রাজ্য দখল (Annexation by the Doctrine of Lapse): লর্ড ডালহৌসী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। যেন-তেন-প্রকারেণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তার তিনি তাঁহার ভারত-শাসনের মূল নীতি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। যুদ্ধের দ্বারা সাম্রাজ্য-বিস্তার ভিন্ন তাঁহার 'স্বত্ব-বিলোপ-নীতি'র প্রয়োগ

দ্বারাও রাজ্য-বিস্তারে তিনি কম সাফল্যলাভ করেন নাই। বস্তুত, তিনি সর্বাধিক সংখ্যক রাজ্য এই নীতির প্রয়োগ দ্বারা-ই অধিকার করিয়াছিলেন। 'স্বত্ব-বিলোপ-নীতি'র মূল কথা হইল এই যে, ব্রিটিশের অধীন অথবা ব্রিটিশ-শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট কোন দেশীয় রাজ্যের রাজবংশের কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে সেই রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িবে। কোন দত্তকপুত্রকে এই সকল রাজ্যের উত্তরাধিকার দেওয়া চলিবে না। ব্রিটিশ সরকারের 'বিশেষ অনুমতি' দান

স্বত্ব-বিলোপ-নীতি



বন্ধ করিয়া দেশীয় রাজগণের দত্তকপুত্র গ্রহণের অধিকার লর্ড ডালহৌসী বস্তুত অস্বীকার করিলেন। ঘটনাচক্রে এমনই হইল যে, ডালহৌসীর আমলেই কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের রাজগণের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইল। ডালহৌসী তাঁহার স্বত্ব-বিলোপ-নীতির

প্রয়োগ দ্বারা এই সকল রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বত্ব-বিলোপ-নীতি লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক উদ্ভাবিত নহে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাইরেক্টর সভা (Court of Directors) কোম্পানির অধীন দেশীয় রাজ্যগুলির রাজগণকে দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতি যেন সহজে না দেওয়া হয় সেই নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

স্বত্ব-বিলোপ-নীতি লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক উদ্ভাবিত নহে

কয়েক বৎসর পরে (১৮৪১) ডাইরেক্টর সভা আদেশ করিলেন যে, সম্মানজনক এবং ন্যায্য পন্থায় কোম্পানি যে-কোন সম্পত্তি ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করিবার চেষ্টায় ত্রুটি যেন না করে। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কুখ্যাত 'স্বত্ব-বিলোপ-নীতি' লর্ড ডালহৌসীর নামের সহিত জড়িত থাকিলেও বস্তুত তিনি এই নীতির উদ্ভাবন করেন নাই। পূর্ববর্তী গবর্ণর-জেনারেলগণ যে-স্থলে এই নীতির প্রয়োগ করা সঙ্গত মনে করেন নাই, অথবা এই নীতি কার্যকরী করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই, সেই স্থলে লর্ড ডালহৌসী উহার ব্যাপক প্রয়োগ করিয়া এই কুখ্যাত নীতির সহিত নিজ নাম জড়িত করিয়াছিলেন। ডালহৌসী যেখানে স্বত্ব-বিলোপ-নীতি কার্যকরী করিবার সামান্য অজুহাত পাইয়াছিলেন সেখানেই উহার প্রয়োগ, এমন কি, অপপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতীয়দের চিরাচরিত রীতি-নীতি, তাহাদের মনোভাব, তাহাদের ন্যায্য-অধিকার—সব কিছু উপেক্ষা করিয়া লর্ড ডালহৌসী তাঁহার এই নীতি কার্যকরী করিয়াছিলেন।

ডালহৌসী কর্তৃক স্বত্ব-বিলোপ-নীতির ব্যাপক প্রয়োগ

স্বত্ব-বিলোপ-নীতি সর্বপ্রথমেই সাতারা রাজ্যটির উপর প্রয়োগ করা হইল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সাতারা রাজ্যটি কোম্পানি কর্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছিল। সাতারার রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা যাইবার পূর্বে এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজার মৃত্যু হইলে কোম্পানির অনুমতি না লইয়া সেই দত্তকপুত্র গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করা হইল এবং সাতারা রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। ডাইরেক্টর সভা এ-বিষয়ে লর্ড ডালহৌসীকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিলেন।* সাতারা রাজ্যের পর আসিল সম্বলপুরের পালা। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সম্বলপুরের রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে লর্ড ডালহৌসী সম্বলপুর অধিকার করিয়া লইলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভোঁসলা বংশের শেষ রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে লর্ড ডালহৌসী নাগপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। নাগপুর কোম্পানি কর্তৃক সৃষ্ট রাজ্য ছিল না। তথাপি সাতারা রাজ্যে যে-নীতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল ঠিক অনুরূপ নীতির প্রয়োগের দ্বারা নাগপুরও দখল করা হইয়াছিল। কলিকাতা ও বোম্বাই, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মধ্যস্থলে অবস্থিত নাগপুর রাজ্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব

সাতারা অধিকার

সম্বলপুর (১৮৫০)
নাগপুর (১৮৫৩)

* "We are fully satisfied that by the general law and custom of India a dependent principality like that of Satara, cannot pass to an adopted heir without the consent of the Paramount Power."

Court of Directors to Gov. Genl. Vide, Smith, p. 704.

সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ডালহৌসীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার-নীতিই ছিল নাগপুর অধিকারের মূল কথা।

সেই বৎসরেই (১৮৫৩) ঝাঁসির রাজার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার দত্তকপুত্রের দাবি অস্বীকার করিয়া ঝাঁসি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। অনুরূপ পরিস্থিতিতে ভগৎ, উদয়পুর, জৈৎপুর, কারাউলি প্রভৃতি রাজ্য লর্ড ডালহৌসী কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ভগৎ ও উদয়পুর রাজ্য দুইটি অবশ্য পরবর্তী গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং তাহাদিগের উত্তরাধিকারীকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কারাউলি রাজ্যের ক্ষেত্রে স্বত্ব-বিলোপ-নীতির প্রয়োগ অবৈধ বিবেচনা করিয়া এই রাজ্যটিও ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কারাউলি ছিল ব্রিটিশের রক্ষণাধীন মিত্ররাজ্য (Protected ally)।

ঝাঁসি, ভগৎ, উদয়পুর, জৈৎপুর, কারাউলি

ভগৎ, উদয়পুর ও কারাউলি প্রত্যর্পণ

ডালহৌসী তাঁহার কুখ্যাত স্বত্ব-বিলোপ-নীতির প্রয়োগ দ্বারা পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র ধন্ধুপন্থের ভাতা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ধন্ধুপন্থ-ই ইতিহাসে নানাসাহেব নামে পরিচিত।

নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ

কর্ণাট ও তাঞ্জোর রাজ্য দুইটি লর্ড ওয়েলসলী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ দুই রাজ্যের রাজগণকে ভাতা দানের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। লর্ড ডালহৌসী তাঞ্জোর ও কর্ণাটের রাজ-পরিবারের বংশধরগণের ভাতা বন্ধ করিয়া ব্রিটিশ সরকারের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না।

তাঞ্জোর ও কর্ণাটের রাজ-পরিবারের ভাতা বন্ধ

(৩) **অরাজকতার অভিযোগে দেশীয় রাজ্য অধিকার (Annexation of native states on grounds of Misgovernment):** লর্ড ডালহৌসী তাঁহার তৃতীয় নীতি অনুসারে অরাজকতার অভিযোগে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। এই অরাজকতা বা অব্যবস্থার সূচনা করিয়াছিলেন লর্ড ওয়েলসলী তাঁহার প্রবর্তিত অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রয়োগের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই যে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল লর্ড ডালহৌসী সে-বিষয়ে মোটেই ভাবিলেন না। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল অযোধ্যার নবাব স্বভাবতই শাসনকার্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারেন নাই। অথচ এই অভিযোগেই লর্ড ডালহৌসীর আমলে ডাইরেক্টর সভার নির্দেশ অনুসারে অযোধ্যা রাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত করা হইয়াছিল।

অযোধ্যা (১৮৫৬)

ঠিক অরাজকতার কারণে না হইলেও কোম্পানির সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখিবার খরচ বাবদ প্রাপ্য অর্থ দিতে হায়দ্রাবাদের নিজাম অক্ষম হইলে বেরার প্রদেশটি তাঁহার নিকট হইতে লইয়া ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করা হইয়াছিল।

বেরার

চার্টার এ্যাক্ট, ১৮৫৩ (Charter Act, 1853): ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দ বা চার্টার আইন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সর্বশেষ চার্টার। এই আইন দ্বারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যতদিন না অন্য ব্যবস্থা করিতেছেন ততদিন পর্যন্ত

ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে সাম্রাজ্য শাসনের ভার ন্যস্ত করেন। কিন্তু এই আইনে ডাইরেক্টর সভার সদস্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া ১৮ করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে ছয় জন ব্রিটিশ রাণী মনোনয়ন করিবেন অবশ্য ইঁহারা সকলেই অন্তত দশ বৎসর ভারতবর্ষে কোম্পানির অথবা ব্রিটিশ সরকারের কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইবেন। অবশিষ্ট বার জনের মধ্যে ছয় জন ভারতবর্ষে অন্তত দশ বৎসর কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে। মাত্র দশ জন সদস্য হইলেই কোরাম (Quorum) হইবে। ইহার ফলে কোন কোন পরিস্থিতিতে রাণী কর্তৃক মনোনীত সদস্যরাই সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবার সম্ভাব্যতার পথ খোলা রাখা হইল।

কোম্পানিকে রাণীর প্রতিনিধি হিসাবে যতদিন না পার্লামেন্ট অন্য ব্যবস্থা করে ততদিন থাকিতে দেওয়া হইল

ডাইরেক্টর সভায় সদস্যসংখ্যা হ্রাস

বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সভাপতি ও সেক্রেটারি অব্ স্টেট উভয়ের ক্ষমতা সমান করিয়া দেওয়া হইল। বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সদস্যদের মাসিক মাহিনা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। কোম্পানির চাকুরির ব্যাপারে বোর্ড-অব্-কন্ট্রোল পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইল। গবর্ণরের কাউন্সিলের সদস্যরা ডাইরেক্টর সভাই পূর্বের ন্যায় নিয়োগ করিবেন কিন্তু এজন্য রাণীর অনুমোদন লইতে হইবে।

বোর্ড-অব্-কন্ট্রোলের সভাপতি আর সেক্রেটারি অব্ স্টেট সম-পর্যায়ে স্থাপিত : পরীক্ষার মাধ্যমে চাকুরিতে নিয়োগ

গবর্ণর-জেনারেলের সভায় আইন-সদস্যকে পুরোপুরি সদস্যের সকল ক্ষমতা দেওয়া হইল। গবর্ণর-জেনারেলের আইনসভার সদস্যসংখ্যা ১২ করা হইল। আইনসভার অধিবেশন জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করা হইল। ডাইরেক্টর সভাকে নূতন প্রেসিডেন্সী গঠন করা, ভারতীয় প্রদেশগুলির সীমারেখার অদল-বদল করা, বাংলার জন্য পৃথক গবর্ণর নিয়োগ করা এবং যতদিন তাহা না করা হয় ততদিন একজন লেফ্টেনান্ট গবর্ণর নিয়োগ করা প্রভৃতি ক্ষমতা দেওয়া হইল।

আইন-সদস্যকে অপরাপর সদস্যের সমান ক্ষমতা দান : আইনসভার প্রকাশ্য অধিবেশন

ডাইরেক্টর সভার বর্ধিত ক্ষমতা

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দের পর যে আইনসভা আইন-প্রণয়নের কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল উহা কার্যত একটি ছোটখাট গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি সভার ন্যায়ই আইন-প্রণয়ন ভিন্ন নানাপ্রকার অভাব-অভিযোগ ও প্রশাসনিক দূরীকরণের ব্যবস্থা কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত, অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি করিতে লাগিল। আইনসভার কার্যপদ্ধতিও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতির অনুসরণ ও অনুকরণ করিতে লাগিল। পার্লামেন্টে বিল যেভাবে পাস করা হয়, সেই ভাবেই আইনের খসড়া বা বিল তিন বার পাঠ করিয়া এবং প্রয়োজনবোধে সিলেক্ট্ কমিটির মাধ্যমে উহার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ গ্রহণ ইত্যাদি নানাবিধ পার্লামেন্টারী প্রথা অনুসরণ করা হইতে লাগিল। আইনসভা অর্থাৎ লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলের অধিবেশন সর্বসাধারণের সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল এবং কার্যকলাপের বিবরণী (Hansard) প্রকাশিত হইত। লর্ড ডালহৌসী আইনসভার কার্যকলাপ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া

সমালোচনা

লর্ড ডালহৌসীর অভিমত

একটি ব্যক্তিগত পত্রে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "আমাদের নবীন পার্লামেণ্ট ভাল এবং সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। ইহা জন্মিবার কালে খুবই বাধা-বিপত্তি দেখা দিয়াছিল, কিন্তু ইহা একটি অতি উচ্চ ধরনের যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে, ইহা দীর্ঘস্থায়ী হইবে এবং অনেক অনেক ভাল কাজ করিতে পারিবে"।*

বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের প্রেসিডেণ্ট সার্ চার্লস উড্ ভারতের আইনসভার এই ধরনের ক্ষমতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি লর্ড ডালহৌসীকে ব্রিটিশ সরকারের পূর্ব-অনুমতি লইয়া আইন পাস করিতে জানাইয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়াছিল। লর্ড ডালহৌসী সুস্পষ্টভাবে সার চার্লস্ উড্‌কে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, প্রশাসনিক ব্যাপারে বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সভাপতির উপদেশ-নির্দেশ দিবার ক্ষমতা থাকিলেও আইন-প্রণয়ন সম্পর্কে সেইরূপ কোন ক্ষমতা তাঁহার নাই, তিনি আইন পাস হইয়া গেলে উহার প্রয়োগ বন্ধ করিতে পারেন, কিন্তু আইন-প্রণয়ন সম্পর্কে কোন উপদেশ-নির্দেশ দেওয়া চলিবে না। সার্ চার্লস্ উড্ আইনসভায় স্বাধীনভাবে আইন-প্রণয়নের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু সেক্ষেত্রেও লর্ড ডালহৌসী স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, আইনসভার স্বাধীনতা পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্টেই দেওয়া হইয়াছে, উহা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নহে।

সার্ চার্লস্ উড়ের সহিত লর্ড ডালহৌসীর মতভেদ

উপসংহারে একথা বলা যাইতে পারে যে, যদি আইনসভায় কয়েকজন বেসরকারী প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে আইনসভার স্বাধীনতা এবং স্বাধীন কর্মক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইত।

লর্ড ডালহৌসীর সংস্কার কার্যাদি (Reforms of Lord Dalhousie) : ভারত-ইতিহাসে লর্ড ডালহৌসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক এবং স্বত্ব-বিলোপ-নীতির প্রয়োগকর্তা হিসাবেই সমধিক খ্যাতি বা কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এই সকল সাম্রাজ্যবাদী কাজের ফলে তাঁহার সুযৌক্তিক ও জনহিতকর সংস্কারগুলি সাধারণত আমাদের মনে তেমন স্থান পায় না। কিন্তু কতকগুলি সংস্কার সাধনের জন্য লর্ড ডালহৌসী ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবেই আশা করিতে পারেন।†

সংস্কারের জন্য কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্যতা

সেনাবাহিনীর মধ্যে তখন সমুদ্রযাত্রা জাতিগত পবিত্রতা বিনাশের কারণ হিসাবে বিবেচিত হইত। লর্ড ডালহৌসী এই অযৌক্তিক কুসংস্কার হইতে ভারতীয় সৈনিকদের মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে এমন একটি ব্যবস্থা চালু করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন যাহাতে প্রত্যেক সুস্থ, সবল ব্যক্তিই সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিবে এবং পরবর্তী কালে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হইবে।

সেনাবাহিনীর সংস্কার চেষ্টা

* Baird J C. A. *Private letters of Dalhousie*. 309.

† "It is natural that we should look back on Dalhousie's reign as a time of territorial expansion. But it was also one of intense and beneficent activity". Thompson & Garrat, *Rise and Fulfilment of British Rule in India*, p. 417.

সেই সময়কার বাংলার সৈনিকদের সামরিক যোগ্যতার অভাব দৃষ্টে তিনি এই ব্যবস্থা চালু করিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

জেমস টমাসন্ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সুযোগ্য গবর্ণরের পরিকল্পনা অনুযায়ী ডালহৌসী রুরকির এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপন করেন। কলিকাতার বেথুন কলেজ তিনি নিজ ব্যয়ে কিছুকাল চালু রাখিয়াছিলেন। ডাইরেক্টর সভার উপর তিনি অধিক পরিমাণ অর্থ ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে বার বার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

রুরকির এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপন, বেথুন কলেজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ব্যয় বহন

বাংলাদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব তখন পর্যন্ত গবর্ণর-জেনারেলের অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল। লর্ড ডালহৌসীর চেষ্টায় বাংলার জন্য একজন পৃথক লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর নিয়োগ করা হয়।

বাংলার জন্য লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর-পদ সৃষ্টি

লর্ড ডালহৌসী কেন্দ্রীয় আইনসভার স্বাধীন কার্যকলাপের পক্ষপাতী ছিলেন এবং বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতির সহিত এ বিষয়ে বিতণ্ডা করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। ভারতবাসী একদিন নিজেদের শাসন, আইন-প্রণয়ন নিজেরাই করিবে, এই কল্পনাও তিনি করিতেন।*

আইনসভার স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা

ডালহৌসী পূর্ত বিভাগের কার্যাদির জন্য বিরাট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করিয়াছিলেন। নূতন নূতন রাজ্য অধিকার করিবার ফলে রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহা তিনি এই সর্ব জনহিতকর কার্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডের পুনর্নির্মাণের কাজ তিনি শুরু করান।

পূর্ত কার্যাদি

গঙ্গা খাল (Ganges Canals) তিনি আরও প্রসারিত করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এই সব খাল খননের কাজ সম্পন্ন হয়। মোট ব্যয় হয় চৌদ্দ লক্ষ পাউণ্ড। এর মধ্যে ডালহৌসীর আমলেই বার লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউণ্ড ব্যয়িত হয়। মোট খালের দৈর্ঘ্য তখন ভারতবর্ষে ছিল ৫২৫ মাইল। টমাসন্ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, সেচ খাল ভারতবর্ষে যাহা ছিল সভ্যজগতের সম্মুখে উহা এক দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে।

সেচ খাল

মেরিয়া নামক এক সমাজ-বিরোধী দলের অত্যাচারে বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছিল। ডালহৌসীর আমলে এই মেরিয়া উপদ্রবের অবসান ঘটিলে দেশে ভীতি দূর হয়।

মেরিয়া উপদ্রবের অবসান

লর্ড ডালহৌসীর আমলে ভারতের সর্বপ্রথম রেল লাইন বোম্বাই হইতে টানা পর্যন্ত চালু হয় (১৮৫৩)। ইহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ রেল লাইন পরবৎসর কলিকাতা ও রাণীগঞ্জ এলাকার মধ্যে চালু হয়।

রেলপথ স্থাপন শুরু

* "Dalhousie sanctioned Thomason's plans for an engineering college at Rurki and kept up at his own cost the girls college founded in Calcutta by J. E. Drinkwater Bethune."—*Ibid*, p 418

টেলিগ্রাফ্ ব্যবস্থা

লর্ড ডালহৌসীর আমলে টেলিগ্রাফ্ ব্যবস্থা চালু হয়। ইহার ফলে অফিসের কাজকর্মে যে অযথা বিলম্ব ঘটিত তাহার অনেক কিছু দূরীভূত হইয়া জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে খবর টেলিগ্রামের মাধ্যমে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রেরণ করা সম্ভব হইল।

পাঞ্জাবে সামরিক চলাচলের জন্য রাস্তা নির্মাণ

পাঞ্জাবের সর্বত্র জন টমাসনের পরিকল্পনা অনুসারে সামরিক চলাচলের সুবিধার জন্য রাস্তা তৈয়ার করা হইল। ইহার ফলে জনসাধারণের চলাফেরা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি সাধিত হইল।

বনভূমির সংরক্ষণ—চা বাগানের প্রসার

বনভূমি সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্তন করিয়া প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক আবহাওয়া বজায় রাখিয়া উপযুক্ত বারিপাতের সুযোগ যাহাতে নষ্ট না হয় সেই ব্যবস্থা করা হইল। চা বাগানের প্রসার সাধনে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হইল।

পোস্টাফিসের দক্ষতা বৃদ্ধি

পোস্টাফিসের কার্যকলাপ কতকটা শ্লথ হইয়া পড়িয়াছিল। লর্ড ডালহৌসী উহার দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেন। শুধু তাহাই নহে পূর্বে যেমন দুই পয়সায় চিঠিপত্র দেওয়া চলিত সেই ব্যবস্থা পুনরায় চালু করিয়া তিনি দরিদ্র জনসাধারণের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য লর্ড ডালহৌসীর দায়িত্ব (Dalhousie's responsibility for the Revolt of 1857): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য লর্ড ডালহৌসী যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিলেন, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেই একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। ডালহৌসী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তারে তিনি কোনপ্রকার নৈতিকতা বা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কথা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্বত্ব-বিলোপ-নীতির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন ইংলণ্ডস্থ কোম্পানির ডাইরেক্টর সভা। কিন্তু ডালহৌসীর পূর্ববর্তী গবর্ণর-জেনারেলগণ ভারতীয়দের চিরাচরিত রীতি-নীতি ও স্ব-স্ব রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধি দ্বারা কতক পরিমাণে পরিচালিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ডাইরেক্টর সভার নির্দেশ সত্ত্বেও যথেচ্ছভাবে দেশীয় রাজগণের অধিকার নাশে সাহসী হন নাই। কিন্তু লর্ড ডালহৌসীর নিকট ভারতীয়দের রীতি-নীতি, বা তাহাদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কোন প্রশ্নই ছিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, দেশীয় রাজ্যগুলিকে যতই ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করা যাইবে ততই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি যেমন ঘটিবে, তেমনি দেশীয় রাজগণের প্রজাবর্গ ইংরাজ শাসনের সুফল ভোগ করিতে পারিবে।

ভারতীয়দের চিরাচরিত রীতি-নীতির উপেক্ষা

এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি সাতারা ও নাগপুর রাজ্য দুইটি অধিকার করেন এবং নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করেন। এইভাবে মারাঠা রাজ্যপঞ্চকের মধ্যে তিনটির-ই তিনি অবসান ঘটাইলেন। তাঞ্জোর ও কর্ণাটের রাজপরিবারের ভাতাও তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার সাম্রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। তিনি অযোধ্যা রাজ্যটিও অরাজকতার অজুহাতে অধিকার করিয়া লইলেন। এমন কি, তিনি দিল্লীর সম্রাটের উপাধি নাকচ করিয়া দিয়া ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের সার্বভৌম শক্তিতে

পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন না পাওয়াতে ইহা তিনি কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

ডালহৌসীর স্বত্ব-বিলোপ-নীতি প্রয়োগের অনৈতিকতা এবং নাগপুর ও অযোধ্যা রাজ্য অধিকারকালে তাঁহার নীচ স্বার্থপরতা ও অত্যাচার ভারতবাসীদের মনে ব্রিটিশদের প্রতি এক ব্যাপক ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। নাগপুরের রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিয়া গরু, ঘোড়া, হাতী হইতে আরম্ভ করিয়া আসবাবপত্র ও মণি-মুক্তা লুণ্ঠন করিতে ইংরাজগণ দ্বিধাবোধ করে নাই। অশীতি বৎসরের বৃদ্ধা রাণীমাতার আপত্তি সত্ত্বেও ইংরাজগণ প্রাসাদ হইতে আসবাবপত্র সরাইয়া লইতে লজ্জাবোধ করে নাই। এই সকল আসবাবপত্র ও মণি-মুক্তা বিক্রয়ের জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। নাগপুর রাজ্য অধিকার অপেক্ষা রাজপ্রাসাদ-লুণ্ঠন প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল।*

অনৈতিকতা, অত্যাচার, নাগপুরের রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন

অযোধ্যা রাজ্য অধিকারের সময়ও নাগপুর রাজ্য অধিকারকালের বর্বরতার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। নবাব-পরিবারকে রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়া নবাবের কোষাগারের দরজা ভাঙ্গিয়া যাবতীয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করা হইয়াছিল। ইহাতে অযোধ্যার নবাবকে তাঁহারই প্রজাবর্গের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল। কিন্তু এই আচরণ ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ মর্যাদায় কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।†

অযোধ্যার নবাব-পরিবারের প্রতি বর্বরোচিত আচরণ

ডালহৌসীর উপরি-উক্ত কার্যকলাপ ভারতবর্ষের সর্বত্র দেশীয় রাজগণের মনে এক দারুণ সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহাদের মনে এই কথাই উদিত হইল যে, নাগপুর বা অযোধ্যার ন্যায় ব্রিটিশের সমর্থক দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি যখন ব্রিটিশগণ এইরূপ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তখন অপরাপর রাজ্যের প্রতি তাহারা না জানি কি করিবে।‡

ঝাঁসিরাজ্য দখল এবং নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করিয়াও ডালহৌসী ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। লর্ড ডালহৌসীর ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পূর্বে বিদ্রোহ শুরু না হইলেও তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতির কঠোর প্রয়োগ এবং অপরাপর নানাবিধ কারণে বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিল। এই বিদ্রোহের জন্য ডালহৌসী যে যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য।

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি (Society Economy and Culture under the East India Company) : ব্রিটিশ শাসনের

* Vide, Sir John William Kaye's *A History of the Sepoy War in India*, vol. i, pp. 83-84. also see R. C. Majumdar's *The Sepoy Mutiny & Revolt of 1857*, p. 8.

† Ibid, vol. i, pp. 404-5, also see Majumdar p. 12, S. N. Sen's *Eighteen Fifty Seven*, pp. 38-39.

‡ Kaye, vol. i. p. 152, also see Majumdar, p. 14, also vide S. N. Sen, p. 39.

প্রাথমিক পর্যায়ে যে-সকল ইংরাজ বণিক ভারতবর্ষে কর্মরত ছিল তাহারা অর্থনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণার দিক্ দিয়া ভারতীয়দের অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এমন কি, নৈতিকতা, ধর্ম, বুদ্ধি-বিবেচনার দিক্ দিয়াও তাহারা ভারতবাসীর সমপর্যায়ের ছিল না। তাহারা যখন ভারতবর্ষে, বিশেষভাবে বাংলায় রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইল তখন স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসীর সমাজজীবন, অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এক নূতন ধরনের পরিবর্তন শুরু হইল। এই পরিবর্তনকে আমরা মোটামুটিভাবে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ পর্যন্ত অর্থাৎ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন ভারত, এই সময়ের গণ্ডির মধ্যে আলোচনা করিতে পারি। এই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্নাংশে অর্থাৎ যে-সকল স্থানে কোম্পানির শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে চিরাচরিত সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। পূর্বেকার জাতিভেদ প্রথায় কিছু পরিবর্তন দেখা গেল। সংকীর্ণ জাতিভেদ প্রথায় কতক পরিমাণে উদারতা পরিলক্ষিত হইতে থাকে।

নূতন এবং পৃথক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণার প্রবর্তন

সামাজিক (Social) : সর্বপ্রথম বাংলায় এই পরিবর্তন শুরু হয়, পরে তাহা অপরাপর অঞ্চলে বিস্তারলাভ করে। অবশেষে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশের অধীন হইয়া পড়িলে সর্বত্র এই পরিবর্তন প্রসারিত হয়। ভারতের চিরন্তন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি জাতির স্থলে এক নূতন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। অর্থ, শিক্ষা, পেশাগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক নূতন শ্রেণী—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুত্থান সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সূচনা করে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী এক নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিত্বের নূতন ধারণা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে।

সামাজিক পরিবর্তন : মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব

মুঘল শাসনব্যবস্থার পতন এবং নূতন ভূস্বামী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবীদের অভ্যুত্থান, ব্রিটিশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে শিক্ষিত, উকিল, মোক্তার, চাকুরীজীবী শ্রেণীর উদ্ভব ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে এবং অপরাপর শহর-নগরে প্রথম দেখা গিয়াছিল। ইংরাজ পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইংরাজ শাসনের সুবিধার জন্য যে-সকল শহর ও নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়া কলিকাতা ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিশেষভাবে বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের জন্য বিরাট সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হইত সেই সংখ্যক লোক বাংলার ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্য হইতে গ্রহণ করা হইত। এইভাবে ইংরাজদের রাজনৈতিক ও

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎপত্তির কারণ

অর্থনৈতিক প্রয়োজনের মধ্য দিয়াই ভারতের, বিশেষভাবে বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে জাতিপ্রথার কোন সংযোগ ছিল না। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্‌গোপ, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও মিশ্র জাতির লোক ছিল। ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি শ্রেণীর চিরাচরিত জাতি বিভাগ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ছিল না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী—চিরাচরিত জাতিগত বিভাগের সহিত অসম্পৃক্ত

ইংরেজী শিক্ষার প্রসার একদিকে যেমন ইংরাজ প্রশাসনের সুবিধা ও প্রয়োজন মিটাইয়াছিল অপরদিকে রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে এক নূতন আদর্শ শিক্ষিত সমাজকে—বিশেষভাবে বাংলার শিক্ষিত সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। এই শিক্ষার মাধ্যমে একদিকে যেমন ইংরাজদের অনুগত, অনুগ্রহপ্রার্থী এক শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল, অপরদিকে ইংরাজ লেখকদের তথা পাশ্চাত্য দেশীয় লেখকদের রচনার প্রভাবে প্রভাবিত অপর এক শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতবাসীর মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, স্বাধিকার, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন, সমাজের পশ্চাৎপদতা দূরীকরণ, অর্থনৈতিক দুর্দশার অবসান প্রভৃতি আদর্শ ক্রমে জাগিয়া উঠিতেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে উহার ফলশ্রুতি ছিল ভারতের জাগরণ ও স্বাধীনতালাভের জন্য চেষ্টা।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব—নূতন আদর্শে ভারতবাসী উদ্‌বুদ্ধ: ভারতের জাগরণ

অর্থনীতি (Economy): অর্থনীতির ক্ষেত্রে কৃষিই ছিল সর্বপ্রধান এবং মূল ভিত্তি। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার কোন আধুনিকীকরণ হয় নাই। উপরন্তু ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের ক্রম-অবনতি পাশ্চাত্য দেশীয়, বিশেষভাবে বিলাতী সামগ্রীর অসম প্রতিযোগিতার ফলে অধিকতর মাত্রায় কৃষির উপর চাপ স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় কৃষিকে পশ্চাৎপদ করিয়া দিতে লাগিল। ঔপনিবেশিক শিল্পনীতির মূল কথাই ছিল উপনিবেশগুলিকে কাঁচামাল উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে পরিণত করিয়া সেই কাঁচামাল নিজ দেশে চালান দিয়া তৈয়ারী সামগ্রী উপনিবেশে রপ্তানি করা। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও ইহার অন্যথা হয় নাই। ইহা ভিন্ন, ইংরাজদের নিজ প্রয়োজনে কৃষিব্যবস্থাকে ব্যবহার করাও ভারতবাসীর পক্ষে কৃষি-উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল হিসাবে জমিদারগণের কৃষিজমির উন্নয়নে উদাসীনতা পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল।

কৃষির পশ্চাৎপদতা

ঔপনিবেশিক শিল্পনীতি

কি ঘটনা প্রবাহে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল এবং উহার ফলে রায়তদের কি অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল, জমিদারদেরই বা কি সুবিধা-অসুবিধা তাহাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল সে-সম্পর্কে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। সরকারের দিক্‌ হইতে কোন্‌ কোন্‌ যুক্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া সমর্থনযোগ্য ছিল তাহারও আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

এদিকে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের দশ বৎসরের মধ্যে ইস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানি দক্ষিণ-ভারতের

সর্বাধিক সমৃদ্ধ অঞ্চল নিজ অধিকারে আনিয়াছিল। এই অঞ্চলই পরে মাদ্রাজ প্রদেশে রূপান্তরিত হয়। এই অঞ্চলে টমাস্ মান্রো রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করেন। এই প্রথা অনুযায়ী কোম্পানি রায়তদের সহিত সরাসরি জমির বন্দোবস্ত দিত এবং রাজস্ব আদায় করিত। এই বন্দোবস্তও চিরস্থায়ী ছিল, কিন্তু রায়ত এবং কোম্পানির মধ্যস্থলে কোন মধ্যসত্ত্বভোগী জমিদার ছিল না। এই ব্যবস্থার সুফল দৃষ্টে ক্রমে কানাড়া, মালাবার, তাঞ্জোর প্রভৃতি অঞ্চলেও রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করা হয়। রায়তওয়ারি বন্দোবস্তে খাজনা চিরস্থায়ী হইলেও নূতন কোন জমি কৃষির আওতায় আনিলে সেজন্য অতিরিক্ত খাজনা দিতে হইত। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্থলে যখন ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন তখন চার্লস্ উড্-এর আদেশে জমির খাজনা চাষের খরচের উপর উদ্বৃত্তের অর্ধেক ধার্য করায় রায়তদের দুর্দশার অন্ত রহিল না।

মাদ্রাজে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর অত্যধিক খাজনা ধার্য

উত্তর-ভারতে ব্রিটিশ অধিকার বিস্তৃত হইলে জন শোরের ইচ্ছাক্রমে বারাণসী এবং এই সকল অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হয়।

১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার নবাব সুজা-উদ্-দৌলাকে তিন হাজার টাকা উপঢৌকন দিয়া ২½ শতাংশ শুল্ক কর না দিয়াই বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করে। মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাংলার নবাব তখন তিনি ইংরাজ কোম্পানির এই অধিকার স্বীকার করিতে রাজী হন নাই। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফারুক্শিয়ার সুজা-উদ্-দৌলা যে-শর্তে ইংরাজ বণিকদিগকে বাণিজ্যের অধিকার দিয়াছিলেন তাহা এক 'ফারমান'-এ স্বীকার করিয়া লন। বাংলার নবাব ইংরাজদের সহিত স্থির করেন যে, কোম্পানির বিনা-শুল্কে মাল চালানের অনুমতিপত্র বা দস্তক, কেবলমাত্র তাহাদের বিদেশে মাল চালানিবার এবং বিদেশ হইতে মাল দেশের অভ্যন্তরে আনিবার জন্য ব্যবহার করা চলিবে, দেশীয় বাণিজ্যের জন্য তাহারা দস্তক ব্যবহার করিতে পারিবে না।

সুজা-উদ্-দৌলার অনুমতি

ফারুক্শিয়ারের ফারমান

দস্তক

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজ বণিকগণ দস্তক অন্যায়ভাবে ব্যবহার করিয়া দেশীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতে শুরু করিলে, বাংলার ব্যবসায়ী, যাহারা নিয়মিত শুল্ক দিয়া মাল এক স্থান হইতে অন্যত্র রপ্তানি করিত, তাহাদের লোকসান হইতে লাগিল। কারণ শুল্ক না দিয়া ইংরাজ বণিকরা মাল অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে বিক্রয় করিয়া দিত।

দস্তকের অপব্যবহার

এই অসদুপায়ে ইংরাজ বণিকদের দেশীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ মুর্শিদকুলি খাঁ, আলিবর্দী, কেহই বন্ধ করিতে পারেন নাই। সিরাজ-উদ্-দৌলা কোম্পানির গবর্ণরের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। মির কাশিমের আমলে দস্তকের অপব্যবহার এত বেশি বৃদ্ধি পাইল যে, দেশীয় বণিকদের নিকটও দস্তক বিক্রয় করা হইতে লাগিল। মির কাশিম এই দুর্নীতির কুফল হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতে গিয়া ইংরাজদের

দস্তকের অপব্যবহার দমনে নবাবদের অক্ষমতা

সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে মসনদ হারাইতে হইয়াছিল।

দস্তকের অপব্যবহার এবং দেশীয় বণিকদের উপর জোর-জুলুমের দ্বারা ইংরাজ বণিকগণ ভারতের বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু তাহাদের জোর-জুলুম ও অত্যাচার কেবল দেশীয় বণিকদের উপরই সীমাবদ্ধ রহিল না। তাহারা দেশীয় শিল্পীদের, বিশেষভাবে তাঁতশিল্পীদের উপর অত্যাচার শুরু করিল। বাংলার সুতীবস্ত্রের চাহিদা ইংলণ্ড এবং ইওরোপীয় দেশে অত্যধিক থাকায় ইংরাজ বণিকগণ তাঁতশিল্পীদিগকে আগাম টাকা অর্থাৎ দাদন দিয়া তাহাদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতীবস্ত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতি লইত। পশ্চাতে কোম্পানির সমর্থন থাকায় তাঁতীরা সময়মত মালপত্র তাহাদের সরবরাহ না করিতে পারিলে তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত। নানা প্রকার দৈহিক নির্যাতন, অন্যায়মূলক চুক্তি স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া প্রভৃতি তাহারা করিত। এইভাবে তাঁতীদের উপর জোর-জুলুম চালু হইলে স্বাভাবিক ভাবেই তাহারা নিজ নিজ কাজে তেমন মন দিতে পারিত না, ফলে উৎপাদনও ব্যাহত হইত। ইহাতে তাহাদের ভাগ্যে আরও অত্যাচার জুটিত। এইভাবে একদিকে যেমন ইংরাজ কোম্পানি বাংলার সুতী ও রেশমশিল্পের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনি তাঁতশিল্প বিনাশপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কর্ণওয়ালিস তাঁতশিল্পের উন্নয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করেন নাই। সুতরাং বাংলার তাঁতশিল্পের সর্বনাশের দুইটি কারণের মধ্যে একটি হইল বস্ত্রশিল্পের উপর কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার এবং অপরটি তাঁতশিল্পীদের উপর ইংরাজ কর্মচারীদের অত্যাচার। কিন্তু এই সর্বনাশ সম্পূর্ণ হইয়াছিল একটি তৃতীয় কারণে। উহা হইল বিলাতী বস্ত্রের অসম প্রতিযোগিতা।

দেশীয় বণিকদের উপর অত্যাচার ক্রমে তাঁতশিল্পীদের উপর প্রসারিত

কোম্পানির সমর্থনে ইংরাজ বণিকগণ কর্তৃক দেশীয় তাঁত-শিল্পীদের উপর দৈহিক নির্যাতন

ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের সুতী এবং রেশমী বস্ত্রের চাহিদা মেশিনে তৈরী বস্ত্র অপেক্ষাও অনেক বেশি ছিল। শিল্প বিপ্লবের ফলে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদনের ফলে সেগুলির দাম স্বভাবতই কম ছিল। কিন্তু তাহাতেও ভারতীয় সুতী ও রেশমী বস্ত্রের চাহিদা ছিল খুব বেশি। এজন্য ১৭০০ খ্রীঃ এবং ১৭২০ খ্রীঃ এই দুই বৎসর দুইটি আইন পাস করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতীয় সুতী ও রেশমী বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দিল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পরে নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-মার্কিন-যুদ্ধের ফলে ভারতীয় সুতী ও রেশমী বস্ত্র ইংলণ্ডে আমদানি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ব্রিটিশ সূক্ষ্ম ছাপা সুতী বস্ত্রশিল্পীরা ব্রিটিশ সরকারের নিকট ভারতীয় ছাপা সুতী বা রেশমী বস্ত্র আমদানি বন্ধ করিবার জন্য দাবি জানাইলে চারি বৎসরের জন্য তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

ইংলণ্ডে ভারতীয় সুতী ও রেশমী বস্ত্রের চাহিদা

শিল্প-বিপ্লব, মার্কিন স্বাধীনতা যুদ্ধ, নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ, ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ—১৭০০, ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের আইন সব কিছুর ফলে ভারতীয় সুতী ও রেশমী বস্ত্র ইংলণ্ডে আমদানি বন্ধ

ইহার ফলে ইংরাজ বস্ত্রশিল্পীরা যে সুযোগ পাইল তাহাতে তাহারা তাহাদের বস্ত্রের মান বহুগুণে উন্নত করিতে সমর্থ হইল। ফলে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে ভারতে ব্রিটিশ রপ্তানির পরিমাণ ছিল বার লক্ষ পাউণ্ড, সেই স্থলে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পরিমাণ দাঁড়ায় এক কোটি চুরাশি লক্ষ পাউণ্ড। পলাশীর যুদ্ধের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাংলার সুতী ও রেশম শিল্পের সর্বনাশ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বাংলাদেশের সম্পর্কে যাহা সত্য ছিল, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রান্তের ক্ষেত্রেও তাহা ছিল সমভাবে সত্য। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝির মধ্যেই ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

ইংরাজ বস্ত্রশিল্পের উন্নতি

ঊনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগের মধ্যে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের বিনাশ

ভারতবর্ষকে কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করিয়া বাণিজ্য ফসল, যেমন—নীল, পাট, চা, এবং শিল্প হিসাবে খনিশিল্প, পাট-জাত সামগ্রী প্রস্তুত শিল্প প্রভৃতি গঠনের দিকে ইংরাজগণ মনোনিবেশ করে। এই সকল উৎপাদনে ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় অর্থ বিনিয়োগ করিয়া মুনাফা লুঠের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এক কথায় ইংরাজ শিল্প ও বাণিজ্য নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক শোষণ।

ইংরাজদের ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য-নীতির উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক শোষণ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এবং কৃষি ভিন্ন অন্যান্য পেশা অনুসরণের সুযোগের অভাব ঘটিলে জমির দাম বাড়িতে লাগিল। জমি বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণের সুযোগ ও জমির দামও চাহিদা বৃদ্ধির ফলে অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে কৃষকরা জমি বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করিতে লাগিল। ভারতবর্ষের কৃষকদের অধিকাংশই এইভাবে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িল। মহাজন শ্রেণীর হস্তে তাহারা অসহায় ঋণীতে পরিণত হইল।

ভারতীয় কৃষকের ঋণগ্রস্ততা

অন্যদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস 'এজেন্সী সিস্টেম' (Agency system) চালু করিলে পূর্বে গোমস্তা, দালাল, পাইকার প্রভৃতি কোম্পানির রপ্তানি ব্যবসার জন্য যে জিনিসপত্র সংগ্রহ করিত তাহা ইংরজ "এজেন্সী হাউস" নামে প্রতিষ্ঠানগুলি সরাসরি করিতে লাগিলে এক বিরাট সংখ্যক ভারতীয় গোমস্তা, দালাল, পাইকার প্রভৃতি বেকার হইয়া পড়িল। ফলে ক্রমে ক্রমে বাণিজ্য, অর্থ লেনদেন সবকিছু ভারতীয়দের হাত হইতে ইংরাজদের হাতে চলিয়া গেল। তৈয়ারী সামগ্রীর স্থলে কাঁচামাল যেমন—রেশম, শণ, চিনি, তুলা, নীল প্রভৃতি রপ্তানি শুরু হইলে ভারতীয়, বিশেষভাবে বাংলার শিল্প বিনাশপ্রাপ্ত হইতে চলিল। বিলাতী তৈয়ারী সামগ্রীর ভারতের বাজারে আধিপত্য ভারতের ধনদৌলত বিদেশে যাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। অষ্টাদশ শতকের শেষে ভারতের মোট রপ্তানি যেখানে ছিল দেড় কোটি পাউণ্ডের সামগ্রী, সেই স্থলে আমদানির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল দুই কোটি বাইশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের তৈয়ারী সামগ্রী। এইভাবে ক্রমেই ভারতীয় অর্থনীতি দুর্বল ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছিল।

কর্ণওয়ালিস সিস্টেম

শিল্প-ব্যবস্থার পরিবর্তন

লর্ড ক্যানিং : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ
(Lord Canning : Revolt of 1857)

পূর্ব-অভিজ্ঞতা

লর্ড ক্যানিং, ১৮৫৬-'৬২ (Lord Canning, 1856-'62) : লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ভারতের গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি ছিলেন ভূতপূর্ব ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড ক্যানিং-এর পুত্র। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে তিনি কিছুকাল ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালের সর্বপ্রধান ঘটনা হইল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ
চীনা যুদ্ধ

লর্ড ক্যানিং যে-বৎসর গবর্ণর-জেনারেল হিসাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বৎসর রাশিয়ার গ্রাস হইতে তুরস্ককে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ক্রিমিয়ার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। তদুপরি ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারে পরবৎসর (১৮৫৭) চীন দেশেও এক ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল। লর্ড পামারস্টোনের রুশ-ভীতি এবং তুরস্কের নিরাপত্তারক্ষা নীতি লর্ড ক্যানিং-এর পররাষ্ট্র-নীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

লর্ড ক্যানিং কর্তৃক পারস্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার মিত্রশক্তি পারস্য হিরাট দখল করিয়া লইলে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা অত্যন্ত ভীত হইলেন। পারস্য সমগ্র আফগানিস্তান গ্রাস করিয়া ভারতে ব্রিটিশ নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, এই আশংকা করিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার নির্দেশে লর্ড ক্যানিং পারস্য উপসাগর অঞ্চলে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই অভিযান অবশ্য আশাতীতভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছিল। ইংরাজগণ বুশায়ার অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয়ের পর পারস্যের সেনাবাহিনী হিরাট ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তদুপরি ভবিষ্যতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এক ব্যাপক অভ্যুত্থান ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ভিত্তি কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল।

সিপাহী বিদ্রোহ বা জাতীয় সংগ্রাম ?

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ (Revolt of 1857) : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যে-বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল উহার প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ পরস্পর-বিরোধী মত পোষণ করেন। প্রধানত দুইটি মতের পরিপ্রেক্ষিতেই এই বিদ্রোহের প্রকৃতি বিচার করা সমীচীন হইবে। কাহারও কাহারও মতে এবং ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও লেখকদের অধিকাংশের মতে—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ছিল সিপাহীদের বিদ্রোহ। এই কারণে তাঁহারা ইহাকে "সিপাহী বিদ্রোহ" নামকরণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কাহারও কাহারও—বিশেষত ভারতীয়

ঐতিহাসিক ও লেখকগণের মতে ইহা ছিল ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসানকল্পে সর্বপ্রথম জাতীয় সংগ্রাম। এই উভয় মতেরই সপক্ষে এবং বিপক্ষে এত সব যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলা যেমন অনুচিত, তেমনি 'জাতীয় সংগ্রাম' বলাও যুক্তিযুক্ত হইবে না। এই কারণে ইহাকে এই পুস্তকে '১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ' বলিয়া অভিহিত করা হইল।

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক কারণ

কারণ (Causes): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের নানাবিধ কারণকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক এই কয়টি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করিয়া আলোচনা করাই সুবিধাজনক হইবে।

(১) রাজনৈতিক

রাজনৈতিক কারণের মধ্যে লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ব-বিলোপ-নীতির প্রয়োগ দ্বারা সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি অধিকার এবং নানা-সাহেবের ভাতা বন্ধ করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন, তাঞ্জোর ও কর্ণাটেরও রাজপরিবারের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অযোধ্যা রাজ্যটি কু-শাসনের অজুহাতে অধিকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল রাজ্য অধিকার করিবার অনৈতিকতার প্রশ্ন বাদ দিলেও, যে অত্যাচার ও অমানুষিকতার সহিত নাগপুরের রাজপ্রাসাদ এবং অযোধ্যার নবাবের প্রাসাদ লুণ্ঠন করা হইয়াছিল, তাহা তদানীন্তন ভারতের দেশীয় রাজগণের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভ ও সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল।

(ক) স্বত্ব-বিলোপ-নীতির প্রয়োগ

বলপূর্বক নাগপুর প্রাসাদের গরু, ঘোড়া, হাতী, মণিমুক্তা ও আসবাবপত্র লইয়া গিয়া নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিবার পশ্চাতে ব্রিটিশ স্বার্থপরতার অতি নীচ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। অযোধ্যার নবাবের প্রাসাদ হইতে নবাব-পরিবারের কন্যাদের পর্যন্ত বাহির করিয়া দিয়া বলপূর্বক নবাবের কোষাগার লুণ্ঠনও একই দোষে দুষ্ট ছিল। এই অত্যাচারী নীতি সমগ্র ভারতে এক ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতির এবং ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যের কোন মূল্য নাই, দেশীয় রাজগণ ও জমিদার শ্রেণীর নিকট এই কথাই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।*

(খ) নাগপুরে ও অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন

অযোধ্যার নবাবের আর্থিক সাহায্যের উপর নবাব পরিবারের সহিত সম্পর্কিত বহুসংখ্যক পুরুষ ও মহিলা নির্ভরশীল ছিলেন। দেশীয় শাসনব্যবস্থার এই চিরাচরিত রীতি কেবল অযোধ্যায় নহে দেশের অন্যান্য অংশেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ অধিকারের পর অযোধ্যায় এইরূপ বহু পরিবার অর্থসাহায্যের অভাবে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অলঙ্কারপত্র এবং অপরাপর সামগ্রী বিক্রয় করিয়া তাহাদিগকে দিনযাপন করিতে হইত ছিল। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই সকল পরিবারের ভাতার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহা কার্যকরী হইবার

(গ) অযোধ্যার নবাবের আশ্রিত পরিবারবর্গের দুর্দশা— জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ

* The rulers of native states, all over India, must have asked themselves the question "who could be safe, if the British thus treated one who had ever been their most faithful ally." Vide, Majumdar, p. 14.

পূর্বেই বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের পর্যন্ত রাত্রিতে অপরের নিকট খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল।* এইরূপ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের মনে স্বভাবতই দেখা দিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ইহা ভিন্ন, অযোধ্যার যে নূতন রাজস্ব-নীতির প্রচলন করা হইয়াছিল, তাহার ফলে অসংখ্য তালুকদার তাঁহাদের জমিদারিচ্যুত হইয়াছিলেন। তদুপরি তাঁহাদের অনুচরবাহিনী ও দুর্গাদি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অযোধ্যার চিরাচরিত বিচার-ব্যবস্থার স্থলে নূতন বিচার-ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা ছিল ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ।

(ঘ) অযোধ্যায় প্রবর্তিত নূতন রাজস্ব-নীতি ও বিচার-ব্যবস্থার ত্রুটি

(ঙ) ব্রিটিশ কর্মচারিবর্গের অত্যাচারী শাসন

ফলে, জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কোভারলি জ্যাক্সন্ (Coverly Jackson) ও গাব্বিনস্ (Mr Gubbins)-এর ন্যায় উদ্ধত প্রকৃতির ব্রিটিশ-কর্মচারিগণ জনসাধারণের মনে ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

সামাজিক কারণও বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, বলা বাহুল্য। বিদ্রোহের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ শাসকবর্গের ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা এবং ভারতীয়দের সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিবার মনোবৃত্তি ভারতবাসীর নিকট প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। সিয়ার-উল্-মুতাখ্খিরণ গ্রন্থে ব্রিটিশ কর্মচারিবর্গের ভারতীয়দের প্রতি এইরূপ মনোভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ওয়ারেন হেস্টিংস্ও একথা তাঁহার এক পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এইরূপ ব্যবধান শান্তি বা আনুগত্যের অনুকূল নহে, বলা বাহুল্য। বাংলাদেশেই ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তন হইয়াছিল। কিন্তু উহার একশত বৎসর পরেও জনৈক শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল শাসনের পরও ইংরাজ ও হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে কোনপ্রকার সৌহার্দ্য বা পরস্পর শ্রদ্ধার ভাব জাগে নাই।† ভারতবাসীর প্রতি সাত-সমুদ্র-তের-নদীর অপর পারের ইংরাজদের এইরূপ ব্যবহার উদার-মনোবৃত্তিসম্পন্ন কোন কোন ব্রিটিশ কর্মচারীরও মনঃপূত ছিল না। লেফটেনান্ট্ ভার্ণে (Verney)-এর রচনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, ব্রিটিশ কর্মচারিবর্গের সহিত ভারতীয়দের কোনপ্রকার মেলামেশা ছিল না। কোন কারণে কোন ভারতবাসীকে ব্রিটিশ কর্মচারীর নিকট যদি বা আসিতে হইত, তাহা হইলে সেই সাক্ষাতের পর ব্রিটিশ কর্মচারীর প্রতি তাহার ঘৃণা-ই বৃদ্ধি পাইত।‡

(২) সামাজিক :

(ক) ব্রিটিশ কর্মচারিগণের ভারতবাসীর প্রতি ঘৃণা

* "Families which had never before been outside the *zenana* used to go out at night and beg their bread." Kaye, vol. i, p. 420, footnote, also see Majumdar, p. 13.

† Vide, S. N. Sen, *Eighteen Fifty Seven*, p. 29.

‡ Vide, S. N. Sen, pp. 29-30.

(ঘ) ইংরাজী শিক্ষা, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সতীদাহ দমন প্রভৃতি দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া সন্দেহ

ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সতীদাহ দমন প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যাদি যুক্তির দিক দিয়া সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য হইলেও অপরাপর কারণ এবং ব্রিটিশ শাসকবর্গের শাসিতদের হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার মনোবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে ঐগুলি ভারতবাসীর নিকট দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল।

(গ) ব্রিটিশ কর্মচারিবর্গের ব্যভিচার

ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারিবর্গের ব্যভিচার, নীচজাতির স্ত্রীলোক লইয়া 'হারেম' গঠন প্রভৃতি অ-নৈতিকতা সমসাময়িক ভারতবাসীর চক্ষে ব্রিটিশদের হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছিল।

অর্থনৈতিক কারণের উপর পূর্বেকার ঐতিহাসিকগণ ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় ইহার যথাযথ গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া গিয়াছে।

(৩) অর্থনৈতিক :

বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তনের সময় হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পূর্বাবধি একশত বৎসর ধরিয়া ইংরাজগণ যে পরিমাণ সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ভারতবর্ষ হইতে লইয়া গিয়াছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ব্রিটিশ-অধিকৃত রাজ্যের প্রজাবর্গের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। ইংরাজদের আমলে নূতন রাজস্বনীতি এই দুরবস্থার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল। বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্যাদির আমদানির ফলে দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ক্রমেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছিল। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনে পূর্বেকার বিদ্বান সমাজের সমাদর হ্রাস পাইতেছিল। দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত বা ফারসী-শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের জীবিকার্জনের পন্থা ক্রমেই লোপ পাইতেছিল। বিদ্রোহের সময় হিন্দু ও মুসলমানগণের যুগ্ম ঘোষণায় জনসাধারণের আর্থিক অবনতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। চৌকিদারী কর বৃদ্ধি, পথকর শুল্ক, যানবাহনের উপর কর স্থাপন প্রভৃতি জনসাধারণের দুর্দশা বৃদ্ধি করিয়াছিল।* এই আর্থিক কারণ

(ক) ভারতবর্ষ হইতে মূল্যবান ধাতু ইংলণ্ডে রপ্তানি—দেশীয় শিল্পের অপমৃত্যু

(খ) জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা

সেনাবাহিনীর মধ্যে সিপাহী—অর্থাৎ ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যেও দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। সাধারণ সিপাহীর মাহিনা ছিল মাসিক ৯·০০ টাকা। 'সোয়ার' অর্থাৎ অশ্বারোহী সৈনিকদের অবস্থা কোন অংশে উন্নত ছিল না। তাহাদের মাহিনা সামান্য অধিক ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের মাহিনা হইতে নানা খাতে কিছু কিছু করিয়া অর্থ কাটিয়া রাখা হইত। মোট ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৫২০ জন সিপাহী এবং দেশীয় অফিসার-এর জন্য মোট ৯৮ লক্ষ

* "........in Hindoostan they have exacted as revenue Rupees 300/- when only 200/- were due and still they are solicitous to raise their demands. The people must therefore be ruined and begarred. They have doubled and quadrupled and raised tenfold the Chowkeedaree tax and have wished to ruin the people. The occupation of all respectable men is gone, and millions are destitute of the necessaries of life." Vide, S. N. Sen, p. 1.

পাউন্ড ব্যয় করা হইত, অথচ মাত্র ৫১ হাজার ৩১৬ জন ইওরোপীয় অফিসার ও সৈনিকের পশ্চাতে মোট ৫৬ লক্ষ ৬৮ হাজার পাউন্ড ব্যয়িত হইত। দেশীয় রাজগণের হাত হইতে শাসনভার ব্রিটিশ হস্তে চলিয়া যাইবার ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে বহু একদা-সম্ভ্রান্ত এবং সচ্ছল পরিবার চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

(গ) সৈনিকদের আর্থিক দুরবস্থা

কিন্তু বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সেনাবাহিনীর অসন্তোষ। নানা কারণে এই অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইওরোপীয়দের তুলনায় ভারতীয় সৈনিকদের বেতনের স্বল্পতাও সৈনিকদের মনে স্বভাবতই বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এই বিদ্বেষের সঙ্গত কারণও ছিল। প্রধানত, সিপাহীদের সাহায্যেই ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যজয়ে সাহায্যের বিনিময়ে তাহারা কোনপ্রকার আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পায় নাই। উপরন্তু ব্রিটিশ সৈনিকদের তুলনায় তাহাদের মাহিনা এত অল্প ছিল যে, তাহারা এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই বৈষম্যমূলক ব্যবহার অন্তরকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া দিয়াছিল।

(৪) সামরিক :

(ক) সিপাহীদের মাহিনার স্বল্পতা—বৈষম্যমূলক ব্যবহার

ইংরাজ সামরিক কর্মচারীদের ব্যবহারও যেমন ছিল উদ্ধত তেমনি অপমানজনক। দেশীয় সৈনিকদিগকে তাহারা 'শুয়োর' প্রভৃতি গালাগালি না দিয়া কথা বলিত না। দেশীয় ভাষা তাহারা জানিত না বটে, কিন্তু গালাগালির প্রয়োজনীয় কথাগুলি শিখিয়া লইতে তাহাদের বিলম্ব হইত না। উর্ধ্বতন কোন ইওরোপীয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া সিপাহীরা প্রতিকার পাইত না। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে ব্রিটিশ কর্মচারী ও সিপাহীদের সম্পর্ক এইরূপ ছিল না। তখন ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারিবর্গ যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিত। কিন্তু ক্রমেই তাহাদের ব্যবহার আপত্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল।

(খ) ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারিবর্গের কটূক্তি

পদোন্নতির ক্ষেত্রেও দেশীয় ও ইওরোপীয়দের মধ্যে বৈষম্য করা হইত। ভারতীয় অফিসার ও সিপাহীদের পদোন্নতির আশা ছিল না। অভিজ্ঞ ভারতীয় অফিসারদের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া অনভিজ্ঞ ইওরোপীয় অফিসারগণকে দায়িত্বমূলক কার্যে নিযুক্ত করা হইত। ইহার ফলে ইওরোপীয় অফিসার ও সৈনিকদের বিরুদ্ধে দেশীয় অফিসার ও সিপাহীদের বিদ্বেষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল।

(গ) ভারতীয় সামরিক অফিসার বা সিপাহীর পদোন্নতির সুযোগের অভাব

ভারতীয় সৈনিকদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিবার পশ্চাতে ইওরোপীয় সামরিক কর্মচারিগণেরও দায়িত্ব যে নেহাত কম ছিল না, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সামরিক ঘাঁটির কোন কাজের কন্‌ট্রাক্ট্ দিবার কালে অফিসারগণ উৎকোচ গ্রহণ করিত। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাইরেক্টর সভার আদেশক্রমে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই অবৈধ অর্থগ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়া দিলে ব্রিটিশ অফিসারগণ বিদ্রোহ করিতে ত্রুটি করে নাই। সাময়িকভাবে বিদ্রোহ মাদ্রাজের বাহিরে অপরাপর সামরিক ঘাঁটিতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ভেলোর সিপাহী বিদ্রোহ, বারাকপুরে

(ঘ) ব্রিটিশ সামরিক অফিসারগণের দৃষ্টান্ত—মাদ্রাজ বিদ্রোহ

(ঙ) পূর্বতন সিপাহী বিদ্রোহ—ভেলোর, বারাকপুরে

সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত হইতেও এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, কর্তৃপক্ষের অন্যায়মূলক আদেশ—বিশেষত ধর্মবিরোধী আদেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীরাও বিদ্রোহ করিয়া প্রতিবাদ জানাইতে পশ্চাৎপদ ছিল না।

উপরি-উক্ত কারণের ফলে ভারতবাসীদের এবং বিশেষভাবে সিপাহীদের মনে যখন ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব জাগিয়াছে, তখন ইওরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম-যাজকদের হিন্দু ও মুসলমানগণকে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করিয়াছিল। রেভারেণ্ড গোপীনাথ নন্দী নামে জনৈক ভারতীয় ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টধর্মযাজকের বিবরণী হইতে সেই সময়কার খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পদ্ধতির কথা অবগত হওয়া যায়। সিপাহীদের নিকট পাদ্রীরা খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা করিত। জেলখানায় কয়েদীদের নিকট পাদ্রীদের অবাধ যাওয়া-আসার অধিকার ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই এই ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। এমতাবস্থায় ভারতীয়দের নিকট সতীদাহ-প্রথা নিবারণ, বিধবা-বিবাহ আইন, এমন কি রেলভ্রমণে জাতিভেদ মানিয়া চলিবার অসুবিধা প্রভৃতি, ইংরাজ শাসকবর্গের সকলকে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার এক অভিসন্ধি বলিয়া মনে হইল। ভেলোর সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল সিপাহীদের চামড়ার টুপি পরিধানের এবং দাড়ি কামাইয়া ফেলিবার আদেশ দান। বারাকপুরের বিদ্রোহের কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ ছিল বটে, কিন্তু প্রধান কারণই ছিল সিপাহীদের উপর সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশে যাইবার আদেশ।

(৫) ধর্মনৈতিক ঃ

(ক) খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা

(খ) রেলপথ, সতীদাহ দমন বিধবা-বিবাহ—প্রভৃতি দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া ধারণা

(গ) ধর্মনৈতিক কারণে ভেলোর ও বারাকপুরের বিদ্রোহ

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক কারণে যখন বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তখন চর্বি-মাখান কার্তুজ (greased cartridge) বারুদ-স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার এনফিল্ড রাইফল (Enfield Rifle নামে একপ্রকার নূতন ধরনের বন্দুক সেনাবাহিনীতে চালু করিলেন। এই বন্দুকের কার্তুজ (cartridge) দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হইত। গরু এবং শূকরের চর্বি-মাখান কার্তুজ স্বভাবতই হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মনাশের সূক্ষ্ম পন্থা বলিয়া মনে হইল। স্বভাবতই উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদের মধ্যেই এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহী প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেইদিন মঙ্গল পাণ্ডের সহকর্মীদের সকলে না হইলেও অনেকেই তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে নাই। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই কারণে সমগ্র রেজিমেণ্ট (34th N. I.) ভাঙ্গিয়া দিয়া বিদ্রোহের আগুন চা দিতে চাহিলেন। মঙ্গল পাণ্ডে ও তাহার সমর্থক জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। কিন্তু তাহাতে বিদ্রোহের আগুন নিভিল না। ৩৪নং পদাতিক রেজিমেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলে কর্মচ্যুত সিপাহীরা বিদ্রোহের আগুন ছড়াইতে বিরত হইল না। ক্রমে অপরাপর সেনাদলের মধ্যেও জাতিনাশের ভীতি নিদারুণভাবে ছড়াইয়া পড়িল। পরবর্তী

প্রত্যক্ষ কারণ

এনফিল্ড রাইফল

ঘটনা ঘটিল মীরাটের সামরিক ছাউনিতে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল কুচকাওয়াজের কালে মোট ৯০ জন সিপাহীর মধ্যে ৮৫ জন চর্বি-মাখান কার্তুজ স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিল। সামরিক আইন অনুসারে বিচার করিয়া তাহাদিগকে দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ৯ই মে (১৮৫৭) সমবেত সেনাবাহিনীর সম্মুখে দণ্ডপ্রাপ্ত সিপাহীদের হাতে-পায়ে লোহার বেড়ী লাগাইয়া জেলখানায় লইয়া যাওয়া হইল। পর দিন (১০ই মে, ১৮৫৭) দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সৈনিকদের সহকর্মিগণ জেলখানায় বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীদের মধ্যে যখন এক দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে তখন সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহাত্মক পন্থা ত্যাগ করিতে উপদেশদান-রত কর্ণেল ফিনিস (Col. Finnis)-কে গুলি করিয়া হত্যা করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত বিদ্রোহ শুরু হইল (১০ই মে, ১৮৫৭)।

মীরাটের বিদ্রোহ
১০ই মে, ১৮৫৭

বিদ্রোহের বিস্তার (Spread of the Revolt): সিপাহীদের বিদ্রোহ বারাকপুর হইতে মীরাট এবং তথা হইতে দিল্লীতে বিস্তারলাভ করিল। মীরাট হইতে বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিল্লীতে পেঁছিয়া (১১ই মে) মুঘল বংশধর বাহাদুর শাহ্‌কে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। মীরাট এবং দিল্লী উভয় স্থানেই সিপাহীরা ব্রিটিশ সামরিক অফিসার ও অপরাপর ইওরোপীয়দের হত্যা করিতে দ্বিধা করিল না। দিল্লী বিদ্রোহী সিপাহীগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া ফিরোজপুর (১৩ই মে) এবং মুজফ্‌ফর নগরের সিপাহীগণও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত কোন কোন স্থানে জনসাধারণও যোগদান করিতে ত্রুটি করিল না। পাঞ্জাব, নৌসেরা, হত-মর্দান প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। অযোধ্যা ও বর্তমান উত্তরপ্রদেশে বিদ্রোহ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইল। এটোয়া, মইনপুরী, রুরকী, এটা, হোদাল, মথুরা, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, শাহ্‌জানপুর, মোরাদাবাদ, বোদাও, আজমগড়, কানপুর, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, দরিয়াবাদ, ফতেপুর, ফতেগড়, হাতরস ও অপরাপর বহুস্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বিদ্রোহিগণ জেলখানা ভাঙ্গিয়া কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল, সরকারী খাজাঞ্চীখানা লুট করিল। সিপাহীদের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতি স্থানেই বেসামরিক জনসাধারণও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

বারাকপুরের বিদ্রোহ

দিল্লী: বাহাদুর শাহ্ (২য়) সম্রাট বলিয়া ঘোষিত

ফিরোজপুর, মুজফ্‌ফর নগর

পাঞ্জাব, নৌসেরা হতমর্দান

অযোধ্যা ও বর্তমান উত্তরপ্রদেশে ব্যাপক বিদ্রোহ

অযোধ্যায় যে-সকল তালুকদার ব্রিটিশ অধিকারের (১৮৫৬) পর সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই বিদ্রোহে যোগদান করিল। কৃষকগণও তালুকদারগণের পক্ষ গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। সমগ্র অযোধ্যা রাজ্যে বিদ্রোহ এক ব্যাপক জাতীয় বিদ্রোহে রূপান্তরিত হইল।

অযোধ্যার তালুকদার ও কৃষকদের অংশগ্রহণ

মীরাট, দিল্লী ও অযোধ্যা ভিন্ন কানপুরে নানাসাহেব, ঝাঁসিতে ঝাঁসির রাণী এবং জগদীশপুরে কুনওয়ার সিং বিদ্রোহে এক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। বুন্দেলখণ্ডে বান্দার নবাব এবং বাণপুর ও শাহ্‌গড়ের রাজগণও অনুরূপ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে যেমন বাহাদুর শাহ্‌ সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ নানাসাহেবও নিজেকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অযোধ্যার রোহিলখণ্ডের জমিদারগণও নিজেরা স্বাধীন হইয়া গেলেন। বেরিলীর খান বাহাদুর খাঁ ছিলেন হাফিজ রহমৎ খাঁ'র বংশধর। তিনি নিজেকে দিল্লী-সম্রাটের স্থানীয় প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করিয়া নিজস্ব শাসনব্যবস্থা চালু করিলেন। বেরিলীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বিজনোর রাজ্যেও মাহ্‌মুদ খাঁ দিল্লী-সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করিলেন। এইভাবে বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ শাসন-ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ-শাসনের অবসান ঘটাইতে চাহিলেন।

নানাসাহেব, ঝাঁসির রাণী

খান বাহাদুর খাঁ, মাহ্‌মুদ খাঁ

বিহারে দানাপুর নামক স্থানের সিপাহীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কুনওয়ার সিং-এর নেতৃত্বাধীনে সমবেত হইল। দেওগড়-এর সেনাবাহিনীও বিদ্রোহে যোগদান করিল। বাংলাদেশে ঢাকা ও চট্টগ্রামে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইলে উভয় স্থানেই তাহাদিগকে সহজে দমন করা হইল।

বিহার ও বাংলাদেশ

দাক্ষিণাত্য মধ্য-ভারত, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলেও বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল।

দাক্ষিণাত্য মধ্য-ভারত ও রাজস্থান

বিদ্রোহ-দমন (Suppression of the Revolt) : বিদ্রোহীদের ব্রিটিশ-বিদ্বেষ কোন কোন স্থানে নির্দোষ ইওরোপীয় নারী ও শিশুদের হত্যাকাণ্ডে প্রকাশলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বিদ্রোহ-দমনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পৈশাচিকতা কোন অংশে কম ছিল না।

নৃশংসতা

বিদ্রোহের প্রথম দিকে ব্রিটিশ পক্ষ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও সার্‌ জন লরেন্স, সার্‌ হেনরী লরেন্স, হেভেলক্‌, আউটরাম বা উট্রাম্‌, সার্‌ কোলিন ক্যাম্পবেল্‌ প্রভৃতি ইংরাজ কর্মচারী ও সেনাপতিদের তৎপরতায় এবং শিখ, নেপালী ও ব্রিটিশ সৈনিকদের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইয়াছিল।

বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ কর্মচারী ও সেনাপতি-গণের তৎপরতা

বিদ্রোহীদের নেতৃবর্গের মধ্যে প্রধান ছিলেন কানপুরের নানাসাহেব ও তাঁতিয়া তোপী। তাঁতিয়া তোপীর প্রকৃত নাম রামচন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ তোপী। ইনি তাঁতিয়া তোপী নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁতিয়া তোপী নানাসাহেবের প্রধান পার্শ্বচর হিসাবে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। নানাসাহেবের অপর একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন আজিম-উল্লা। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে নানাসাহেব আজিম-উল্লাকে ডাইরেক্টর সভার নিকট এ-বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিদ্রোহী নেতৃবর্গের অপর একজন ছিলেন রাজপুত-দলপতি কুনওয়ার সিং। ইনি জগদীশপুরের (আররা) তালুকদার ছিলেন। ফৈজাবাদের মৌলভী আহ্‌মদ-উল্লা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমানগণকে সমবেতভাবে দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তিনি নিজ অনুচরবর্গসহ ব্রিটিশের

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও করিয়াছিলেন। ঝাঁসীর রাণীর কথা কাহারও অবিদিত নহে। তাঁহার সামরিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতা, তাঁহার সাহস ও বীরত্ব ব্রিটিশেরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। মধ্য-ভারত ও বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন ঝাঁসির রাণী। তাঁতিয়া তোপী ও ঝাঁসির রাণী অনন্যসাধারণ সামরিক কৌশল প্রদর্শন করিয়া গোয়ালিওর অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পর সার্ হিউ রোজ-এর অধীনে এক ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারাইয়া ভারতীয় বীরাঙ্গনাদের অন্যতম হিসাবে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁতিয়া তোপী হিউ রোজ-এর হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু পরে ধৃত হন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। নানাসাহেব পরাজিত হইয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে কিভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল সে-বিষয়ে সঠিক কিছু জানিতে পারা যায় না।

বিদ্রোহী নেতৃবর্গ : নানাসাহেব, তাঁতিয়া-তোপী, আজিম-উল্লা, কুনওয়ার সিং ঝাঁসির রাণী

এ-দিকে ব্রিটিশদের পক্ষে দিল্লী জয় করা অপরিহার্য ছিল। কারণ, হিন্দুস্থানের সার্বভৌমত্বের সহিত দিল্লী রাজধানীর ছিল এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ; সুতরাং দীর্ঘ চারিমাস ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ পক্ষ দিল্লী পুনরধিকারে সমর্থ হইল। সম্রাট বাহাদুর শাহ্ বন্দী হইলেন। তাঁহাকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করিয়া মুঘল বংশের অবসান ঘটান হইল।

ব্রিটিশ শক্তির দিল্লী পুনরধিকার—বাহাদুর শাহের নির্বাসন

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি (Character of the Rovolt of 1857) : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ 'সিপাহী বিদ্রোহ' কিংবা 'জাতীয় আন্দোলন' এই প্রশ্ন সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী মত আছে। প্রধানত দুইটি ভাগে এই সকল বিভিন্ন মতকে ভাগ করিয়া বিচার করা উচিত হইবে। (১) জে. বি. নর্টন (J. B. Norton), ডক্টর ডাফ (Dr Duff) প্রমুখ ব্যক্তিদের মতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমত, সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও পরে উহা ব্যাপকতা এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল। সমসাময়িক জনৈক মার্কিন লেখকও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। (২) পক্ষান্তরে জন কে (J. W. Kaye), সার্ সৈয়দ আহম্মদ, জনৈক বাঙ্গালী সামরিক কর্মচারী —দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতে ইহা সিপাহীদের বিদ্রোহ ভিন্ন কিছুই ছিল না। বেসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা ইহাতে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন ও গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করা।

পরস্পর-বিরোধী মতবাদ

উপরি-উক্ত দুইটি মতের প্রথমটিকে স্ফীত করিয়া সাভারকর, ডক্টর এস. বি. চৌধুরী প্রমুখ দেশপ্রেমিকগণ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুত, বিদ্রোহের সময় হইতে শুরু করিয়া এযাবৎ কোন সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। অধুনা প্রকাশিত ডক্টর মজুমদারের The Sepoy Mutiny & The Revolt of 1857 এবং ডক্টর সেনের Eighteen Fifty Seven—এই দুইখানি গ্রন্থে নূতন গবেষণালব্ধ তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। ডক্টর মজুমদার এবং ডক্টর সেন মোটামুটি একই কথা

ডক্টর মজুমদার ও ডক্টর সেনের অভিমত

বলিয়াছেন। ডক্টর মজুমদার চার্লস্ রেক্স্ (Mr Charles Raikes) নামে তদানীন্তন জনৈক ইংরাজ বিচারপতির রচনার উপর নির্ভর করিয়া এবং নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ জাতীয় আন্দোলন হিসাবে প্রথম শুরু হয় নাই। প্রধানত ইহা একটি সিপাহী বিদ্রোহ-ই বটে, কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে সিপাহী বিদ্রোহ-ই প্রসার লাভ করিয়া জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইয়াছিল। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ, মধ্যপ্রদেশের এক ক্ষুদ্র অংশ এবং বিহারের পশ্চিমাংশে সিপাহী বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অন্যত্র ইহা সিপাহী বিদ্রোহ ভিন্ন অপর কিছু ছিল না।* ডক্টর সেনও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিয়াছেন যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও সকল স্থানে ইহা কেবল সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে বিদ্রোহীদের পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন ছিল। অবশ্য স্থানবিশেষে এই সমর্থনের মাত্রা অল্প বা অধিক ছিল।

মূলত সিপাহী বিদ্রোহ—কোন কোন অঞ্চলে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত

এখানে বলা প্রয়োজন যে, ডক্টর মজুমদার বা ডক্টর সেনের যুক্তি সর্বক্ষেত্রেই অকাট্য এমন নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহাদের উভয়ের সিদ্ধান্তই গতানুগতিক ও রক্ষণশীল মনোবৃত্তিপ্রসূত। নর্টন ও ডক্টর ডাফের মন্তব্য, বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহিগণ কর্তৃক হিন্দুস্তানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা, বাহাদুর শাহের ঘোষণায় দেশের হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোককে ইংরাজ-বিতাড়নে অগ্রসর হইবার আহ্বান প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহের চরিত্র দান করিয়া থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীতে সামরিক বলে বলীয়ান ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাসীর পক্ষে কোনপ্রকার আন্দোলন শুরু করিবার কল্পনাও আসে নাই। সেই সময়ে ব্রিটিশের সহিত যুঝিতে হইলে সামরিক শক্তিও প্রয়োজন—এই ছিল ধারণা। ইহা ভিন্ন, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দলের মধ্যে কোনপ্রকার ঐক্য যে না ছিল, এমন নহে। তদুপরি ব্রিটিশ-বিতাড়নই ছিল সেই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। বহুস্থানে কৃষকগণও বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল, এই প্রমাণও আছে। এমতাবস্থায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সামরিক বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হওয়াই ছিল তদানীন্তন পরিস্থিতিতে একমাত্র যুক্তিসম্মত পন্থা। সুতরাং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমে সামরিক বিদ্রোহ হিসাবে শুরু

অপরাপর মতামত

* "The most reasonable conclusion, therefore, seems to be that primarily the outbreak was a mutiny of the troops......All the available facts fully support his (Raikes) thesis that the outbreak of 1857 was not a mutiny growing out of a national revolt or forming a part of it, but primarily a mutiny gradually developing into a general revolt in certain areas." Majumdar, pp. 318-321.

"The movement began as a mutiny but it was not everywhere confined to the army." Sen, p. 405.

"........The revolt commanded popular support in varying degree in the principal theatres of war, which extended roughly from western Behar to the eastern confines of the Punjab." Ibid, p. 407.

হইয়াছিল, পরে কোন কোন স্থানে জাতীয় রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, এইরূপ সূক্ষ্ম পার্থক্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত মর্যাদা না দিবার যুক্তি নাই, এ-কথা অনেকে মনে করিয়া থাকেন। আর ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধকে আজিকার মানদণ্ডে বিচার করিলেও চলিবে না। ব্যাপক ব্রিটিশ বিদ্বেষ প্রথমত সেনাবাহিনীর বিদ্রোহে প্রকাশ লাভ করিলেও জাতীয় চরিত্র ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। এই বিদ্রোহের সুযোগে প্রধানত ব্যক্তিগত কারণে ব্রিটিশের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ, পদচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত শাসকশ্রেণী ও জমিদারগণ স্ব-স্ব প্রাধান্য-স্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্রোহ যদি সফলতার পথে অগ্রসর হইত তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত এই স্বার্থান্বেষী, প্রজার স্বার্থবিরোধী শাসকবর্গকে যে পুনরায় ক্ষমতা হারাইতে হইত তাহার সম্ভাবনা একেবারে ছিল না, এ-কথা বলা যায় কি ?

উপসংহার

যাহা হউক, উপসংহারে এই কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। নূতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইলেই এই বিষয়ে যে মতানৈক্য রহিয়াছে উহার অবসান ঘটিবে।*

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের বিফলতার কারণ (Causes of the failure of the Revolt of 1857) : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের বিফলতার বিভিন্ন কারণের মধ্যে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিদ্রোহীদের কার্যপন্থা, সময় প্রভৃতির সম্পর্কে উপযুক্ত যোগাযোগ বা সংহতি ছিল না। ফলে, একই সময়ে সকল স্থানে বিদ্রোহ যেমন শুরু হয় নাই, তেমনি সর্বত্র একই নীতি বা কর্মপন্থা অনুসৃত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, নানাসাহেব ও বাহাদুর শাহের মধ্যে স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। নানাসাহেব পেশওয়া হইবার এবং মারাঠা প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বাহাদুর শাহ্ স্বভাবতই চাহিয়াছিলেন মুঘল প্রাধান্য পুনরুজ্জীবিত করিতে। তৃতীয়ত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহ দেখা দিবার ফলে উহা আঞ্চলিক সীমার মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতে এই বিদ্রোহের বিস্তৃতি ঘটে নাই। চতুর্থত, বিদ্রোহী নেতাগণের ব্যাপক বিদ্রোহ-পরিচালনার মত যোগ্যতা ও দক্ষতা ছিল না। ঝাঁসির রাণী, নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপী, কুনওয়ার সিং প্রভৃতি নেতৃবর্গ স্ব-স্ব এলাকায় সুযোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দান করিলেও ব্যাপক বিদ্রোহের সামগ্রিক পরিচালনার ক্ষমতা তাঁহাদের কাহারও ছিল না। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব বিদ্রোহের অসাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য। তদানীন্তন দেশীয় রাজগণের মধ্যে কেহই এই বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই। পঞ্চমত, বিদ্রোহের পরাজয়ের কারণগুলির মধ্যে ব্রিটিশ কূটকৌশলেরও উল্লেখ করিতে হইবে। ভীতিপ্রদর্শন

(১) সংহতির অভাব

(২) আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য

(৩) আঞ্চলিক সীমার সীমাবদ্ধতা

(৪) সুযোগ্য নেতার অভাব

* ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিশদ আলোচনা এই গ্রন্থে সংযোগ করা সম্ভব নহে। মোটামুটি ধরনের আলোচনা করা হইল মাত্র।

করিয়া এবং প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া তাহারা অনেককেই সপক্ষে টানিতে সক্ষম হইয়াছিল। শিখদের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কৌশল সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হইয়াছিল। মাত্র দশ বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাব অধিকার করিয়া শিখ-শক্তির অবসান ঘটাইয়াছিল, কিন্তু সেই শিখদের ব্রিটিশ-শক্তি এই বিদ্রোহ-দমনের কার্যে নিয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ষষ্ঠত, বিদ্রোহকে সমগ্রভাবে পরিচালনার কোন সামগ্রিক পরিকল্পনা বা কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না। ফলে, বিদ্রোহীদের শক্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে অযথা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৫) ব্রিটিশ কূটকৌশল

(৬) বিদ্রোহীদের সংগঠনের অভাব

কোন কোন স্থানে বিদ্রোহীদের মধ্যে সংগঠনের পরিচয় পাওয়া গেলেও বিদ্রোহকে জয়যুক্ত করিতে হইলে যে কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, তাহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে গড়িয়া উঠে নাই। সপ্তমত, ব্রিটিশ সেনাবাহিনী যাহাতে দিল্লী অবরুদ্ধ করিতে না পারে সেইজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করিয়া বিদ্রোহিগণ অত্যন্ত ভুল করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, দিল্লী যখন ব্রিটিশ সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল তখন দিল্লীর অভ্যন্তর হইতে বাধা দানের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতেও অবরোধকারী ব্রিটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা না করিয়া বিদ্রোহিগণ সামরিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল।* অষ্টমত, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সামরিক দক্ষতা, গোলাবারুদের প্রাচুর্য এবং সর্বোপরি একই সেনাপতির নির্দেশানুযায়ী যুদ্ধ করা—প্রভৃতির স্থলে সিপাহীদের সামরিক দক্ষতার ন্যূনতা, গোলাবারুদের অপ্রাচুর্য এবং সর্বোপরি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত সামরিক নেতৃত্ব তাহাদের দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা, সামরিক দূরদর্শিতা, উন্নত ধরনের সেনাপতিত্বও বিদ্রোহীদের পরাজয়ের কারণ ছিল, বলা বাহুল্য।

(৭) বিদ্রোহীদের সামরিক ভুল

(৮) ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দক্ষতা

বিদ্রোহের ফলাফল (Results of the Revolt) : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। প্রথমত, ইংলণ্ডের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হস্তে এত বড় সাম্রাজ্যের শাসনভার ছাড়িয়া দেওয়া নিরাপদ নহে। এই কারণে ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটাইয়া এই সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের অধীনে স্থাপন করা হইল।

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান

আধুনিক ঐতিহাসিকদের একজন† ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে দুইটি পতনোন্মুখ শাসনব্যবস্থার সংঘর্ষ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই দুইটির একটি হইল ভারতীয় মুসলমান ও মারাঠা শক্তি ও শাসনব্যবস্থা, অপরটি হইল ইংরাজ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থা। এই বিদ্রোহের ফলে উভয়েরই পতন ঘটিয়া ব্রিটিশ সরকারের শাসন অর্থাৎ ব্রিটিশ মহারাণীর শাসন স্থাপিত হইয়াছিল।

---

* Vide, Majumdar, p. 271.
† Sir George Trevelyan, vide, *A History of India*: Michael Edwardes, p. 269.

ভারত-শাসনের উন্নতির জন্য একটি আইন পাস করিয়া ভারতের শাসনভার একজন সেক্রেটারী ও পনর জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কাউন্সিলের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। এই সংস্থাটি ইংলণ্ডে স্থাপিত হইল এবং ইংলণ্ডের মহারাণীর পক্ষে ভারতের শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব এই কাউন্সিল ও সেক্রেটারীর হস্তে ন্যস্ত করা হইল। ব্রিটিশ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের গবর্ণর-জেনারেলকে ভাইস্‌রয় বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল।

ভাইস্‌রয় নিয়োগ

দ্বিতীয়ত, মহারাণীর ঘোষণা দ্বারা লর্ড ডালহৌসী-প্রবর্তিত স্বত্ব-বিলোপ-নীতি পরিত্যক্ত হইল। এই ঘোষণায় স্পষ্টভাবে বলা হইল যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে আর রাজ্যবিস্তার করিবেন না। দেশীয় নৃপতিদের মনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি যে-সন্দেহ উপজাত হইয়াছিল উহা দূরীকরণের জন্যই এই কথার উল্লেখ করা হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। ইহা ভিন্ন, দেশীয় রাজগণের উত্তরাধিকার তাঁহাদের নিজ-নিজ আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং দত্তক পুত্র গ্রহণের ব্যাপারেও তাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।*

স্বত্ব-বিলোপ-নীতি পরিত্যক্ত

তৃতীয়ত, ভারতের শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিকতর অংশদানের নীতিও গৃহীত হইল। ভারতের ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায় এবং ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে কোনপ্রকার যোগাযোগ ছিল না বলিয়াই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, এই কথা স্মরণ করিয়া ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি প্রবর্তিত হইল।

শাসনব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ নীতি

চতুর্থত, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ ও বোম্বাই কাউন্সিলের আইন-প্রবর্তনের ক্ষমতা কলিকাতা কাউন্সিলের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্রোহের পর এই কেন্দ্রীয়করণ-নীতি পরিত্যক্ত হইল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্‌ এ্যাক্ট্‌ (Councils Act) পাস করিয়া বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ফিরাইয়া দেওয়া হইল। ব্রিটিশ শাসনাধীনে কোন প্রদেশ গঠন করা হইলেই উহাতে কাউন্সিল স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। এই সকল কাউন্সিলে ভারতীয় সভ্য গ্রহণের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

কাউন্সিলস্‌ এ্যাক্ট্‌ (১৮৬১)

পঞ্চমত, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ শাসকবর্গের মধ্যে যে-ভীতি ও সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্য এবং ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্য-বাদী বিভেদ নীতির (Divide et impera) প্রচলন করিতে সচেষ্ট হইলেন। সেই সময় হইতেই সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণের চেষ্টা শুরু হইল।

সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ নীতি (Divide et impera)

ষষ্ঠত, ভারতীয় সিপাহীদের সংখ্যার অনুপাতে অতি নগণ্য সংখ্যক ব্রিটিশ সৈনিক রাখিবার বিপদ বুঝিতে পারিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরও বহু ব্রিটিশ সৈন্য ভারতবর্ষে আনাইয়া ভবিষ্যতে সিপাহী বিদ্রোহের পথ বন্ধ করিতে চাহিলেন। ইহা ভিন্ন, যাবতীয় দায়িত্বমূলক কার্যে কেবলমাত্র ইংরাজ কর্মচারী নিয়োগের নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল।

ব্রিটিশ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি

* Thompson & Garratt. p. 468.

সপ্তমত, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল শাসক অর্থাৎ ব্রিটিশ এবং শাসিত অর্থাৎ ভারতীয়দের মধ্যে গভীর পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সন্দেহ। সার্ জর্জ ট্রেভেলিয়ান (Sir George Trevelyan) বিদ্রোহের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। বিদ্রোহীরা যখন এক-এক স্থান হইতে বিতাড়িত হইতেছিল সেই সময়ে তিনি সামরিক কর্মচারীদের আলাপ-আলোচনা, তাহাদের আক্রোশ, নৃশংসতার সব কিছুর প্রত্যক্ষসাক্ষী ছিলেন। সামরিক কর্মচারীরা বাণারস লুণ্ঠনের পরিকল্পনা যখন করে, তখন তিনি সশরীরে সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। বাণারস তখন এক্জিটার বা নিউ-ইয়র্ক-এর মতই ইংরাজ-অধ্যুষিত শহর ছিল। উহার ধনদৌলত প্রায় দশ কোটি টাকা মূল্যের কম ছিল না। ট্রেভেলিয়ানের মতে সামরিক কর্তৃপক্ষের নৃশংসতার তুলনায় বেসরকারী ইংরাজ কর্মচারীদের নৃশংসতা ও প্রতিশোধপরায়ণতা শতগুণে বেশি ছিল। কারণ এই সকল লোক ভারতবর্ষে অর্থ রোজগারের উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিল, ভারতবাসীর ধন, মান, প্রাণ তাহাদের অর্থললুপতার নিকট কিছুই ছিল না। বিদ্রোহে তাহাদের জীবন ও অর্জিত সম্পদ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হওয়া মাত্র তাহারা ভারতবাসীর উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া তাহার প্রতিশোধ গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার এই ধরনের প্রতিশোধপরায়ণ নিচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের উপর স্থানীয় শাসনের ভার সাময়িকভাবে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সকল স্থানে পূর্ণমাত্রায় সন্ত্রাসের শাসন ইহারা চালু করিয়াছিল।

ভারতবাসী ও ইংরাজদের পরস্পর ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সন্দেহ

বিদ্রোহ অবসানে ভারতবাসীদের উপর নৃসংশ অত্যাচার

বিদ্রোহ চলাকালে এবং উহার অব্যবহিত পরে ইংরাজী পত্রিকাগুলি ভারতবাসীর উপর অত্যাচার করিবার জন্য সকল রকমে উসকানি দিতে ত্রুটি করে নাই। ফরাসী বিপ্লবের কালেও ম্যারা বা হিবার্ট (Marat or Hebert), ইঁহারা কেহ এই ধরনের প্ররোচনা দিতে সক্ষম হন না। প্রতিশোধ গ্রহণের নামে ভারতবাসীকে—অর্থাৎ একটি সমগ্র জাতিকে হত্যা, লুণ্ঠন, নৃশংস অত্যাচারের শিকার করিবার জন্য প্রতিদিন ইংরাজী পত্রিকাগুলির উসকানিমূলক রচনা সাংবাদিকতাকে কদর্য, নিচ প্রচারপত্রে পরিণত করিয়াছিল। সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল এজন্য প্রত্যেক হিন্দু এবং প্রত্যেক মুসলমানকে বিদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, হত্যাকারী বিবেচনা করিয়া একই ফাঁসির দড়িতে ঝুলাইতে হইবে এই ছিল তাহাদের মূল বক্তব্য। তাহারা লর্ড ক্যানিং যথেষ্ট পরিমাণে নৃশংস হইতেছেন না, সেইজন্য তাঁহাকে পর্যন্ত দোষারোপ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

ইংরাজী পত্রিকার উসকানিমূলক প্রচার

এই সকল কারণে ভারতবাসী ও ইংরাজদের মধ্যে এক গভীর পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংলণ্ডে ভারতে ইংরাজদের এই প্রতিশোধাত্মক নীতি গভীর উদ্বেগ ও বিরোধিতার সৃষ্টি করে। কোন কোন পত্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি উদার ও সৌজন্যমূলক বক্তব্যও প্রকাশিত হইতে থাকে। অবশ্য এক শ্রেণীর পত্রিকা এই

ইংলণ্ডে ক্রমে এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

সব কিছুর এমন কি, এই সকল বক্তব্য প্রকাশের জন্য সেই সকল পত্রিকার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই।*

সর্বশেষে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের কারণগুলির মধ্যে ব্রিটিশ শাসনাধীনে সতীদাহ-প্রথা দমন, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি সংস্কার প্রবর্তন অন্যতম কারণ ছিল, এই কথা উপলব্ধি করিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সংস্কার-কার্যাদি গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। বস্তুত, তাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিলেন।

সংস্কার-নীতি পরিত্যক্ত —প্রতিক্রিয়াশীলতা

প্রথম ভাইস্‌রয় হিসাবে লর্ড ক্যানিং (Lord Canning as the First Viceroy): বিদ্রোহের অবসানের পর ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইলে তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং সর্বপ্রথম ভাইস্‌রয় নিযুক্ত হইলেন। লর্ড ক্যানিং ছিলেন উদারচিত্ত, মানবতাসম্পন্ন শাসক। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনের দায়িত্ব স্বভাবতই লর্ড ক্যানিং-এর উপর ন্যস্ত হইল। তিনি ক্ষমা, উদারতা ও সহানুভূতির মনোবৃত্তি লইয়া তদানীন্তন ভারতবাসীর মন হইতে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু ভারতস্থ ব্রিটিশ-সম্প্রদায় এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে একাংশ বিদ্রোহে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি চরম শাস্তিদানের দাবি করিতে লাগিল। লর্ড ক্যানিং তাঁহার স্বদেশবাসীর এই প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তির সমর্থন করিলেন না; তিনি তাঁহার উদার নীতি হইতে একবিন্দুও টলিলেন না। এজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে তদানীন্তন ব্রিটিশ-সম্প্রদায় নানা কটূক্তি করিতেও দ্বিধা করেন নাই। এমন কি, তাঁহার নীতি দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অন্ধ উদারতার দোষে দুষ্ট এইরূপ অভিযোগ করিয়া তাঁহারা লর্ড ক্যানিং-এর অপসারণ দাবি করিয়াছিলেন।

বিদ্রোহীদের প্রতি ক্যানিং-এর উদারতা

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার ফলে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিলে কোম্পানির সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনের প্রয়োজন হইল। ইহা ভিন্ন, বিদ্রোহের পর নূতন সামরিক নীতি প্রবর্তন করিয়া ভবিষ্যতে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দূর করিবার চেষ্টা চলিল। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের সমগ্র সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ ইংরাজ সৈনিক দ্বারা গঠিত হইবে, এই নীতি গৃহীত হইল। কোম্পানির সেনাদল ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতনভাবে সেনাবাহিনী গঠন করা হইল; গোলন্দাজ বাহিনী কেবলমাত্র ব্রিটিশ সৈনিকদের লইয়া গঠিত হইবে, এই নীতিও কার্যকরী করা হইল।

সামরিক পুনর্গঠন

বিদ্রোহের ফলে সরকারী ঋণের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং আর্থিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড হইতে উইলসন্ (James Wilson) নামে জনৈক রাজস্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইল। উইলসন্ রাজস্ব-আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আয়কর এবং আমদানি শুল্ক স্থাপন করিলেন। ইহা ভিন্ন, কাগজী মুদ্রা প্রচলন এবং সরকারী বিভাগগুলি হইতে নিত্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মচারী ছাঁটাই করিবার পরিকল্পনাও তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার

* Vide, *A History of India*, by Michael Edwardes, Trevelyan quoted in extenson, pp. 269-72.

কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে স্যামুয়েল লেইং (Samuel Laing) পরবর্তী অর্থসচিব নিযুক্ত হইয়া আসিয়া উইলসন্ কর্তৃক আরব্ধ কার্য সম্পাদন করিলেন।

রাজস্ব আইন (১৮৫৯), পেনাল কোড্ (১৮৬০), ফৌজদারী আইনবিধি (১৮৬১), হাইকোর্ট স্থাপন

ইতিমধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটিগুলি প্রকট হইয়া উঠিলে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি রাজস্ব আইন পাস করিয়া রায়তদের বিনা কারণে উচ্ছেদ করা নিষিদ্ধ হইল। লর্ড ক্যানিং-এর আমলে লর্ড ম্যাকলের আরব্ধ ভারতীয় পেনাল কোড্ (Penal Code) এবং ফৌজদারী আইনবিধির (Criminal Procedure Code) সংকলন সম্পন্ন হইল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বেকার সুপ্রীম কোর্ট এবং কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত অপরাপর আদালতের স্থলে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে একটি করিয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হইল।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

লর্ড ক্যানিং-এর আমলে কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। লর্ড ক্যানিং নীলকর সাহেবদের অত্যাচার হইতে ভারতীয় কৃষকদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কতক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ ক্রাউনের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত

ভারত সরকার আইন, ১৮৫৮ (Government of India Act, 1858) : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের ফলে এ-কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, একটি বণিক কোম্পানির হস্তে ভারতবর্ষে অবস্থিত বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনভার আর ছাড়িয়া রাখা সম্ভব নহে, এজন্য ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার আইন পাস করিয়া ঘোষণা করা হইল যে, ভারতবর্ষের কোম্পানির রাজত্বের অবসান ঘটিয়া কোম্পানির সকল ভূসম্পত্তি ও ক্ষমতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া তথা ব্রিটিশ শক্তির প্রতীক রাজমুকুট (Crown)-এ বর্তাইবে। একজন সেক্রেটারী-অব্-স্টেট্-ফর-ইণ্ডিয়া (Secretary of State for India) ও তাঁহার একটি পরিষদ ভারতবর্ষের শাসন পরিচালনা করিবে। এই সেক্রেটারী ও তাঁহার পরিষদ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও বোর্ড-অব্-কণ্ট্রোল যে-ক্ষমতা প্রয়োগ করিত, সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে। গবর্ণর-জেনারেল ও বিভিন্ন প্রদেশ ও প্রেসিডেন্সীর গবর্ণরগণ মহারাণী কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। গবর্ণর-জেনারেল মহারাণীর প্রতিনিধি হিসাবে 'ভাইস্রয়' (Viceroy) নিযুক্ত হইলেন।

ভারতের শাসন-ক্ষমতা সেক্রেটারী ও তাঁহার পরিষদের উপর

এলাহাবাদের দরবার—মহারাণীর ঘোষণা—কানপুরের দরবার

১লা নভেম্বর, ১৮৫৮ এলাহাবাদের এক দরবারে ভারতের সর্বপ্রথম ভাইস্রয় লর্ড ক্যানিং মহারাণীর পক্ষে ঘোষণা পাঠ করিলেন যে, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে, জনসাধারণকে তাহাদের চিরাচরিত অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হইবে। তাহাদের প্রতি উদার, ধর্মসহিষ্ণু নীতি অনুসৃত হইবে। প্রজাদের মধ্যে ধর্মপালনের স্বাধীনতা এবং সরকারী চাকরি গ্রহণের সমতা প্রবর্তন করা হইবে। যাহারা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল তাহাদের সকলকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি দেওয়া হইল। পর বৎসর কানপুরে আরও একটি দরবারে ডালহৌসী প্রবর্তিত 'স্বত্ব-বিলোপ-

নীতি' নাকচ করিয়া ঘোষণা করা হইল যে, কোম্পানির সহিত যে-সকল চুক্তি দেশীয় রাজন্যবর্গ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেগুলির মর্যাদা দেওয়া হইবে।

সমালোচনা

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইনের সমালোচনার সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আইন পাস করিয়া ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ সরকারের হস্তে গ্রহণ করিলেও পার্লামেণ্ট এই শাসনব্যবস্থায় 'ঘুমন্ত অভিভাবক' (sleepy guardian) হিসাবে রহিয়া গিয়াছিল। প্রকৃত শাসনকার্যের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল সেক্রেটারী-অব্-স্টেট্-ফর্-ইণ্ডিয়া ও তাঁহার পরিষদের উপর। কিন্তু তাঁহার পরিষদের পক্ষে যাহা কিছু ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সরকারকে অর্থাৎ গবর্ণর-জেনারেলকে সকল প্রকার উপদেশ-নির্দেশ দিবার একমাত্র অধিকারী ছিলেন। ভারত সরকারের পক্ষে গবর্ণর-জেনারেল যাহা কিছু ইংলণ্ডের সরকারকে লিখিতেন, তাহা একমাত্র সেক্রেটারী-অব্-স্টেট্‌কেই লিখিতে পারিতেন—পরিষদকে নহে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সেক্রেটারী-অব্-স্টেট্ ছিলেন তাঁহার এবং তাঁহার পরিষদের কার্যকলাপের জন্য পার্লামেন্টের নিকট দায়ী। কিন্তু এখানে এ-কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সর্বপ্রথম সেক্রেটারী-অব্-স্টেট্ সার্ চার্লস্ উড তাঁহার কাউন্সিল বা পরিষদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা যাহাতে বজায় থাকে সেইদিকে বিশেষ নজর দিতেন। কিন্তু পার্লামেণ্ট কর্তৃক গঠিত ও পার্লামেন্টের নিকট দায়ী কোন সংস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিলে পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বের নীতি-বিরোধী হইয়া পড়ে।* আরও একটি বাস্তব অসুবিধা ছিল এই যে, অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও যদি সেক্রেটারী-অব্-স্টেট্ কাউন্সিলের নিকট উপস্থিত না করিতেন তাহা হইলে সে-সম্পর্কে কোন আলোচনা করা চলিত না। এ-কথা সেক্রেটারী-অব্-স্টেটের কাউন্সিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সার্ জন স্ট্রাচি, যিনি সেই কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন দীর্ঘ দশ বৎসর, তিনি মন্তব্য করিয়াছেন।

আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা

ভারতীয় কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট্, ১৮৬১ (The Indian Councils Act of 1861) : ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যে-রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই কতক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর ভারতীয়দের সৌহার্দ্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সম্ভ্রান্ত ভারতীয়দের কয়েকজনকে শাসনব্যবস্থায় অংশদানের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হইয়াছিল। এই সকল কারণে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট্ পাস করা হইল। এই আইন অনুসারে ভারতীয় আইনসভার কার্যাদি কেবলমাত্র আইন-প্রণয়নেই সীমাবদ্ধ থাকিবে স্থির হইল। এই আইন অনুসারে গবর্ণর-জেনারেলের কার্যকরী সভার সদস্যসংখ্যা পাঁচজন হইবে এবং এই পাঁচজনের মধ্যে

* "Parliamentary sovereignty was not in keeping with an independent statutory body." "It contradicted the very basis of responsibility of the Secretary of State to the Parliament." Sriram Sharma : *A Constitutional History of India*, p. 87, A. C. Kanpur : *Constitutional History of India*, p. 65.

তিনজনের অন্তত দশ বৎসর ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। একজন অন্তত পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যারিস্টার বা এ্যাডভোকেট হওয়া চাই। ভারতের সামরিক সেনাপতিকে সেক্রেটারী-অব্-স্টেট্ কার্যকরী সভার সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

শর্তাদি ঃ কার্যকরী সভা

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গবর্ণর-জেনারেলের আইনসভার সদস্যসংখ্যা বাড়াইয়া আরও ন্যূনতম ছয় এবং অনধিক বারজন সদস্য গবর্ণর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং ইঁহাদের প্রত্যেকের কার্যকাল হইবে দুই বৎসর। এইসকল অতিরিক্ত সদস্যদের অন্তত অর্ধেক সংখ্যক বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে লইতে হইবে। গবর্ণর-জেনারেলের আইনসভার অধিবেশন যে-কোন প্রেসিডেন্সীতে বসিতে পারিবে। এইভাবে যখন যে প্রেসিডেন্সীতে অধিবেশন বসিবে তখন সেই প্রেসিডেন্সীর গবর্ণর বা লেফ্টেনাণ্ট্ গবর্ণর সভার সদস্য হিসাবে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। এখন হইতে আইনসভার সদস্য হিসাবে কোন জজকে গ্রহণ করা হইত না, কারণ স্যার চার্লস্ উড-এর এক মন্তব্য হইতে ইহা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আইনসভার ন্যায় জনসাধারণের জন্য কার্যসম্পাদনে জড়িত থাকিলে বিচারকদের স্বাধীন বিচারক্ষমতা কতকটা ব্যাহত হইবার আশঙ্কা থাকে।

আইনসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি

বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে ভারতীয়দের গ্রহণ করিবার কোন শর্ত ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট্-এ ছিল না। কিন্তু ভারত সরকার ও ব্রিটিশ সরকার উভয়েই এ-বিষয়ে একমত ছিলেন যে, ভারতীয়দের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। গবর্ণর-জেনারেলের নিকট নির্দেশেও সেক্রেটারী-অব্-স্টেট্ ভারতীয়দের গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারকে স্ব-স্ব এলাকায় আইন-প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হইল। কিন্তু এই সকল আইন গবর্ণর-জেনারেল 'ভিটো' (veto) করিয়া নাকচ করিতে পারিবেন স্থির হইল। বাংলা (১৮৬২), উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ—বর্তমান উত্তরপ্রদেশ (১৮৮৩), এবং পরে পাঞ্জাবে (১৮৯৭), এক-একটি আইন-পরিষদ স্থাপিত হইয়াছিল। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য মনোনয়ন দ্বারা সদস্য গ্রহণ করা হইবে স্থির হইল। কিন্তু এই সকল মনোনীত সদস্যদের অর্ধেক সংখ্যা বেসরকারী সদস্য হইতে হইবে। জরুরী পরিস্থিতিতে গবর্ণর-জেনারেল আইন-পরিষদের অনুমোদন না লইয়াই জরুরী আইন (অর্ডিন্যান্স) পাস করিতে পারিবেন। গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্যগণের প্রত্যেকে এখন হইতে এক-একটি নির্দিষ্ট কার্যের দায়িত্ব লাভ করিলেন।

ভারতীয়দের সদস্য হিসাবে গ্রহণের নীতি

গবর্ণর-জেনারেলের ভিটো ক্ষমতা

কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি

গবর্ণর-জেনারেলের অর্ডিন্যান্স পাসের ক্ষমতা

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট্-এ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল যাহাতে ভারতের আইনসভা একটি ক্ষুদ্র পার্লামেণ্টে রূপান্তরিত

না হইতে পারে। সেক্রেটারী-অব্-স্টেট্ তাঁহার চিঠিপত্র ও নির্দেশগুলিতে ভারতীয় আইনসভা যাহাতে কেবলমাত্র আইন-প্রণয়নের কার্য ভিন্ন অপর কিছু না করে এবং একটি কমিটি বা পরিষদ যেভাবে কার্য সম্পাদন করে তাহার বেশি কিছু না করে, বার বার সে-কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যে-সকল বেসরকারী ভারতীয়দের মনোনীত সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল তাঁহারা হয় দেওয়ান, জমিদার বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী ছিলেন। সুতরাং প্রতিনিধিমূলক আইনসভার চরিত্র এই আইনসভার ছিল না। পূর্বেকার আইনসভার কার্যকলাপের স্বাধীনতার তুলনায় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আইনের দ্বারা গঠিত আইনসভার স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

সমালোচনা

অধ্যায় ১৫

ব্রিটিশ ভাইসরয়দের শাসনাধীন ভারত

(India under the rule of the British Viceroys)

লর্ড এল্‌গিন, ১৮৬২-'৬৩ (Lord Elgin, 1862-'63) : ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সর্বপ্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং অবসর গ্রহণ করিলে লর্ড এল্‌গিন ভারতের গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার শাসনকালে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশে 'ওহাবী' নামে এক দুর্ধর্ষ মুসলমান সম্প্রদায়ের দমন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া আকস্মিকভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ওহাবী আন্দোলন

সার্ জন লরেন্স, ১৮৬৪-'৬৯ (Sir John Lawrence, 1864-'69) : লর্ড এল্‌গিনের পর সার্ জন লরেন্স গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় নিযুক্ত হইলেন। ইতিপূর্বেই সার্ জন লরেন্স ভারতীয় শাসনকার্যে দক্ষতার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে পাঞ্জাব রক্ষা এবং দিল্লী পুনরধিকার করিয়া তিনি ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করিয়াছিলেন। শাসক হিসাবে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিলেও ভাইসরয়-পদের মর্যাদাবোধ তাঁহার ছিল না। যাহা হউক, তাঁহার আমলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ভুটান রাজ্য হইতে প্রায়ই ব্রিটিশ রাজ্যসীমা আক্রান্ত হইত। এ-বিষয়ের মীমাংসার জন্য এশ্‌লে ইডেন (Ashley Eden) নামে জনৈক ইংরাজ কর্মচারীকে প্রেরণ করা হইলে ভুটানীরা তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল এবং ডুয়ার্স অঞ্চল ভুটানের রাজাকে অর্পণ করিবার শর্ত-সংবলিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করাইয়া লইল। এই সূত্রে লরেন্স ভুটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অ[illegible]যে ভুটান-রাজ ডুয়ার্স ব্রিটিশদের নিকট ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু এজন্য ব্রিটিশ সরকারকে বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হইতে হইল।

ভুটান যুদ্ধ

সার্ লরেন্সের শাসনকালের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ (১৮৬৬)। বস্তুত, এই দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশ হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত সমগ্র উপকূল অঞ্চল ধরিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল। মাদ্রাজ সরকার মাদ্রাজ এলাকার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের সাহায্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা সরকার ও ভারত সরকার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের কোন প্রকার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না। উড়িষ্যার প্রায় দশ লক্ষ লোক অনাহারে ও মহামারীতে প্রাণ হারাইল। সার্ জন লরেন্স তাঁহার কাউন্সিলের অম[illegible] দুর্ভিক্ষের উপশমার্থে কোনপ্রকার চেষ্টা করিলেন না। তারপর যখন দুর্ভিক্ষজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যু হইতে মানুষকে বাঁচান অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন সার্ জন লরেন্স ও বাংলা সরকারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিন্তু তখন যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল উহার সুযোগ গ্রহণ করিবার অবকাশ আর দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের ছিল না। তাহারা ইতিমধ্যেই মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইয়াছিল। এই

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ

দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোকের মৃত্যুর জন্য তদানীন্তন বাংলা সরকার ও সার্ জন লরেন্স সমভাবে দায়ী ছিলেন। অতঃপর ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ উপশমের উপায় স্থির করিবার জন্য একটি দুর্ভিক্ষ কমিশন স্থাপন করা হইয়াছিল। উহার সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সরকার দুর্ভিক্ষের উপশমার্থে 'দুর্ভিক্ষ-নীতি' গ্রহণ করিলেন। ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সরকারী কর্মচারিবর্গের পক্ষে উহার উপশমার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক হইল।

দুর্ভিক্ষ কমিশন—দুর্ভিক্ষ-নীতি

লরেন্সের শাসনকালে মার্কিন অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছে। আমেরিকা হইতে তুলা আমদানি করিবার অসুবিধা দেখা দিলে ভারতীয় তুলার আন্তর্জাতিক চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এই সূত্রে বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্ক (Bank of Bombay) যথেচ্ছভাবে ব্যবসায়িগণকে ঋণদান করিতে লাগিল। কিন্তু ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিলে আকস্মিকভাবে এক দারুণ বাণিজ্য সংকট দেখা দিল। বোম্বাই ব্যাঙ্ক উঠিয়া গেল। বহু অর্থশালী ব্যক্তি তাহাতে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইল।

বাণিজ্যিক সংকট

জমিদারগণের অত্যাচার হইতে কৃষকগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে লরেন্স ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি রাজস্ব আইন পাস করিয়াছিলেন। বিশেষ কারণ ভিন্ন রায়তগণকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা এখন হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, তিনিই পাঞ্জাব প্রজাস্বত্ব আইনের যে-খসড়া প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে উহাই আইনে পরিণত করা হইয়াছিল।

প্রজাস্বত্ব আইন

লরেন্স-এর আফগান নীতি (Lawrence's Afghan Policy): ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দোস্ত মহম্মদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তানের সিংহাসন লইয়া এক তীব্র উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। লরেন্স আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। ইতিপূর্বে লর্ড অকল্যান্ড ও এলেনবরা আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ-নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া নানাপ্রকার সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ফলে সরকারের দায়িত্ব ও পরিস্থিতির জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সকল কারণে লরেন্স 'না-হস্তক্ষেপ' নীতি অনুসরণ করা-ই স্থির করিলেন। তিনি আফগানিস্তানের গৃহবিবাদে যে-ব্যক্তি আমীর-পদ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকেই আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন, এই কথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন। ফলে, একজনকে একবার এবং তাঁহাকে বিরোধীপক্ষ অপসারণে সমর্থ হইলে অপরকে পুনরায় আমীর বলিয়া স্বীকার করা হইল। এই অদ্ভুত নীতি 'masterly inactivity'-নীতি নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিল। ইহার ফলে আফগানদের মনে ব্রিটিশদের মতামতের কোন মূল্য নাই, এই ধারণা-ই জন্মিয়াছিল। আজ যাহাকে তাহারা আমীর বলিয়া স্বীকার করিল আগামীকাল সে বিরুদ্ধপক্ষ কর্তৃক সিংহাসন হইতে অপসারিত হইলেই লরেন্স তাহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিতেন। কিন্তু সর্বশেষে শের আলি যখন আমীর-পদ লাভ করিলেন, তখন লরেন্স তাঁহাকে

'না-হস্তক্ষেপ'-নীতি—'masterly inactivity'

সরাসরি আমীর বলিয়া স্বীকার করিলেন না। কিন্তু তিনি শের আলিকে কতক পরিমাণ সামরিক উপকরণ ও অপরাপর জিনিসপত্র উপহারস্বরূপ পাঠাইলেন। রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করিবার দায়িত্ব ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকে গ্রহণ করিবার জন্য লরেন্স প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব অবশ্য অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। যাহা হউক, লরেন্স-এর আফগান-নীতি আফগান জাতির মধ্যে ব্রিটিশদের প্রতি এক বিরক্তিকর মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল।

আফগানদের মনে তিক্ততার সৃষ্টি

লর্ড মেয়ো, ১৮৬৯-'৭২ (Lord Mayo, 1869-'72) : লর্ড মেয়ো ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সার্ লরেন্স-এর নিকট হইতে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ছিলেন আয়র্ল্যান্ডবাসী। তাঁহার অমায়িকতা, বিশেষভাবে তাঁহার সহানুভূতিশীল আচরণ দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি আলোয়ার রাজ্যের দেশীয় নৃপতির অত্যাচারী শাসনের অবসানকল্পে একটি কাউন্সিলের হস্তে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কাথিয়াবাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির নানাবিধ সমস্যার ন্যায্য সমাধান তিনি করিয়াছিলেন। আজমীরে তিনি মেয়ো কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লাহোর ও রাজকোটেও তিনি অনুরূপ কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতীয় শাসনের যাবতীয় ব্যয় যাহাতে রাজস্ব-আয় দ্বারা সংকুলান করা সম্ভব হয় সেইজন্য তিনি কয়েকটি নূতন কর স্থাপন করেন এবং সরকারী খরচের ব্যাপারে স্বয় মিতব্যয়িতা অবলম্বন করেন। তিনি প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করিয়া দিয়া সেই অর্থের দ্বারা ব্যয় সংকুলান করিবার দায়িত্ব এবং যে-খাতে যে-পরিমাণ অর্থব্যয় প্রয়োজন সেইভাবে ব্যয় করিবার স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন। এইভাবে আর্থিক ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলিকেও দায়িত্বশীল করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন।

অমায়িক সহানুভূতিশীল আচরণ

মেয়ো কলেজ প্রতিষ্ঠা

অর্থনৈতিক সংগঠন

লর্ড মেয়োর আফগান-নীতি (Lord Mayo's Afghan Policy) : আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে লর্ড মেয়ো তাঁহার পূর্বগামী সার্ লরেন্স-এর না-হস্তক্ষেপ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। অবশ্য তাঁহার আমলে 'masterly inactivity'-নীতি সাফল্যের সহিত অনুসৃত হইয়াছিল। আমীর শের আলি ব্রিটিশদের সহিত মিত্রতাস্থাপনে তখন উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড মেয়ো কোনপ্রকার সরাসরি মিত্রতা স্থাপনে রাজী না হইলেও শের আলি তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে প্রীত হইয়াছিলেন। আম্বালায় উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার-কালে লর্ড মেয়ো শের আলিকে প্রয়োজনবোধে অর্থাৎ রাশিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, অর্থ ও সামরিক উপকরণ দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন এই প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, তাঁহার চেষ্টায়ই রাশিয়ার সহিত আফগানিস্তানের সীমারেখা-সংক্রান্ত বিবাদের অবসান ঘটিয়াছিল। রাশিয়া অক্ষুনদীকে রুশ সাম্রাজ্য ও আফগানিস্তানের সীমারেখা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বাদাখ্শানের উপর আফগানিস্তানের আমীরের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল।

না-হস্তক্ষেপ নীতি

সাফল্যের সহিত অনুসৃত না-হস্তক্ষেপ নীতি

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো আন্দামানের দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের বাসস্থান পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে জনৈক পাঠান কয়েদী তাঁহাকে আকস্মিকভাবে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে।

তাঁহার মৃত্যু

লর্ড নর্থব্রুক্, ১৮৭২-'৭৬ (Lord Northbrook 1872-'76) : লর্ড মেয়ো আকস্মিকভাবে আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলে লর্ড নর্থব্রুক্ গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্রয়-পদে নিযুক্ত হইলেন। শাসনকার্যে দক্ষতার পরিচয় দান করিলেও তাঁহার চরিত্রে কোন আকর্ষণী শক্তি ছিল না। সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে বরোদার ব্রিটিশ রেসিডেন্টের মৃত্যু ঘটিলে লর্ড নর্থব্রুক্ মল্হার রাও গাইকোয়াড়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। গাইকোয়াড়ের বিরুদ্ধে রেসিডেণ্টকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগ আনা হইয়াছিল। কিন্তু উহা প্রমাণিত না হওয়ায় শাসনকার্যে অক্ষমতার অজুহাতে তাঁহাকে অপসারণ বরা হইয়াছিল। লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ভারতবর্ষে পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। নর্থব্রুকের আমলে বিহারে এক মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল (১৮৭৩-'৭৪)। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সহিত মতানৈক্য দেখা দিলে তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

গাইকোয়াড়কে সিংহাসন হইতে অপসারণ

প্রিন্স অব্ ওয়েলস্-এর ভারত-ভ্রমণ

লর্ড নর্থব্রুকের আফগান-নীতি (Lord Northbrook's Afghan Policy) : লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে রাশিয়া আফগানিস্তানের দিকে রাজ্যবিস্তার করিতে থাকে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া 'খিবা' নামক স্থানটি অধিকার করে। ফলে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। ঐ বৎসর আমীর শের আলি ইংরাজদের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য সিমলায় দূত প্রেরণ করেন। লর্ড নর্থব্রুক্ শের আলিকে সাহায্য দানের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডস্থ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই নীতি সমর্থন করিলেন না। কারণ তাঁহারা নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া মনে করিলেন না। ব্রিটিশ মৈত্রীর আশায় বঞ্চিত হইয়া শের আলি রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে চাহিলেন।

শের আলির দূত প্রেরণ

শের আলির রুশ-মৈত্রীর চেষ্টা

লর্ড লিটন্, ১৮৭৬-'৮০ (Lord Lytton, 1876-'80) : লর্ড নর্থব্রুকের পরবর্তী গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্রয় লর্ড লিটন ছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজ্‌রেলীর মনোনীত ব্যক্তি। লর্ড লিটন একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। 'আওয়েন মেরিডিথ্' (Owen Meredith) ছদ্মনামে তিনি সাহিত্য রচনা করিতেন। শাসনকার্যে তাঁহার কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু তিনি শাসনকার্যে দক্ষতার পরিচয়ই দিয়াছিলেন।

সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি

লর্ড লিটন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজ্‌রেলীর নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতবর্ষের মহারাণী বলিয়া ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয় হইবে। ডিজ্‌রেলী লর্ড লিটনের এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 'কাইজার-ই-হিন্দ্' উপাধিতে ভূষিত করিবার উদ্দেশ্যে Royal Title Act পাস করিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাসমারোহে

মহারাণীকে "ভারত-সম্রাজ্ঞী" উপাধি দান

দিল্লীতে এক দরবারের অনুষ্ঠান হইল এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতবর্ষেরও সম্রাজ্ঞী (Kaiser-i-Hind) বলিয়া ঘোষণা করা হইল (১৮৭৭, ১লা জানুয়ারি)। এই উপলক্ষে জেলখানার কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল।

সেই বৎসরই মহীশূর, দাক্ষিণাত্য, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ক্রমে মধ্য-ভারত ও পাঞ্জাবে উহা ছড়াইয়া পড়িল। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেই ব্যবসায়িগণের হাত হইতে খাদ্যশস্য আমদানি ও বণ্টনের ভার সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। কিন্তু খাদ্যশস্য আমদানি ও বণ্টনের দায়িত্ব-পালনে মাদ্রাজ সরকারের অক্ষমতাহেতু বহুসংখ্যক লোক প্রাণে মারা গেল। লর্ড লিটন এই অব্যবস্থা দূর করিলেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই এক বিশাল সংখ্যক লোক দুর্ভিক্ষের প্রকোপে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। যাহা হউক, লর্ড লিটন একটি দুর্ভিক্ষ কমিশন নিযুক্ত করিয়া ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের সাহায্যের জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতি যাহাতে প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার অনুসরণ করিয়া চলিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করিলেন। উহার উপর নির্ভর করিয়া পরবর্তী কালের Famine Code রচিত হইয়াছিল।

দুর্ভিক্ষ (১৮৭৬-'৭৮)

দুর্ভিক্ষ-নীতির প্রবর্তন

অর্থনীতি সম্পর্কেও লর্ড লিটনের গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি তুলার উপর শুল্ক ও সমুদ্রবাহী দ্রব্যের উপর শুল্ক গ্রহণের নীতির কতক পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। লবণের উপর শুল্ক পূর্বে এক-এক স্থানে এক-এক হিসাবে গ্রহণ করা হইত। লিটন লবণ করের হার সর্বত্র প্রায় সমান করিয়া দিয়াছিলেন।

শুল্ক নীতি

লর্ড লিটনের শাসনকালে ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া তুরস্ককে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্যানস্টিফানোর সন্ধি দ্বারা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের সন্ধির শর্তগুলি ভঙ্গ করিয়াছিল। এই সূত্রে ইঙ্গ-রুশ যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত বার্লিন কংগ্রেসের বৈঠকে স্যানস্টিফানোর সন্ধির পরিবর্তন সাধন করিয়া রাশিয়ার তুরস্ক-গ্রাস নীতি প্রতিহত করা হইয়াছিল। সেই সময়ে দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলিতে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইলে লিটন দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রের উপর কতকগুলি বাধা-নিষেধ আরোপ করিবার উদ্দেশ্যে Vernacular Press Act পাস করিলেন। সরকারের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন মন্তব্য বা তথ্য দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে ছাপান নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়ে এই সকল পত্রিকার সমালোচনা করিবার ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইল। ইংরাজী পত্রিকাগুলি অবশ্য এই আইনের কবলে পড়িল না। এই আইনের কবলমুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকা এক রাত্রিতে ইংরাজী পত্রিকায় রূপান্তরিত হইয়াছিল।

দেশীয় সংবাদপত্র-দমন আইন - Vernacular Press Act

লর্ড লিটনের আফগান নীতি (Lord Lytton's Afghan Policy): লর্ড ব্যাকনস্‌ফিল্ড—অর্থাৎ ডিজ্‌রেলী ও লর্ড সলস্‌বেরী-প্রমুখ রক্ষণশীল দলের নেতৃবৃন্দ

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াই পূর্বেকার নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করিয়া রুশ অগ্রগতি প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে 'অগ্রসর নীতি' (Forward Policy) অবলম্বন করিলেন। লর্ড লিটনকে আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে অগ্রসর নীতি অনুসরণের বিশেষ নির্দেশ দিয়াই ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইতিপূর্বে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া কর্তৃক 'খিবা' নামক স্থানটি অধিকৃত হইয়াছিল। এই সকল কারণে রক্ষণশীল দল অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। লিটন ব্যাকন্স্ফিল্ড সলসবেরীর নির্দেশ অনুযায়ী আফগান-নীতি পরিচালনা করিতে গিয়া প্রথমেই আমীর শের আলির সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু করিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শের আলি যে-সকল শর্তে ব্রিটিশ মৈত্রী গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, লিটন সেই সকল শর্ত মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন। অবশ্য ইহার বিনিময়ে শের আলিকে আফগানিস্তানে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট্ গ্রহণ করিতে বলা হইল। এই ব্যাপারে পাকাপাকি আলাপ-আলোচনার জন্য একটি মিশন আফগানিস্তানে প্রেরণের প্রস্তাবও ঠিক হইল। কিন্তু এই মিশন রওয়ানা হইবার পূর্বেই শের আলি জানাইলেন যে, দুর্ধর্ষ আফগানজাতির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁহার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। শের আলি লিটনের প্রস্তাব এড়াইয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ লিখিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য। কিন্তু মিত্রতা স্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকিলে এইভাবে শর্তপূরণের দাবি করা লিটনের পক্ষে অদূরদর্শিতার কাজ হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন। যাহা হউক, শের আলির জবাবে লিটনের ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি শের আলির 'ঔদ্ধত্য'-দমনে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি শের আলিকে স্পষ্ট জানাইলেন যে, আফগানিস্তান রাশিয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী অঞ্চল। দুইটি লৌহস্তম্ভের মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র মাটির পাত্রের ন্যায়ই উহা অসহায় ও দুর্বল (an earthen pipkin between two iron posts)। এমতাবস্থায় আফগানিস্তান যদি ব্রিটিশ শক্তির সহিত মিত্রতা স্থাপন করে তাহা হইলে ব্রিটিশ শক্তি আফগানিস্তানকে লৌহ-বেষ্টনীর ন্যায় ঘিরিয়া রাখিবে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। আর আফগানিস্তান যদি রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করে তাহা হইলে ব্রিটিশ শক্তি আফগানিস্তানকে সামান্য খাগের (reed) মতই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে। স্বাধীনচেতা আফগানজাতি লিটনের এই ভীতি-প্রদর্শনে ক্ষুব্ধ হইল বটে, কিন্তু ভয় পাইল না। ইংরাজদের প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ইহার অব্যবহিত পরেই লিটন আফগানিস্তানের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। যুদ্ধ-প্রস্তুতির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবেই তিনি কালাত নামক রাজ্যের খাঁ (Khan)-এর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং সেই সূত্রে কোয়েটা দখল করিলেন। কোয়েটার অবস্থান সামরিক দিক দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, উহা ব্রিটিশ অধিকারে আসিবার ফলে ব্রিটিশ সামরিক দৃঢ়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

না-হস্তক্ষেপ নীতির স্থলে—অগ্রসর নীতি গৃহীত

লিটন কর্তৃক আফগানিস্তানে 'মিশন' প্রেরণের চেষ্টা ব্যাহত

লিটনের ঔদ্ধত্য—আফগানিস্তানকে যুদ্ধের ভীতি-প্রদর্শন

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ (The Second Afghan War) : কোয়েটা ব্রিটিশ অধিকৃত হওয়ার পরই (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) শের আলির সম্মতি না লইয়া জনৈক রুশ দূত কাবুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শের আলির সহিত একটি চুক্তি সম্পাদনেও সমর্থ হইলেন। ইহার ফলে ব্রিটিশ পক্ষের ভীতি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। লর্ড লিটন শের আলির নিকট ব্রিটিশ দূত প্রেরণ করিতে চাহিলে শের আলি লিটনের পূর্ব-ব্যবহার স্মরণ করিয়া সেই প্রস্তাব আগ্রহ্য করিলেন। লিটন শের আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে আর বিলম্ব করিলেন না।

কাবুলে রুশ দূতের আগমন—ব্রিটিশ দূত গ্রহণে শের আলির অপত্তি

লর্ড লিটন আফগানিস্তানের তিনটি গিরিপথ দিয়া তিনটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। এমতাবস্থায় শের আলি কাবুল ত্যাগ করিয়া রুশ তুর্কীস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। গাবদামুক-এর সন্ধি দ্বারা ইংরাজগণ শের আলির পুত্র ইয়াকুব খাঁকে আফগানিস্তানের আমীর-পদে স্থাপন করিল। এই চুক্তির শর্তানুসারে ইয়াকুব খাঁ কাবুলে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট গ্রহণ এবং আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র-নীতি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইলেন। আফগানিস্তানের গিরিপথগুলি এবং আরও কতক স্থান ব্রিটিশ কর্তৃক অধিকৃত হইল। এই সকল শর্তের বিনিময়ে ইয়াকুব খাঁ বাৎসরিক ছয় লক্ষ টাকা এবং প্রয়োজনবোধে ব্রিটিশ সৈন্য-সাহায্য পাইবেন স্থির হইল।

গাবদামুক-এর সন্ধি—ইয়াকুব খাঁকে আমীর-পদে স্থাপন

স্বাধীনচেতা আফগানজাতি ইয়াকুব খাঁ কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই অপমানজনক চুক্তি মানিয়া লইতে রাজী হইল না। তাহারা কাবুলের সর্বপ্রথম ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্যার লুই ক্যাভাগ্নারি (Sri Louis Cavagnari) ও তাঁহার অনুচরবৃন্দকে কাবুলে উপস্থিত হইবার অল্পকালের মধ্যেই হত্যা করিল। ফলে ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ পুনরায় শুরু হইল। এইবার ব্রিটিশ সৈন্য কান্দাহার দখল করিল এবং চরসিয়ার-এর যুদ্ধে আফগান বাহিনীকে পরাজিত করিয়া কাবুলে প্রবেশ করিল। ইয়াকুব খাঁ পূর্বেই ব্রিটিশ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ইংরাজগণ বন্দী করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিল। ইহার পর লিটন আফগানিস্তানকে চিরকালের মত পঙ্গু এবং ব্রিটিশ শক্তির উপর নির্ভরশীল করিবার উদ্দেশ্যে কাবুল ও কান্দাহারকে পৃথক করিয়া আফগানিস্তানকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করিতে চাহিলেন। ঠিক সেই সময়ে লর্ড লিটনকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হইল না।

প্রথম ব্রিটিশ রেসিডেন্টের হত্যা—পুনরায় যুদ্ধ শুরু

লর্ড লিটনের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৮৮০)

লর্ড লিটনের আফগান-নীতি সমসাময়িক রাজনীতিকগণ কর্তৃক কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। বিরুদ্ধ পক্ষের নেতা গ্লাডস্টোন পার্লামেন্টে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন : 'আমরা ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তানের সহিত ব্যবহারে ভুল করিয়াছিলাম। ভুল অবশ্য মানুষ মাত্রেই হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতিতে দ্বিতীয়বারও ভুল করিলাম। এই ভুলের সমর্থনে আমাদের কোন যুক্তি নাই।' লর্ড গ্ল্যাডস্টোনের

লিটনের আফগান-নীতির সমালোচনা

এই উক্তি দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের অযৌক্তিকতার অতি সুন্দর অভিব্যক্তি সন্দেহ নাই : লর্ড লিটনের আফগান-নীতিতে কোনপ্রকার দূরদর্শিতার পরিচয় ছিল না, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি এ-কথা উপলব্ধি করেন নাই যে, ভারতবর্ষের নিরাপত্তা হিরাট, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানের উপর নির্ভরশীল নহে।

লিটন মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তার করিবার অবান্তর আশা পোষণ করিতেন। ডক্টর স্মিথ্ বলেন, লর্ড লিটন কাবুলে রেসিডেন্ট্ স্থাপনের শর্তটি জোর করিয়া ইয়াকুব আলির উপর চাপাইয়া স্যর্ ক্যাভাগ্নারি-র হত্যার পথ প্রস্তুত করিলেন।

সুফল

লিটনের আফগান-নীতির কয়েকটি সুফলের উল্লেখ করাও প্রয়োজন। কোয়েটা-অধিকার বোলান্ গিরিপথের উপর ব্রিটিশের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। কালাত রাজ্যটির উপরও ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থায়িভাবে স্থাপিত হইয়াছিল।

তাঁহার বিবিধ পরিকল্পনা

লর্ড লিটনের অপরাপর কার্যকলাপ (Other activities of Lord Lytton) : লর্ড লিটন কোন কোন বিষয়ে উদ্ধত প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় কতকগুলি নীতি তিনি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল নীতির বহু কিছুই পরবর্তী কালে গৃহীত হইয়াছিল। তিনিই সর্বপ্রথম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, ভারতবর্ষে স্বর্ণমান (gold standard) প্রবর্তনের প্রস্তাব তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাব সেই সময়ে গৃহীত হইলে পরবর্তী কালে রূপার দাম কমিয়া যাওয়াতে ভারতবর্ষের যে-আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল তাহা ঘটিত না। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই আই. সি এস পদে ভারতীয়দের নিয়োগের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের ভাইসরয়কে পরামর্শদানের জন্য দেশীয় নৃপতি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া গঠিত একটি প্রিভি কাউন্সিল স্থাপনের পরামর্শও তিনি দান করিয়াছিলেন। ভারতে কর্মরত ইংরাজগণের ক্ষেত্রে বিচারে গুরু অপরাধে লঘু দণ্ড দিবার প্রচলিত নীতির তীব্র বিরোধিতা করিয়া লর্ড লিটন বিচারকার্যে নিরপেক্ষতা-প্রবর্তনে সাহায্য করিয়াছিলেন।

নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থার প্রবর্তন

মধ্য-ভিক্টোরিয়ান যুগের উদারপন্থী

লর্ড রিপন, ১৮৮০-'৮৪ (Lord Ripon, 1880-'84) : ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসে লর্ড রিপন এক অতি গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মধ্য-ভিক্টোরিয়ান (Mid-Victorian) যুগের অন্যতম উদারপন্থী ছিলেন লর্ড রিপন। রিপন ছিলেন উদারপন্থী নেতা গ্ল্যাডস্টোনের দলের লোক। শান্তি, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাতন্ত্র্যবাদে (Laissez Faire) তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এবং প্রশাসন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণায় তিনি ছিলেন লর্ড লিটনের সম্পূর্ণ বিপরীত। রিপন যখন গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন ভারতের শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের কোন স্থান ছিল না বলিলেও চলে। গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী জনমতের ইঙ্গিত অনুসারে শাসন-পরিচালনার প্রশ্নই

তখন ছিল না। ইংরাজ কর্মচারিগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরই শাসনকার্যাদি নির্ভর করিত। তাহারা যাহা ভাল মনে করিত, তাহাই করা হইত। জনসাধারণের তাহাতে মঙ্গল হইতেছে কিনা সে-বিষয়ে ভাবিবার বা জনমতের ধার ধারিবার কোন প্রয়োজন কেহ বোধ করিত না *

তদানীন্তন শাসন-নীতি

কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য দেশসমূহের শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণের দাবিও ভারতবাসীরা করিতে আরম্ভ করিল। শিক্ষিত সমাজ প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক শাসন এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি উত্থাপন করিল। লর্ড রিপন ভারতবাসীর এই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি স্বভাবতই ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্রমূলক করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। তদানীন্তন ব্রিটিশ কর্মচারিবর্গ রিপনের উদারনৈতিক সংস্কার-কার্যাদির তীব্র বিরোধিতা করায় তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, তিনি তাহাতে দমিবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার উদারপন্থী জনহিতৈষী সংস্কারাদির জন্য তিনি ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবি

ব্রিটিশ কর্মচারিবর্গের তীব্র বিরোধিতা

তাঁহার সংস্কার-কার্যাদি (His Reform measures) : লর্ড রিপনের সংস্কার-গুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় হইবে, যথা : (১) শুল্ক ও রাজস্ব, (২) শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রী-করণ, (৩) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, (৪) শিক্ষা, (৫) আশ্রিত দেশীয় রাজ্য এবং (৬) সামাজিক।

বিভিন্ন সংস্কার

(১) শুল্ক ও রাজস্ব-সংক্রান্ত সংস্কার (Reforms of Tariff and Revenue) : লর্ড রিপন যখন ভারতের গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয় হইয়া আসিলেন তখন ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। এই আর্থিক সচ্ছলতার কালই সংস্কার-কার্য সম্পাদনের উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া লর্ড রিপন লর্ড নর্থব্রুক্-প্রবর্তিত এবং লর্ড লিটন কর্তৃক অনুসৃত অবাধ বাণিজ্য-নীতির সম্পূর্ণতা সাধন করিলেন। লবণ, মদ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি দ্রব্যের উপর শুল্ক রাখিয়া অপরাপর যাবতীয় জিনিসপত্রের উপর হইতে তিনি শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। লবণের শুল্কও তিনি পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস করিলেন।

অবাধ বাণিজ্য-নীতি

* "We set aside the people altogether, we devise and say that such a thing is a good thing and to be done and we carry it out without asking them very much about it." Sir Robert Montgomery, Vide, P. B. Roberts, p. 463.

লর্ড রিপন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কতক পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বন্দোবস্ত স্থায়ী হইলেও জমির উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা উচিত হইবে। সেক্রেটারী-অব্-স্টেট্ লর্ড রিপনের এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। রিপনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি প্রধান ত্রুটি দূর হইত, সন্দেহ নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কতক পরিবর্তনের প্রস্তাব—ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান

(২) **শাসনব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Administration) :** লর্ড রিপনের সংস্কার-কার্যাদির মধ্যে স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব-পরিচালন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অন্যতম প্রধান। এই ব্যাপারে রিপন তদানীন্তন ভারতের শিক্ষিত সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার সহানুভূতির পরিচয় দান করিয়াছিলেন। স্থানীয় শাসন বা নাগরিক শাসনকার্যে তিনি ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিয়াছিলেন। লোক্যাল বোর্ড স্থাপন করিয়া তিনি গ্রাম্য-এলাকার শাসনভার, জনস্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট-নির্মাণ, শিক্ষা, মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধি নিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ কার্যের দায়িত্ব সেই সকল লোক্যাল বোর্ডের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানকে তিনি আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের দায়িত্ব দিয়াছিলেন। স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা অবশ্য লর্ড রিপনের পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয় এবং ক্রমে অপরাপর প্রেসিডেন্সীতেও প্রবর্তিত হয়। লর্ড রিপন এই ব্যবস্থার ব্যাপক প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া এবং পূর্বেকার সরকার-মনোনীত সভ্যদের স্থলে জনসাধারণের নির্বাচিত সদস্য ও নির্বাচিত মেয়র, চেয়ারম্যান প্রভৃতির উপর স্বায়ত্তশাসনভার অর্পণ করিয়া উহাকে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অবশ্য এই সকল প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন সরকারী মনোনীত সদস্য রাখিবার এবং এগুলির উপর সরকারী পরিদর্শনের ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। কোনপ্রকার অব্যবস্থা দেখা দিলে সরকার এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন, এই নীতিও প্রবর্তিত হইয়াছিল। এইভাবে তিনি পূর্বেকার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের স্থলে সরকার কর্তৃক বাহির হইতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

লোক্যাল বোর্ড

নির্বাচন দ্বারা অধিকাংশ সভ্য, মেয়র, চেয়ারম্যান প্রভৃতি নিয়োগের ব্যবস্থা

সরকারী পরিদর্শন

(৩) **সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of the Press) :** লর্ড লিটন সরকারের কার্যাদির সমালোচনা রুদ্ধ করিবার জন্য দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সমালোচনার ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। Vernacular Press Act পাস করিয়া দেশীয় পত্রিকাগুলিকে তিনি দমন করিতে চাহিয়াছিলেন। লর্ড রিপন লিটন-প্রবর্তিত Vernacular Press Act বাতিল করিয়া দিয়া দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিকেও রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সমালোচনার অধিকার দিয়াছিলেন।

দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত

(৪) **শিক্ষা (Education) :** লর্ড রিপন হাণ্টার কমিশন নামে একটি কমিশনের উপর ভারতীয়দের শিক্ষা সম্পর্কে তদন্তের ভার অর্পণ করেন। এই কমিশনকে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে যথাযথ সুপারিশ করিবার নির্দেশও দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উড্-এর ডেস্‌পাচের নির্দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে কতদূর কার্যকরী করা হইয়াছে, সেই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহই ছিল হাণ্টার কমিশন নিয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য। উচ্চশিক্ষার তুলনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা রাষ্ট্র কর্তৃক অবহেলিত হইতেছে—এইরূপ মন্তব্য করিয়া হাণ্টার কমিশন এই দুই পর্যায়ের শিক্ষা উৎসাহিত করিবার জন্য কতকগুলি নীতি নির্ধারণ করিয়াছিলেন। এই নীতি সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

হাণ্টার কমিশন

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের ব্যবস্থা

হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন এবং মিউনিসিপাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কর্তৃক প্রাথমিক স্কুলগুলির পরিচালনার সুপারিশ করা হয়। হাণ্টার কমিশন সরকারী অনুমোদনের মাধ্যমে বেসরকারী প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কলেজীয় শিক্ষার প্রশংসা করেন। সরকারকে ক্রমশ অধিক পরিমাণে অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া বেসরকারী স্কুল-কলেজের প্রসারের সাহায্য করিতে এবং সরকারী স্কুল-কলেজের আর প্রসার না করিতে উপদেশ তাঁহারা দিয়াছিলেন। হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টের ফল হিসাবে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে।

হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট

(৫) **আশ্রিত রাজ্যের প্রতি আচরণ (Treatment of the Native States) :** লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে শাসনকার্যে অব্যবস্থার অজুহাতে মহীশূর রাজ্যের শাসনভার কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। রিপন মহীশূর রাজ্যের শাসনভার সেই রাজ্যের রাজবংশের উত্তরাধিকারীর হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ব্রিটিশ শাসনে মহীশূর রাজ্যে যে-সব আইন-কানুন চালু হইয়াছিল সেগুলি গবর্ণর-জেনারেলের সম্মতি ভিন্ন পরিবর্তন করা হইবে না, এই শর্তও মহীশূর রাজ্যকে মানিয়া লইতে হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, মহীশূর রাজ্যের শাসনব্যাপারে গবর্ণর-জেনারেল সময় সময় নির্দেশ বা উপদেশ দিতে পারিবেন, এই কথাও স্বীকৃত হইয়াছিল।

মহীশূর রাজ্যের শাসনভার মহীশূর রাজবংশের হস্তে প্রত্যর্পণ

(৬) **সামাজিক সংস্কার (Social Reforms) :** লর্ড রিপন ভারতীয় জনসমাজের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং জনসাধারণের উন্নতির জন্য তিনি নানাবিধ সংস্কার কার্যকরী করিয়াছিলেন। জমিদারগণ কর্তৃক রায়তদের অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড রিপন একটি প্রজাস্বত্ব আইনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই বিলটি অবশ্য তাঁহার পরবর্তী গবর্ণর-জেনারেল কর্তৃক আইনে পরিণত হইয়াছিল।

প্রজাস্বত্ব আইনের পরিকল্পনা

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমজীবীদের সুবিধার্থে তিনি ফ্যাক্টরী আইন (Factory Act) পাস করিয়া সাত হইতে বারো বৎসরের শিশুদের মোট নয় ঘণ্টার বেশি কারখানায় খাটান নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি উপযুক্তভাবে

ঘিরিয়া রাখিবার নিয়মও এই আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। কারখানা আইনের শর্তগুলি প্রতিপালিত হইতেছে কিনা পরিদর্শনের জন্য তিনি 'ফ্যাক্টরী ইনস্পেক্টর' নামে এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কারখানা আইন

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফৌজদারী আইনবিধি অনুসারে কোন ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা জজ (Sessions Judge) ইওরোপীয়দের বিচার করিতে পারিতেন না। দশ বৎসর পরে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাপার লইয়া লর্ড রিপনকে এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। জাতিগত বৈষম্যের জন্য ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে ইওরোপীয়দের বিচার করিবার অধিকার না-দেওয়ার কোনরূপ যুক্তি ছিল না। ইতিমধ্যে ভারতীয়দের অনেকে সেসনস্ বা দায়রা জজের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ফলে, এই বৈষম্য আরও অধিকভাবে সকলের দৃষ্টিতে পতিত হইল। লর্ড রিপন এই জাতিভেদমূলক, যুক্তি-হীন অন্যান্য বৈষম্য দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। সার্ ইল্‌বার্ট (Ilbert) এজন্য একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। এই বিলে ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও সেসনস্ জজ প্রভৃতিকে ইওরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও সেসনস্ জজের সম-মর্যাদা ও সম-ক্ষমতা দানের নীতি গৃহীত হইল। কিন্তু এই সূত্রে ইওরোপীয় কর্মচারিবর্গের মধ্যে এক তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। তাহারা লর্ড রিপনকে নানাভাবে বিব্রত করিয়া তুলিল, এমন কি, তাঁহাকে এজন্য পরোক্ষভাবে অপমানিত করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। পরিস্থিতির চাপে লর্ড রিপন শেষ পর্যন্ত ইলবার্ট বিলের কতক পরিবর্তন সাধনে বাধ্য হইলেন। এই পরিবর্তনের ফলে স্থির হইল যে, কোন ভারতীয় বা ইওরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা সেসনস্ জজের আদালতে কোন ইওরোপীয় ব্যক্তি বিচারের কালে জুরি দ্বারা বিচার প্রার্থনা করিতে পারিবে এবং সেই জুরির অধিকাংশ ইওরোপীয় ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হইবে। এইভাবে সরকারী কর্মচারিবর্গের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য লর্ড রিপনের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ভারতীয়দের প্রতি লর্ড রিপনের সহানুভূতিশীল ব্যবহার একদিকে যেমন তাঁহাকে ভারতবাসীর নিকট জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল, অপর দিকে তিনি তেমনি ইউরোপীয়দের বিরাগভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

ভারতীয় ও ব্রিটিশ বিচারপতিদের মধ্যে বিচার-ক্ষমতার অযৌক্তিক বৈষম্য

ইল্‌বার্ট বিল আন্দোলন

ইল্‌বার্ট বিলের কতক পরিবর্তন

লর্ড রিপনের শাসনকালের গুরুত্ব (Importance of Lord Ripon's Administration): লর্ড রিপনের শাসনকাল গণতন্ত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লর্ড রিপন লর্ড লিটন-প্রবর্তিত Vernacular Press Act নাকচ করিয়া এবং ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে বৈধ সমালোচনার অধিকার

রাজনৈতিক শিক্ষার পথ প্রস্তুতকরণ

দান করিয়া ভারতবাসীর রাজনৈতিক শিক্ষা ও দায়িত্ববোধ-বৃদ্ধির পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দানে দায়িত্ব-বোধ বৃদ্ধিকরণ

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্যদের অধিকাংশ নির্বাচিত হইবেন এবং মেয়র, চেয়ারম্যান প্রভৃতি নির্বাচন দ্বারা নিযুক্ত হইবেন, এই সকল নীতি প্রবর্তন করিয়া লর্ড রিপন ভারতীয়গণকে অধিকতর দায়িত্বশীল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন—দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টির পন্থা

পূর্বে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। রিপন হাণ্টার কমিশন নিয়োগ করিয়া উহার সুপারিশ অনুসারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিলেন। শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা করিয়া তিনি দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টির পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শিক্ষাদান

ইলবার্ট বিলের শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইয়াছিল এবং রিপনের মূল উদ্দেশ্য তাহাতে বিফল হইয়াছিল। কিন্তু এই বিল-সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলে ভারতবাসীর মধ্যে আন্দোলনের মাধ্যমে অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের শিক্ষা বিস্তৃত হইয়াছিল। এইভাবে নানা দিক দিয়া লর্ড রিপন ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্রের শিক্ষা ও দায়িত্ববোধ ভারতবাসীর মধ্যে বিস্তার করিয়া ভারতবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন।

অধ্যায় ১৬

ভারতের জাগরণ : নব-চেতনা
(Awakening of India : New Spirit)

বাংলার নবজাগরণ (Bengal Renaissance) : সুষুপ্তির পর আসে জাগরণ, আর দীর্ঘ সুপ্তির ফলে যখন আত্মাবলুপ্তি ঘটে, তখন আসে চিরপতন কিংবা পুনর্জন্ম বা নবজাগরণ। ইওরোপের মধ্য-যুগের দীর্ঘ সুষুপ্তি যখন আত্মাবলুপ্তিতে পরিণত হইয়াছিল, তখনই ঘটিয়াছিল এক ব্যাপক নবজাগরণ বা রেনেসাঁস। আর সেই নবজাগরণের অগ্রদূত ছিল ইতালি ও ইতালিবাসী। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও অনুরূপ নবজাগরণের অগ্রদূত ছিল বাঙালী ও বাংলাদেশ।

ইওরোপের নবজাগরণ

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে সমগ্র ভারতবর্ষে এক বিরাট অনৈক্যের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা-জনিত অন্তর্মুখিতা সমগ্র ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এই বিচ্ছিন্নতা রাজনীতির গণ্ডি ছাড়াইয়া অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে ক্রমে এক আত্মবিস্মৃতিতে পরিণত হইয়াছিল। ভারত-ইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছে। সংস্কৃতির ধর্মই হইল আঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া। আবদ্ধ জলে যেমন স্রোত আসে না, জোয়ার-ভাঁটা খেলে না, সেইরূপ আবদ্ধ সংস্কৃতির অগ্রগতি থাকে না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্যই পরিলক্ষিত হয়।

মুঘল শাসনের শেষ-ভাগে ভারতীয় সংস্কৃতির গতিহীনতা

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে, বিশেষভাবে বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার ফলে ক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করিল। বাঙালী জাতি-ই হইল এই নূতন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য-সম্পদের সর্বপ্রথম সংগ্রাহক। আরব দেশের সহিত বাণিজ্যব্যপদেশে আরবীয় সভ্যতার প্রভাব যেমন ইতালিতে বিস্তার লাভ করিয়া ইওরোপীয় রেনেসাঁস সৃষ্টির পথ প্রস্তুত করিয়াছিল, সেইরূপ পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবও প্রথমে বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়া ভারতের নবজাগরণের সূত্রপাত করিয়াছিল। রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে ইওরোপে, ইতালি ও ইতালীয় জাতি যে-অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি ভারতীয় নবজাগরণে অনুরূপ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এ-বিষয়ে বাংলাদেশই ছিল ভারতের ইতালি।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নবজাগরণের সূত্রপাত

বাংলাদেশ ভারত-বর্ষের ইতালি

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম একশত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সত্ত্বেও, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, এক কথায় ভারতীয়দের মানসিক ক্ষেত্রে এমন এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল যাহার ফলে সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে এক

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নূতন চেতনা

বিরাট পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তন প্রধানত ইংরাজী শিক্ষার সূত্র ধরিয়া ঘটিয়াছিল। পাশ্চাত্যের উদার মতবাদ ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি এক নূতন দৃষ্টিপাতের এবং এক সমালোচনামূলক দৃষ্টি-ভঙ্গীর সূচনা করিয়া নূতন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়াছিল। এই নূতন চেতনা পাশ্চাত্য জগতের যুক্তিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইবার ফলে ক্রমে এক নবজাগরণে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রভাবে নূতন চেতনা নবজাগরণে রূপান্তরিত

রাজা রামমোহন রায়, ১৭৭২-১৮৩৩ (Raja Rammohan Roy, 1772-1833): ইওরোপীয় রেনেসাঁসের অগ্রদূত ইতালির সহিত বাংলাদেশের নানাদিক দিয়া সামঞ্জস্য ছিল: পেত্রার্ক বোক্‌কাচো প্রভৃতি হিউম্যানিস্টগণ যেমন ইতালীয় রেনেসাঁসের সূচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বাংলাদেশের নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন হিউম্যানিস্ট বা মানবধর্মী রাজা রামমোহন রায়। ভারতীয় কৃষ্টি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সংমিশ্রণে যে আধুনিক ভারতের আধুনিক মানুষের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহাদের অগ্রদূত ছিলেন রামমোহন। হিউম্যানিস্টসুলভ অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারসুলভ মনোবল এবং ঋষিসুলভ প্রজ্ঞা লইয়া রামমোহন এক যুগপ্রবর্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের এক অভূতপূর্ব মূর্ত প্রতীক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত— হিউম্যানিস্ট রাজা রামমোহন রায়

নবজাগরণের প্রধান শর্তই হইল চিন্তাধারার মুক্তি। গতানুগতিকতার স্থলে অনুসন্ধানী ও সমালোচক দৃষ্টি না জন্মিলে নবজাগরণের সূচনা হইতে পারে না। উহার জন্য প্রয়োজন আত্মাবলুপ্তির স্থলে আত্মচেতনার। রক্ষণশীলতা ত্যাগ করিয়া যুক্তি-তর্কের দ্বারা সকল কিছুরই মূল্য নির্ধারণ এবং বৃহত্তম স্বার্থের জন্য যাহা প্রকৃত সহায়ক উহা গ্রহণ করিবার মধ্যেই নবজাগরণের বীজ নিহিত থাকে। রামমোহন বাঙালী তথা ভারতবাসীর আত্মাবলুপ্তি দূর করিয়া তাহাদের চিন্তাধারার মুক্তি সাধন করিয়াছিলেন।

চিন্তাধারার মুক্তি

মানবসভ্যতার মাপকাঠি হইল সমন্বন-সাধনের ক্ষমতা। ইতিহাসের স্রোতে যখন বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতির প্রভাব একই স্থলে আসিয়া সমবেত হয়, তখন স্বভাবতই শুরু হয় সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের। এই সংঘর্ষের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই সভ্যতা অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। ভারত-ইতিহাসের এরূপ এক যুগসন্ধিক্ষণে যখন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা—হিন্দু, ইসলামীয় ও ইওরোপীয়—একই স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিল, তখন স্বভাবতই প্রয়োজন হইল এক বিরাট সমন্বয়ের। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যেন রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল বহুত্বের এক বিরাট সমন্বয়স্বরূপ। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সভ্যতা সংস্কৃতির পূর্ণ সমন্বয়ের প্রতীক ছিলেন রাজা রামমোহন। এই সমন্বয়ই ছিল তাঁহার মূল প্রতিভা এবং উহার মাধ্যমেই হইয়াছিল নূতন যুগের সূচনা। রামমোহন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল বারাণসীতে সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং পাটনায় আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা

হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের প্রতীক

করিয়াছিলেন। তিব্বতে গিয়া তিনি তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। ইহা ভিন্ন, ইংরাজী, হিব্রু, গ্রীক, সীরীয় প্রভৃতি ভাষায়ও তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল।

তাঁহার শিক্ষা

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের দৃষ্টান্ত ও ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব তাঁহার স্বভাবত-বিপ্লবী মনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ধর্ম ও যুক্তিবাদ (Rationalism)-এর সমন্বয় সাধন করা, রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আনয়ন করা, এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কুসংস্কারমুক্ত স্বাধীন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার সূচনা করা ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। ইংরাজ হিউম্যানিস্ট ফ্রান্সিস্ ব্যাকন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ ও নিউটন, হিউম, গিবন্, ভল্টেয়ার, টোমাসপেইন প্রভৃতি মনীষিগণের চিন্তাধারার সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। সুতরাং রামমোহনের চরিত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মনীতি, সব কিছুর এক মহাসমন্বয় ঘটিবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

রামমোহনের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব মিশ্রণ

এইভাবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া 'সকল ধর্মই মূলত একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী' এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইলেন। তিনি হিন্দুধর্মের অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান, বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস প্রভৃতির যে কোন মূল্য নাই তাহা বেদ ও উপনিষদ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা শুরু করিলেন। তিনিই সর্ব প্রথম হিন্দুধর্মকে আধুনিক রূপ দিতে সচেষ্ট হন। তিনি হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত একেশ্বরবাদে পরিণত করিবার জন্য প্রচার-কার্য শুরু করিলে তদানীন্তন বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। এই সূত্র ধরিয়া রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে এক তীব্র বিতর্কের সূচনা হইল। সংস্কারমুক্ত একদল শিক্ষিত বাঙালী রামমোহন রায়ের সহিত যোগদান করিলেন। নিজধর্মমত প্রচারের জন্য রামমোহন প্রথমে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি আলোচনা সভা স্থাপন করিয়াছিলেন (১৮১৫)। কিন্তু জীবনের শেষভাগে তিনি অধিকতর সুসংবদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন (১৮২৮)। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'ব্রাহ্ম সভা'। ইহাই পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রামমোহন রায় প্রবর্তিত ধর্মমত হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত একেশ্বরবাদের প্রচার ভিন্ন আর কিছু নহে।

উপনিষদের ভিত্তিতে একেশ্বরবাদের প্রচার —রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরোধিতা

আত্মীয় সভা—পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত

রাজা রামমোহন রায় শুধু হিন্দুধর্মকে সংস্কারমুক্ত করিবার চেষ্টাতেই নিজ কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি ছিলেন ভারতের নবযুগের অগ্রদূত। শিক্ষা, সংস্কার, রাজনীতি ও দেশপ্রেম —সকল ক্ষেত্রেই তিনি নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন।

শিক্ষা, সংস্কার, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে রামমোহনের দান

বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে রামমোহনের নাম সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির চার্টার-এ বৎসরে এক লক্ষ টাকা ভারতীয় শিক্ষার খাতে ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই নির্দেশ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে Committee of Public

Instruction নামে একটি সংস্থা সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইল। এই সংস্থাটি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিতে মনস্থ করিলে রাজা রামমোহন রায় গবর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট-এর নিকট ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা যথা, রসায়ন-বিদ্যা, শারীর-বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি প্রবর্তন করিবার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়িত হওয়া প্রয়োজন এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও সরকারী সাহায্যে সংস্কৃত কলেজ, মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থাপন করা চলিল। সংস্কৃত পুস্তকাদি মুদ্রণে সরকারী অর্থ ব্যয়িত হইতে লাগিল। কিন্তু তদানীন্তন বাংলার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য আগ্রহ লর্ড আমহার্স্টের নিকট রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সরকার —অর্থাৎ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ভারতে প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করিলেও খ্রীষ্ট ধর্মযাজক ও উদারপন্থী ভারতীয়দের চেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল-কলেজ স্থাপিত হইতেছিল। ডেভিড্ হেয়ার ও রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। পরে উহার প্রেসিডেন্সী কলেজ নামকরণ করা হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের জন্য ডেভিড্ হেয়ার ঐ বৎসরই 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করিয়াছিলেন। স্কটিশ মিশনারী ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ্ প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে সচেষ্ট হন, তখনও রাজা রামমোহন রায় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য দান করিয়াছিলেন। ডক্টর ডাফ্ কর্তৃক স্থাপিত জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইন্স্টিটিউশন বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজে রূপান্তরিত হইয়াছে। রামমোহন স্বয়ং একটি অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ও বেদান্ত কলেজ নামে একটি কলেজ স্থাপন করিয়াও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনে রামমোহনের আগ্রহ

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা —ডেভিড্ হেয়ার

ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ঃ জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ কলেজের প্রতিষ্ঠা

বাংলা গদ্যের স্রষ্টা হিসাবেও রাজা রামমোহনের দান কৃতজ্ঞতা [illegible]কারে স্মরণযোগ্য। বাংলা গদ্যের উন্নতি সাধনে রামমোহন রায়ের রচনার দান নেহাত কম ছিল না। তাঁহার প্রচারিত একেশ্বরবাদ-সংক্রান্ত বিতর্ক একদিকে যেমন কুসংস্কারমুক্ত হিন্দুধর্ম স্থাপনের পথ-নির্মাণে সচেষ্ট ছিল তেমনি অপরদিকে বাংলা গদ্যেরও উন্নতিবিধানে সাহায্য করিয়াছিল। রামমোহন রায় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে একখানি বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ব্যাকরণখানি আধুনিক কালের পণ্ডিতগণেরও প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। তিনি শ্রীরামপুরের মিশনারীদের বাংলা সাহিত্য, ভাষা প্রভৃতি প্রসারের কাজে সাহাযা করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় যতিচিহ্ন অর্থাৎ কমা, সেমিকোলন, প্রভৃতি ব্যবহারের রীতি তিনিই চালু করেন।

বাংলা গদ্যের স্রষ্টাদের অন্যতম

সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের দান চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। জাতিভেদ-প্রথা দূরীকরণ, স্ত্রীজাতির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, হিন্দুসমাজের কুসংস্কার-দূরীকরণ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রামমোহন নিজ মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন।

রামমোহনের উদারচেতা মন হিন্দ্ সমাজের অযৌক্তিক, এমন কি, নৃশংস আচার-আচারণ দূর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে এই সকল সামাজিক কুসংস্কার দূর না করিয়া সেগুলি অপরিবর্তিত রাখিবার নীতিই অনুসরণ করিতে লাগিল। এই সকল কুসংস্কারের মধ্যে সর্বাধিক নৃশংস ছিল সতীদাহ-প্রথা। মৃত স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক দাহ করিবার অমানুষিক রীতি দূর করিবার চেষ্টা বাদশাহ্ আকবরের আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহা দূর করা সম্ভব হয় নাই। ১৮১৫ হইতে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ, এই সামান্য কয় বৎসরের মধ্যে মোট আট হাজার বিধবাকে স্বামীর চিতায় দাহ করা হইয়াছিল। রামমোহন এই অমানুষিক প্রথার অযৌক্তিকতা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতি দিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিলেন। ডিরেক্টর সভাও এই অমানুষিক প্রথা বিলোপের সুপারিশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ শাসকগণ এই প্রথার উচ্ছেদ সাধনে সাহসী হন নাই। লর্ড বেণ্টিঙ্ক রামমোহন রায়ের সমর্থন লাভ করিয়া এই নির্মম প্রথার অবসান ঘটাইলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি রেগুলেশন পাস করিয়া তিনি সতীদাহ নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। এই আইনের বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুগণ ব্রিটিশ প্রিভি কাউন্সিলের নিকট প্রতিবাদ প্রেরণ করিলে রামমোহন রায় ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেন্টের নিকট সতীদাহ-প্রথা-নিবারণ আইনের পক্ষে যুক্তি দেখাইয়া আবেদন পেশ করিলেন। ফলে গোঁড়া হিন্দুদের আবেদন নাকচ হইয়া গিয়াছিল। সতীদাহ-প্রথা-নিবারণে তাঁহার সহানুভূতি ও সহযোগিতা না থাকিলে লর্ড বেণ্টিঙ্ক উহা পাস করিতে সমর্থ হইতেন কিনা সন্দেহ। হিন্দু বিধবাগণ যাহাতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইতে পারেন সেই চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু বিধাবা-বিবাহেরও পক্ষপাতী ছিলেন। নারীজাতির আদর্শ এবং সমাজে নারীজাতির পুরুষদের নিকট হইতে কিরূপ ব্যবহার পাওয়া উচিত, সে-বিষয়েও তিনি প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া হিন্দুসমাজের উন্নয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি ছিলেন ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের প্রকৃত উদ্যোক্তা।

সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে রামমোহন রায়ের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা

সতীদাহ-নিবারণের পক্ষে রামমোহনের সমর্থন

বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ-নিবারণ আইন পাশ (১৮২৯)

জাতিভেদ-প্রথা দূরীকরণ, স্ত্রীজাতির মর্যাদা-বৃদ্ধি, বিধবাদের উত্তরাধিকার, সতীদাহ-প্রথা-নিবারণ, হিন্দু বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির চেষ্টা

রাজনীতি ক্ষেত্রে রামমোহন ছিলেন ভারতের নবজাগরণের ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদের মূল কথাই ছিল স্বাধীনতা-স্পৃহা ও দেশপ্রেম। তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শ ছিল দেশের স্বাধীনতা লাভ। ইংলণ্ডে মিঃ আরনট ছিলেন রামমোহনের সেক্রেটারী। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, রামমোহন বিশ্বাস করিতেন, আরও চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়া পৃথিবীর সভ্য, স্বাধীন দেশগুলির অন্যতম হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রামমোহন আরও বেশ কিছুকাল ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনে থাকিয়া স্বাধীনতা দাবি করিবার যোগ্যতা অর্জন করুক, এই কথায় বিশ্বাস করিতেন। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে

রাজনৈতিক অভিযোগ দূরীকরণের যে-ইঙ্গিত তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন, উহা অনুসরণ করিয়াই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নীতি নির্ধারিত হইয়াছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার মতবাদ ছিল অতি আধুনিক ধরনের। তিনি প্রশাসনিক বিভাগ ও বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণ চাহিতেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রাজস্ব ও বিচার-ব্যবস্থা এবং জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক সম্প্রদায়ের দুরবস্থা প্রভৃতি অভিযোগের প্রতিকার দাবি করিয়া তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন।

ভারতে জাতীয়তাবাদের জনক

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও রামমোহন যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীন এবং বলিষ্ঠ জনমতের সৃষ্টি ও প্রকাশের দায়িত্ব সংবাদপত্রের; রামমোহন রায় সর্বপ্রথম ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেস রেগুলেশনের প্রতিবাদ করিয়া তিনি সুপ্রীম কোর্টের নিকট এক দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি বাংলাদেশের সংবাদপত্র-সেবীদের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন যথা, হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী, মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কেশবচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতিকে এই দায়িত্বপূর্ণ বৃত্তিগ্রহণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন।*

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে রাজা রামমোহন রায় যে ভারতের আধুনিক যুগের অগ্রদূত, বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সমন্বয়-প্রসূত নূতন যুগের মানুষ ছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। রামমোহন রায় ভারতের সত্য পরিচয় নিজ ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নূতন যুগের নূতন মানুষ

ভারতের নব-যুগের প্রবর্তক রাজা রামমোহন তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও সুবিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তদানীন্তন বাংলার মনীষীদের অনেককেই প্রভাবিত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজ ও ধর্মসংস্কারক এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎসস্বরূপ। স্বভাবতই তাঁহার বহুগুণ-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব এক বিরাট সংখ্যক মনীষীর মনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের প্রবর্তকদের মধ্যেও এইরূপ বহু গুণের ও বহু ক্ষমতার সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় না। রামমোহনের মধ্যে বহুত্বের একক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা তথা ভারতীয় রেনেসাঁসের জনক রাজা

ভারতের নব যুগের প্রবর্তক রামমোহনের বহুগুণ-সমন্বিত ব্যক্তিত্ব

* "The prospect of an educated India, or an India approximating to European standards, cultures, seems to have never been long absent from Rammohan's mind; and he did, however vaguely, claim in advance for his countrymen, the political rights which progress in civilization inevitably involves. Here again Rammohan stands forth as the tribune and prophet of new India." Quoted in *The Advanced History of India*, pp. 807-8, (from Rammohan's English biographer), Also vide, *The Father of Modern India:* Rammohan Roy Centenary vol. p. 313.

রামমোহন এক নবযুগের আলোকবর্তিকা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান অনুচরদের মধ্যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), রমানাথ ঠাকুর (১৮০০-১৮৭৭), প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮), ব্রজমোহন মজুমদার (১৭৮৪-১৮২১), নন্দকিশোর বসু (১৮০২-৪৫), তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০১-৪০) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ(১৭৮৫-১৮৪৪), কালীনাথ মুন্সী (১৮০৪-৪০), বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী (১৮০৬-৫৫), রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল এবং আরও অনেকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার অনুচরবৃন্দ

রামমোহনের ধর্মমতের বিরুদ্ধে যে-সকল রক্ষণশীল হিন্দু প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭), ভবানীচরণ ব্যানার্জী, রামকমল সেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সকল রক্ষণশীল নেতৃবর্গ রামমোহন রায়ের ধর্মমত সম্পর্কে প্রতিবাদ করিলেও তাঁহার সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক মতবাদ প্রভৃতির তাঁহারা সমর্থক ছিলেন। রামমোহন কৃষক-সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিল, কিন্তু রায়তদের উপর অত্যধিক মাত্রায় করভার চাপাইয়া তাহারা কৃষকদের চরম দুর্দশার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

রক্ষণশীল দলের নেতৃবৃন্দ

রাজা রামমোহন ভারতবর্ষের নানাবিধ আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করিয়া দিয়া ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতবাসীর নব-চেতনা সৃষ্টিতে এবং বিজ্ঞান, নীতিবাদ, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি মানুষকে আগাইয়া লইয়া যাইবার যাবতীয় কার্যকলাপ এবং সর্বোপরি তাঁহার মানবতা দ্বারা ভারতবাসীকে এক নূতন চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন।

উপসংহার

রাজনৈতিক আন্দোলনের আদি পর্বে রাজনৈতিক সঙ্ঘ ও সমিতি (Early Political Associations): রাজা রামমোহন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটাইয়াছিলেন, উহার ফলশ্রুতি পরবর্তী কালে ভারতীয়দের মধ্যে সংঘবদ্ধতা ও রাজনৈতিক ঐকমত্য গঠনের প্রয়াসে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন' (Academic Association) নামে এক সমিতি রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও নৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়।

বাংলা : এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ জ্ঞান আহরণ সমিতি (Society for Acquisition of General Knowledge) নামে একটি সংস্থা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জুরির সাহায্যে বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করান প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়।

সাধারণ জ্ঞান আহরণ সমিতি

ঐ বৎসরই 'জমিদার সমিতি' (Land Holder's Society) নামে এক সমিতি স্থাপিত হয়। সরকারকে রাজস্ব দিতে হয় না এরূপ জমি যাহাতে সরকার খাসদখলে লইতে না পারে, সেই চেষ্টা

জমিদার সমিতি

করাই ছিল প্রথমে এই সমিতির উদ্দেশ্য। ক্রমে জমিদারদের অধিকার রক্ষা করিবার দায়িত্বও এই সমিতি গ্রহণ করিয়াছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর জর্জ টমসন নামে এক সাহেবকে ইংলণ্ড হইতে ভারতে লইয়া আসেন। ইঁনি ইংলণ্ডে ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতায় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয়। জনসাধারণের অবস্থা, আইন-কানুনের পরিস্থিতি, দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ সম্পর্কে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করা ও প্রচার করা এবং সর্বস্তরের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধন ছিল এই সোসাইটির উদ্দেশ্য।

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি

এইভাবে ভূস্বামী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমে রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি স্থাপন করে। রাধাকান্ত দেব ছিলেন উহার প্রথম সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম সম্পাদক। ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ ও আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে অবহিত করা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইন পাস করিবার পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে অনুসন্ধান করেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন একটি স্মারকলিপি দিয়াছিল। এই স্মারকলিপিতে আইনসভার সদস্যরা ভারতীয়গণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন, এই রাজনৈতিক দাবি করা হইয়াছিল।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও এই ধরনের চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বোম্বাইয়ে 'লোকহিতবাদী' পত্রিকায় দেশমুখ ভারতবর্ষের জন্য পার্লামেণ্ট স্থাপনের দাবি উত্থাপন করেন। নৌরোজী ফারদুনজী, দাদাভাই নৌরোজী, জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, ভাউ দাজী 'বোম্বাই এ্যাসোসিয়েশন' (Bombay Association) নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ, সংস্কারমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, ভারতবাসীর দাবি-দাওয়া প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের নিকট স্মারকলিপি দেওয়া প্রভৃতি কাজ এই সমিতি শুরু করে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট ভারতীয় প্রশাসনের ত্রুটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিযোগ এবং উহার সংস্কার দাবি করিয়া এই সমিতি আবেদন পেশ করে। আইনসভার গঠনতন্ত্রের সংস্কার, ভারতীয়দিগকে প্রশাসনের উচ্চপদে নিয়োগ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি দাবিও এই স্মরাকলিপিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

বোম্বাই ঃ বোম্বাই এ্যাসোসিয়েশন

অনুরূপ মাদ্রাজে 'মাদ্রাজ নেটিভ্ এ্যাসোসিয়েশন' (The Madras Native Association) ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ঐ বৎসর চার্টার আইন পাসের পূর্বে এই সমিতি মাদ্রাজের জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ পার্লামেণ্টের দৃষ্টিগোচর করে।

মাদ্রাজ ঃ মাদ্রাজ নেটিভ্ এ্যাসোসিয়েশন

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির হাত হইতে ব্রিটিশ সরকারের হাতে ভারতের শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার পূর্বে এইভাবে ভারতীয় জনমত রাজনৈতিক দিক দিয়া সুসংবদ্ধ ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে।

সুসংবদ্ধ ও সুস্পষ্ট জনমত

নূতন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার (New Religious and Social Reforms) : ধর্মাশ্রয়ী ভারতবাসীর কোন প্রকৃত উন্নতি সাধনে ধর্ম ও নৈতিকতাকে বাদ দিলে যে কোন কালেই চলিবে না, সে-কথা রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সমসাময়িক কালের ধর্ম-নৈতিক আন্দোলনে প্রকাশলাভ করিয়াছিল। প্রাচীনযুগে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্ম বহিরাগত গ্রহণযোগ্য যে-কোন প্রভাবকে স্বীকার করিয়া লইতে পশ্চাৎপদ ছিল না। কিন্তু মুসলমান শাসনকালে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের এই উদারতা লোপ পাইয়াছিল। নব-চেতনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য যুগধর্মের সহিত তাল রাখিয়া ধর্মের ক্ষেত্রেও যুক্তিযুক্ত পরিবর্ধন ও পরিবর্তন প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা রামমোহন রায় যেমন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি করিয়াছিলেন দয়ানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস। অবশ্য ইঁহাদের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিলেও পন্থার পার্থক্য ছিল। ভারতের জাতীয় জীবনের অপরাপর স্তরে নব-চেতনার প্রাথমিক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় ধর্ম-নৈতিক সংস্কার সাধন এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইবার আগ্রহে। মিসেস্ এ্যানি ব্যাসান্ত এই কারণে বলিয়াছিলেন যে, ভারতে কোন সংস্কারকে যদি প্রকৃত সংস্কারে পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে উহাকে ধর্মাশ্রয়ী করা একান্ত প্রয়োজন। ভারতের নবজাগরণের ক্ষেত্রেও এ-কথার সত্যতা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং নবজাগরণের উন্মেষ, পূর্ণবিকাশ ও পরিণতির আলোচনায় সর্বাগ্রেই ধর্মনৈতিক চেতনার আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতে আন্দোলন মাত্রেই ধর্মাশ্রয়ী ও নৈতিকতা-ভিত্তিক

এ্যানি ব্যাসান্ত-এর উক্তি

ব্রাহ্মসমাজ : রাজা রামমোহন রায়ের বিপ্লবী মন হিন্দুধর্মের প্রসার আনুষ্ঠানিক দিকটিকে বর্জন করিয়া বেদান্ত ও উপনিষদের ভিত্তিতে উহাকে একেশ্বরবাদী ও কুসংস্কারমুক্ত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। তাঁহার 'আত্মীয় সভা'-ই পরবর্তী কালের ব্রাহ্মসমাজের পূর্বাভাস বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সার্বজনীনত্ব-ই ছিল রামমোহন রায়ের ধর্মমতের মূলকথা। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক, এ-কথা মনে করা ভুল হইবে। বস্তুত, মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি ছিলেন 'Brahmin of the Brahmins'। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মমতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের মূলগত একেশ্বরবাদেরই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মধর্ম যে-রূপ লাভ করিয়াছিল, উহা রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ধর্মমত হইতে পৃথক, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, রামমোহনের ধর্মমতের সার্বজনীনত্ব

যাহা হউক, রামমোহনের আরব্ধ কার্য পরবর্তী কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনকে ব্যাপক

করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কতিপয় ধর্মপ্রচারক নিয়োগ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, "আমরা ব্রাহ্মরা মহান হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত।

দেবেন্দ্রনাথের উক্তি

হিন্দু শাস্ত্রের মূলে সত্য উদ্ঘাটন করা আমাদের কর্তব্য। আমরা হিন্দু শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত চরম সত্যের আলোকে আমাদের সামাজিক, ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানকে পবিত্র করিয়া আমাদের সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিব। কিন্তু আমরা যেন অতি দ্রুত সেই কাজ সম্পন্ন করিতে গিয়া আমরা আমাদের মহান হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্যুত হইয়া না পড়ি।" (১৮৬৭) ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক কয়েকজন অক্ষয়কুমার দত্তের নেতৃত্বে বেদের অপৌরুষেয়তার সমালোচনা শুরু করিলেন। তাঁহারা যুক্তিবাদের সূক্ষ্ম মাপকাঠিতে সব কিছু বিচার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজ

কেশবচন্দ্র সেন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই আন্দোলনে যোগদান করিলে তাঁহার বাগ্মিতায় ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের প্রতি এক ব্যাপক ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হইল। অনেকে এই ধর্ম গ্রহণ করিয়া আন্দোলনে যোগদান করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন-ই ব্রাহ্মধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তাহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের অতিশয় প্রগতিশীল সংস্কারনীতির সহিত শেষ পর্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও তাল রাখিয়া চলা সম্ভব হইল না। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরবর্গকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কার করিলেন। কেশবচন্দ্র যীশু খ্রীষ্টের ধর্মনীতির উপর ভিত্তি করিয়া অনুশোচনা ও ভগবদ্‌প্রেম ব্রাহ্মধর্মের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি বৈষ্ণবদের সংকীর্তন-রীতি গ্রহণ করিয়া যীশুবাদ ও চৈতন্য-বাদের সংমিশ্রণ সাধন করিলেন। বৈষ্ণ ধর্মের প্রভাব হেতু ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিবাদের প্রাধান্য

যীশু ও চৈতন্যের প্রভাবের সংমিশ্রণ

ঘটিল। পরস্পর পরস্পরকে এবং বিশেষভাবে কেশব সেনকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিবার রীতিও চালু হইল। এই সূত্রে কেশব সেন পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইল। অগ্রগতিশীল দলের স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে অত্যধিক উদারতা কেশব সেনের মনঃপূত হইল না। পর্দাপ্রথা সম্পূর্ণভাবে উঠাইয়া দেওয়া, স্ত্রীজাতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া বা স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না—এই ছিল কেশব সেনের ধারণা। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশব সেন নিজ নাবালিকা কন্যাকে কুচবিহারের

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

হিন্দু মহারাজার সহিত বিবাহ দিলে প্রগতিপন্থিগণ তাঁহার নেতৃত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। ইঁহারা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে এক নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। কেশব সেন পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ 'নববিধান' নামে পরিচিত লাভ করিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শাসনতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ঘোষণা করিল যে, ব্রাহ্ম আদর্শ

* "At first Jesus was the inspirer and teacher of Keshab Sen and now came Chaitanya. The two streams combined and made a confluence which produced novel and striking results." Vide, *Advanced History of India*, p. 879.

কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে উদারতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, উহার আদর্শ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অধীনে সর্বস্তরের মানুষের স্বাধীনতা লাভ। শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্মগণ ভারতের স্বাধীনতায় তাঁহাদের বিশ্বাস, বিদেশী সরকারের অধীনে কাজ না-করা এবং শান্তিপূর্ণ-ভাবে তাঁহাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করিবার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতায় ব্রাহ্মদের বিশ্বাস

পর্দাপ্রথা, বাল্য-বিবাহ ও বহু-বিবাহপ্রথা প্রভৃতি পরিত্যাগ, এবং বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-জাতির উচ্চশিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ প্রগতিশীল সংস্কারের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দাবি উত্থাপন করিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইনের সমর্থনে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক তদানীন্তন হিন্দুসমাজের উপর প্রভাব বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত সংস্কারগুলির সব কয়টি হিন্দুসমাজে ক্রমে গৃহীত হইয়াছে। জাতিভেদ-প্রথার ক্ষেত্রেও এ-কথা বলা যায়। জাতি বিসর্জন না-দিয়াও অপর জাতির লোকের সহিত বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি যে করা যায়, এই রীতি হিন্দু সমাজেও আজ প্রায় সর্বসম্মত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল দিক দিয়া নব-যুগের সৃষ্টিতে ব্রাহ্মসমাজের দান যথেষ্ট রহিয়াছে। অবশ্য একেশ্বরবাদ-প্রচারে ব্রাহ্মসমাজ অকৃতকার্য হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের অবদান

প্রার্থনাসমাজ: ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন বাংলাদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতের অপরাপর অংশেও বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রে ইহার প্রভাব ছিল সর্বাধিক। কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মিতা ও আকর্ষণী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে 'প্রার্থনাসমাজ' নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মসমাজ হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, ইহা হিন্দুধর্মেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। নামদেব, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় ধর্মবীরদের মূল নীতি গ্রহণ করিয়া 'প্রার্থনাসমাজ' হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরীণ একটি সংগঠন হিসাবে সামাজিক সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল। অস্পৃশ্যতা-বর্জন, জাতিভেদ দূরীকরণ, অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা বিবাহ, সমাজের নিম্নস্তরের লোকের উন্নয়ন প্রভৃতি ছিল প্রার্থনাসমাজের কর্মসূচী। মাধবগোবিন্দ রাণাডে ছিলেন প্রার্থনাসমাজের প্রাণস্বরূপ। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই চেষ্টায় বিধবা-বিবাহ সমিতি (Widow Marriage Association) নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের 'এডুকেশন সোসাইটি' তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায়ও রাণাডের দান স্মরণযোগ্য। রাণাডে ভারতীয়দের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের উপর জোর দিতেন। মানুষের উন্নতির জন্য তাঁহার আংশিক উন্নয়নের চেষ্টা করা অযৌক্তিক এবং প্রকৃত উন্নতি সাধনের পথই হইল মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা। সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক বা রাজনৈতিক, যে-কোনপ্রকার উন্নতির পন্থা এবং উদ্দেশ্য হইল সমাজের লোকের উন্নতি সাধন। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি এবং মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মধ্যেই সমাজের উন্নতির বীজ নিহিত, এই সত্যই তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। রাণাডের প্রভাবেই তদানীন্তন সংস্কার-নীতি অধিকতর মানবধর্মী হইয়া উঠিয়াছিল। মাধবগোবিন্দ রাণাডে ছিলেন

'প্রার্থনাসমাজ' হিন্দু ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ

মাধবগোবিন্দ রাণাডে

বোম্বাই বিচারালয়ের একজন বিচারপতি। তাঁহার সংস্কারনীতি স্বভাবতই পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। এ-দিক দিয়া রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার কতক সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

আর্যসমাজ ঃ ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনাসমাজ ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত আন্দোলন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া আরও দুইটি ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ভারতবাসীর মনের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই দুইয়ের একটি ছিল 'আর্যসমাজ' এবং অপরটি ছিল 'রামকৃষ্ণ মিশন'। আর্যসমাজ আন্দোলনের জনক ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩)। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা তিনি মোটেই গ্রহণ করেন নাই। দয়ানন্দ রামমোহন রায়ের মতই একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি তদানীন্তন হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়া বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। জাতিভেদ-প্রথা, বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কার হইতে মুক্তি ছিল তাঁহার আর্যসমাজ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন, সমুদ্রযাত্রা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতিরও তিনি উৎসাহ দান করিতেন। দয়ানন্দ-প্রবর্তিত আর্যসমাজ-আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দিক হইল 'শুদ্ধি'। অহিন্দুগণ হিন্দুধর্ম গ্রহণেচ্ছু হইলেই তাহাদের শুদ্ধি অনুষ্ঠানের দ্বারা হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার উদার পন্থা স্বামী দয়ানন্দই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। তাঁহার সংস্কারমুক্ত ও দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ মন ভারতবাসীকে এক ধর্ম, এক জাতি ও একই সমাজে ঐক্যবদ্ধ এক গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। এই নূতন ধারা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে দয়ানন্দ 'সত্যার্থ প্রকাশ' নামে একখানি গ্রন্থে আর্যসমাজের যাবতীয় নীতির ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৈদিক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া জাতিকে আত্মবিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দয়ানন্দ তাঁহার আর্যসমাজ-আন্দোলনে আপামর সাধারণকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। রামমোহন রায় তথা মাধবগোবিন্দ রাণাডের ন্যায় সমালোচকের মনোবৃত্তি দয়ানন্দের মধ্যে হয়ত ছিল না, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় হিন্দুধর্ম এক সর্বগ্রাসী শক্তিতে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। তিনি-ই সর্বপ্রথম জনসাধারণকে তাঁহার এই আন্দোলনে যুক্ত করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় বা রাণাডের আন্দোলন কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের এক ক্ষুদ্রসংখ্যক ব্যক্তিকে দলভুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু দয়ানন্দ জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়া ভবিষ্যতে রাজনৈতিক, সামাজিক তথা যে-কোন সংস্কারের পশ্চাতে ভারতের বিশাল জনসাধারণের সমর্থন একান্ত প্রয়োজন, এই সত্যটি প্রমাণিত করিয়াছিলেন। আর্যসমাজের সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার-কার্যাদি আজিও ভারতের উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক প্রভাব হিসাবে বিদ্যমান। দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যুর পর লালা হনসরাজ, পণ্ডিত গুরুদত্ত, লালা লাজপৎ রায় ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিসঞ্চয়ে সাহায্য

আর্যসমাজ আন্দোলনের সূচনা—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

জাতিভেদ-প্রথা, বাল্য-বিবাহ দূরীকরণ, সমুদ্রযাত্রা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহের উৎসাহ দান

'শুদ্ধি' আন্দোলন

আর্যসমাজ ঃ আন্দোলনের আবেদনের সর্বজনীনতা

করিয়াছিলেন। ক্রমে আর্যসমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সমাজের অগ্রগতির সহিত পা ফেলিয়া চলিবার জন্য অপরাপর উদারপন্থী সংস্কারনীতি গ্রহণ করিয়াছে। স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় প্রকার শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সমাজ-উন্নয়ন, শুদ্ধি, সমাজসেবা প্রভৃতি কার্যাদি এখনও আর্যসমাজ করিতেছে।

হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন (Hindu Revivalism): উনবিংশ শতকের সত্তর দশকে বাংলাদেশে এবং আশি দশকে মহারাষ্ট্রে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনাসমাজের জনপ্রিয়তা হ্রাস করিতে থাকে। প্রায় চারি দশকের যুক্তিবাদী ধর্মমতের প্রাধান্য নাশ করিয়া হিন্দুধর্ম পুনরায় উহার আগ্রাসী শক্তি লইয়া জনসাধারণের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে।

ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা-সমাজের জনপ্রিয়তা হ্রাস: হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন

বাংলাদেশে এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনের নেতৃত্বে ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যতম প্রধান গোঁড়া হিন্দু শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব। তিনি রামমোহন রায়ের 'ব্রাহ্মসভার' প্রতিরোধকল্পে 'ধর্মসভা' নামে একটি হিন্দুধর্মীয় সংস্থা স্থাপন করেন (১৮৩০)। কিন্তু রাধাকান্ত দেব ও তাঁহার 'ধর্মসভা' তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই, ফলত ডিরোজিও'র ইয়ং বেঙ্গল এবং দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথের সংস্কারমূলক কার্যকলাপ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশের জনমানসে মর্যাদার আসন অধিকার করিয়া রহিল। তাঁহাদের সংস্কার আন্দোলন অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু এবং অপরাপর অনেকে সমর্থন করায় ব্রাহ্মসমাজের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতেই ক্রমশ উদারনৈতিক সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা যেন হ্রাস পাইতে লাগিল এবং সেই স্থলে রক্ষণশীলতা প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে থাকিল। এই পরিবর্তন অর্থাৎ গোঁড়া হিন্দু-ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন বাংলাদেশে সত্তর দশক এবং মহারাষ্ট্রে আশি দশকে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ, ভারতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ, বিদেশী শাসকদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারের বিরোধিতার মনোবৃত্তি, দরিদ্র গ্রামবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি, এবং স্বাধীনতা ও সমতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা এই পুনরুজ্জীবনের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিল। ভারতীয় সব কিছুর উপর আস্থা এবং ভারতীয় সবকিছু লইয়া গর্ববোধ করিবার মনোবৃত্তি প্রথম দেখা দিয়াছিল ধর্মের ক্ষেত্রে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, ভারতের নিজস্ব ইতিহাস আলোচনা, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, আইন প্রভৃতির পুনর্মূল্যায়ন ভারতবাসীর মনে যেমন আত্মশ্লাঘা জন্মাইয়াছিল এবং পৃথিবীতে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিল, তেমনি বৈদেশিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি এক গভীর বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করিয়াছিল।

রাধাকান্ত দেবের ধর্মসভা রামমোহনের ব্রাহ্মসভার প্রতিবাদী সংস্থা

ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব

হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন কারণ

নূতন ভাবধারার ফলে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা 'নব-হিন্দুধর্ম' নামে পরিচিত। এই সকল আন্দোলনকারী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, এক দল কোন প্রকার সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল না, অপর দল হিন্দুধর্মের মৌলিক পরিবর্তন সাধন না করিয়া সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল। সংস্কার-বিরোধী দলের মধ্যে প্রধান ছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কার-পন্থীদের প্রধান ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদের সহিত হিন্দুধর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দর্শন সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান, এবং কাণ্ট্, বেন্থাম, ফিক্টি, মিল স্পেন্সার, প্রভৃতির রচনা-পাঠের ফলে সূক্ষ্ম সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী, কোথ্-এর দৃষ্টবাদ (Positivism) তাঁহার আদর্শকে প্রভাবিত করিলেও তাঁহার জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত করিতে পারে নাই। তাহা করিতে পারিয়াছিল হিন্দু দর্শন ও হিন্দু ধর্ম। তিনি চাহিয়াছিলেন চিন্তার স্বাধীনতা আনিতে, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাব হইতে ভারতীয় চিন্তাধারার মুক্তিসাধন করিতে এবং জনসাধারণের নিকট তাহারা যে ভাষা বুঝিতে পারে সেই ভাষায় কথা বলিতে। ধর্ম তাঁহার কাছে নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের হাতিয়ার স্বরূপ ছিল। তাঁহার মধ্যে আমরা নৈতিকতা জাতীয়তা, স্বদেশিকতা এবং আন্তর্জাতিকতার এক সুন্দর সমন্বয় দেখিতে পাই।

নব হিন্দুধর্ম

দুই দল- সংস্কার-বিরোধী এবং সংস্কার-সমর্থক

শশধর তর্কচূড়ামণি

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমের আদর্শ

রামকৃষ্ণ মিশন ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেমন রাজা রামমোহন রায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তেমনি সেই শতাব্দীরই দ্বিতীয় ভাগে অপর এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম ও সমাজক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাবধারার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি হইলেন দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬)। রামকৃষ্ণ অতি সাধারণ পুরোহিত ছিলেন। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য শিক্ষা বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায় সেইরূপ কোন শিক্ষাই তাঁহার ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন ঐশ্বরিক শক্তির প্রতীকস্বরূপ। শিক্ষিতদের শিক্ষা দিবার ক্ষমতা তাঁহার অন্তরে জাগিয়াছিল। তাঁহার মুখনিঃসৃত চরম সত্য অপর কোন মনীষীর মুখ হইতে এতটা সহজভাবে এবং সহজ ভাষায় বাহির হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। ম্যাক্স মুলার (Max Muller) বলিয়াছিলেন: "'অশিক্ষিত' রামকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইওরোপের শিক্ষিত মনীষিগণ এখনও অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছেন।"

রামকৃষ্ণ (১৮৩৬-৮৬)

রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ পরবর্তী কালে অন্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া হিন্দুধর্মের গণ্ডি ত্যাগ করিয়াছিল। হিন্দুধর্মকে সংস্কারমুক্ত করিতে গিয়া ব্রাহ্মসমাজ এক নূতন ধর্মস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রার্থনাসমাজ ও আর্যসমাজ অবশ্য হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে থাকিয়াই উহার সংস্কারের জন্য সচেষ্ট ছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মের মূল উৎস বেদ-এর উপর নির্ভর করিয়া মানুষের আধ্যাত্মিক

উন্নতি সাধন এবং প্রজ্জ্বলিত মূর্তিপূজার মাধ্যমেও চরম অধ্যাত্মজ্ঞান লাভের পন্থা প্রদর্শন করিয়া রামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের শক্তির পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন। হিন্দু-ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর অধিকতর জোর দিয়া হিন্দুধর্মের মূলনীতি তদানীন্তন হিন্দুসমাজ বিস্মৃত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ সেই কারণে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে হিন্দুধর্মকে আবদ্ধ না রাখিয়া উহার মূল উদারতা ও ব্যাপকতা সকলের নিকট উদ্ঘাটিত করিলেন।

হিন্দুধর্মের মূলনীতি ও শক্তির পুনর্বিকাশ

রামকৃষ্ণের মানবতা

তাঁহার ধর্মমতের মূল আবেদন ছিল মানবতার আবেদন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ মানুষ হিসাবেই জন্মিয়াছিলেন। জীবনে অধিকাংশ ভারতবাসীর ন্যায়-ই পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ তাঁহার ছিল না। তাই তাঁহার ভাষা ছিল অন্তরের ভাষা। কৃত্রিমতার স্থান সেখানে ছিল না। তাঁহার কথায় মানুষ বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর অন্তরের কথা-ই যেন শুনিতে পাইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই সাদাসিধা মানুষটির অন্তরে হিন্দু, মাসলমান, খ্রীষ্টান সকল ধর্মের সমন্বয়ে, সকল ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় বিকাশ লাভ করিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-ভাষীর নিকট জলের নাম যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি একই ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইল খোদা, খ্রীষ্ট, হরি বা কৃষ্ণ – এরূপ সহজভাবে ধর্মকে প্রকাশ করিবার শক্তি আর কাহারও ছিল কিনা সন্দেহ। বাহ্যিক অনুষ্ঠান, খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতির উপর ধর্ম নির্ভরশীল, এ-কথা রামকৃষ্ণ মনে করিতেন না। আধুনিকতা এবং হিন্দুধর্মের প্রতি অবিশ্বাস যখন বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করিয়াছিল, তখন রামকৃষ্ণের বাণী হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি পুনরায় সর্বজনসম্মুখে প্রকাশিত করিল। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার বাণীকে বিশ্বের দরবারে পেঁছাইলেন। শিকাগোর সর্বধর্ম সম্মেলন (Parliament of Religions) অনুষ্ঠানে নরেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের মূল স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করিলেন। হিন্দুধর্ম নরেন্দ্রনাথের প্রচারের ফলে এক জগদ্ধর্মে পরিণত হইয়াছিল। আমেরিকাবাসীর মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রচার ইহার প্রমাণস্বরূপ। নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। রামকৃষ্ণের ধর্মমতে সমাজসেবা ও জীবের প্রতি প্রেম ছিল ধর্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। এই সূত্রে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী প্রণিধানযোগ্য।

তাঁহার উদারতা

স্বামী বিবেকানন্দ

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

পূর্বে এ-কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নৈতিকতা ও ধর্মকে ত্যাগ করিয়া কোন আন্দোলনই ভারতের বুকে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ধর্মাশ্রয়ী সংস্কৃতি। রামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরায় জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে এইভাবে বাঙালী জাতির চিন্তাধারা আত্মবিস্মৃতির পথ ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শনের দিকে ধাবিত হইল, তখন উহা এক বিশাল শক্তি হিসাবে জাতীয় জীবনের

রামকৃষ্ণের দান

প্রতি স্তরে সৃষ্টি করিল এক নবজাগরণ। বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দের অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। বাংলার শিল্পকলার, বাঙালীর সাহিত্যে—সর্বত্রই মূলে ভারতীয় মন, ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও ভারতীয় কৃষ্টির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া গেল।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) ঃ রামকৃষ্ণ পরমহংসের মানবতা তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দকে আশ্রয় করিয়া বিকশিত হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, সংসার আশ্রমে নরেন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে দর্শনশাস্ত্রে বি. এ. পাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সুতীক্ষ্ম বুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তা ডেকার্টে, স্পিনোজা, কান্ট, ফিক্টি, হেগেল, কোথ, ডারউইন, শোপেনহয়ার, হিউম, মিল প্রভৃতির রচনাপাঠে বহুগুণে সমালোচনাধর্মী ও বিশ্লেষণ-প্রবণ হইয়া উঠিল। প্রথমে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে প্রভাবিত হইয়া পড়েন, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত সাক্ষাতের পর তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহার গুরু রামকৃষ্ণের একান্ত প্রিয়, অনুগত এবং বিশ্বস্ত শিষ্যে পরিণত হইলেন। গুরুর মৃত্যুর পর বিবেকানন্দ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। পরিব্রাজক হিসাবে তিনি ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণে এবং হিমালয়ের ঘন জঙ্গলে দীর্ঘ ছয় বৎসর অতিবাহিত করিলেন। এইভাবে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণের ফলে তাঁহার অন্তরে গভীর প্রশান্তি আসিল, তিনি ভারত-আত্মার পরিচয় লাভ করিলেন। ভারতের দরিদ্র, দুঃখী এবং তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "The only God in whom I believe, the sumtotal of all souls and above all, my God the wicked, my God the afflicted my God the poor of all races."

প্রথম জীবন

ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব

রামকৃষ্ণের প্রভাবে নূতন পথ গ্রহণ

ভারত দর্শন

তাঁহার ধর্মীয় আদর্শ

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ শিকাগো শহরে পৃথিবীর ধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগদান করিতে গিয়া রামকৃষ্ণেরই বাণী "যত মত তত পথ"-এর বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন জলস্রোত যেমন সমুদ্রে গিয়া লয়প্রাপ্ত হয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম একই ভগবানের কাছে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ। তাঁহার হিন্দুধর্মের সর্বজনীনত্ব, উহার মূল ? শিষ্ট্যের বিশ্লেষণ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ, অভিভূত করিয়াছিল। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিবেকানন্দকে ধর্ম-মহাসম্মেলনে সমবেত সকল প্রতিনিধিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল। আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি "বেদান্ত সোসাইটি" নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। আমেরিকা হইতে তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইটজারল্যান্ড ও জার্মানিতে গিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

শিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগদান (১৮৯৩)

ইওরোপের বিভিন্ন দেশে গমন

রামকৃষ্ণ মিশন সংগঠন

বিবেকানন্দের অবদানের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ্য হইল আধুনিক জগতে পৃথিবীর সম্মুখে হিন্দুধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বলিষ্ঠ ভাষায় প্রচার এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ভারতবাসীর মধ্যে জাগাইয়া তোলা।

হিন্দুধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য দেশের ব্যবহার, সংস্কৃতি, ধর্ম সব কিছুর সম্মুখে ভারতবাসীর হীনমন্যতার ভাব দূর করিয়া ভারতের ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করিবার মানসিক বল অর্জনের কথা তিনি ভারতবাসীদের বলিয়া গিয়াছেন।

ভারতবাসীর মধ্যে নিজ দেশের ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রতি উচ্চ ধারণা সৃষ্টি

তৃতীয়ত, যদিও বিবেকানন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বলেন নাই, তথাপি এক সুদৃঢ়, নির্ভীক, প্রগতিশীল জাতি-গঠন ছিল তাঁহার স্বপ্ন। তিনি এক শক্তিশালী আত্মনির্ভরশীল ভারতবর্ষ গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন।

শক্তিশালী আত্ম-নির্ভরশীল ভারত গঠনের আশা

চতুর্থত, তিনি দরিদ্র, বঞ্চিত, তথাকথিত নীচ ভারতবাসীর প্রতি আন্তরিক ভালবাসা জাগাইবার এবং জাতিভেদের অযৌক্তিক বেড়াজাল দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দরিদ্রের, বঞ্চিতের, নিপীড়িতের সেবাই ঈশ্বরের সেবা বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তাঁহার অবিস্মরণীয় কথাগুলি হইল: "Do not forget the lowly, the poor, ignorant, the currier, the sweeper, are your blood, are your brethren. O ye brave one, take courage, be proud that you are an Indian and proudly proclaim—I am an Indian, every Indian's is my brother. The soul of India is my highest heaven, India's good is my good."

দরিদ্র, বঞ্চিত নীচ ভারতবাসীকে ভ্রাতৃত্বের মর্যাদায় স্থাপনের আহ্বান

পঞ্চমত, বিবেকানন্দের রাজনৈতিক আদর্শের ধারণা তাঁহার বক্তব্য হইতে জানা যায়। তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, ভগবানের আদেশ, সকলে বিশ্বাস কর, ভাগবানের আদেশ এই যে. ভারতবর্ষ জাগিয়া উঠিবেই, দরিদ্রদের জীবন আবার আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিবে, ভারতবাসী ভগবানের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করিবে। ভারতবর্ষের পুনরভ্যুত্থান তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বলা বাহুল্য।

তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শ

সার্ ভি. চিরল-এর মতে বিবেকানন্দ ছিলেন প্রথম হিন্দু যাঁহার ব্যক্তিত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি পৃথিবীতে শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিয়াছিল এবং ভারতবাসীর নবলব্ধ জাতীয়তার স্বীকৃতি আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

সার্ চিরলের মত

থিওসোফিক্যাল সোসাইটি: মার্কিন কর্ণেল ওল্কট্ (Col. Olcott) এবং ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি (Madam Blavatski) ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান 'থিওসোফিক্যাল সোসাইটি' (Theosophical Society) নামে একটি সমাজের প্রতিষ্ঠা

করেন। কয়েক বৎসর পর (১৮৭৯) তাঁহারা ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন এবং মাদ্রাজের আদিয়ার নামক স্থানে নূতন কর্মস্থল গড়িয়া তোলেন। মিসেস্ এ্যানি ব্যাসান্ত (Mrs Annie Besant) এই সমাজকে হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের এক শক্তিশালী সংঘে পরিণত করিয়াছিলেন। সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ এই সংঘ হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যেই এ্যানি ব্যাসান্ত বারাণসীতে সেন্ট্রাল হিন্দু স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে উহাকে কেন্দ্র করিয়া মদনমোহন মালব্যের চেষ্টায় বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। গোপালকৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬-১৯১৫) থিওসোফিক্যাল সোসাইটির অন্যতম স্বনামধন্য সদস্য ছিলেন।

এ্যানি ব্যাসান্ত

গোপালকৃষ্ণ গোখলে

বাংলার নবজাগরণের পরিণতি (**Flowering of the Bengal Renaissance**) **ঃ** ইওরোপের নবজাগরণের প্রকাশ যেমন রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি কোন দিকই বাদ দেয় নাই, বাংলার নবজাগরণও তদ্রূপ এই সকল বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল। বাংলায় নবজাগরণের ভাবধারা-প্রভাবিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট বা 'মানবিক' ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন-যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রভাবগুলির সংমিশ্রণে নবযুগের যে সূচনা হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ করা যায়। খাঁটি হিন্দু পণ্ডিত হিসাবে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করিলেও বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অবহেলা করেন নাই। তাঁহার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। সমাজ-সংস্কার, কুসংস্কার হইতে মুক্তি, বিধবা-বিবাহ, সমাজের লাঞ্ছিত ও নিপীড়িতদের মুক্তি-সাধন প্রভৃতি রামমোহনী প্রভাব যেমন তাঁহার চরিত্রের একদিকে জুড়িয়া রহিয়াছিল, অপর দিকে খাঁটি হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণ্যধর্ম পালন প্রভৃতিতে এবং বিশেষভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নয়নের মাধ্যমে ভরতের প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রভৃতিতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের প্রতীক

স্ত্রীশিক্ষা, বাংলা ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দান অবিস্মরণীয়। তাঁহার উদার ও সংস্কারকামী মন বাল্য-বিবাহ-নিরোধ, বিধবা-বিবাহের প্রচলন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়নের পশ্চাতে বিদ্যাসাগরের চেষ্টাই ছিল সর্বাধিক। তাঁহার ব্যক্তিগত ও জাতীয় মর্যাদাবোধ, ইংরাজদের প্রতি তাঁহার স্বাধীনতাব্যঞ্জক ব্যবহার হইতেই প্রমাণিত হয়। সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতি, দুঃস্থদের প্রতি তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য এবং সর্বোপরি তাঁহার উচ্চাদর্শের নৈতিকতাপূর্ণ ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র তাঁহাকে ভারতীয় সংস্কৃতির এক অতি সুন্দর প্রতীকস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিল।

সমাজ-সংস্কার, বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবোধ

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণের পরিস্ফুটন সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা দিল বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা রচনায়। ইওরোপের রেনেসাঁসের অন্যতম প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল দেশীয় ভাষার উন্নতিতে। বস্তুত, নবজাগরণের স্বাভাবিক ও সাবলীল প্রকাশ মাতৃভাষায়-ই সম্ভব। বাংলাদেশেও নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা দেখা গেল। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলার সাহিত্য-জগতে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিল। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়া বাংলা সাহিত্যে এক বিপ্লব আনিলেন।

বাংলা সাহিত্যের পরিস্ফুটন

মাইকেল মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩)

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' তদানীন্তন ইঙ্গ বণিকদের অত্যাচারী ও স্বার্থান্বেষী নীতির বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের শোচনীয় দুর্দশার চিত্র সর্বসমক্ষে স্থাপিত হইল। কিন্তু বাংলা ভাষাকে প্রকৃত সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী,' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হইল। প্রায় সেই সময়েই (১৮৭২) বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' নামে বাংলা সাংস্কৃতিক পত্রিকার প্রকাশন শুরু করিলেন। বাংলা সাহিত্য-জগতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নব সৃজনীশক্তি দ্বারা এক নব-চেতনা জাগাইয়া তুলিলেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ (১৮৭৫) বঙ্কিমচন্দ্রের নিজ মানবিকতা ও জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া গেল।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

তারপর আসিল তাঁহার জাতীয়তাবোধের চরম অভিব্যক্তি। 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাদেশিকতার যে-মন্ত্র ভারতবাসীকে দিয়া গিয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ এবং সকল ভারতবাসীকে উহার সম্মোহনী শক্তি এক গভীর দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ভারতীয় জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার বীজমন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

জাতীয়তাবোধের চরম অভিব্যক্তি—'বন্দে মাতরম্'

সেই যুগে কালীপ্রসন্ন সিংহ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষিগণও তাঁহাদের সাহিত্য-সেবা দ্বারা বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণের সম্পূর্ণতা আনয়নে সাহায্য করিয়াছিলেন। ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় Indian Association for the Cultivation of Scientific Research প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল।

অপরাপর মনীষিগণ

বাংলাদেশে যে নবজাগরণের সূচনা হইয়াছিল উহা ক্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে, সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট জাগরণের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই নবজাগরণের সূত্র ধরিয়া সমগ্র ভারতে এক শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বাংলাদেশ ভারতের জাগরণের অগ্রদূত

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত (১৮৮৫) জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (National Movenent upto the foundation [1885] of the Indian National Congress) : প্রত্যেক বিপ্লবের পশ্চাতেই একটি মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন থাকে। 'বিপ্লব' শব্দটিতে 'প্লব' অর্থাৎ প্লাবনের ধারণা সুস্পষ্ট। এই প্লাবন সৃষ্টি করিতে হইলে সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন হয় ভাবধারার প্লাবনের। শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতবর্ষকে কুক্ষিগত করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধি সাধনে ব্যস্ত, সেই সময়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভারতবর্ষের ভাবজগতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিতেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষের অন্তস্তলে এক জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতেছিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফল

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইওরোপীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি, ইওরোপীয় জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের জ্ঞান বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। এ-বিষয়ে বাংলা ও মাদ্রাজে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অবদান উল্লেখ্য। খ্রীষ্টান মিশনারী যাঁহাদের চেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের সূচনা ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে উইলিয়াম কেরীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ডেভিড হেয়ার ও ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে রামমোহন কেরীর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে গভীর রেখাপাত করিল। ক্রমে এই দুইটি ধারা ভারতীয়দের জাতীয় আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইওরোপে ও আমেরিকায় গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের যে বিশাল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট সেই ইতিহাস অবিদিত ছিল না। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ প্রভৃতি গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কেবলমাত্র ইওরোপ ও আমেরিকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল, মনে করা ভুল হইবে। সেগুলির তরঙ্গাঘাত শিক্ষিত ভারতবাসীকেও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। উদারপন্থী ব্রিটিশ রাজনীতিকদের প্রচারিত আদর্শ এবং ভারতীয়দের উদার ও জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের সহানুভূতি স্বভাবতই এই সকল ভাবধারার বিস্তৃতিতে সাহায্য করিয়াছিল। মিল, বেন্থাম্ প্রভৃতি মনীষীদের রচনা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নূতন চেতনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা এবং প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে ভারতবর্ষের সব কিছুই অবহেলার যোগ্য এই ধারণা দূরীভূত হইয়াছিল। 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' (Asiatic Society of Bengal)-এর দান এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। স্যার্ উইলিয়াম জোনস্ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার 'শকুন্তলা' কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার ইওরোপীয়দের নিকট উন্মুক্ত করিয়াছিল। ম্যাক্স মুলার ও উইলিয়াম জোনস্-এর নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি ব্রিটিশ শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ ভারতে একই প্রকার আইন-কানুন প্রভৃতি প্রচলিত হওয়ায় সর্বত্র একই প্রকার সুযোগ-সুবিধা ও অভাব-

পাশ্চাত্য জগতের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব

পাশ্চাত্য মনীষীদের রচনার প্রভাব—গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ

অভিযোগের সৃষ্টি হইল। ইহার ফলেও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিবার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

উদারপন্থী ব্রিটিশের সহানুভূতি

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় উদার-নীতি অনুসরণের নির্দেশ এবং সদিচ্ছার প্রকাশও পরিলক্ষিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের ইম্পীচমেণ্ট্ কালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এড্মাণ্ড বার্ক প্রমুখ নেতৃবর্গের উক্তি হইতে ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় উদারতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পাইয়াছিল।

১৮১৩ এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার এ্যাক্ট্-এ ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর জনকল্যাণকর করিয়া তুলিবার নির্দেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় (১৮৫৮) ভারতবাসীকে ব্রিটিশ প্রজাবর্গের সম-পর্যায়ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল।* কিন্তু ভারতবাসীদের নিকট ক্রমেই এ-কথা পরিষ্কার হইল যে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট্-এ এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় ভারতীয়দের অধিকার স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও, বিশেষভাবে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার

ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক ব্যবহার

ঘোষণা এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিস এ্যাক্ট্ (১৮৬১)-এ ভারতবাসীদের আই. সি. এস. পদে নিযুক্ত করিবার নীতি স্বীকৃত হইলেও ব্রিটিশ সরকার এই সকল নীতি মানিয়া চলিতে ইচ্ছুক নহেন। ভারবাসীকে মুখে বড় বড় আশার কথা শুনাইয়া কার্যত সেই সকল বিষয় এড়াইয়া যাইবার মনোবৃত্তি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল, বলা বাহুল্য। ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ শাসনব্যবস্থার ভারতীয়-করণের প্রথম এবং অপরিহার্য পদক্ষেপ বিবেচনা করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক সংখ্যায় আই. সি. এস. পদে নিযুক্ত হইবার চেষ্টা চলিল। অপর পক্ষে ব্রিটিশ সরকার এক অন্যায্য এবং বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে আই. সি. এস. পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে আই. সি. এস. পদে নিযুক্ত না করিবার চেষ্টা চলিলে একমাত্র ব্রিটিশ বিচারালয়ের নিকট আবেদন করিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার করা সম্ভব হইয়াছিল। অবশ্য আই. সি. এস পদে নিযুক্ত হইলেও অল্পকালের মধ্যেই সুরেন্দ্রনাথ

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

সামান্য কারণে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু চেষ্টায়ও তাঁহার প্রতি এই অন্যায় আচরণের কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবার ফলে-ই সুরেন্দ্রনাথ দেশমাতৃকার সেবার সুবিশাল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই চেষ্টায় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (Indian Association) স্থাপিত হইল। সমগ্র ভারতকে একই জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।

---

* "We hold ourselves to the native of our Indian territories by the same obligations of duty which bind us to all our other subjects." Queen's Proclamations, 1858.

পর বৎসর (১৮৭৭) ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আদেশে আই. সি. এস. পরীক্ষার্থীদের বয়স উনিশ বৎসরের অনধিক হইতে হইবে, এ-কথা ঘোষণা করা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে এক গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। কলিকাতায় এই আদেশের প্রতিবাদে সভা-সমিতি আহূত হইল। সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষে এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লাহোর, অমৃতসর, আগ্রা, মিরাট, এলাহাবাদ, দিল্লী, আলিগড়, লক্ষ্মৌ, কানপুর, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে বিরাট বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দান করিলেন। আপাতদৃষ্টিতে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল, আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রতিযোগীদের বয়সের সীমাবৃদ্ধি, অবাধ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে আই. সি এস. পদে লোকনিয়োগ, একই সময়ে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে পরীক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি দাবি ব্রিটিশ সরকার হইতে আদায় করা। কিন্তু ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে এক রাজনৈতিক তথা ভারতীয় জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি করা। সুরেন্দ্রনাথের সর্বভারত পরিভ্রমণ ও সর্বত্র বক্তৃতাদানে পূর্ববঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত সকল স্থানে এক প্রবল চেতনার সৃষ্টি হইল। সমগ্র ভারতে বিশাল জনসমাজ, জাতি-ধর্ম-আচার-আচরণ-নির্বিশেষে একই আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিবার মধ্যে ভবিষ্যতে রাজনীতি ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ঐক্যের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই আন্দোলনের এখানেই অবসান হইল না। উপরি-উক্ত দাবি-সংবলিত এক স্মারকলিপি ব্রিটিশ কমন্স সভায় পেশ করিবার উদ্দেশ্যে লালমোহন ঘোষ নামে এক বিখ্যাত বাঙালী ব্যারিস্টারকে প্রেরণ করা হইল। জন ব্রাইট্ (John Bright)-এর সভাপতিত্বে লণ্ডনে এক বিরাট সভায় লালমোহন ঘোষের অনন্যসাধারণ বাগ্মিতা ইংলণ্ডে এক দারুণ প্রভাব বিস্তার করিল। তাঁহার বক্তৃতার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আই. সি. এস নিয়োগ-সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনের পরিবর্তনের প্রস্তাব কমন্স সভায় উত্থাপিত হইল।

আই. সি. এস. পরীক্ষা-সংক্রান্ত আন্দোলন

জাতীয়তাবোধের বৃদ্ধি

লালমোহন ঘোষের সাফল্য

আই. সি. এস. নিয়োগ-সংক্রান্ত আন্দোলনের সাফল্যে ভারতবাসীর মধ্যে এক ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল। লর্ড লিটনের Arms Act ও Vernacular Press Act-এর বিরুদ্ধেও অনুরূপ প্রতিবাদ জানাইতে ভারতবাসী বিলম্ব করিল না। সেক্রেটারী অব্ স্টেট্ লর্ড সলসবেরীর প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার পরোক্ষ ফল হিসাবে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ভারতীয়দের স্বার্থ-বিরোধী আইন-কানুন-এর প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া মূলত ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হইলেও ক্রমেই উহার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রসার ঘটিল। শাসন-ব্যবস্থায় চাকরি গ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াই ভারতবাসী আর সন্তুষ্ট রহিল না। ক্রমে স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাহারা আন্দোলন শুরু করিল। ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ যখন এক শক্তিশালী প্রভাব হিসাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে ইলবার্ট বিল লইয়া এক প্রবল আন্দোলনের সুযোগ উপস্থিত হইল। তদানীন্তন আইন-সচিব

লর্ড সলসবেরীর প্রতিক্রিয়াশীলতার ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি

(Law Member) মিঃ ইলবার্ট (Ilbert) ইওরোপীয় ও ভারতীয় বিচারপতিদের বিচার-ক্ষমতার সমতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি বিল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা ইতিহাসে 'ইলবার্ট বিল' নামে খ্যাত। ইতিপূর্বে কেবলমাত্র ইংরাজ বিচারপতিগণই ইওরোপীয়দের বিচার করিতে পারিতেন। 'ইলবার্ট বিলে' এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসান করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এইসূত্রে ইংরাজগণ নিজের অধিকার রক্ষার্থে এই বিলের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন শুরু করিলে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিলের সমর্থনে এক আন্দোলন শুরু হইল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ইলবার্ট বিলের পরিবর্তন করিয়া ভারতীয় বিচারকের বিচারালয়ে ইওরোপীয় প্রজাবর্গের জুরি দ্বারা বিচার দাবি করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই জুরির অর্ধাংশ ইওরোপীয়দের লইয়া গঠিত হইবে এই নীতিও স্বীকৃতি পাইয়াছিল। এই বিল-সংক্রান্ত আন্দোলন ইওরোপীয় ও ভারতীয় প্রজাবর্গের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটাইতে পারিল না বটে, কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে ভারতীয়দের জাতীয় ঐক্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

ইলবার্ট বিল-সংক্রান্ত আন্দোলন—জাতীয়তাবাদের গভীরতা বৃদ্ধি

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (Founding of the Indian National Congress) : ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিক হইতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষভাবে বাংলাদেশ, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজে যে-সকল রাজনৈতিক সঙ্ঘ-সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার এবং সকল অংশের ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করিবার পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার যেভাবে ভারতবাসীদের সমর্থন ও সহানুভূতি হারাইয়াছিলেন, ব্রিটিশ রাজত্বের অপর কোন সময়ে এইরূপ হয় নাই। যখন ব্রিটিশ সরকার এবং ব্রিটিশ কর্মচারীরা জনসাধারণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন, সেই সময়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে তেমনি দেশবাসী ও দেশের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ববোধও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে এই দুই বিপরীতমুখী ধারা—একটি গণ্ডিবদ্ধ, আত্মকেন্দ্রিক, অপরটি দেশবাসী ও দেশসেবার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ—ব্রিটিশ সরকার ও ভারতবাসীর পারস্পরিক সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দিয়াছিল। শিক্ষিত ভারতবাসী প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের দাবি উত্থাপন করিলেন। উদারপন্থী ইংরাজগণও ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থন করিতে ত্রুটি করিল না।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে বিভিন্ন সঙ্ঘ, সমিতি কর্তৃক রাজনৈতিক সংগঠন ও ঐক্যের পথ প্রস্তুতকরণ

ভারতবাসী ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা

এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের সেক্রেটারী-পদে কাজ করিতেন। লর্ড লিটন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্বাধীন মতবাদের জন্য তাঁহাকে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করেন। হিউম আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতবাসীর স্বার্থের সহিত ব্রিটিশ স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে, কিংবা দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইতে ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষা

এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের স্বাধীন মতবাদের জন্য পদচ্যুতি

করিতে, তাহাদিগকে হতাশামুক্ত করিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। সর্বোপরি সরকার ভারতীয় প্রজাবর্গ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় জনসাধারণের মতামত, অর্থাৎ জনমত জানিবার কোন ব্যবস্থা নাই। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুককে লিখিত এক প্রতিবেদনে হিউম সাহেব দ্বিধাহীনভাবে জানাইয়াছিলেন যে, ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তি এক অতি সূক্ষ্ম তন্তুর বন্ধনে আবদ্ধ, যে মেঘ এখন দৃষ্টির প্রায় অগোচর যে-কোন সময় উহা সমগ্র দেশের উপর বিস্তৃত হইয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে যে, সমগ্র দেশে এক সর্বনাশাত্মক অরাজকতা দেখা দিতে পারে। এই সম্ভাব্য দুর্দিন হইতে রক্ষার পন্থা হিসাবে হিউম তিনটি কর্তব্য সম্পাদন প্রয়োজন মনে করিতেনঃ (১) ভারতবাসীদিগকে এক জাতীয় সংগঠনে সংগঠিত হইতে হইবে, (২) এই জাতীয় ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ ভারতবাসীই আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধনে সমর্থ হইবে, (৩) ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে সংঘবদ্ধতা বৃদ্ধির জন্য ভারতবাসীর প্রতি অন্যায়মূলক এবং ভারতীয়দের ক্ষতিকারক সব কিছুর পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হিউম ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনার পর ইহা স্থির করিলেন যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রবর্তিত এবং ব্রিটিশ মহারাণী কর্তৃক অনুমোদিত ভারত সরকারের অনুসরণীয় নীতির যিনিই বিরোধিতা করিবেন, তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে হইবে। সেই সময়কার পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে উইলফ্রিড্ ব্লাণ্ট্ বলিয়াছিলেন "আজ ভারতবাসীরা সংস্কার দাবি করিতেছে, আমরা যেন তাহাদের দাবি অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে বিপ্লবের পথে ঠেলিয়া না দেই।" (১৮৮৪)।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার ধারণা

এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউমের পরিকল্পনা

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্ধারিত নীতি

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ হিউম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের উদ্দেশ্য করিয়া এক খোলা চিঠিতে ভারতীয়দের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী সংস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাইলেন। লর্ড ডাফ্‌রিণের সহিত হিউমের আলোচনায় ডাফ্‌রিণ স্পষ্টভাষায়ই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ রাণীর, অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী পক্ষ ভারতবর্ষেও গঠন করা তাঁহার অভিপ্রেত। সুতরাং হিউম প্রকল্পিত সংস্থার রাজনৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য থাকাও বাঞ্ছনীয়।

হিউমের খোলা চিঠি

ডাফ্‌রিণের অভিমত

এখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম, লর্ড ডাফ্‌রিণ উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা (Safety valve) হিসাবেই গড়িয়া তোলা। ইহার মাধ্যমে ভারতীয়দের পুঞ্জীভূত অভাব-অভিযোগ যাহাতে একটি নির্গমনের পথ পায় সেই ব্যবস্থা করা।

মূল উদ্দেশ্য

এ-দিকে ইলবার্ট বিল লইয়া যে আন্দোলন শুরু হইয়াছিল (১৮৮৩) উহার সূত্রে সুরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতি সম্পর্কে তাঁহার "বেঙ্গলী" পত্রিকায় কিছু মন্তব্য করেন। এজন্য আদালত অবমাননার দায়ে তাঁহার দুই মাস কারাদণ্ড হয়। সেই সময়ে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে মামলা-মকদ্দমার সময় ভাল আইনজীবী দ্বারা সাহায্য দিবার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় তহবিল গঠন করিবার প্রশ্ন উঠে। সুরেন্দ্রনাথ জেল হইতে ছাড়া পাইবার পর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮-৩০ ডিসেম্বর কলিকাতা ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স নামে এক সম্মেলন আহূত হয়। প্রায় এক শত জন নেতা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে এই সম্মেলনে যোগদান করেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যয় সংকুলানের জন্য একটি জাতীয় তহবিল (National Fund) খোলা হইল। রামতনু লাহিড়ী প্রথম দিনের অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫-২৭ ডিসেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথের দুই মাস কারাদণ্ড—জাতীয় তহবিলের প্রশ্ন

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স (১৮৮৩)

'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স' (১৮৮৩) ও জাতীয় তহবিল

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও আদর্শ (Aims and Objectives of the Congress) : সাধারণত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু কংগ্রেসের প্রথম দিকের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখিয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ভারতীয়দের দাবি আদায় করা ছিল কংগ্রেসের নীতি। বিংশ শতকের গোড়ার দিক হইতে কংগ্রেসের এই বিনম্র নীতির প্রতি কংগ্রেসেরই একাংশের মধ্যে যে সমর্থনের অভাব দেখা দিল, তাহা ক্রমে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী আন্দোলনে রূপ লাভ করিয়াছিল।

কংগ্রেসের প্রথম দিকের ইতিহাস ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা ও আবেদন-নিবেদনের ইতিহাস

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে আদর্শ ছিল শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আদায়, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক কাউন্সিল—অর্থাৎ আইনসভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বাচিত সদস্যদের অনুপাত বৃদ্ধি এবং দায়িত্বশীল সরকার (responsible government) স্থাপন করা। এই সকল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ ভিন্ন, অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের কর্মসংস্থান, কৃষকদের খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্টকরণ, অরণ্য সংক্রান্ত আইন, লবন আইন প্রভৃতির পরিবর্তন করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের যাহাতে সুবিধা হয় সেই ব্যবস্থা করা, শিক্ষার উন্নতি সাধন, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিচার ও প্রশাসন বিভাগকে পৃথকীকরণ, প্রভৃতি।

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও আদর্শ

বলা বাহুল্য, ক্রমে কংগ্রেস ভারতের নব-চেতনার প্রতীক এবং মুখপাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামের হাতিয়ারে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার

মিঃ হিউমের এবং তদানীন্তন ভারতের শিক্ষিত এবং গণ্যমান্য সম্প্রদায়ের চেষ্টায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন বসে। বাঙালী ব্যারিস্টার মিঃ ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী (Mr W. C. Bonerjee) এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিলেন। ঠিক সেই সময়ে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল। ন্যাশনাল কংগ্রেস ও ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের আদর্শ ও পন্থা একই ছিল। সুতরাং এই দুইটি প্রতিষ্ঠান পৃথকভাবে থাকিবার কোন সার্থকতা নাই, এই কথা উপলব্ধি করিয়া ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে অদ্যাবধি জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বোম্বাই শহরে প্রথম অধিবেশন (১৮৮৫)—সভাপতি ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী

অধ্যায় ১৭

জাগ্রত ভারত

(Resurgent India)

লর্ড ডাফ্‌রিন, ১৮৮৪-'৮৮ (Lord Dufferin, 1884-'88) : লর্ড রিপনের পর লর্ড ডাফ্‌রিন ভাইস্‌রয় ও গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। ইলবার্ট বিল-সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলে ভারতবাসীর মনে যখন দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সময়ে প্রয়োজন ছিল একজন বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসকের। লর্ড ডাফ্‌রিনের ভাইস্‌রয় ও গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিয়োগ এই প্রয়োজন মিটাইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। দীর্ঘকাল ভারতের আণ্ডার-সেক্রেটারী অব্ স্টেট্ (Under Secretary of state for India), কানাডার গবর্ণর, রাশিয়া ও তুরস্কে ব্রিটিশ দূত এবং মিশরের কমিশনার হিসাবে বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লর্ড ডাফ্‌রিন সমসাময়িক কালের অন্যতম প্রধান কূটনীতিক ও বাগ্মী হিসাবেও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণী শক্তি ছিল অসাধারণ।

লর্ড ডাফ্‌রিনের পূর্ব অভিজ্ঞতা—বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক

ইলবার্ট বিল-সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলে যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছিল, লর্ড ডাফ্‌রিনের বিচক্ষণতায় উহার উপশম ঘটিল। জাতি বা সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বা সুযোগ-সুবিধা দানের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। ইহা ভিন্ন, ভারতীয় জনমত-গঠনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই কারণে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সমর্থন ছিল। ডাফ্‌রিন সিন্ধিয়াকে গোয়ালিওর ক্ষতিপূরণ সহ ফিরাইয়া দিয়া দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি তাঁহার উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন পাস করিয়া জমিদারগণ কর্তৃক ন্যায্যভাবে রায়তদের খাজনা-বৃদ্ধি এবং অন্যায়ভাবে তাহাদের উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করিলেন। ইহার দুই বৎসর পর (১৮৮৭) তিনি পাঞ্জাবের রায়তগণকেও অনুরূপ সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে একটি আইন প্রণয়ন করিলেন। অযোধ্যায় প্রজাবর্গকে সাত বৎসরের জন্য তিনি জমি বন্দোবস্ত দিলেন এবং সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে পর যদি কোন কারণে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা হয় তাহা হইলে জমি উন্নয়নের জন্য তাহারা যে খরচ করিয়াছে সেই অর্থ পাইবে, এই শর্তও গৃহীত হয়।

ইলবার্ট বিল-সংক্রান্ত আন্দোলনের উপশম—জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

সিন্ধিয়াকে গোয়ালিওর প্রত্যর্পণ

বাংলা (১৮৮৫) ও পাঞ্জাবের (১৮৮৭) প্রজাস্বত্ব আইন : অযোধ্যার রায়তদের প্রতি বিশেষ ব্যবস্থা

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy) : লর্ড ডাফ্‌রিনের কার্যকালে ভারতের পররাষ্ট্র-সমস্যা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং পূর্ব সীমান্ত এক জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল। শাসনভার গ্রহণ করিয়াই লর্ড ডাফ্‌রিন এই দুই সমস্যার সম্মুখীন হইলেন।

উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব সীমান্ত সমস্যা

আফগান নীতি (Afghan Policy) : ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের রুশ-ভীতি পুনরায় দেখা দিল। ঐ বৎসর আফগানিস্তানের সীমা হইতে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত মারভ্ নামক শহরটি রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত হইলে ইংলণ্ড এবং ভারত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে রুশ-ভীতি দারুণভাবে বৃদ্ধি পাইল। যাহা হউক, রুশ সরকার ব্রিটিশ সরকারের রুশ-ভীতির উপশমার্থে এক ইঙ্গ-রুশ কমিশনের সাহায্যে রুশ-আফগান সীমারেখা নির্ধারণের প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। লর্ড রিপনের কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই এই প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছিল এবং তিনি উহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। লর্ড ডাফ্‌রিন ব্রিটিশ পক্ষের কমিশনার প্রেরণ করিলেন, কিন্তু রুশ কমিশনারগণের আসিয়া পেঁছিতে বিলম্ব হইল। অবশ্য কিছুকাল পরে রুশ কমিশনারগণও উপস্থিত হইলেন। কমিশন যখন সীমানির্ধারণ-সংক্রান্ত আলোচনায় রত সেই সুযোগে রাশিয়া পাঞ্জডে (Panjdeh) নামক স্থানটি দখল করিয়া লইলে সীমান্ত সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিল। এই ব্যাপার লইয়া ইঙ্গ-রুশ যুদ্ধ বাধিবার প্রায় উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু পাঞ্জডে গ্রামের অধিকার লইয়া আফগান আমীর কোন যুদ্ধ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন না। এই কারণেই যুদ্ধ বাধে নাই। বস্তুত, পাঞ্জডে গ্রামটির উপর কাহার আইনসম্মত অধিকার ছিল, এ-কথা কেহ জানিত না। জুলফিকার গিরিপথটি সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করিতে পারিলে আব্দুর রহমান পাঞ্জডে রাশিয়াকে ছাড়িয়া দিতে মোটেই অনিচ্ছুক ছিলেন না। সুতরাং এই শর্তের ভিত্তিতেই দুই পক্ষের আলাপ-আলোচনা চলিল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে উভয় পক্ষের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহা দ্বারা আফগান আমীর আব্দুর রহমান জুলফিকার গিরিপথটি পাইলেন এবং রাশিয়া পাঞ্জডে গ্রামটি নিজ অধিকারে রাখিল। এইভাবে রুশ-আফগান সমস্যার পরোক্ষ ফল হিসাবে ইঙ্গ-রুশ গোলযোগের যে উপক্রম হইয়াছিল তাহা দূর হইল। এশিয়ার দুইটি বৃহৎ এবং বর্ধিষ্ণু সাম্রাজ্যের– রাশিয়া ও ব্রি[illegible]র—মধ্যে ভবিষ্যতে যোগাযোগের পথ এইভাবে রুদ্ধ হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ইঙ্গ-আফগান মৈত্রীও দৃঢ়তর হইল। রাওলপিণ্ডিতে আমীর আব্দুর রহমান ও লর্ড ডাফ্‌রিনের মধ্যে সাক্ষাৎকারের ফলেও ইঙ্গ-আফগান সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

রাশিয়া কর্তৃক মারভ্ অধিকার—ব্রিটিশের ভীতি

সীমা নির্ধারণের জন্য ইঙ্গ-রুশ কমিশন

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি ইঙ্গ-রুশ-আফগান সমস্যার সমাধান

তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ ১৮৮৬ (Third Burmese War, 1886) : লর্ড ডাফ্‌রিনের আমলে ইঙ্গ-আফগান নীতি রুশ-ভীতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, একথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। পূর্ব সীমান্তে ব্রহ্মদেশের প্রতি এই সময়কার ব্রিটিশ নীতি ছিল ফরাসী-ভীতি-প্রসূত। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে আরাকান ও টেনাসেরিম অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে (১৮৫২) পেগু ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই সকল স্থা[illegible] ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হওয়ায় ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশ সমুদ্র-উপকূল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রোপকূলে পেঁছিবার জন্য সেই [illegible] ব্রিটিশের উপর নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বে[illegible] ইংরাজ বণিকদের ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশে বাণিজ্য-সুযোগ দিতে রাজী ছিল না। যে ইংরাজ জাতি ব্রহ্মদেশের

তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের পরোক্ষ কারণ

একাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তাহাদের প্রতি বর্মীগণ সন্দিহান হইয়া উঠিবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। যাহা হউক, বর্মীদের এই নীতি ইংরাজদের মনঃপূত হইল না। ব্রিটিশ বণিকগণ চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করিয়া উত্তর-ব্রহ্মেও ব্রিটিশ অধিকার স্থাপনের চেষ্টা শুরু করিল। তাহারা তদানীন্তন ভারত-সরকারকে ব্রহ্মদেশের অবশিষ্টাংশ জয় করিবার জন্য চাপ দিতে লাগিল। এই সকল অভিসন্ধিমূলক আচরণের সংবাদ ব্রহ্মরাজ থিবো (Thebaw)-এর অজ্ঞাত রহিল না। তিনি ব্রিটিশ আক্রমণ হইতে নিজরাজ্য রক্ষার জন্য ফরাসী সাহায্য-গ্রহণে সচেষ্ট হইলেন। ইতিপূর্বেই, অর্থাৎ থিবো সিংহাসনে আরোহণ (১৮৭৮) করিবার অব্যবহিত পরে ব্রিটিশদূতকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণ ছিল থিবোর ব্রিটিশ-বিদ্বেষ।

ব্রহ্ম-ফরাসী চুক্তি

এ-দিকে ফরাসী সাহায্য লাভের জন্য ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে থিবো ফরাসী দেশে দূত প্রেরণ করিলেন। এই দৌত্য ফরাসীদের সাহায্য ও সহানুভূতির প্রতিশ্রুতি-সংবলিত এক ব্রহ্ম-ফরাসী চুক্তি সম্পাদনে সাফল্যলাভ করিলে দুই বৎসর পরে (১৮৮৫) মান্দালয়ে এক ফরাসী দূত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে ব্রহ্মসরকার ফরাসী বণিকদিগকে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিবার প্রতিশ্রুতি এবং মান্দালয়ে একটি ফরাসী ব্যাঙ্ক স্থাপনের অনুমতি দিয়াছিলেন। ইন্দোচীনে ইতিপূর্বে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। এখন ব্রহ্মদেশেও ফরাসী প্রভাব বিস্তার লাভ করিতেছে দেখিয়া ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। পরিস্থিতি যখন এইরূপ

তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের পরোক্ষ কারণ

জটিলতাপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে বর্মী-রাজা থিবো Bombay-Burma Trading Company নামক এক ব্রিটিশ কোম্পানিকে এক অতি সামান্য অপরাধে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। এই আচরণে ইঙ্গ-ব্রহ্ম বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল। লর্ড ডাফ্রিন এ-বিষয়ে তদন্ত দাবি করিলেন। কিন্তু থিবো এই ব্যাপারে কোনপ্রকার পুনর্বিবেচনার অবকাশ নাই, এই কথা জানাইলে তাঁহাকে এক চরমপত্র দেওয়া হইল। ইহাতে থিবোকে অবিলম্বে মান্দালয়ে অর্থাৎ রাজা থিবোর রাজধানীতে একজন ব্রিটিশ দূত স্থাপনে স্বীকৃত হইতে এবং দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে বলা হইল। ইহা ভিন্ন, ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া ব্রিটিশ বণিকদের চীনদেশের সহিত বাণিজ্য করিবার অধিকার মানিয়া লইতে এবং ব্রিটিশ দূতের অনুমোদন ভিন্ন কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত কোনপ্রকার যোগাযোগ স্থাপন না করিতেও বলা হইল। ব্রহ্মসরকারের পক্ষে এই সকল অপমানজনক শর্ত মানিয়া লওয়া সম্ভব ছিল না। থিবো চরমপত্র অগ্রাহ্য করিলে লর্ড ডাফ্রিন ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধ কেবল

ব্রিটিশ কর্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকার

নামেমাত্রই হইল। একপ্রকার বিনাবাধায়-ই ব্রিটিশ বাহিনী মান্দালয় অধিকার করিতে সমর্থ হইলে থিবো আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ভারতবর্ষে লইয়া আসা হইল এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। অবশ্য ইহার পরবর্তী পাঁচ বৎসর ধরিয়া বর্মী সেনাবাহিনী ব্রিটিশদের ক্রমাগত অতর্কিত আক্রমণ করিতে ত্রুটি করিল না।

লর্ড ডাফ্রিনের ব্রহ্মদেশ-সংক্রান্ত কার্যকলাপ ন্যায় এবং সততার দৃষ্টিতে অত্যন্ত

গহিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, বলা বাহুল্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যূপকাষ্ঠে আফগানিস্তানের মত ব্রহ্মদেশকেও স্বাধীনতা বলিদান করিতে হইয়াছিল। স্বাধীন রাজা থিবোর পক্ষে ফরাসী মিত্রতা-গ্রহণ সম্পূর্ণ বৈধ ছিল, ইহাতে দ্বিমতের অবকাশ নাই। কিন্তু ন্যায়বোধহীন স্বার্থপর ব্রিটিশ শক্তি ব্রহ্ম-রাজের সার্বভৌমত্বের কথা না ভাবিয়া নিছক স্বার্থসিদ্ধি এবং সাম্রাজ্যবাদী লালসা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ঐতিহাসিক পি ই. রবার্টস্ (P. F. Roberts) থিবোর অত্যাচারী শাসন এবং তাঁহার বর্বরোচিত আচরণের কথা উল্লেখ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট লর্ড ডাফ্‌রিন তথা ব্রিটিশ সরকারের নীতিজ্ঞানহীনতা ও নীচ স্বার্থপরতা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িবে, বলা বাহুল্য। ব্রহ্মদেশে চীন-সম্রাটের আধিপত্য স্বীকৃত হইত। কাজেই ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ কর্তৃক অধিকৃত হইলে পর চীনদেশের সহিত ব্রিটিশ সরকার এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালাইলেন এবং শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের উপর ব্রিটিশ প্রভুত্ব-বিস্তার চীন-সম্রাট মানিয়া লইলেন।

লর্ড ডাফ্‌রিনের ব্রহ্ম-নীতির সমালোচনা

লর্ড ল্যান্সডাউন, ১৮৮৮-'৯৪ (Lord Lansdowne, 1888-'94): লর্ড ডাফ্‌রিন তাঁহার কার্যকাল উত্তীর্ণ হইবার এক বৎসর পূর্বেই পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে লর্ড ল্যান্সডাউন ভাইসরয় নিযুক্ত হইলেন।

অভ্যন্তরীণ নীতি (Internal Policy): লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে রূপার আন্তর্জাতিক বাজার অত্যধিক মন্দা হওয়ার ফলে ভারতবর্ষে এক দারুণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। নূতন নূতন রূপার খনির আবিষ্কার এবং জার্মানি কর্তৃক রূপার মুদ্রা-ব্যবহার পরিত্যাগের আন্তর্জাতিক ফল হিসাবেই রূপার মূল্য হ্রাস পাইয়াছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রৌপ্যমুদ্রার মূল্য পূর্বের মূল্যের অর্ধেক অপেক্ষাও কম হইয়া গেলে এক দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল। এই পরিস্থিতিতে আংশিক স্বর্ণমান (Gold standard) চালু করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাস রোধ করা সম্ভব হইল। লর্ড কার্জনের আমলে এক গিনির পরিবর্তে পনেরটি রৌপ্যমুদ্রা দেওয়া হইবে, এই অনুপাত প্রচলিত হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়

আংশিকভাবে স্বর্ণমানের প্রবর্তন

লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে কয়েকটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল। রিপন-প্রবর্তিত ফ্যাক্টরী অ্যাক্ট-এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করিয়া স্ত্রীলোক-শ্রমিকদের দৈনিক শ্রমের সর্বোচ্চ সময় এগার ঘণ্টা এবং শিশু-শ্রমিকদের সাত ঘণ্টার বেশি হইতে পারিবে না নিয়ম করা হয়। পূর্বে সাত বৎসরের নিম্নবয়স্ক শ্রমিককে 'শিশু শ্রমিক' বলিয়া বিবেচনা করা হইত, কিন্তু উহা সাত হইতে নয় বৎসরে বাড়াইয়া দেওয়া হয়। শিশু-শ্রমিকদের রাত্রিতে কাজে খাটানো নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়। ইহা ভিন্ন, সপ্তাহে একদিন ছুটি দিবার রীতিও কারখানাগুলির উপর বাধ্যতামূলকভাবে চালু করা হয়।

ফ্যাক্টরী এ্যাক্ট

স্ত্রীলোকদের পক্ষে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিবার অধিকার পূর্বে দশ বৎসর বয়স হইতেই স্বীকৃত ছিল। ইহাতে নানাপ্রকার দুর্নীতির সুযোগ ছিল বলিয়া স্বেচ্ছায় বিবাহের বয়স দশ হইতে বারোতে বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

স্ত্রীলোকদের ইচ্ছাধীন বিবাহের বয়স বৃদ্ধি

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy) : ল্যান্সডাউনের শাসনভার-গ্রহণের অল্পকালের মধ্যেই মণিপুর-সংক্রান্ত এক গোলযোগের উদ্ভব ঘটে। আসামের সীমান্তে মণিপুর রাজ্যটি ছিল তখন স্বাধীন। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত-দ্বন্দ্বের ফলে মণিপুর রাজ্যে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিলে লর্ড ল্যান্সডাউন এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন। আসামের চীফ-কমিশনারকে মণিপুর রাজ্যের গোলযোগ মিটাইবার জন্য প্রেরণ করা হইলে, মণিপুর রাজ্যের সেনাপতি তাঁহার তিনজন অনুচরসহ তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। এই সূত্রে ব্রিটিশ বাহিনী মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সেনাপতি ও তাঁহার সহকারীদের বন্দী করিল। সেনাপতি এবং অপর অনেককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের তত্ত্বাবধানে জনৈক নাবালক রাজ-পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করা হইল।

মণিপুরে রাজ্য আক্রমণ

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ আশ্রিত-রাজ্য কালাত-এর খাঁ তাঁহার ওয়াজীরকে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীকে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা এবং যুবক পুত্রসহ হত্যা করাইলেন। লর্ড ল্যান্সডাউন খাঁর এইরূপ নৃশংসতার প্রতিবাদে কালাত রাজ্যের নেতৃবর্গের অনুমোদনক্রমে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন এবং সেইস্থলে তাঁহারই অপর এক পুত্রকে স্থাপন করিলেন।

কালাত-এর খাঁর পদচ্যুতি

মিঃ প্লাওডেন্ (Mr Plowden) নামে কাশ্মীরস্থ ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপনীতি অনুসরণ করিলে লর্ড ল্যান্সডাউন তাঁহাকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু পর বৎসর আকস্মিকভাবে এবং কতকগুলি অপ্রমাণিত কারণ দেখাইয়া তিনি কাশ্মীরের মহারাজকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন এবং সেইস্থলে একটি প্রতিনিধি সভা নিয়োগ করিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এই ব্যাপার লইয়া বিতর্কের ফলে ভারত-সরকার কাশ্মীরের মহারাজকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন (১৯০৫)।

কাশ্মীর রাজ্যের প্রতি ব্রিটিশ ব্যবহার

ভারতীয় কাউন্সিল্স্ এ্যাক্ট্, ১৮৯২ (Indian Councils Act, 1892) : লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন 'ভারতীয় কাউন্সিল্স্ এ্যাক্ট্' পাস। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার পর হইতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি ক্রমেই ব্যাপকতা লাভ করে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিল্স্ এ্যাক্ট্ অনুসারে সামান্য কয়েকজন গণমান্য ভারতবাসী আইনসভার সদস্য হইতে পারিতেন বটে, কিন্তু সেই সকল আইনসভার কাজ ছিল কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন করা। সরকারী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ বা সরকারী কার্যের সমালোচনা করিবার অধিকার ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিল্স্ এ্যাক্ট্ অনুসারে/গঠিত আইনসভার ছিল না। কংগ্রেস

কংগ্রেস কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবি

আইনসভার অপরাপর কার্য করিবার ক্ষমতা এবং নির্বাচনের ভিত্তিতে সদস্য নিয়োগ দাবি করিল। এযাবৎ আইনসভার সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইতেন। লর্ড ডাফরিনের শাসনকালে এ-বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্ স্টেট্ লর্ড ক্রস্ (Lord Cross)-এর চেষ্টায় ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতীয় কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ পাস করেন।

লর্ড ক্রস্ কর্তৃক ভারতীয় কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ পাস

এই নূতন আইন অনুসারে গবর্ণর-জেনারেল-এর কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা আরও বাড়াইয়া ন্যূনতম দশজন এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্-এর মতই ষোল জনের বেশি হইবে না, স্থির হইল। ইঁহাদের অন্তত অর্ধেক বেসরকারী ব্যক্তি হইতে হইবে। প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে আরও পঁচিশ জন লওয়া হইল। ইঁহাদের মধ্যে নয়জন সরকারী কর্মচারী, চারিজন মনোনীত সরকারী কর্মচারী এবং অন্যরা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন। নূতন সদস্যগণ পূর্বের ন্যায় সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন স্থির হইল, নির্বাচনের নীতি এই আইনে স্বীকার করা হইল না। কিন্তু জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করিবার অধিকার দিবার ফলে নির্বাচনমূলক সদস্য-নিয়োগের নীতি প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। কাউন্সিলের ক্ষমতাও কতক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। পূর্বে কাউন্সিলের সদস্যগণ কেবলমাত্র কর-স্থাপন সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিতেন। এখন হইতে নিয়ম হইল যে, সরকারী ব্যয়বরাদ্দ অর্থাৎ বাজেট সদস্যগণ কর্তৃক সমালোচিত হইতে পারিবে। শাসন-সংক্রান্ত কার্যাদির কোন কোন বিষয় সম্পর্কে সদস্যগণ সরকারকে কাউন্সিলের সভায় প্রশ্নাদি করিতে পারিবেন।

কাউন্সিলগুলির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি

নির্বাচন প্রথা পরোক্ষ-ভাবে স্বীকৃত

কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের আইন পূর্বেকার আইন অপেক্ষা কোন ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের হইলেও ভারতীয় জনসাধারণের দাবি ইহাতে স্বীকৃত হইল না। সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ তখনও সরকারী সদস্য ছিলেন। যাহা হউক, এই আইন অনুযায়ী গঠিত আইনসভায় গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রাসবিহারী ঘোষ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যোগদান করিলে তাঁহাদের বক্তৃতা এবং সমালোচনায় সরকারী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত না হইলেও কতকটা প্রভাবিত হইতে লাগিল।

ভারতীয় দাবি অস্বীকৃত : গোপালকৃষ্ণ গোখলে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদস্য হিসাবে যোগদান

লর্ড এল্‌গিন, ১৮৯৪-'৯৯ (Lord Elgin, 1894-'99) : লর্ড ল্যান্সডাউনের পরবর্তী ভাইস্‌রয় ও গবর্ণর-জেনারেল এল্‌গিনের শাসনকাল ছিল ভারতের এক সংকটপূর্ণ কাল। রূপার মূল্যহ্রাসের অর্থনৈতিক ফল তখন পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছে। সরকারী বাজেট্-ঘাটতি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং

তাঁহার সমস্যা

সীমান্ত-বিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ জটিলতা লর্ড এল্‌গিনের শাসনকালকে সমস্যাসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিল।

উদারনীতির সমর্থক

লর্ড এল্‌গিন ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের এক উদার এবং প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। সুশাসক হিসাবে পূর্ব হইতেই তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার শাসনকালে কোন কোন ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি যে না হইয়াছিল এমন নহে, তথাপি তাঁহার সময়ে পরিস্থিতির জটিলতার কথা স্মরণ রাখিলে এই সকল ভুলভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না, এ-কথা বলিতে হইবে।

আমদানি শুল্ক স্থাপন

সরকারী আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমেই বিদেশী পণ্য-দ্রব্যাদির উপর আমদানি শুল্ক স্থাপন করিলেন। একমাত্র কাপড়ের উপর কোন শুল্ক স্থাপন করা হইল না। কিন্তু ইহাতে আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন না হওয়ায় কাপড়ের উপরও আমদানি শুল্ক স্থাপন করা হইল। ইহাতে বিলাতী কাপড়-ব্যবসায়িগণ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে পারে, সেজন্য ভারতীয় মিলগুলিতে প্রস্তুত কাপড়ের উপর শুল্ক (Excise Duty) স্থাপন করা হইল। এই সকল ব্যবস্থা এবং স্বর্ণমানের প্রবর্তন প্রভৃতির ফলে শেষ পর্যন্ত আর্থিক সঙ্কট দূরীভূত হইল।

সামরিক সংগঠন ও সংস্কার

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক সংগঠন-সংক্রান্ত কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংস্কার গৃহীত হইল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর সামরিক বিভাগের কতক সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর সেনাবাহিনী তখন সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের সেনাবাহিনী একজন পৃথক সেনাপতির অধীনে ছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সকল সৈনিককে একই প্রধান সেনাপতির অধীনে স্থাপন করিয়া সামরিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করা হইল। প্রধান সেনাপতির অধীনে চারিজন উপ-সেনাপতি বা লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ জেনারেল নিয়োগ করা হইল এবং বোম্বাই মাদ্রাজ, কলিকাতা ও পাঞ্জাব এই চারিস্থানে চারিটি বিমান ঘাঁটি স্থাপন করিয়া এক-একজন লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ জেনারেলের উপর এক-একটি ঘাঁটির দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইল।

রাশিয়ার সহিত পামির অঞ্চলে সীমারেখা সংক্রান্ত চুক্তি

সেই সময় রাশিয়া পামির পার্বত্যাঞ্চলের যাবতীয় স্থানে অধিকারস্থাপনে প্রয়াসী হইলে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এক ইঙ্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে পামির অঞ্চলে দীর্ঘকালব্যাপী ইঙ্গ-রুশ সীমান্ত বিরোধের অবসান ঘটে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ডুরাণ্ড্‌ চুক্তি অনুসারে কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত চিত্রাল নামক দেশীয় রাজ্যটির উপর ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তৃত হয়। ইহা ভিন্ন, লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত রেলপথ প্রভৃতি নির্মাণের ফলে সেই অঞ্চলের পাঠান উপদলগুলির নিকট ব্রিটিশ সরকারের অগ্রগতি দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া মনে হয়। চিত্রালে ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় এই সন্দেহ গভীরতর হইয়া উঠে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপদলগুলি বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ঠিক সেই সময়ে গিলগিটের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট চিত্রালের এক উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য তথায় উপস্থিত হইলে মোহাম্মদ উপদলীয় নেতৃবর্গ তাঁহাকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে চিত্রাল অবরোধ করে। কিন্তু গিলগিট হইতে আনীত ব্রিটিশ সেনাবাহিনী চিত্রালের অবরোধ উন্মোচন করিতে সমর্থ হয়। এ-দিকে আফ্রিদি উপদলীয় নেতৃবর্গ খাইবার গিরিপথে অবস্থিত ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করিতে থাকে। পেশওয়ার হইতে প্রেরিত একদল ব্রিটিশ সৈনিক আফ্রিদিগণকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। দীর্ঘ এক বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত অবশ্য আফ্রিদি উপদলকে দমন করা সম্ভব হইয়াছিল। পর বৎসর লর্ড কার্জন ভারতের ভাইসরয় ও গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। তাঁহার আমলে এই সকল সমস্যার সমাধান হইয়াছিল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে অগ্রসর-নীতির ফল—পাঠান উপদলগুলির বিদ্রোহ

লর্ড কার্জন, ১৮৯৯-১৯০৫ (Lord Curzon, 1899-1905) : ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লর্ড এলগিনের কার্যকাল শেষ হইলে লর্ড কার্জন ভারতের ভাইসরয় ও গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। ইতিপূর্বেই তিনি ব্রিটিশ কমন্স সভার সদস্য এবং ভারতীয় ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-বিভাগের উপ-সম্পাদক (Under Secretary) হিসাবে নিজ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, ভারতের শাসনভার প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই তিনি চারিবার এ-দেশে আসিয়াছিলেন, এবং সিংহল, আফগানিস্তান, চীন, পারস্য তুর্কীস্তান, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহ সম্পর্কে এইরূপ অভিজ্ঞতা অপর কোন গবর্ণর-জেনারেলের ছিল না। লর্ড ডালহৌসী ভিন্ন অপর কোন গবর্ণর-জেনারেল ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় লর্ড কার্জনের মত স্থায়ী কাজ করিয়া যান নাই। ভাল বা মন্দ* যে-ভাবেই হউক, লর্ড কার্জনের নাম ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব লাভ করিয়াছিল।

পূর্ব-অভিজ্ঞতা

লর্ড কার্জন স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার কর্মক্ষমতা, উদ্যোগ ও উদ্দীপনা, তাঁহার সংস্কারের মনোবৃত্তি তাঁহার শাসনকালকে বিশেষত্ব দান করিয়াছিল। তাঁহার উদ্ধত উক্তি কোন কোন সময়ে দারুণ বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল বটে, তথাপি কর্মদক্ষতার দিক হইতে বিচার করিলে তাঁহাকে ব্রিটিশ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবর্ণর-জেনারেল বলিয়া অভিহিত করা অনুচিত হইবে না।

চরিত্র

পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy) : লর্ড কার্জনের পররাষ্ট্র-নীতিকে (১) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি, (২) আফগান নীতি, (৩) পারস্য এবং (৪) তিব্বত-সংক্রান্ত নীতি এই চারিভাগে ভাগ করিয়া বিবেচনা করা সমীচীন হইবে।

* Vide, P. E. Roberts p. 515.

(১) **উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি (North-West Frontier Policy):** ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই লর্ড কার্জন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সমস্যা সমাধানে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি প্রথমেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে তাঁহার পূর্বগামীদের অগ্রসর-নীতি পরিত্যাগ করিয়া অধিকৃত অঞ্চলের সংহতি, দৃঢ়তা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। চিত্রাল রাজ্যটি অবশ্য তিনি ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত রাখিলেন এবং পেশোয়ার হইতে চিত্রাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করিয়া উহার নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করিলেন। ভারতের শাসনভার গ্রহণের পূর্বে লর্ড কার্জন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে লর্ড এল্‌গিন-অনুসৃত চিত্রাল-সংক্রান্ত নীতি এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশে অগ্রসর-নীতির সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিবার পর তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে অগ্রসর-নীতির (Forward Policy) আর তেমন উৎকট সমর্থক ছিলেন না। তাঁহার পূর্ববর্তী গবর্ণর-জেনারেলের আমলে সীমান্ত প্রদেশের উপজাতিদের দমনের উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ সামরিক অভিযান প্রেরণ করা প্রয়োজন হইত। এই সকল অভিযান যেমন ব্যয়সাপেক্ষ ছিল তেমনি তাহাতে কোন স্থায়ী ফলও হইত না। লর্ড কার্জন এই ব্যয়সাপেক্ষ অথচ স্থায়ী ফলহীন অভিযান-প্রেরণ নীতি ত্যাগ করিলেন। খাইবার গিরিপথ, কুর্‌রম উপত্যকা, ওয়াজিরীস্তান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অপসারিত করিলেন। কিন্তু চিত্রাল, কোয়েটা, মালখন্দ্‌, দরগাই প্রভৃতি স্থানে তিনি ব্রিটিশ অধিকার বা সামরিক ঘাঁটির কোনপ্রকার পরিবর্তন করিলেন না। উপরন্তু ব্রিটিশ সৈনিকের পরিবর্তে উপজাতীয়দের লইয়া তিনি এই সকল অঞ্চলের সেনাবাহিনী গঠন করিলেন। বলা বাহুল্য, এই সকল সেনাবাহিনীর পরিচালনার কর্তৃত্ব ব্রিটিশ অফিসারদের উপর। উপদল-অধ্যুষিত অঞ্চলে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তিনি ব্রিটিশ সীমান্তের অভ্যন্তরে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা (Second line of defence) অবলম্বন করিলেন। দর্‌গাই, জামরুদ্‌ ও থাল্‌ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করিয়া দ্রুত সামরিক চলাচলের ব্যবস্থা তিনি করিলেন। ইহা ভিন্ন, উপজাতীয় অঞ্চলে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিয়া সেই অঞ্চলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিলেন। উপজাতীয় অঞ্চল একপ্রকার স্বাধীন-ই ছিল। কিন্তু উপদলগুলি ব্রিটিশ রাজ্যসীমার অভ্যন্তরে সামরিক অভিযান প্রেরণ করিত বলিয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসাবেই সেই অঞ্চলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি নির্মিত হইয়াছিল। লর্ড কার্জন উপজাতীয় দলপতিদের স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিলেন যে, ব্রিটিশ পক্ষ হইতে তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করা হইবে না, তবে উপজাতীয় দলগুলি যদি ব্রিটিশ সীমায় হানা দেয় তাহা হইলে উহার সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে।

পূর্বগামীদের অগ্রসর-নীতি পরিত্যক্ত

কোয়েটা, চিত্রাল, দর্‌গাই, মালখন্দ্‌ প্রভৃতি স্থানে ব্রিটিশ অধিকার সংরক্ষিত—অপরাপর অঞ্চল হইতে অপসারণ

ব্রিটিশ রাজ্যসীমা নিরাপত্তার ব্যবস্থা

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য লর্ড কার্জন পাঞ্জাবের সরকারী কর্মচারি-

বর্গের আপত্তি উপেক্ষা করিয়া পাঞ্জাবের একাংশ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কয়েকটি স্থান লইয়া 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ' নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করিলেন (১৯০১)।* এই প্রদেশটি একজন চীফ্ কমিশনারের অধীনে স্থাপন করা হইল। পূর্বে আগ্রা ও অযোধ্যাকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বলা হইত, কিন্তু এখন হইতে এই অঞ্চল যুক্ত-প্রদেশ (United Provinces) নামে পরিচিত হইল।

নূতন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন—পূর্বেকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 'যুক্ত-প্রদেশ' নামকরণ

লর্ড কার্জনের সীমান্ত-নীতির ফলে দীর্ঘকাল পরে এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হইল, ফলে অযথা ব্যয়ভারও লাঘব হইল। কিন্তু লর্ড কার্জনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-নীতি যে সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল তাহা নহে। উপজাতীয় অঞ্চলে তখন রাজস্ব ও বিচার-সংক্রান্ত অসুবিধা এবং অব্যবস্থা দূরীভূত হয় নাই। ১৯০০-১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মাহ্‌সুদ অবরোধ, ১৯০৮-৯ মোহান্দ্ ও জক্কাখেল বিদ্রোহ কার্জনের সীমান্ত-নীতি যে স্থায়িভাবে শান্তি আনিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালেও (১৯১৪-১৮) এই অঞ্চলে দারুণ অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। পরবর্তী কালেও এমন কি ১৯৩০-৩৭ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালেও এই অঞ্চলে একাধিকবার বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল।

কার্জনের সীমান্ত-নীতির সমালোচনা—স্থায়ী সাফল্যলাভে অসমর্থ

(২) **আফগান-নীতি** (**Afghan Policy**): লর্ড কার্জনের আফগান-নীতি রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং পারস্য উপসাগর ও মধ্য-এশিয়া অঞ্চলে রুশ প্রাধান্য বিস্তৃতি প্রভৃতি নানাবিধ প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

বিভিন্ন প্রভাবে প্রভাবিত আফগান-নীতি

আফগান-আমীর আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হবিব উল্লাহ্ আমীর-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। হবিব উল্লাহ্ এবং ইংরাজদের মধ্যে প্রথম হইতেই বিরোধ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছিল। আব্দুর রহমানও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে যে-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্তানকে আর্থিক সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু হবিব উল্লাহ্ আমীর-পদ লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করিলেন যে, আমীর আব্দুর রহমানের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চুক্তি। এজন্য হবিব উল্লাহ্‌কে নূতন চুক্তি সম্পাদনের জন্য বলা হইল। কিন্তু হবিব উল্লাহ্ ব্রিটিশ সরকারের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি নূতন চুক্তি স্বাক্ষরে প্রস্তুত নহেন জানাইলেন। এই সূত্রে উভয়পক্ষে মনোমালিন্য দেখা দিল এবং ইঙ্গ-আফগান মৈত্রী এক প্রকার বিনাশপ্রাপ্ত হইল। আমীর হবিব উল্লাহ্ ব্রিটিশের নিকট হইতে অর্থসাহায্য না লইয়াই চলিতে লাগিলেন। কিন্তু হবিব উল্লাহ্ ব্রিটিশের সহিত

আমীর হাবিব উল্লাহ্-এর সহিত ব্রিটিশের মতানৈক্য

* "The new Frontier Province, extending over an area of 40,000 square miles included the political agencies of the Malkand, the Kurram, the Khyber, the Tochi and Wana and all the trans-Indus districts of the Punjab, excepting the settled district of Dera Ghazi Khan which remained under the control of the Punjab Government." Vide, *An Advanced History of India*, pp. 902-3.

কোনপ্রকার বিরোধিতা করিলেন না। উপরন্তু সীমান্তবর্তী উপজাতীয় দলগুলিকে স্ববশে রাখিয়া তিনি ব্রিটিশ সীমার নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন সাময়িকভাবে বিদায় গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থলে অস্থায়ী ভাইসরয় লর্ড এম্‌প্‌থিল (Lord Ampthil) সার্ লুই ডেনকে আফগানিস্তানে দূত হিসাবে প্রেরণ করিলেন। এই দৌত্যের ফলে আফগানিস্তানের আমীর ও ভারত সরকারের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব স্থাপিত হইল। কিন্তু হবিব উল্লাহ্ আব্দুর রহমানের সহিত পূর্ব-স্বাক্ষরিত ব্রিটিশ চুক্তি বলবৎ রহিয়াছে, এই দাবি ত্যাগ করিলেন না। এক প্রকার বাধ্য হইয়াই ব্রিটিশ পক্ষ এই চুক্তিই মানিয়া লইলেন। তদুপরি আফগানিস্তানের আমীরকে "His Majesty" সম্বোধন করিতে এবং পূর্ণমাত্রায় রাজকীয় সম্মান দানে স্বীকৃত হইলেন। এইভাবে যখন উভয়পক্ষে পুনরায় মৈত্রী স্থাপিত হইল, তখন হবিব উল্লাহ্ ব্রিটিশের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করিলেন।

লর্ড এম্‌প্‌থিল কর্তৃক দূত প্রেরণ—আফগানিস্তানের সহিত সদ্ভাব পুনঃস্থাপন

লর্ড এম্‌প্‌থিল-অনুসৃত আফগান-নীতির বিরুদ্ধে সমালোচকগণ অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, ইহাতে ব্রিটিশ মর্যাদা ক্ষুন্ন হইয়াছিল। এই অহেতুক মর্যাদাবোধ ব্রিটিশ ঔদ্ধত্যের প্রকাশ হিসাবে সমর্থনযোগ্য হইলেও প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলে লর্ড এম্‌প্‌থিলের আফগান-নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনার অবকাশ থাকে না।

লর্ড এম্‌প্‌থিলের আফগান-নীতির সমালোচনা

(৩) **পারস্য-নীতি (Persian Policy):** লর্ড কার্জনের আমলের দীর্ঘকাল পূর্ব হইতে মধ্য-এশিয়ায় ব্রিটিশ-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা। বিশেষভাবে পারস্য উপসাগর অঞ্চলে ব্রিটিশ অধিকার বজায় রাখা ছিল ব্রিটিশ স্বার্থের পক্ষে অপরিহার্য। পক্ষান্তরে রাশিয়া, ফ্রান্স, তুরস্ক প্রভৃতি দেশও ঐ অঞ্চলে প্রাধান্য-বিস্তারে বিশেষ তৎপর ছিল। এই সূত্রে ব্রিটিশ ও অপরাপর দেশগুলির মধ্যে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয়। মধ্য-এশিয়া ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল অপর কোন শক্তির অধীন হইয়া পড়িলে ব্রিটিশের স্বার্থহানির সমূহ কারণ ছিল। এমতাবস্থায় উত্তর-পারস্যের দিকে রুশ অগ্রগতি স্বভাবতই তদানীন্তন ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ সরকারের ত্রাসের সৃষ্টি করিল। পারস্য উপসাগর অঞ্চলে অপরাপর শক্তির প্রভাব-নাশের উদ্দেশ্যে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন স্বয়ং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে উপস্থিত হইলেন। লর্ড কার্জন সেই অঞ্চলে ব্রিটিশ স্বার্থ বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ত্রুটি করিলেন না।

পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ব্রিটিশ অধিকার বজায় রাখিবার নীতি

লর্ড কার্জনের পারস্য উপসাগর অঞ্চলে উপস্থিতি ও যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন (১৯০৩)

(৪) **তিব্বতের সহিত সম্পর্ক (Relation with Tibet):** লর্ড কার্জনের তিব্বত-সংক্রান্ত নীতিও রুশ-ভীতি-প্রভাবিত ছিল। তিব্বত ছিল চীনদেশের আনুগত্যাধীন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উহা সম্পূর্ণ স্বাধীনই ছিল। তিব্বতীয়গণ বিদেশীদের তেমন পছন্দ

করিত না। ওয়ারেন হেস্টিংস্ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে তাসি লামার রাজসভায় বোগ্‌ল (Bogle)-কে দূত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দৌত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তিব্বতের সহিত এবং তিব্বতের মধ্য দিয়া নেপাল ও নিকটবর্তী অঞ্চলের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করা।

তিব্বতের সহিত পূর্ব-সম্পর্ক

কিন্তু ইহার পর হইতে তিব্বতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশদের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ও তিব্বতীয়দের মধ্যে এক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উহা পুনরায় অনুমোদিত হইয়াছিল। কিন্তু এই চুক্তি অনুযায়ী তিব্বতীয় ব্রিটিশ বাণিজ্য-সম্পর্ক তেমন বৃদ্ধি পাইল না। লর্ড কার্জন যখন ভাইসরয় নিযুক্ত হইয়া আসিলেন, তখন তিব্বত ও ভারতবর্ষের পরস্পর সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই সময়ে দলাই লামা রাশিয়ার সাহায্যে চীনদেশের অধীনতামুক্ত হইবার চেষ্টায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রুশ ভিক্ষুর মাধ্যমে রুশ সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। এই সংবাদে ভারত সরকারের ভীতির সঞ্চার হইল। লর্ড কার্জন তিব্বতে দূত প্রেরণ করিবার অনুমতি চাহিয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট পত্র লিখিলেন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে লর্ড কার্জন ইয়ং হাস্‌বেণ্ড্ নামক জনৈক ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারীকে তিব্বতে প্রেরণ করিলেন।

ইয়ং হাস্‌বেণ্ড-এর দৌত্য (১৯০৪)

তিব্বতীয়গণ ইয়ং হাস্‌বেণ্ড্-এর তিব্বত-প্রবেশে বাধাদান করিলে এক সামরিক সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইয়ং হাস্‌বেণ্ড্ বলপূর্বক তিব্বতে প্রবেশ করিয়া লাসা দখল করিলেন। ইহাতে ভীত হইয়া তিব্বতীয়গণ ব্রিটিশের সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ বণিকদের তিব্বতীয় বাজারে বাণিজ্য করিবার অধিকার স্বীকৃত হইল এবং দলাই লামা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ব্রিটিশদের দিতে বাধ্য হইলেন।

লাসা দখল—তিব্বতের সহিত চুক্তি সম্পাদন

এই ঘটনার অল্পকালের মধ্যেই (১৯০৭) রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক মিত্রতা-চুক্তি স্থাপিত হইলে তিব্বতে রুশ-প্রভাব বিস্তারের ভয় দূরীভূত হইল। এই চুক্তি অনুসারে রুশ বা ব্রিটিশ সরকার তিব্বতের কোন স্থান দখল বা তিব্বতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহা ভিন্ন, তিব্বতের সহিত এই দুই দেশ কোনপ্রকার সরাসরি আলাপ-আলোচনা না করিয়া তিব্বতের সার্বভৌম দেশ চীনের মাধ্যমে তাহা করিবে এই নীতিও গৃহীত হইবে।

ইঙ্গ-রুশ চুক্তি (১৯০৭)—তিব্বতীয় সমস্যার সমাধান

লর্ড কার্জনের অভ্যন্তরীণ নীতি (Internal Policy of Lord Curzon): দক্ষতা ও গতিশীলতা ছিল লর্ড কার্জনের অভ্যন্তরীণ নীতির মূলসূত্র। শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় ত্রুটি দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমেই তদন্ত করিয়া সেগুলি দূরীকরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। (১) তিনি রাজস্ব-নির্ধারণের অথবা রাজস্ব-আদায়-সংক্রান্ত কার্যাদিতে কৃষকদের অবস্থা পূর্ণমাত্রায় বিবেচনা করিবার নীতি প্রবর্তন করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তাধীন

রাজস্ব-নির্ধারণে কৃষকদের অবস্থা বিবেচনা করিবার নীতি

এলাকায় অবশ্য এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু অস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে রাজস্ব-নীতি এবং কৃষকদের মঙ্গলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি কৃষি ও কৃষিজীবীদের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। (২) লর্ড কার্জন-ই ভারতবর্ষে সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া কৃষিজীবীদের পক্ষে অল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। (৩) কৃষিজমি যাহাতে খণ্ডীকৃত না হইতে পারে সেজন্য তিনি পাঞ্জাব Land Alienation Act পাস করিয়া কোন বিশেষ পরিস্থিতি ভিন্ন জমি হস্তান্তর রোধ করিয়াছিলেন। (৪) লর্ড কার্জন সরকারী কৃষিবিভাগ স্থাপন করিয়া একজন ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেলের হস্তে কৃষিবিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। (৫) ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অধিকতরভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন' পাস করিলেন। ইহা ভিন্ন, কলেজগুলি পরিদর্শনের জন্য তিনি একজন কলেজ ইন্‌স্‌পেক্টর নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কলেজের affiliation অর্থাৎ কলেজ প্রতিষ্ঠার এবং কি কি বিষয়ে পড়ান হইবে সে-সম্পর্কে অনুমতিদানের অধিকার লর্ড কার্জন সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের শর্তানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের কার্য না করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিতেও বাধ্য হইয়াছিল। (৬) লর্ড কার্জন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপন করিয়া ভারতের ইতিহাসের ছাত্রদের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি, প্রাচীন শহর-নগরের ধ্বংসাবশেষ, স্মৃতিস্তম্ভ, মূর্তি প্রভৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন আইন প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই আইনের বলে ঐতিহাসিক চিহ্নাদি-সংরক্ষণ সরকারের দায়িত্ব হিসাবে বিবেচিত হয়। (৭) তিনি দেশীয় বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ নামে একটি সরকারী বিভাগ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিভাগটি তিনি একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অধীনে স্থাপন করেন। (৮) ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ ভাগে রুপার মূল্য হ্রাস পাইবার ফলে যে আর্থিক-সঙ্কট দেখা দিয়াছিল উহার উপশমার্থে তিনি গিনির সহিত রুপার টাকার বিনিময় হার পনর টাকায় এক গিনি হিসাবে নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং গিনি দ্বারা বিনিময়ের অনুমতি দান করিয়াছিলেন। (৯) অল্প মাহিনাভোগী ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য লর্ড কার্জন আয়কর মকুবের ন্যূনতম পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি লবণ করও হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন। (১০) কার্জন ইম্পিরিয়াল ক্যাডেট্ কোর (Imperial Cadet Corps) নামে সামরিক শিক্ষানবীশীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দেশীয় নৃপতিগণের পুত্রগণকে সামরিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। (১১) দেশীয় রাজগণকে নিজ খরচে এক-একদল সৈনিক পোষণে

সমবায় সমিতি স্থাপন

কৃষিজমি খণ্ডীকৃত হওয়া রোধ—পাঞ্জাব Land Alienation Act, সরকারী কৃষিবিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয় আইন

ঐতিহাসিক চিহ্নাদি সংরক্ষণ

শিল্প-বাণিজ্য বিভাগ স্থাপন

আর্থিক সঙ্কটের উপশমার্থ ব্যবস্থা

অল্প বেতনভোগীদের আয়কর মকুবের ন্যূনতম পরিমাণ বৃদ্ধি

ইম্পিরিয়াল ক্যাডেট্ কোর

তিনি বাধ্য করিয়াছিলেন। ভারত সরকারের প্রয়োজনে এই সকল সৈন্য ব্যবহার করা যাইবে ইহা-ই ছিল এই ব্যবস্থার মূল শর্ত। (১২) তিনি হায়দরাবাদের নিজামের নিকট হইতে বেরার প্রদেশটির বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেশীয় রাজগণকে নিজ খরচে সৈন্য পোষণের ব্যবস্থা

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের ব্যবচ্ছেদ হইল লর্ড কার্জনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য। বিশাল বাংলাদেশ সুষ্ঠু শাসনের পক্ষে উপযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া লর্ড কার্জন বাংলাদেশের একাংশ লইয়া 'ইস্টার্ন বেঙ্গল ও আসাম' নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করিলেন। এই নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী হইল ঢাকা। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বাঙালী জাতি ছিল সর্বাধিক অগ্রণী। বাঙালী জাতির ঐক্য বিনাশ সেজন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দিক দিয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। বঙ্গ-ভঙ্গ এই নীতিরই ফলশ্রুতি, বলা বাহুল্য।

'ইস্টার্ণ বেঙ্গল ও আসাম' প্রদেশের সৃষ্টি

ঐ বৎসরই (১৯০৫) ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড কিচেনার (Lord Kitchener)-এর সহিত সামরিক পরিচালনা-সংক্রান্ত নীতি লইয়া মতানৈক্য দেখা দিলে লর্ড কার্জন পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

কার্জনের পদত্যাগ

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গ-ভঙ্গ (Partition of Bengal): সাম্রাজ্যবাদের প্রধান অস্ত্র হইল অধীন জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ, পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া উভয়পক্ষের কাছেই সেই শাসন অপরিহার্য করিয়া তোলা এবং শাসন কায়েম করিয়া রাখা।

সাম্রাজ্যবাদের বিভেদ-নীতির প্রয়োগ

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষভাবে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর হইতে ভারতবাসীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের ক্রম প্রসার ব্রিটিশ শাসকবর্গের অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক ব্রিটিশ শাসনের ত্রুটি সম্পর্কে সোচ্চার হইয়া উঠা ও ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগের প্রতিকার দাবি প্রভৃতি ভারতবাসীর অন্তরে জাতীয়তাবাদী প্রভাব আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে লাগিল। সার্ সৈয়দ আহম্মদের কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কি পরিমাণে অনুপ্রাণিত ছিল সে-বিষয়ে সঠিক কিছু বলা না গেলেও এ-কথা অনস্বীকার্য যে, ইহার ফলে ভারতবাসীদের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের—হিন্দু ও মুসলমান—মধ্যে বিভেদনীতি প্রয়োগের সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল। ভারতবাসীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ সেই সময় হইতেই ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর স্নেহরসে সিঞ্চিত হইতে থাকে।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের ক্রম প্রসার

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ফলে সেই প্রভাব গভীরতর

সার্ সৈয়দ আহম্মদের কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন—ব্রিটিশের সুযোগ

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি আনন্দমোহন বসু তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া ভাষণ দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন লিখিয়া-

কংগ্রেসের প্রতি কার্জনের মনোভাব

ছিলেন ঃ "কংগ্রেস টলটলায়মান অবস্থায় ক্রমেই পতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং ভারতবর্ষে থাকাকালে আমার অন্যতম প্রধান আকাঙ্ক্ষাই হইল উহার শান্তিপূর্ণ মৃত্যুতে সাহায্য করা।" "The Congress is tottering to its fall and one of any greatest ambitions while in India is to assists it to a peaceful demise."

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল বাংলা ও বাঙালী জাতি, এ-কথা ইতিহাস-সম্মত। বাঙালী জাতি যখন ক্রমেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল সেই সময়ে (১৯০৪-০৫) রুশ-জাপানী যুদ্ধে ক্ষুদ্র দেশ জাপান বিশাল দেশ রাশিয়াকে পরাজিত করিলে চীন, জাপান, পারস্য, সর্বত্র বিদেশী প্রভাব ও প্রাধান্যমুক্ত হইবার গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। স্বাভাবিকভাবেই উহা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। ইহা ভিন্ন, দক্ষিণ-আফ্রিকায় কৃষ্ণকায়দের উপর শ্বেতাঙ্গদের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল। বাঙালী স্বভাবতই ভাবপ্রবণ জাতি। তাহাদের মনে এই সকল ঘটনা গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

রুশ-জাপানী যুদ্ধ—পারস্য, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বিদেশী প্রভাব ও প্রাধান্য নাশের চেষ্টা, আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার ঃ বাঙালী তথা ভারতবাসীর উপর প্রভাব

সেই সময়ে ভারতের ভাইসরয় ও গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫)। তিনি ছিলেন একাধারে উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি, সুদক্ষ শাসক এবং ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। উচ্চ-শিক্ষা, শাসনকার্যে দক্ষতার সহিত সাম্রাজ্য বাদী মনোবৃত্তির সংমিশ্রণের ফলে তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদের বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং সেই বিরোধিতা সুকৌশলে প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার শাসনকালে বাঙালীর জাতীয়তাবাদ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। বাঙালী জাতি ছিল স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের পুরোধা। স্বাভাবিকভাবেই লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী শাসন, জনমত উপেক্ষা করিয়া চলিবার নীতি এবং সর্বোপরি তাঁহার ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি বাঙালী তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সংগ্রামের পথে ঠেলিয়া দিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাতন্ত্র্য নাশ করিয়া সেগুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, কলিকাতা করপোরেশনের উপর সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ, ভারতীয়দের সম্পর্কে তাঁহার অপমানসূচক উক্তি—সব কিছু মিলিয়া সেই সময়ে ভারতবাসীর মধ্যে এক দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করিল। সেই সময়ে লর্ড কার্জন ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে বাঙালী জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন। শাসনকার্যের সুবিধার অজুহাতে তিনি বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়া বাঙালীর সংহতি বিনাশ করিতে চাহিলেন।

লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী মনোভাব

বিশ্ববিদ্যালয় ও করপোরেশনের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ

ভারতবাসীর মধ্যে ক্ষোভ

বাংলা ব্যবচ্ছেদের অজুহাত

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা ব্যবচ্ছেদের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সঙ্গে সংযুক্ত হইবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এই

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা

পরিকল্পনা প্রকাশিত হইলে হিন্দু, মুসলমান—সমগ্র বাঙালী জাতি তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা ত্যাগ করা হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বাঙালী জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ, লর্ড কার্জনের কাছে এ-কথা আরও সুস্পষ্ট করিয়া দিল যে, বাঙালী জাতির জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া ব্রিটিশ স্বার্থের দিক দিয়া বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে।

জাতীয় কংগ্রেসও বাংলা ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিল বাঙালী জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ—পরিকল্পনা পরিত্যক্ত

লর্ড কার্জন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীর ঐক্যবদ্ধতা ও জাতীয়তাবোধের গভীরতা লক্ষ্য করিয়া ব্রিটিশ স্বার্থের দিক দিয়া ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইলেন। তিনি এইবার গোপনে বাংলা ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা রচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই গোপন প্রস্তুতি গোপন রহিল না। পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে বাঙালী জাতি সম্ভাব্য ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আরম্ভ করিল।

লর্ড কার্জনের গোপন পরিকল্পনা রচনা

ঐ বৎসর (১৯০৫) জুলাই মাসে বাংলাদেশকে বিভক্ত করিবার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইল। এই পরিকল্পনার যুক্তি হিসাবে বলা হইল যে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা লইয়া গঠিত বিশাল অঞ্চলের শাসনভার একটি প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত রাখা শাসনকার্যের দক্ষতার দিক দিয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। এজন্য কার্জন বাংলাদেশকে ভাগ করিয়া ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং দার্জিলিং—অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' (Eastern Bengal & Assam) নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করিলেন। একজন লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণরের উপর এই প্রদেশের শাসনভার দেওয়া হইল আর এই নূতন প্রদেশের রাজধানী হইল ঢাকা শহর। মূল বাংলা প্রদেশে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা রাখা হইয়াছিল।

বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গ-ভঙ্গ (১৯০৫)

পূর্ববঙ্গ ও আসাম লইয়া নূতন প্রদেশ গঠন

লর্ড কার্জনের যুক্তি যদি মানিয়া লওয়া হয় এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা লইয়া গঠিত বাংলা প্রদেশের সুষ্ঠু শাসনের জন্য যদি বাংলা ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজন স্বীকার করা হয় তাহা হইলেও যেভাবে বাংলাদেশকে ভাগ করা হইয়াছিল তাহা বাঙালী জাতি ও বাঙালী জাতির ঐক্য ও জাতীয়তাবোধকে আঘাত করিবার জন্যই যে করা হইয়াছিল, এ-কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ শাসনকার্যের সুব্যবস্থাই যদি একমাত্র যুক্তি হইত তাহা হইলে বাঙালী জাতিকে দ্বিখণ্ডিত না করিয়া বিহার ও উড়িষ্যা এই দুইটি অঞ্চলকে পৃথকীকৃত করিলেই লর্ড কার্জনের যুক্তির পশ্চাতে তাঁহার কোন সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি ছিল না তাহা প্রমাণিত হইত। কিন্তু লর্ড কার্জনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বাঙালী জাতির ঐক্য বিনাশ করিয়া তাহাদের জাতীয়তাবোধের উপর আঘাত হানা। জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ বাঙালী জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের সংহতি ও

বঙ্গ-ভঙ্গের পশ্চাতে কার্জনের মূল উদ্দেশ্য

জাতীয়তাবাদী ঐক্য বিনাশ করা ছিল এই অযৌক্তিক ব্যবচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন, এই ব্যবচ্ছেদের অন্তর্নিহিত অপর উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে লালন করা। পূর্ববঙ্গ ও আসামের হিন্দু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘুতে পরিণত করিয়া সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করা, এবং পশ্চিমবঙ্গকে বিহার ও উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিয়া বাঙালীকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়া বাঙালী জাতিকে আঘাত করা ছিল কার্জন তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল কৌশল ও উদ্দেশ্য।

সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ লালন: বাঙালী জাতিকে সংখ্যালঘুতে পরিণত-করণ—কার্জনের উদ্দেশ্য

এইভাবে বাঙালী জাতির জাতীয়তাবাদী ঐক্য ও শক্তি বিনাশ ও হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও ঐক্যে আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গ-ভঙ্গ কার্যকর হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ —বঙ্গ-ভঙ্গ কার্যকর

স্বদেশী আন্দোলন (Swadeshi Movement): লর্ড কার্জনের বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গ-ভঙ্গ বাঙালীর ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের উপর যে কঠিন আঘাত হানিয়াছিল তাহাতে বাঙালী জাতি সে দিন মুহ্যমান না হইয়া এক অভূতপূর্ব দৃঢ়তা ও শক্তি লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপকৌশলের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাঙালী জাতির কাছে বঙ্গ-ভঙ্গ মায়ের অঙ্গচ্ছেদের মতই শোকাবহ, মর্মন্তুদ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। বঙ্গ-ভঙ্গ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সর্বত্র গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, নগরে, বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া উঠে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার নিজ পত্রিকা 'বেঙ্গলী' ও 'সন্ধ্যা' এবং অপরাপর পত্র-পত্রিকা 'হিতবাদী' প্রভৃতিতে বাংলা ব্যবচ্ছেদকে এক সর্বনাশাত্মক জাতীয় বিপর্যয় বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। ইংরাজদের পরিচালিত 'স্টেট্‌সম্যান', 'ইংলিশম্যান', 'পাইওনীয়ার' প্রভৃতি পত্রিকাও এই ব্যবচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ করে। এমন কি, ইংলণ্ডের 'মানচেস্টার গার্ডিয়ান', 'দি লণ্ডন টাইমস', 'লণ্ডন ডেইলি' নিউজ প্রভৃতি পত্রিকায় বাঙালী জাতির মতামত উপেক্ষা করিয়া লর্ড কার্জনের বাংলা ব্যবচ্ছেদের ঘোষণার নিন্দা করা হয় এবং উহা অদূরদর্শিতার কাজ হইয়াছে বলিয়া সমালোচনা করা হয়। ইংরাজ বণিকগণ পরিচালিত ইংরাজ বণিকসভা 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স' এই ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু বাংলা ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে বাঙালী তথা ভারতীয়দের প্রতিবাদী আন্দোলন যখন অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে সেই সময়ে এই সকল বিদেশী পত্রিকা সুর পাল্টাইয়া সেই আন্দোলনের বিরোধিতা করিতে শুরু করে।

বাংলার ব্যবচ্ছেদ বাঙালীর কাছে মায়ের অঙ্গচ্ছেদের ন্যায় মর্মন্তুদ বিবেচিত

দেশীয় এমন কি, বিদেশী পরিচালিত, ও ইংলণ্ডের পত্রিকা-সমূহের প্রতিবাদ

ইংরাজ বণিকসভার প্রতিবাদ

আন্দোলনের তীব্রতা বিদেশী পত্রিকা-সমূহের বিরোধিতা সৃষ্টি

বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে যে-আন্দোলন শুরু হইল তাহাতে বাঙালী ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান, শহরবাসী-গ্রামবাসী নির্বিশেষে সকলে সমান উৎসাহ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বাঙালী জাতির অভূতপূর্ব সাড়া

নেতৃত্বে সেই আন্দোলন এক অদমনীয় শক্তি লইয়া ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইতে লাগিল।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা লর্ড কার্জনের ভীতির সৃষ্টি করিলে তিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া আন্দোলন দমন করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি কূটচালে ঢাকার নবাব সলিম-উল্লাহ্‌কে ব্রিটিশের সমর্থনে আনিতে সমর্থ হইলেন। নূতন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের সর্বাধিক ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার নবাব হইবেন এবং ঢাকা এক উন্নত, সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হইবে এইসব প্রলোভন ঢাকার নবাবকে দেখান হইলে তিনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ঢাকার নবাব সলিম-উল্লাহ্‌ বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দৃঢ় সমর্থকে রূপান্তরিত হইলেন। কার্জনের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তাদানের উপায় হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের এক উল্লেখযোগ্য অংশকে তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন হইতে বিরত রাখিলেন।

লর্ড কার্জন কর্তৃক সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রয়োগ

ঢাকার নবাবকে ব্রিটিশ পক্ষের সমর্থনে আনিতে সক্ষম

বাংলা ব্যবচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন কেবলমাত্র প্রতিবাদেই সীমিত রহিল না। প্রতিবাদে যখন ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়িল না, তখন বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল। সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিলেন। বিলাতী সামগ্রী বর্জন করা এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বয়কট আন্দোলনের তাঁহার প্রস্তাব বাংলার সর্বত্র পূর্ণমাত্রায় সমর্থিত হইল। বয়কট আন্দোলন সর্বপ্রথম শুরু হয় বাগেরহাট মহকুমা শহরে। সেখানে এক বিশাল জনসভায় বঙ্গ ভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রকার বিলাতী সামগ্রী কেহ ব্যবহার করিবেন না, অর্থাৎ বিলাতী সব কিছু বয়কট করা এবং ছয় মাস পর্যন্ত কোন প্রকার উৎসব বা আনন্দ অনুষ্ঠানে কেহ যোগ দিবে না, এই প্রতিজ্ঞা সকলেই গ্রহণ করিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় লালমোহন ঘোষ প্রস্তাব দিলেন যে, ভারতবাসীর জনমতের মর্যাদা ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে আদায় করিবার শ্রেষ্ঠ পথ হইল বিলাতী বস্ত্র বয়কট করা। এইভাবে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন—বিলাতী সামগ্রী, বিশেষভাবে বিলাতী বস্ত্র বর্জনের আন্দোলন শুরু হইল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন প্রধানত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। বয়কট আন্দোলন কেবলমাত্র বিলাতী বর্জনেই সীমাবদ্ধ রহিল না, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রভৃতি হইতে ভারতীয়দের পদত্যাগ, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটদের পদত্যাগ প্রভৃতিও বয়কট আন্দোলনের অঙ্গীভূত হইল।

সক্রিয় আন্দোলন—অর্থনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ :

বয়কট আন্দোলন—সর্বপ্রকার বিলাতী বর্জন

বাগেরহাট মহকুমা শহরে বয়কট আন্দোলনের শুরু

মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড প্রভৃতি হইতে পদত্যাগ

এই আন্দোলনে বাংলার ছাত্র-সম্প্রদায়ও অংশ গ্রহণে অগ্রসর হইলেন। কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা এক সভায় সমবেত হইয়া বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ এবং বিলাতী

বর্জন অর্থাৎ বয়কট আন্দোলনে তাঁহাদের পূর্ণ সমর্থন জানাইলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট তারিখে কলিকাতা টাউন হলে কাশিম-বাজারের মহরাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে এক জনসভায় বঙ্গ-ভঙ্গ বাঙালী জাতির পক্ষে এক চরম দুর্দৈব বলিয়া বর্ণনা করা হইল। বঙ্গ-ভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ এই সভায় সোচ্চার হইয়া উঠিল। সেই দিন কলিকাতার ছাত্রসমাজও পশ্চাৎপদ ছিল না। ছাত্রদের এক বিশাল শোভাযাত্রা টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। টাউন হলে এই বিশাল জনস্রোতের স্থান সংকুলান না হওয়ায় হলের বাহিরে আরও দুইটি পৃথক সভার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই দুইটি সভার একটির সভাপতিত্ব করেন ভূপেনচন্দ্র বসু অপরটির অম্বিকাচরণ মজুমদার।

কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের আন্দোলনের সমর্থন জ্ঞাপন

কলিকাতা টাউন হলে বিশাল জনসভা : হলের বাহিরে আরও দুইটি সভা

পরের মাসে (সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯০৫) মহালয়ার দিনে কলিকাতা কালীঘাটের কালী-মন্দির প্রাঙ্গণে এক বিরাট সংখ্যক লোক সমবেত হইয়া কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গকে স্বৈরাচারী, অন্যায়মূলক এবং অপ্রয়োজনীয় কুকীর্তি বলিয়া নিন্দাবাদ করিল এবং বয়কট আন্দোলনকে সমর্থনের শপথ গ্রহণ করিল। ক্রমে বয়কট আন্দোলন বাংলার সর্বত্র বিস্তারলাভ করিয়া এক প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করিল। বাংলার ছাত্রসমাজ বিলাতী সামগ্রী যাহাতে কেহ ক্রয় করিতে বা বিক্রয় করিতে না পারে সেজন্য দোকানে দোকানে পিকেটিং করিতে লাগিল। বয়কট আন্দোলন কেবলমাত্র বিলাতী সামগ্রী বয়কটেই সীমাবদ্ধ রহিল না, ইংরাজদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবেও তাহা প্রয়োগ করা হইতে লাগিল। সাহেবদের খানা তৈয়ার করিতে উড়িষ্যার পাচকরা অসম্মত হইল, মুচীরা সাহেবদের জুতা মেরামত করিতে, ধোপা তাহাদের কাপড় পরিষ্কার করিতে রাজী হইল না। শুধু তাহাই নহে, বিলাতী সামগ্রী, বস্ত্র, লবণ, চিনি প্রভৃতি কোন পূজা-পার্বনে ব্যবহার করিলে পুরোহিতরা পূজা করিতে অসম্মত হইলেন। এইভাবে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, শহর-নগরবাসী-গ্রামবাসী সকলেই বয়কট আন্দোলনে যোগদান করিলে সেই আন্দোলন এক শক্তিশালী ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হইল।

বয়কট আন্দোলনের ব্যাপক সমর্থন

দোকানে দোকানে পিকেটিং

পাচক, ধোপা, মুচী—সকল শ্রেণীর মধ্যে বয়কট আন্দোলনের প্রসার

বয়কট আন্দোলন এক শক্তিশালী ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত

বিলাতী বর্জন বা বয়কট আন্দোলন একটি নেতিবাচক (Negative) আন্দোলন ছিল বলা যাইতে পারে। এই আন্দোলন ব্রিটিশ জাতির স্বার্থের উপর কঠোর আঘাত হানিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবাসীর দিক দিয়া এই আন্দোলন নেতিবাচক ছিল বলিয়া পরিপূরক হিসাবে স্বদেশী সামগ্রী প্রস্তুতের ও ব্যবহারের আন্দোলন শুরু হইল। স্বদেশী আন্দোলন বলিতে সেজন্য দুইটি ধারাকেই বুঝায়—বিলাতী সব কিছু বর্জন এবং বিলাতী দ্রব্যাদি বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী সামগ্রীর স্থান পূরণ করিবার জন্য দেশে সেই সব সামগ্রী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা। সুতরাং বয়কট

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন একে অপরের পরিপূরক

আন্দোলনের পরিপূরক স্বদেশী শিল্পজাত সামগ্রী ব্যবহার এই উভয়ে মিলিয়া ব্রিটিশকে কঠিন আঘাত হানিবার আন্দোলন চলিল। বিলাতী সামগ্রীর অসম প্রতিযোগিতায় মৃত বা মৃতপ্রায় দেশীয় শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলা, বিলাতী সামগ্রী বিশেষভাবে মানচেস্টারে প্রস্তুত বিলাতী বস্ত্র সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া ব্রিটিশ জাতিকে অর্থনৈতিক আঘাত হানা এবং বঙ্গ-ভঙ্গ রদের জন্য চাপ সৃষ্টি করা ছিল স্বদেশী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

ব্রিটিশ জাতিকে অর্থনৈতিক আঘাত হানা এবং বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করিতে চাপ দেওয়া

স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বিলাতী বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া সেগুলিতে অগ্নিসংযোগ এবং বিলাতী বস্ত্র বা অপরাপর সামগ্রী যাহাতে কেহ ক্রয় বা বিক্রয় করিতে না পারে সেজন্য দোকানে দোকানে পিকেটিং করা ছিল ছাত্রদের কর্মসূচী। তাহাদের এই কার্যকলাপে সমগ্র ছাত্রসমাজ এবং জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উৎসাহিত হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন ভারতবাসীকে, বিশেষভাবে বাঙালী জাতিকে এক গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রচিত স্বদেশী গান বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া জাতীয়তাবাদের এক উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গানের পালা বাংলার শহরে-গ্রামে স্বাদেশিকতার বন্যা আনিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই", মুকুন্দ দাসের 'ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গ নারী কভু হাতে আর পরো না' প্রভৃতি গান গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-নগরে সকলের মুখে মুখে গীত হইয়া এক অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ছাত্রসমাজের অবদান

স্বদেশী গানের প্রভাব

সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পালের অনন্যসাধারণ বাগ্মিতায় স্বদেশী আন্দোলনের নেশা বাঙালী জাতির অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। বাঙালী জাতি সাহেবী পোশাক ত্যাগ করিল, উকিল, মোক্তার আদালত বর্জন করিলেন, ছাত্রো স্কুল-কলেজ বয়কট করিয়া স্বদেশী আন্দোলনকে ব্যাপক এবং শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। বহু জমিদার, বহু ব্যবসায়ী ব্রিটিশ সরকারের কোপানলে পতিত হইবার ভয় এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা ভুলিয়া গিয়া ব্রিটিশ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিন পালের নেতৃত্ব

স্বদেশী আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে শুরু হইল স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং নূতন নূতন শিল্প স্থাপন। কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা কোম্পানি, চিনি, লবণ, দিয়াশলাই, সাবান, ঔষধের কারখানা প্রভৃতি স্থাপিত হইল। বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্র শিল্প এই আন্দোলনের সূত্রে গড়িয়া উঠিল। এইভাবে স্বদেশী আন্দোলন একদিকে যেমন ব্রিটিশ স্বার্থে আঘাত হানিল, অপর দিকে তেমনি দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পথ উন্মুক্ত করিল। ক্রমে স্বদেশী সব কিছুর এবং স্বদেশের প্রতি এক গভীর মমত্ববোধ সকলের অন্তরে জাগাইয়া তুলিল। ভারতের

স্বদেশী শিল্প স্থাপন

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে জাতীয় আন্দোলন অগ্রসর

জাতীয় আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য।

লর্ড কার্জন ঢাকার নবাব সলিম উল্লাহ্‌কে নিজ পক্ষে টানিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশকে স্বদেশী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে সমর্থ হইলেও আবুল হালিম গজনভী, লিয়াকৎ হুসেন, আব্দুল রসুল, মহম্মদ ইসমাইল প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ-ভঙ্গ কার্যকর হইবার দিন বলিয়া স্থিরীকৃত ছিল। সেই দিন বাঙালী জাতি শোকদিবস হিসাবে পালন করিয়াছিল এবং অনশনে কাটাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই দিন রাখীবন্ধন উৎসবের প্রচলন করিলেন। ব্যবচ্ছিন্ন বাংলার মানুষ যে ভাই ভাই, তাহাদের ভ্রাতৃবোধ যে অটুট এবং অবিচ্ছেদ্য তাহার প্রতীক হিসাবে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান নির্বিশেষে একে-অপরের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিলেন। ঐ দিনই 'ফেডারেশন হল' বা মিলন-মন্দির নামে একটি সভাগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়া বাঙালী জাতির ঐক্যের স্থায়ী প্রতীক চিহ্ন গড়িবার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইল। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মিলনক্ষেত্র হিসাবে এই মিলন মন্দিরের ভিত্তি সেদিন স্থাপিত হইয়াছিল। বাংলার অন্যতম কৃতী সন্তান আনন্দমোহন বসু সেদিন অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও এই মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে পঞ্চাশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। এই জনসভায় সকলে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, সমগ্র বাঙালী জাতির প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া সরকার বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে সেই দুর্দৈবের যাবতীয় কুফল হইতে জাতিকে রক্ষা করিতে এবং বাঙালী জাতির ঐক্য অটুট রাখিতে সকলে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।*

রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধন উৎসবের প্রচলন

মিলন-মন্দির বা ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

সেই দিন (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫) কলিকাতা এবং সমগ্র বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। সমগ্র বাংলাদেশ যেন সেদিন থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দোকান পাট সব বন্ধ ছিল, কোন যান চলাচল করে নাই, ছাত্র ও যুব সমাজ বন্দে মাতরম্ গান প্রাতঃকাল হইতে গাহিয়া পথ পরিক্রমা করিতেছিল। দলে দলে লোক গঙ্গা নদীতে স্নান করিয়া সেই পাপগ্রস্ত দিনের অভিসম্পাত স্খালন করিতেছিল।

১৯০৫, ১৬ই অক্টোবরের ঘটনা

বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন-প্রসূত স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ রহিল না। বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নাংশে এই আন্দোলন প্রসারিত হইল। বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীমতী যোশী, শ্রীমতী কেতকার বোম্বাই প্রদেশে স্বদেশী আন্দোলনকে এক শক্তিশালী ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে চণ্ডিকা দত্ত, রামগঙ্গারাম মুন্সীরাম (পরবর্তী কালে শ্রদ্ধানন্দ

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত

* Vide R. C. Majumdar: *History of Freedom Movement*, p. 26.

মাদ্রাজে আনন্দ চারলু, সুব্রহ্মনিয়াম আয়ার, টি. এস. নায়ার প্রভৃতি স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। এইভাবে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন এক সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

বাংলার ছাত্র সমাজের অবদানের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনে তাহাদের যোগদানের ফলে একদিকে যেমন আন্দোলনের শক্তি ও ব্যাপকতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি অপর দিকে ব্রিটিশ সরকারের ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। স্বভাবতই, ব্রিটিশ সরকার ছাত্র সমাজকে এই আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সচেষ্ট হইলেন। কার্লাইল সারকুলার (Carlyle Circular Oct. 10, 1905) নামে এক গোপন আদেশ জারি করিয়া স্কুল-কলেজের ছাত্রদের পক্ষে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান শৃঙ্খলাহীনতা বিবেচিত হইবে এবং স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ এই কাজে বাধা না দিতে পারিলে সেই স্কুল বা কলেজ সরকারী অনুদান হইতে বঞ্চিত হইবে, স্কুল বা কলেজের অনুমোদন (Affiliation) নাকচ করা হইবে। মিঃ আর. ডব্লিউ কার্লাইল ছিলেন বাংলা সরকারের অস্থায়ী প্রধান সচিব। এই সারকুলারের পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা পেড্‌লার সাহেব (Director of Public Instruction) কলিকাতার কোন কোন কলেজের ছাত্ররা পিকেটিং-এ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল সেইজন্য সেই সব কলেজের অধ্যক্ষদের কারণ দর্শাইতে বলিয়াছিলেন। কার্লাইল সারকুলার ও পেড্‌লার সাহেবের অধ্যক্ষদের উপর কারণ দর্শাইবার নোটিশ সর্বত্র দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। সমসাময়িক সংবাদপত্রে এই দুই আদেশকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছিল।

ছাত্র সমাজকে স্বদেশী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা:

কার্লাইল সারকুলার

পেড্‌লারের আদেশ

বাংলার জনসাধারণ কার্লাইল সারকুলার ও পেড্‌লার সাহেবের অধ্যক্ষদের উপর কারণ দর্শাইবার নোটিশ সহজ মনে গ্রহণ করিল না। অক্টোবরের ২৪ তারিখে আব্দুল রসুলের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় কার্লাইল সারকুলারের নিন্দা করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের জন্য স্বাধীন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। ইহাই ছিল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) স্থাপনের সূত্রপাত। ঐ তারিখেই দুই হাজার মুসলমান কলেজ স্কোয়ারে এক সভায় মিলিত হইয়া স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সতীশচন্দ্র মুখার্জী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির উপস্থিতিতে কার্লাইল সারকুলারের নিন্দা করা হইল এবং ছাত্র সমাজের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের সমর্থন জানান হইল। চারুচন্দ্র মল্লিকের পটলডাঙ্গার বাড়ীতে এই সভা বসিয়াছিল। বিভিন্ন কলেজের বহু ছাত্র এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

কার্লাইল সারকুলারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ: জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত

রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবর্গের কার্লাইল সারকুলারের নিন্দাবাদ

এ-দিকে নূতন প্রদেশ 'ইস্টার্ণ বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম'-এ ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলন হইতে বিরত রাখিবার জন্য প্রধান সচিব মিঃ পি. সি. লায়ন কার্লাইল সারকুলারের

অনুরূপ আদেশ জারি করিলে রংপুর জেলা স্কুলের ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলন-সংক্রান্ত সভায় যোগদানের অপরাধে জরিমানা করা হইল। এইভাবে পূর্ববঙ্গেও ছাত্রদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইলে কলিকাতায় এক সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচিত হইল। সরকারের ছাত্র নির্যাতন নীতির বিরোধিতার জন্য 'এণ্টি-সারকুলার সোসাইটি' (Anti-Circular Society) নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইল। নূতন প্রদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বা ছোট লাট সার্ ব্যামফিল্ড্ ফুলার (Sir Bamfylde Fuller) সমগ্র পূর্ববঙ্গে এক মধ্যযুগীয় বর্বরতার সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের মোকাবিলা করিতে লাগিলেন।

নূতন প্রদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর ব্যামফিল্ড্ ফুলারের স্বদেশী আন্দোলন দমনে বর্বরতার আশ্রয় গ্রহণ

এ-দিকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারী বহু ছাত্র, শিক্ষক স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন। বহু ছাত্রকে স্কুল-কলেজ হইতে বহিষ্কারও করা হইয়াছিল। ইহাদের শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিকভাবেই তদানীন্তন নেতৃবর্গের অন্যতম দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হইল। এই সব প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে জাতীয় স্কুল নামে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু জাতীয় স্কুল বা স্বদেশী স্কুল স্থাপিত হইল। এণ্টি-সারকুলার সোসাইটি এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি' (Dawn Society) এই ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। সতীশচন্দ্র তদানীন্তন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্র দত্ত প্রভৃতির সাহায্য লইয়া ১৬ই নভেম্বর (১৯০৫) তারিখে আহূত এক বিরাট জনসভায় "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" (National Educational Council) নামে এক সংস্থা স্থাপন করেন। জাতীয় শিক্ষার জন্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকা, সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা এবং সূর্যকান্ত চৌধুরী আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চলিতে লাগিল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রসারের উদ্যোগ ও উৎসাহ দিয়াছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু, তারকনাথ পালিত, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাক্তার নীলরতন সরকার ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

স্বদেশী স্কুল স্থাপন

এণ্টি-সারকুলার ও ডন সোসাইটির কাজ

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা (১৯০৫)

পর বৎসর (১৯০৬) অরবিন্দ ঘোষকে অধ্যক্ষ করিয়া জাতীয় কলেজ স্থাপিত হয়। একই সঙ্গে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট্ নামে একটি কারিগরি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট্-ই পরবর্তী কালে রূপান্তরিত হয় যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। কলিকাতা ভিন্ন মফঃস্বল অঞ্চলেও জাতীয় স্কুল স্থাপিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রে এইভাবে স্বদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপিত হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা ব্যবস্থার বাহিরে শিক্ষার প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। শুধু

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন

বাংলাদেশেই নহে, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বোম্বাই, মাদ্রাজ, অযোধ্যা, এলাহাবাদ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নাঞ্চলে স্থাপিত হয়। বহু জাতীয় স্কুল এজন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রে জাতীয় অর্থাৎ স্বদেশী শিক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন ভারতবাসীর জাতীয় আন্দোলনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস সন্দেহ নাই।

জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি, ১৮৮৫-১৯১৯ (Progress of the National Movement from 1885-1919): ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারত-ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি ভারতের জাতীয় জীবন এই জাতীয়-প্রতিষ্ঠানটিকে আশ্রয় করিয়া অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ইতিপূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর অবশিষ্ট কয়েক বৎসর কংগ্রেসের কার্যকলাপ দুইটি প্রধান নীতির উপর নির্ভরশীল ছিল, যথাঃ (১) সরকারী কার্যকলাপ ও নীতির সমালোচনা করা এবং (২) সংস্কার দাবি করা। কোন প্রকার প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অবতীর্ণ না হইয়া কংগ্রেসের সভায় প্রস্তাব পাস করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা-ই ছিল সেই যুগে কংগ্রেসের কার্যপন্থা। দেশবাসীর দারিদ্র্য, অস্ত্র-আইন (Arms Act), আবগারী শুল্ক ও লবণকর প্রভৃতি বিষয়ে সরকারী নীতির সমালোচনা করিয়া কংগ্রেস সংস্কার দাবি করিতে লাগিল। স্বায়ত্তশাসন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা গঠন, সাধারণ ও যান্ত্রিক শিক্ষা প্রবর্তন, ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষাদান, সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস, কার্যনির্বাহক (Executive) ও বিচার-কার্য পৃথকীকরণ, সরকারী ব্যয়হ্রাস, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে একই সঙ্গে পরীক্ষা দ্বারা আই. সি. এস.-পদে লোক নিয়োগ করা, শাসনব্যবস্থায় ভারতবাসীকে উচ্চপদস্থ চাকরী-পদে নিয়োগ করা প্রভৃতি দাবি কংগ্রেস উত্থাপন করিল। কিন্তু এই সকল দাবি অথবা সরকারী কার্যকলাপের সমালোচনায় কংগ্রেস মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার এবং সংযত ভাষা ব্যবহার করিতে কখনও অন্যথা করিল না। ভারতবাসীদের দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ ও ব্রিটিশ জাতির নেতৃবৃন্দকে সচেতন করিয়া তোলাই ছিল সেই সময়ের কংগ্রেসী আন্দোলনের উদ্দেশ্য। সরকার কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতি প্রথম দিকে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সরকারী কর্মচারিবর্গের অনেকে যোগদানও করিয়াছিলেন। পর বৎসর (১৮৮৬) কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। অধিবেশন-অবসানে লর্ড ডাফ্‌রিন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের গবর্ণরও অনুরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। এ-দিকে ক্রমেই কংগ্রেসী আন্দোলন শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস স্বদেশী জিনিসপত্রের প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার এবং ভারতীয় শিল্পগুলিকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি একজিবিশনের (Exhibition) ব্যবস্থা করে। সামাজিক দোষ-ত্রুটি দূর করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা জাতীয় জীবনের চির-স্মরণীয় ঘটনা

সমালোচনা ও সংস্কার দাবি

কংগ্রেসী সংস্কার দাবির প্রকৃতি

মর্যাদাপূর্ণ সংযত আন্দোলন

সরকারী সহানুভূতি

সামাজিক কনফারেন্স আহ্বান করিতেও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু এইভাবে ক্রমে কংগ্রেসী আন্দোলন যখন ব্যাপক এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন সরকারের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার মুষ্টিমেয় লইয়া গঠিত কংগ্রেসের দাবি জনগণের দাবি বলিয়া সরকার গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। কংগ্রেস অশিক্ষিত ও দরিদ্র অগণিত ভারতবাসীর মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি হিসাবেই দাবি উত্থাপন করিতেছে, এই কথা জোর করিয়া সরকারকে জানাইতে ত্রুটি করিল না। কিন্তু সরকার কংগ্রেসের দাবি এড়াইয়া চলিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা মিঃ হিউম সরকারী মনোবৃত্তির নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন, "জাতীয় কংগ্রেস সরকারকে শিখাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার শিক্ষাগ্রহণে রাজী নহেন।"*

সরকারী মনোভাবের পরিবর্তন—কংগ্রেসের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব

প্রাথমিক চেষ্টা ফলপ্রসূ হইল না দেখিয়া কংগ্রেস ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয় স্থানেই কংগ্রেসী দাবির সমর্থনে জনমত গঠনে সচেষ্ট হইল। এজন্য ইংলণ্ডে 'ইণ্ডিয়া' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইল। সভা ও বক্তৃতার আয়োজনও করা হইল। ইংলণ্ডে এই আন্দোলন ফলপ্রসূ হইল। পার্লামেন্টের সদস্য চার্লস্ ব্রাড্‌লফ্ (Charles Bradlaugh) ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বোম্বাই কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন এবং পরবৎসর কংগ্রেসের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কার-প্রবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এমতাবস্থায় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল্‌স্ এ্যাক্ট্ পাস করা হইল (কাউন্সিল্‌স্ এ্যাক্টের বিশদ আলোচনা ২৯৬-২৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। ইহাই হইল কংগ্রেসী আন্দোলনের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ফল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিল্‌স্ এ্যাক্ট্ কংগ্রেসী দাবির এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মানিয়া লইল। ফলে আন্দোলনের উপশম হইল না। ক্রমেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সরকার বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ নেতৃবর্গ ব্রিটিশ সরকারের নিকট 'আবেদন নিবেদন, নীতি ত্যাগ করিয়া কার্যত সরকারের বিরোধিতার প্রস্তাব করিলেন। ভারতবাসীদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা, জাতীয়তাবোধ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিলক 'কেশরী' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। এইভাবে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের দাবি উত্থিত হইতেছিল, সেই সময়ে ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগাইয়া তুলিবার ব্যবস্থারও কোন ত্রুটি হইল না। বলা বাহুল্য, প্রথমে কংগ্রেসী আন্দোলন সকল শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোকের নিকট সমভাবে আকর্ষণীয় হইল না। মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের কেহ কেহ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান এবং সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম হইতেই মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরোধিতা

কংগ্রেস কর্তৃক ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে জনমত গঠনের চেষ্টা—চার্লস্ ব্রাড্‌লফ্ঃ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিল্‌স্ এ্যাক্ট্

বালগঙ্গাধর তিলকের প্রস্তাব

ব্রিটিশের বিরুদ্ধ সক্রিয় আন্দোলনের ও জাতীয়তাবোধ-বৃদ্ধির চেষ্টা

* "The National Congress had endeavoured to instruct the Government, but the Govt. had refused to be instructed."......Mr. A. O. Hume, Vide, *An Advanced History of India*, p. 894.

করিতে লাগিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই আচরণের পশ্চাতে তাহাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা-গ্রহণে পশ্চাৎপদতা প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। মুসলমান সম্প্রদায়ের কংগ্রেস আন্দোলন হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার এমন কি উহার বিরোধিতা করিবার মনোবৃত্তি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি এড়াইল না। সাম্রাজ্যবাদের চিরন্তন অস্ত্র 'Divide and Rule' নীতি তাহারা প্রয়োগে বিলম্ব করিল না। যে ব্রিটিশ জাতি মুসলমান শাসকবর্গের হাত হইতে ভারতের বিভিন্ন অংশের অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিল, সেই ব্রিটিশেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। সার্ সৈয়দ আহ্মদ এজন্য যথেষ্ট দায়ী ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য। তিনি স্বদেশ-বিদ্বেষী ছিলেন এ-কথা বলা অন্যায় হইবে বটে, কিন্তু অনুন্নত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হইতে পারিবে না বিবেচনা করিয়া তিনি একদিকে যেমন মুসলমান সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন অপর দিকে কংগ্রেসী আন্দোলন হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন রাখিবার নীতি অবলম্বন করিলেন। কিন্তু ইহার পূর্বে সার্ সৈয়দ আহ্মদ তাঁহার দেশাত্মবোধের উন্নততর পরিচয় দিয়াছিলেন। ইল্‌বার্ট বিলের বিরোধিতা সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের দুইটি চক্ষুবিশেষ। এই দুইয়ের একটিকে আঘাত করিলে অপরটি স্বভাবতই আঘাতপ্রাপ্ত হইবে।" কিন্তু ইহা আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে হইতে পারে যে, তিনিই প্রথম হইতে কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরোধিতা করিতে শুরু করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'এডুকেশন্যাল কংগ্রেস' নামে একটি সংঘ স্থাপন করিয়াছিলেন। 'ইউনাইটেড পেট্রিয়োটিক্ এসোসিয়েশন' (United Patriotic Association) এবং 'মোহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল ডিফেন্স এসোসিয়েশন অব্ আপার ইণ্ডিয়া' (Mohammedan Anglo-Oriental Defence Association of Upper India) নামে অপর দুইটি কংগ্রেস-বিরোধী প্রতিষ্ঠান স্থাপনেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। সার্ সৈয়দ আহ্মদ যে ব্রিটিশের 'Divide and Rule' নীতির প্রভাবাধীনে এইরূপ করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আলিগড়ের এ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ (Aligarh Anglo-Oriental College)-এর ইংরাজ অধ্যক্ষ এই কলেজটিকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রে পরিণত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সার্ সৈয়দ আহ্মদ মনে করিতেন যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা পাইবে না। এইভাবে ভারতবাসীকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করিয়া তাহাদের স্বার্থ এক নহে, এই মনোভাবের সূচনা সার্ সৈয়দ আহ্মদ করিয়া গিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ-বিষয়ে তিনি কতদূর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং কতদূর নিজস্ব বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, বলা কঠিন। সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার

ব্রিটিশ কর্তৃক 'Divide and Rule' নীতির প্রয়োগ

সার্ সৈয়দ আহ্মদ-সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি

সার্ সৈয়দ আহ্মদের কংগ্রেস-বিরোধিতা

সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ ফলপ্রসূ

বিষবৃক্ষ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ক্রমে উহা মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্বাচনের স্থলে মনোনয়নের ব্যবস্থা, পৃথক নির্বাচন এবং সর্বশেষে পাকিস্তান দাবি প্রভৃতি ফল দান করিল।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও প্রভেদ সৃষ্টি করিয়া ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসী আন্দোলনকে দুর্বল করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা দাবাগ্নির ন্যায় ক্রমেই বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ এবং পেশওয়া-বংশসম্ভূত দেশপ্রেমিক বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের আগুন ছড়াইতে লাগিলেন। সেই সময়ে বোম্বাই প্রদেশে প্লেগ দেখা দিলে মিঃ র‍্যাণ্ড্ (Mr Rand) নামে প্লেগ-কমিশনার প্লেগ দমনের নামে অত্যাচার শুরু করিলেন। ইহার প্রতিবাদে 'কেশরী' পত্রিকা অগ্নি উদ্গিরণ করিতে থাকিলে মিঃ র‍্যাণ্ড্ ও জনৈক ইংরাজ সামরিক কর্মচারীকে আততায়িগণ হত্যা করিল। সরকার তিলককে এজন্য দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। কিন্তু ইহাতে ব্রিটিশ-বিরোধিতার আগুন নির্বাপিত হইল না। ক্রমশ দেশের সর্বত্র দেশাত্মবোধের ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে সমগ্র এশিয়ায় এক নব-জাগরণের সূত্রপাত হওয়ায় ভারতের জাতীয় আন্দোলন অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিল। জাপানের জাগরণ এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ (১৯০৪-০৫) সমগ্র এশিয়ায় এক নব-চেতনা সৃষ্টি করিল। চীন, পারস্য, ভারতবর্ষ, জাপান সর্বত্রই বৈদেশিক প্রভাব ও অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য এক তীব্র আগ্রহ দেখা দিল। দক্ষিণ-আফ্রিকায় সেই সময়ে ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বর্বরোচিত ব্যবহার ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি তিক্ততা বৃদ্ধি করিল।

বালগঙ্গাধর তিলকের অবদান

সমসাময়িক এশিয়া মহাদেশে নব-জাগরণের প্রভাব —দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বর্বরোচিত ব্যবহার

এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড কার্জন কর্তৃক স্বৈরাচারী শাসননীতি-অনুসরণ জনমত সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় ইচ্ছানুসারে যে-কোন ব্যবস্থা অবলম্বন এবং সর্বোপরি তাঁহার ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি জাতীয় আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ দান করিল। 'সরকারী গোপনীয়তার আইন' (Official Secrets Bill) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ, কলিকাতা করপোরেশনের সরকারী নিয়ন্ত্রণে বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি ভারতীয়দের সততা সম্পর্কে তাঁহার কটূক্তি এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। এমন সময়ে কার্জন শাসনকার্যের সুবিধার অজুহাতে বাংলাদেশের একাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া 'ইস্টার্ণ বেঙ্গল ও আসাম' নামক প্রদেশটি গঠন করিলে এক প্রবল আন্দোলনের সূচনা হইল। সমগ্র বাংলাদেশে এক দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হইল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার সর্বত্র আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। ব্রিটিশ-সামগ্রী বয়কট করা হইল। স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ এই আন্দোলনে যোগদান করিল। বিদেশী সামগ্রী বিক্রয়-নিবারণ এবং বিলাতী সামগ্রী একত্রিত করিয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ করিবার কার্যে তদানীন্তন ছাত্রসমাজ অগ্রণী ছিল। স্বদেশী জিনিসপত্র

লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন

ক্রয় করা এবং বিলাতী দ্রব্য বর্জন করা সেই যুগের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নীতি ছিল।

স্বদেশী আন্দোলন

'স্বদেশী আন্দোলন' জাতীয় মর্যাদা, জাতীয় '[illegible]' [illegible] স্বাধীনতাবোধ এবং আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিল। ঋষি বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মহামন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিল। এই মহামন্ত্রের প্রভাবে

'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্র

একদিকে যেমন সমগ্র বাঙালী জাতি এবং ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ এক নব-শক্তি লাভ করিল, তেমনি অন্যদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে উহা বিরক্তির সৃষ্টি করিল। প্রকাশ্য স্থানে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা নিষিদ্ধ হইল। ফলে, এই মহামন্ত্রের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন সমগ্র ভারতে এক প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের আপাত উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের ব্যবচ্ছেদ রোধ করা, কিন্তু ইহার মূল এবং অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য ছিল শতগুণে ব্যাপক। ভারতবাসীদের অন্তরে ক্রম-সঞ্চিত ব্রিটিশ-বিরোধিতা এবং তাহাদের গভীর জাতীয়তাবোধ এই আন্দোলনের সূত্র ধরিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। এই আন্দোলন এক অভূত-

অভূতপূর্ব জাতীয় চেতনা

পূর্ব নব-চেতনায় সমগ্র ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সমগ্র দেশে জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত মুখে মুখে গীত হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন এবং আরও অসংখ্য রচয়িতার রচিত গান বিশেষভাবে

স্বদেশী সঙ্গীত

বাংলাদেশের শহর-নগর ও গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল। বিপিনচন্দ্র পালের জ্বালাময়ী বক্তৃতা বাঙালীর অন্তরে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বালাইয়া তুলিতে লাগিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য পোশাক-পরিচ্ছদধারী ব্যক্তিবর্গ বিদেশী পোশাক পরিত্যাগ করিয়া, বাংলার নারীজাতি গৃহস্থালির কাজ ফেলিয়া, ছাত্রেরা স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, এমন কি বহুসংখ্যক জমিদার ও ব্যবসায়ী তাঁহাদের আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভুলিয়া এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

আন্দোলনের ব্যাপকতা—সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের যোগদান

সম্ভ্রান্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আব্দুল রসুল, লিয়াকৎ হুসেন, গজনভী প্রভৃতিও এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনায় দেশীয় কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানি, সাবানের কারখানা, ঔষধের কারখানা প্রভৃতি স্থাপিত হইল। শিবনাথ শাস্ত্রী, সুবোধ মল্লিক, আনন্দমোহন বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুন্দরীমোহন দাস, অশ্বিনী-কুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি বাংলার চিরস্মরণীয় মনীষিগণ এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিলেন। জাতীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থারও ত্রুটি হইল না। 'ন্যাশনাল

স্বদেশী শিক্ষার ব্যবস্থা

কাউন্সিল অব্ এডুকেশন' (National Council of Education) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করিয়া উহার উপর জাতীয় শিক্ষাপ্রসারের ভার অর্পণ করা হইল। ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ, যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, ফেডারেশন হল, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবেই গড়িয়া উঠিল। মুকুন্দ দাস তাঁহার দেশাত্মবোধক গানে বাংলার বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের

শহর ও গ্রামের জনগণকে মাতাইয়া তুলিলেন। (বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ৩০৫-৩০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

বৃটিশ সরকার এই আন্দোলন দমন করিবার চেষ্টায় যথেষ্ট অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। তিলক, বিপিন পাল, লাজপৎ রায় ও অরবিন্দ ঘোষ কংগ্রেসের নরমপন্থীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা চরমপন্থী দল হিসাবে পরিচিতি লাভ করিলেন। আবেদন-নিবেদন নীতি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে চাহিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ দেখা দিল। চরমপন্থিগণ স্বরাজ (Self-govt.) লাভ কংগ্রেসের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। প্রেসিডেণ্ট দাদাভাই নৌরোজীর ব্যক্তিগত চেষ্টায় চরমপন্থীদের প্রকাশ্য বিরোধের উপশম ঘটিল এবং 'স্বরাজ'-লাভ কংগ্রেসের আদর্শ হিসাবে গৃহীত হইল। পরবৎসর সুরাট অধিবেশনে নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধিতা চরমে পোঁছিলে নরমপন্থিগণই প্রাধান্য লাভ করিলেন। কিন্তু চরমপন্থিগণ ইহাতেই পরাজয় স্বীকার করিলেন না। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকা, বিপিন পালের 'বন্দে মাতরম্' (শ্রীঅরবিন্দ এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার লইয়াছিলেন), মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি' এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'যুগান্তর' চরমপন্থীদের ভাবধারায় সমগ্র বাংলা তথা ভারতের যুব-সম্প্রদায়কে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিল। সেই সময় 'অনুশীলন সমিতি' নামে প্রতিষ্ঠানটিও স্থাপিত হইয়াছিল।

চরমপন্থী দলের প্রভাব—'স্বরাজ' কংগ্রেসের আদর্শ বলিয়া গৃহীত

সুরাট কংগ্রেস (১৯০৭) চরমপন্থিগণের প্রাধান্যনাশ

চরমপন্থী মতবাদের প্রচার

১৯০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দে চরমপন্থীদের উপর সরকারের কোপদৃষ্টি পতিত হওয়ায় এই দলের নেতৃবর্গের অনেককেই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। বিপিন পাল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতিকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। অরবিন্দ ঘোষ অবশ্য বিচারে খালাস পাইলেন। সরকার-বিরোধী সভাসমিতি নিষিদ্ধকরণ, স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থকদের উপর পাইকারী হারে জরিমানা, চরমপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকাগুলিকে নানা অজুহাতে দমন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকার ত্রুটি করিলেন না।

চরমপন্থীদের উপর সরকারী আক্রোশ

সরকারী দমননীতি যতই কঠোর হইয়া উঠিতে লাগিল, বাঙালী যুব-সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ-বিরোধিতাও ততই প্রবলতর ও দৃঢ়তর হইতে লাগিল। কঠোর দমন-নীতিতে অতিষ্ঠ হইয়া বাঙালী যুব-সম্প্রদায় সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ব্রিটিশ দমন-নীতি—সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব

সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ (Militant Nationalism): ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পূর্ব হইতেই সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের সূচনা হইয়াছিল। ইহা ভারতের সনাতন ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ভারতের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন এবং ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্তি এই কয়েকটি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি

—এই তিনটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়াই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়াছিল এবং ক্রমে ইহা ভারতের অপরাপর অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

সংগ্রামী বা সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় বাসুদেব বলবন্ত ফাদকের ব্রিটিশ-বিরোধী চেষ্টায়। পশ্চিম-ভারতে ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনসাধারণের অশেষ ক্লেশ দেখিয়া ফাদকের অন্তরে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, এই দুর্দশার মূল কারণ হইল ভারতের পরাধীনতা। স্বাভাবিকভাবেই ফাদকে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্য কৃত-সংকল্প হইলেন। কিন্তু সেজন্য যে-সংগ্রাম চালাইতে হইবে তাহার ব্যয় সংকুলানের উদ্দেশ্যে তিনি রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করিলেন। অর্থ সঞ্চয় করিয়া তিনি গোপনে একশত জনের এক সশস্ত্র বাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকার জানিতে পারিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। কিন্তু ব্রিটিশের কারাগারে তিনি আবদ্ধ থাকিতে চাহিলেন না। স্বেচ্ছায় খাদ্য গ্রহণ ত্যাগ করিয়া তিনি আত্মাহুতি দিলেন। তাঁহার আত্মা ব্রিটিশ কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া ভারত-ইতিহাসে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রামী শহীদ হিসাবে অমর হইয়া রহিল। সেই সময়ে মহারাষ্ট্রে ফাদকের সশস্ত্র বাহিনী ভিন্ন অপরাপর গোপন সমিতি ইতালির কার্বোনারী নামক বিপ্লবী সমিতির অনুকরণে ভারতের অপরাপর অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফাদকের গোপন সশস্ত্র বাহিনী অবশ্য এগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল।

বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রথম শহীদ

পরবর্তী দীর্ঘকাল সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের কোন সক্রিয় কার্যকলাপ তেমন কিছু ছিল না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মহারাষ্ট্রেই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই। বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব গণপতি উপাসনাকে এক রাজনৈতিক উৎসবে পরিণত করিলেন। এই উৎসবের সূত্র ধরিয়া মেলা, শোভাযাত্রা, বক্তৃতা সব কিছুর মাধ্যমে জনসাধারণের অন্তরে দেশাত্মবোধ, শারীরিক শক্তি সঞ্চয়, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইল। এক বিপুল উৎসাহ সর্বত্র পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু তিলকের শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান গণপতি উৎসব অপেক্ষা বহুগুণে বেশি সংগ্রামী জাতীয়তাবোধ জনসাধারণের মনে জাগাইয়া তুলিল। তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকায় মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য শিবাজীর অবদানের ইতিহাস উল্লেখ করিয়া শিবাজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন (১৮৯৫)। রায়গড়ে শিবাজীর সমাধি সৌধের সংস্কার সাধন করিয়া শিবাজীর প্রতি মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলেন। ঐ বৎসরই সর্বপ্রথম শিবাজী উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবে বক্তৃতাদানের কালে তিলক শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁ'র হত্যা যুক্তি-তর্কের দ্বারা সমর্থন করেন এবং দেশ রক্ষার জন্য এইরূপ কার্যকলাপ নিন্দনীয় নহে এই ধারণার সৃষ্টি করেন। তিলক শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে শিবাজীকে

তিলক কর্তৃক গণপতি উৎসব এক রাজনৈতিক উৎসবে রূপান্তরিত

শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে মারাঠা জাতি সংগ্রামী জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ

শিবাজী ও স্বরাজ অভিন্ন এবং সমার্থক

স্বরাজ অর্থাৎ স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করেন। শিবাজী ও স্বরাজ জনসাধারণের কাছে সমার্থক বলিয়া বিবেচিত হয়।

তিলকের চেষ্টায় যখন মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ সংগ্রামী জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ ও উৎসাহিত সেই সময়ে পুণায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। ইংরাজ কর্মচারীরা প্লেগ প্রতিরোধ করিতে গিয়া প্রত্যেক বাড়ীতে প্লেগে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি আছে কিনা দেখিতে এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে সামরিক বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করেন। সামরিক বাহিনীর লোকেরা প্লেগ প্রতিরোধ ও প্রতিষেধের অজুহাতে লোকের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকের প্রতি অশালীন ব্যবহার শুরু করিলে বালকৃষ্ণ চাপেকার ও দামোদর চাপেকার নামে দুই ভ্রাতা পুণার কালেক্টর মিঃ র‍্যাণ্ড্‌ এবং সামরিক বাহিনীর লেফ্‌টেনান্ট আয়ার্স্টকে হত্যা করেন। র‍্যাণ্ড্‌ ছিলেন প্লেগ প্রতিরোধ কমিটির প্রেসিডেন্ট্‌। তাঁহারই আদেশে সেনাবাহিনীর লোকেরা প্রত্যেক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার অত্যাচার ও স্ত্রীলোকের প্রতি অশালীনতার চরম করিতেছিল। বিচারে চাপেকার ভ্রাতাদের ফাঁসি হয় (১৮৯৮)।

প্লেগ প্রতিরোধ ও প্রতিষেধের অজুহাতে সামরিক বাহিনীর স্ত্রীজাতির প্রতি অশালীন ব্যবহার

র‍্যাণ্ড্‌ ও আয়ার্স্ট-এর হত্যা : চাপেকার ভ্রাতা দুইজনের ফাঁসি

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী উৎসবের সূচনার পর হইতে প্রতি বৎসর এই উৎসব পালন করা হইতেছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী উৎসব যেদিন অনুষ্ঠিত হইল তাহার পর দিন র‍্যাণ্ড্‌ ও আয়ার্স্ট সাহেবের হত্যাকাণ্ড ঘটে। এজন্য শিবাজী উৎসব এবং উৎসবের উদ্যোক্তা তিলককে দায়ী করা হইল। তিলককে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার বিচার করা হইল। বিচারে তাঁহার ১৮ মাস কারাদণ্ড হইল।

তিলকের কারাদণ্ড

চাপেকার ভ্রাতাদের গ্রেপ্তার করা সহজ ছিল না। কিন্তু দ্রাভিড্‌ নামে দুই ভ্রাতা তাঁহাদের ধরাইয়া দিয়া প্রচুর পুরস্কার পাইয়াছিল। চাপেকারদের তৃতীয় ভ্রাতা বাসুদেব চাপেকার দ্রাভিড্‌ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন (১৮৯৯)।

দ্রাভিড্‌ ভ্রাতৃদ্বয় হত্যা

পশ্চিম-ভারতও সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল না। ঠাকুর সাহেব নামে এক রাজপুত অভিজাত ব্যক্তির নেতৃত্বে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীদের এক গোপন সমিতি গঠন করা হইয়াছিল। এই ঠাকুর সাহেবের সান্নিধ্যে আসিয়া অরবিন্দ ঘোষ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ে বরোদা কলেজে উপাধ্যক্ষ ছিলেন।

পশ্চিম-ভারতে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সূচনা

এ-দিকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর সাভারকার নাসিকে মিত্রমেলা নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। আজীবন সংগ্রামী সাভারকার মিত্রমেলার সদস্যবর্গকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই 'মিত্রমেলা'ই কয়েক বৎসর পর (১৯০৪) 'অভিনব ভারত' নামে নামান্তরিত হয়। তিনি ইতালির ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান পথিকৃৎ জোসেফ্‌ ম্যাৎসিনির ইয়ং ইতালির অনুকরণে 'অভিনব ভারত' নাম দিয়াছিলেন।

মধ্যপ্রদেশেও সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছিল। সেখানে 'আর্যবান্ধব সমাজ' নামে এক বিপ্লবী সংস্থা স্থাপিত হয়। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হাজার হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত সময়ে ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশদের তাড়াইবার ব্যবস্থা করা। এই বিপ্লবী সংস্থার কার্যকলাপ সম্পর্কে অবশ্য পরে কোন কিছু আর জানা যায় নাই।

মধ্যপ্রদেশে আর্যবান্ধব সমাজ নামে বিপ্লবী সমিতি গঠন

বিপ্লবের সর্বাধিক উর্বর ক্ষেত্র ছিল বাংলা। বাংলার বিপ্লবী সমিতি ব্যারিস্টার পি. মিত্রের নেতৃত্বাধীনে স্থাপিত হয়। এই সমিতির নাম দেওয়া হয় 'অনুশীলন সমিতি'। বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষরূপে কর্মরত অবস্থায় অরবিন্দ ঘোষ ঠাকুর সাহেবের বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে উল্লিখিত ভবানী মন্দিরের ও সন্তান দলের আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে ঐ ধরনের গোপন বিপ্লবী সমিতি স্থাপন করিয়া বাঙালীর ব্রিটিশ-বিরোধী, স্বাধীনতাকামী আন্দোলনকে বিপ্লবী সংগ্রামের পথে চালিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

পি. মিত্রের বিপ্লবী সমিতি, অনুশীলন সমিতি

এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার প্রভাব খাটাইয়া যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জনৈক বাঙালীকে বরোদার সেনাবাহিনীতে যোগদানের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ সেনাবাহিনীর রীতি অনুযায়ী সামরিক শিক্ষা শেষে সেনাবাহিনী হইতে পদত্যাগ করিলেন। অরবিন্দ ঘোষ তাঁহাকে বিপ্লবী গোপন সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। যতীন্দ্রনাথের গোপন সমিতি অবশ্য শেষ পর্যন্ত অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া পড়ে। আপাত-দৃষ্টিতে অনুশীলন সমিতি দেহচর্চার উদ্দেশ্যে লাঠিখেলা, কুস্তি, কুচ্‌কাওয়াজ, ছোরাখেলা প্রভৃতি করিত। কিন্তু এই সবের পশ্চাতে বিপ্লবী সংগঠন, বিপ্লবী কার্যকলাপ এবং সেজন্য মানসিক দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার প্রশিক্ষণ গোপনে চলিতেছিল।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেহচর্চার অন্তরালে বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রস্তুতি

বিপ্লবী সংগঠনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তেমন সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার সেই সময়ে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। অল্পদিনের মধ্যেই যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রের মধ্যে মতান্তর ঘটায় অরবিন্দকে সেই বিবাদ মিটাইতে কলিকাতা আসিতে হইয়াছিল। অরবিন্দ অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিলেন এবং ইহার ব্যয়ভার প্রধানত তিনিই বহন করিতেন। চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট হইতেও অনুশীলন সমিতি যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সাহায্য পাইয়াছিল। এইভাবে অরবিন্দের আগ্রহে বাংলার বিপ্লবী সমিতি ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর শক্তি সঞ্চয় যেমন করিতে লাগিল, তেমন উহার সংগঠনও ক্রমেই বাংলার বিভিন্ন অংশে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য অরবিন্দ স্বয়ং বিভিন্ন স্থানে গিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় হইতে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশে আরও শক্তি সঞ্চয় করে। ১৯০৬

অনুশীলন সমিতি: বারীন্দ্র ও অরবিন্দ

অরবিন্দের অনুশীলন সমিতিতে যোগদান

খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ কলিকাতা জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিয়া অনুশীলন সমিতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হইলে বাংলার সংগ্রামী বিপ্লববাদ এক অদম্য শক্তি অর্জন করিতে থাকে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গ-ভঙ্গ কার্যকরী হইলে তদানীন্তন নেতৃবর্গের বাগ্মিতায় সন্ত্রাসের কাজ উৎসাহিত

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ (Revolutionary Terrorism): ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন তাঁহার বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকরী করিলে বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। তিলক, লালা লাজপৎ রায়, অরবিন্দ, বিপিন পাল প্রভৃতি তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের অগ্নিক্ষরা বাগ্মিতায় ভারতের বিভিন্নাংশে বিপ্লবী সন্ত্রাসের কার্যকলাপ অধিকতর উৎসাহিত হইল।

যুব ও ছাত্রসমাজকে স্বদেশী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের দমন-নীতির আশ্রয়

স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতা এবং জনসাধারণ কর্তৃক এই আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ব্রিটিশ শাসকদের ভীতির সৃষ্টি করিলে তাহারা সর্বশক্তি দিয়া এই আন্দোলন দমন করিতে লাগিলেন। যুবসমাজ, বিশেষভাবে ছাত্রসমাজের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানে ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গণিলেন। যুব ও ছাত্রসমাজকে স্বদেশী আন্দোলনের কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের পক্ষে কোন সভাসমিতিতে যোগদান, বিলাতী সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং করা, এমন কি 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইল। কিন্তু বাঙালী যুব ও ছাত্রসমাজ ব্রিটিশ সরকারের শক্তি ও শাস্তি দানের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া স্বদেশী আন্দোলনকে সাফল্যের দিকে আগাইয়া দিতে লাগিল। বাংলা ব্যবচ্ছেদ তাহারা মায়ের অঙ্গচ্ছেদের মতই মর্মন্তুদ ও অসহনীয় বলিয়া মনে করিল। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিরোধের জন্য তাহারা তখন জীবনমরণ পণ করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

বরিশাল প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে নেতৃবৃন্দের উপর পুলিসী অত্যাচার

বাঙালী যুব, ছাত্র তথা সমগ্র জাতি যখন এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া বঙ্গ-ভঙ্গ রোধের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতেছিল সেই সময়ে বরিশাল প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দের উপর সরকারের আদেশে পুলিস বাহিনী নির্মম অত্যাচার করিল (১৯০৬)। এই ঘটনা সমগ্র বাঙালী জাতির মনে বিশেষভাবে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের মনে এক প্রতিশোধ-স্পৃহার উদ্রেক করিল।

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের দমনমূলক অত্যাচার

এ-দিকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দিতে লাগিলে বিপ্লবী যুবকদের মনে প্রতিহিংসা গ্রহণের মানসিকতা আরও বৃদ্ধি পাইল। এই সময়ে কিংসফোর্ডের এজলাসে সুশীল নামে জনৈক কিশোর 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিলে কিংসফোর্ড সাহেব তাহাকে পনর ঘা বেত মারিবার আদেশ দিলেন। অল্প বয়সী কিশোর সুশীলের উপর নির্মম শাস্তি

কিশোর সুশীল সেনের নির্মম দণ্ড

বিপ্লবীদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিল। কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করা তাঁহারা তাঁহাদের কর্মসূচীর প্রথম কাজ হিসাবে গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল আগে অনুশীলন সমিতির

গোপন কর্মকেন্দ্র সেই সময়কার 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিস হইতে মুরারিপুকুরের এক বাগানবাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। অরবিন্দ জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়া কলিকাতা চলিয়া আসিবার পর মুরারিপুকুর বাগানবাড়ীর গোপন বিপ্লবী কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া চলিলেন। মুরারিপুকুরের বাগানবাড়ীর গোপন কর্মকেন্দ্রের সহিত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী সমিতিগুলির যোগাযোগ ছিল। রাসবিহারী বসু, কানাইলাল দত্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এবং অপরাপর অনেকে এই গোপন বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সমিতির সদস্য ছিলেন। মেদিনীপুর ও ঢাকায় এই বিপ্লবী সমিতির গুরুত্বপূর্ণ শাখা ছিল। ঢাকা শাখার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন পুলিন বিহারী দাস।

কিংসফোর্ডকে হত্যার কর্মসূচী গ্রহণ

কিংসফোর্ড হত্যার পরিকল্পনার কথা ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দাদের একেবারে অজানা রহিল না। তাঁহার উপর সম্ভাব্য আক্রমণ এড়াইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে মজঃফরপুরে বদলি করা হইল। কিন্তু তাহাতেও বিপ্লবীদের কর্মসূচীর পরিবর্তন ঘটিল না। মজঃফরপুরেই কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা রচিত হইল। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকিকে কিংসফোর্ড হত্যার কাজের জন্য নির্বাচন করা হইল। তাঁহাদিগকে বোমা ও পিস্তল দিয়া মজঃফরপুরে পাঠান হইল। কিন্তু ভুলবশত তাঁহারা ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা যে-গাড়ীতে যাইতেছিলেন সেই গাড়ীকে কিংসফোর্ড-এর গাড়ী মনে করিয়া তাহাতে বোমা নিক্ষেপ করেন। ফলে কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা উভয়েই প্রাণ হারান। পলাইয়া যাইবার কালে মোকামা স্টেশনে প্রফুল্ল চাকি ধরা পড়িলে তিনি নিজে রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করিলেন। ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করা হইল। বিচারে তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হইল (১৯০৮)। ক্ষুদিরামের বয়স সেই সময়ে ছিল মাত্র ১৯ বৎসর। বিচারকালে ক্ষুদিরামের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা, দেশপ্রেম ও দেশসেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরিচয় দেশবাসী পাইল। ক্ষুদিরাম দেশবাসীর অন্তরে এক শ্রদ্ধা ও অমরত্বের আসনে স্থাপিত হইলেন। সমসাময়িক ও পরবর্তী কালে ক্ষুদিরামের ফাঁসির উপর লোকগীতি বাংলায় সর্বত্র গীত হইতে লাগিল।

কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া ভুলবশত কেনেডি সাহেবের স্ত্রী ও কন্যার প্রাণনাশ

প্রফুল্ল চাকির আত্মহত্যা: ক্ষুদিরামের ফাঁসি

ক্ষুদিরাম দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও অমরত্বের সম্মানে স্থাপিত

ক্ষুদিরামের কর্মপন্থা যে সেই যুগের বাঙালী জনসাধারণ সমর্থন করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ ক্ষুদিরামের ফাঁসির উপলক্ষে রচিত বহু লোকগীতি হইতে পাওয়া যায়। ব্যক্তিগতভাবে কোন ইংরাজের প্রাণনাশের নির্মমতার কথা উপলব্ধি করিলেও ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাসীর প্রতিবাদের প্রতীক হিসাবেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তখন সাধারণ্যে সমর্থন লাভ করিয়াছিল। ঐ বৎসরই জুন মাসে (২রা জুন, ১৯০৮) কলিকাতার মানিকতলা অঞ্চলে একটি বোমা প্রস্তুতের কারখানা আবিষ্কৃত হয়। অরবিন্দ ঘোষ এই ব্যাপারে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইলেন। তাঁহাকে হাতকড়া দিয়া এবং কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া হয়। অরবিন্দের গ্রেপ্তারের

সংবাদ সমগ্র বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল।

আলিপুরে বোমার মামলা : আসামীদের অসীম সাহসিকতা ও দেশাত্মবোধ

শুধু অরবিন্দ-ই নহেন, মোট ৪৭ জন চরমপন্থী এই সূত্রে ধরা পড়িলেন। আলিপুর বিচারালয়ে অরবিন্দের বিচার চলিল। অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল প্রভৃতি এই মামলায় আসামী ছিলেন। এই সকল দেশপ্রেমিক যুব-সম্প্রদায়ের নির্ভীকতা ও আদর্শ যে-কোন জাতির পক্ষেই শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই।* ইঁহাদের চরিত্রের দৃঢ়তা ও দেশাত্মবোধে ইংরাজ বিচারকও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকায় এই বিচার সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া ব্রিটিশ শাসনের তীব্র নিন্দাবাদ করিলেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ছয় বৎসর নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। এদিকে আলিপুর বোমার মামলার শুনানী চলিল। তদানীন্তন প্রখ্যাতনামা ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রথম একুশ দিনে একুশ হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া শেষে অরবিন্দের পক্ষে মামলা-পরিচালকদের অর্থের অভাব ঘটিলে মোকদ্দমাটি পরিত্যাগ করিলেন। তখন চিত্তরঞ্জন দাশ—পরবর্তী কালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে চারি বৎসর ধরিয়া মোকদ্দমা চালাইলেন। অবশেষে অরবিন্দ খালাস পাইলেন।

অরবিন্দের মুক্তি—বারীন ও উল্লাসকরের দ্বীপান্তর

বিচারাধীন অবস্থায় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী থাকাকালীন নরেন্দ্র গোঁসাই রাজসাক্ষী হইবার দুঃসাহস করিয়াছিলেন বলিয়া কানাইলাল ও সত্যেন আলিপুর জেলখানার অভ্যন্তরেই নরেন্দ্রকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। কানাইলাল ও সত্যেনের এজন্য ফাঁসি হইয়াছিল। বিপ্লবীদের কোন অবস্থায়ই বিশ্বাসভঙ্গের, অর্থাৎ কোনপ্রকার গোপন তথ্য প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল।

বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নরেন্দ্রের হত্যা

এজন্য প্রত্যেক বিপ্লবীকে এক হাতে গীতা এবং অপর হাতে তরবারি লইয়া শপথ গ্রহণ করিতে হইত। নরেন্দ্র গোঁসাই সেই শপথ লঙ্ঘন করিয়া নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য বিপ্লবীদের গোপন তথ্য প্রকাশ করিতে রাজী হইয়াছিলেন। বিপ্লবের পথে দেশমাতৃকার সেবায় বিশ্বাসঘাতকের কোন স্থান নাই এ-কথা প্রমাণ করিবার এবং বিপ্লবীদের গোপন তথ্য যাহাতে ফাঁস না হয় সেজন্য কানাই ও সত্যেন নিজেদের জীবন দান করিয়াছিলেন। বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের ইহাতে অবসান ঘটে নাই। ইতিমধ্যে বাংলার গবর্ণর এণ্ড্রু ফ্রেজার সাহেবকে হত্যার চেষ্টা, পুলিস সাব্-ইন্স্পেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হত্যা, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যা প্রভৃতি সন্ত্রাস যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

---

* অরবিন্দ ঘোষের জবানবন্দী : "স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করা যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে আমি প্রধান অপরাধী। স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ যদি আইন-বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি দোষী—একথা স্বীকার করি। আমি যাহা করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিব কেন? ইহারই জন্য আমি জীবন ধারণ করিয়াছি। স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন। ইহাই যদি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়, তাহা হইলে আর সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন কি?...... আপনারা আমায় কারারুদ্ধ করিতে পারেন, শৃঙ্খলিত করিতে পারেন, কিন্তু আমার এ অপরাধ আমি কিছুতেই স্বীকার করিব না। আমি অকুণ্ঠভাবেই বলিতে চাই, স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা আইনের কোন ধারাতেই অপরাধ নয়।"

[Contd.]

সন্ত্রাসবাদ সরকারী দমন-নীতির কঠোরতা ও অত্যাচার আরও বৃদ্ধি করিয়া দিল।

সরকারী দমন-নীতি

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-নাশ এবং সভা-সমিতি প্রভৃতি দমনের প্রয়োজনীয় আইন-কানুন পাস করা হইল।

এ-দিকে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত দেশপ্রেমিক মুসলমান যোগদান করিলেও তাঁহাদের পশ্চাতে মুসলমান সমাজের ব্যাপক সমর্থন ছিল না। উপরন্তু তাহারা অনেকে বাংলা ব্যবচ্ছেদের সমর্থন করিয়া ঢাকা শহরে এক সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর আগা খাঁ তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করিলেন। লর্ড মিণ্টো আগা খাঁর এই দাবি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ঢাকার নবাব সলিম উল্লাহ্ 'মুশ্লিম লীগ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। ইংরাজদের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা রাজনৈতিক ও অপরাপর অধিকার আদায় করা-ই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে বিভেদ সৃষ্টি করিবার সুযোগ বৃদ্ধি হইল। লর্ড মোর্‌লি (Morley)-এর ভাষায় 'মুশ্লিম লীগ কংগ্রেস-বিরোধী দেশীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল।'

আগা খাঁ ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিশ্রুতি

মুশ্লিম লীগের নীতি

শিক্ষা অথবা সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটদানের অধিকার দেওয়া মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না বিবেচনা করিয়া আগা খাঁ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করিয়াছিলেন। এইভাবে যে-সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ান হইয়াছিল, তাহার কুফল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষে পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক, কংগ্রেসী আন্দোলনের তীব্রতা ও সন্ত্রাসবাদের আতঙ্কে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 'মোর্‌লি-মিণ্টো সংস্কার' (Morley-Minto Reforms) প্রবর্তন করিলেন।

মোর্‌লি-মিণ্টো সংস্কার (১৯০৯)—সাম্প্রদায়িক নির্বাচন

বারীন্দ্র ঘোষের জবানবন্দী: "আমিই উল্লাসকর ও উপেন্দ্রকে লইয়া বিপ্লবকার্য আরম্ভ করিয়াছি। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী আসামীদের মধ্যে নরেন্দ্র গোঁসাইও আমাদের সঙ্গে ছিল। দেশের লোককে সাহসের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে শিক্ষা আমরা দিয়াছি।"

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানবন্দী: "ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য আমিই বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব করিতাম। আমি ছেলেদের......শিক্ষা দেই যে, আমাদিগকে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। দেশময় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের মত প্রচার করিতে হইবে, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ঠিক সময় উপস্থিত হইলে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।...আমি এসব কথা এজন্য স্বীকার করিলাম যে, নির্দোষ লোক যেন শাস্তি না পায়···আরও বলিলাম এজন্য যে, যাহারা এই কাজ চালাইবে তাহারা যেন অধিকতর সতর্কতার সহিত কাজ করিতে পারে।"

উল্লাসকর দত্তের জবানবন্দী: "ইংরাজ রাজত্বের উচ্ছেদ-সাধন আমার জীবনের ব্রত। এই মহাকার্য সম্পাদনের জন্য আমি নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া বোমা তৈয়ারী করিয়াছি...বারীনদা, আমি, উপেনদা, ইন্দু, প্রফুল্ল, বিভূতি—ইহারাই প্রকৃত কার্যকারক। আমার এই স্বীকারোক্তি করিবার উদ্দেশ্য এই যে, নির্দোষ ব্যক্তি যেন দণ্ডিত না হয়।" শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত, ভারত-পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ, ১১০—১১১ পৃষ্ঠা।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, ১৯০৯-১৯১৯ (Constitutional Reforms, 1909-1919) : মোর্‌লি ছিলেন তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্‌ স্টেট্‌ আর মিণ্টো ছিলেন গবর্ণর-জেনারেল। এই আইনের দ্বারা (১) কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। এই সকল সদস্যের মধ্যে মোট ২৮ জনের বেশি সরকারী কর্মচারী হইতে গ্রহণ করা হইবে না। (২) গবর্ণর-জেনারেল মোট পাঁচ জন সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন। (৩) ২৭ জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। (৪) প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য-সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইল। কেন্দ্রীয় আইনসভার সরকারী সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, কিন্তু প্রাদেশিক আইনসভার যাহাতে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। (৫) এই আইন দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে সদস্য নির্বাচনের অধিকার দান করা হইয়াছিল।

আইনসভার পরিবর্তন

নবগঠিত আইনসভাগুলিকে বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করিবার ও প্রস্তাব আনয়নের অধিকার, দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করিবার এবং সে-বিষয়ে সুপারিশমূলক প্রস্তাব পাস করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সরকার এইরূপ প্রস্তাবের যে-কোনটি অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন। দেশীয় রাজ্য, সামরিক বিভাগ, বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে আইনসভা কোনরূপ প্রস্তাব আনিতে পারিতেন না।

আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার ভারতবাসীদের দাবির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ভারতীয়দের দাবি মিটাইতে পারিল না। শাসন-সংক্রান্ত প্রকৃত ক্ষমতা তখনও ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের হস্তেই রহিয়া গেল। কিন্তু তাহাতে পূর্বেকার অবস্থার যে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে সংস্কার দাবি পুনরায় ব্যাপকভাবে দেখা দিল। কংগ্রেস এবং মুশ্লিম লীগ যুগ্মভাবে সংস্কার দাবি করিয়া এক প্রস্তাব-পত্র সরকারের নিকট পেশ করিল। গোখলে স্বয়ং একখানি প্রস্তাব-পত্র পেশ করিলেন। যুদ্ধের শেষ ভাগে ভারতবাসীর দাবি উপেক্ষা করা চলিবে না বিবেচনা করিয়া তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্‌ স্টেট্‌ মিঃ মণ্টাগু (Mr Montague) ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের ২০শে তারিখে কমন্স সভায় ঘোষণা করিলেন যে, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ভারতবাসী যাহাতে দায়িত্বমূলক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হয়, সেই উদ্দেশ্যে ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যক ভারতবাসীকে শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার নীতি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।"* ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কলিকাতা

প্রথম মহাযুদ্ধ : ভারতে ব্যাপক সংস্কার দাবি

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণা

* "The policy of His Majesty's Government......is that of the increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions for the progressive realisation of responsible govt. in India as an integral part of the British Empire." Vide, *An Advanced History of India*, p. 915.

অধিবেশনে চরমপন্থী দল প্রাধান্য লাভ করিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সেক্রেটারী মণ্টাগু ঐ বৎসরেরই শেষ ভাগে ভারতবর্ষের জনমত সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে এ-দেশে আসিলেন। ভারতবর্ষে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সুপারিশ করিয়া তিনি এবং তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্রয় চেমস্‌ফোর্ড যে-রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন, উহা 'মণ্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট' নামে পরিচিত (১৯১৮)। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আইন পাস করা হইল। এই সংস্কার আইন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কার্যকরী করা হইল।

মণ্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট (১৯১৮)

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন (Reforms of 1919): ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব মোটামুটিভাবে বণ্টন করিয়া দিল। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র-বিভাগ, পরিবহন, ডাক-বিভাগ প্রভৃতি সর্বভারতীয় বিষয়-গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রহিল। প্রাদেশিক সরকার বিচার, জেল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, বনবিভাগ, রাজস্ব, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হইল। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের আয়ও দায়িত্বের অনুপাতে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে ভাইস্রয় ও তাঁহার কার্যনির্বাহক সভার (Executive Council) অধীন রহিল। কেন্দ্রীয় আইনসভার নিকট ভাইস্রয় বা তাঁহার কার্যনির্বাহক সভা দায়ী ছিলেন না। তাঁহারা সেক্রেটারী অব্ স্টেটের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় এক দ্বৈতশাসনের (Diarchy) প্রচলন করা হইয়াছিল। গবর্ণর ও তাঁহার কার্যনির্বাহক সভা শান্তি-শৃঙ্খলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কার্যনির্বাহক সভার নিকট দায়ী ছিলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বিষয়গুলি, যাহা ভারতীয় মন্ত্রিবর্গের হস্তে থাকিলেও ব্রিটিশ স্বার্থের কোন ইতরবিশেষ হইত না, সেগুলির ভার নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত মন্ত্রীদের হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। এগুলিকে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ বা *Transferred Subjects* বলা হইল। অপরাপর বিষয়গুলি সংরক্ষিত বিষয়সমূহ বা *Reserved Subjects* নামে অভিহিত হইত।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার

প্রদেশে দ্বৈতশাসনের প্রবর্তন

'Transferred Subjects' & 'Reserved Subjects'

কেন্দ্রীয় আইনসভার 'কাউন্সিল অব্ স্টেট্' এবং 'লেজিস্‌লেটিভ এ্যাসেম্বলী' দুইটি পরিষদ ছিল। উভয় কক্ষেই যাহাতে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা অধিক হয় সেই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভা সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিত। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে আইনের প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে গবর্ণর-জেনারেলের অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন হইত। গবর্ণর-জেনারেল নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া আইনসভা কর্তৃক অগ্রাহ্য বিল আইনে পরিণত করিতে বা আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত বিল নাকচ করিতে পারিতেন।

দুই-কক্ষযুক্ত কেন্দ্রীয় আইনসভা

প্রদেশগুলিতে (ব্রহ্মদেশসহ মোট দশটি) এক-কক্ষযুক্ত আইনসভা স্থাপন করা হইয়াছিল। এগুলিকে 'লেজিস্‌লেটিভ্‌ কাউন্সিল' (Legislative Council) নামকরণ করা হইয়াছিল। *Transferred Subjects* সম্পর্কে এই সকল আইনসভার অর্থ মঞ্জুর করা-না-করার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। কিন্তু *Reserved Subjects* সম্পর্কে এইরূপ স্বাধীনতা ছিল না।

এক-কক্ষযুক্ত প্রাদেশিক আইনসভা

বলা বাহুল্য, এই আইন ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন দাবির অতি নগণ্য অংশও মিটাইতে পারিল না। প্রকৃত ক্ষমতা সব কিছুই গবর্ণর ও তাঁহার কার্যনির্বাহক সভা এবং গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কার্যনির্বাহক সভার হস্তে ন্যস্ত ছিল। জাতীয় দাবি ইহাতে মিটিল না, ফলে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি তীব্র আকারে দেখা দিল। এই শাসনব্যবস্থায় কার্যনির্বাহক অর্থাৎ Executive বিভাগ আইনসভাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিত। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এই আইন প্রাদেশিক কার্যকে Reserved ও Transferred—এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া এক পক্ষে দায়িত্বহীন ক্ষমতা অপর পক্ষে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব অর্পণ করিয়া শাসনকার্যের দক্ষতা নাশ করিয়াছিল। কিন্তু নির্বাচনমূলক নীতির ভিত্তিতে আইনসভা গঠন করিয়া গণতান্ত্রিকতার সামান্য অগ্রগতি সাধন করা হইয়াছিল, এ-কথা বলা যাইতে পারে।

জাতীয় দাবি উপেক্ষিত

লর্ড মিন্টো, ১৯০৫—১০, লর্ড হার্ডিঞ্জ, ১৯১০—১৫, লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড, ১৯১৫—২১ ও লর্ড রীডিং ১৯২১—২৬ (Lord Minto, 1905-10, Lord Hardinge, 1910-15, Lord Chelmsford, 1915-21, Lord Reading, 1921-26)

লর্ড মিন্টো: লর্ড মিন্টোর শাসনকালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শাসনকালে অভ্যন্তরীণ নীতি জাতীয় আন্দোলনের এবং সন্ত্রাসবাদের দমনে পর্যবসিত হইয়াছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিল্‌স্‌ এ্যাক্ট্‌ পাস, মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, এবং পররাষ্ট্রক্ষেত্রে এ্যাংলো-রাশিয়ান কন্‌ভেন্‌শন্‌ স্বাক্ষরের ফলে তিব্বত, পারস্য ও আফগানিস্তান-সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধান প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ

লর্ড হার্ডিঞ্জ: লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও তাঁহার পত্নী সম্রাজ্ঞী মেরী ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন (১৯১১)। সেই সময় দিল্লীতে এক দরবার আহূত হয়। এই দরবারে ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরকরণের এবং বঙ্গ-ভঙ্গ রোধের ঘোষণা করা হইয়াছিল। লর্ড মোর্‌লির স্পর্ধিত ঘোষণা যে, বঙ্গ-ভঙ্গ একটি 'Settled Fact', বাঙালী তথা কংগ্রেসী আন্দোলনের ফলে 'Unsettled' হইয়াছিল। এই সূত্রে সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "We unsettle settled facts" লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালেও সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটে নাই। তাঁহার উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া সন্ত্রাসবাদী রাসবিহারী বসু পলাইয়া গিয়াছিলেন। হার্ডিঞ্জ বিস্ফোরণের ফলে আহত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জনৈক অনুচর প্রাণ হারাইয়াছিল।

বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ (১৯১১): কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত

লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালের শেষ ভাগে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হইলে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরিত হইয়াছিল। নরমপন্থী দল সরকারকে পূর্ণ সহায়তা দান করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, যুদ্ধের ব্যয়-সংকুলানের জন্য ভারতবাসীর দান নেহাত কম ছিল না।

প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবাসীদের সহায়তাদান

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড: প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্যদানের বিনিময়ে ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে শাসনতান্ত্রিক উদারতাই আশা করিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরে ব্রিটিশ সরকার সম্পূর্ণ অত্যাচারী নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের ফলে দ্রব্যমূল্য অত্যধিকমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল। তদুপরি দেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলনের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণের দুর্দশার আর সীমা ছিল না। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিও সেই সময়ে প্রবলভাবে দেখা গিয়াছিল। সন্ত্রাসবাদেরও অবসান ঘটে নাই। এইরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার দমন-নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাওল্যাট আইন (Rowlatt Act) নামে এক আইন পাস করিয়া যে-কোন ব্যক্তিকে নির্বাসন-দণ্ড দান, সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ এবং জুরির সাহায্য না লইয়া রাজনৈতিক অপরাধীদের বিচার করিবার অধিকার কার্যনির্বাহক বিভাগকে দেওয়া হইয়াছিল। দেশের সর্বত্র এই অত্যাচারী আইনের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন শুরু হইল। পাঞ্জাবে আন্দোলন অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দিলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চরম অত্যাচার দ্বারা উহা দমন করিতে চেষ্টা করিলেন। রাওল্যাট এ্যাক্ট্-এর প্রতিবাদকল্পে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর জেনারেল ডায়ার (General Dyer) অমানুষিকভাবে গুলিচালনা করিয়া যে-বর্বরতার অনুষ্ঠান করিলেন তাহা ব্রিটিশ নামে শুধু কলঙ্ক-লেপন করিল এমন নহে, সমগ্র ভারতে ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষভাব শতগুণে বাড়াইয়া দিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিরস্ত্র জনতার মধ্যে প্রায় দুই হাজার লোক হতাহত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার এই নগ্ন প্রকাশের প্রত্যুত্তরস্বরূপ দেখা দিল ভারতের অসহযোগ আন্দোলন।

যুদ্ধের পরবর্তী কালে ভারতবাসীর দুর্দশা

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবি

রাওল্যাট এ্যাক্ট

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড

চেমসফোর্ড-এর শাসনকালে আফগানিস্তানের আমীর হবিব-উল্লাহ্ আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলে তাঁহার পুত্র আমান-উল্লাহ্ আমীর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি রুশ প্রভাবাধীন ভারতবর্ষের সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করিলে ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক প্রতিহত হইলেন। এই সুযোগে ভারত সরকার আমীরকে পূর্ব-প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্য দান বন্ধ করিলেন। আমীর আমান-উল্লাহ্-ও পররাষ্ট্র ব্যাপারে সম্পূর্ণ ইচ্ছামত চলিবার স্বাধীনতা লাভ করিলেন।

আফগানিস্তানের সহিত সংঘর্ষ

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড-এর শাসনকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল মণ্টাগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন প্রণয়ন। এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা ৩২৯-৩৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংকার আইন

লর্ড রীডিং : লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড-এর শাসনকালের পরে লর্ড রীডিং ভাইস্‌রয় ও গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। তাঁহার শাসনকালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার বিরোধিতা সত্ত্বেও লবণকর বৃদ্ধি করিয়া লর্ড রীডিং জনসাধারণের বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন

তাঁহার শাসনকালে মালাবার উপকূলে মোপ্‌লা নামক ধর্মোন্মত্ত আর মুসলমানগণ কর্তৃক সেই অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অকথ্য অত্যাচার এবং উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কোহাট প্রভৃতি অঞ্চলে অনুরূপ অত্যাচার ব্রিটিশ শাসকবর্গ-রোপিত সাম্প্রদায়িকতা বিষবৃক্ষের ফলস্বরূপ উল্লেখযোগ্য। লর্ড রীডিং অবশ্য দুই-একটি বিষয়ে নিজ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি রাওল্যাট আইন নাকচ করিয়া এবং ভারতে প্রস্তুত কাপড়ের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সামরিক বিভাগে ভারতীয়দের King's Commission পর্যায়ের অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হইবার অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের স্যাণ্ড্‌হার্স্ট (Sandhurst) সামরিক কলেজে ভারতীয়দের শিক্ষাগ্রহণের পথও উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই ভারতের রাজকীয় নৌবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা—মোপ্‌লা অত্যাচার

অপরাপর কার্যাদি

স্বাধীনতার পথে ভারত
(India on the road to Freedom)

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ (The Year 1919): ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ একাধিক কারণে ভারত-ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। এই বৎসর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতের জাতীয়তা-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই বৎসরেই একদিকে যেমন শাসন-সংস্কার আইন পাস করা হইয়াছিল, তেমনি অপর দিকে ব্রিটিশ অত্যাচার নগ্ন বর্বরতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যালীলা এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের গুরুত্ব

আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন: খিলাফৎ আন্দোলন (Civil Disobedience & Non-Co-operation Movement : Khilafat Movement): প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতবাসী যখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উদার শাসন-সংস্কার প্রত্যাশা করিতেছিল, সেই সময়ে ভারত সরকারের অত্যাচারী নীতি এক দারুণ হতাশা ও ব্রিটিশ-বিদ্বেষের সৃষ্টি করিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দমনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রাওল্যাট আইন পাস করিতে উদ্যত হইলে, মহাত্মা গান্ধী উহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং গবর্ণর-জেনারেল চেম্‌স্‌ফোর্ডকে এই আইনে তাঁহার সম্মতি না দিতে অনুরোধ জানাইলেন। চেম্‌স্‌ফোর্ড এই অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কুখ্যাত রাওল্যাট এ্যাক্ট-এ বা আইনে সম্মতিদান করিয়া উহা বলবৎ করিলেন। ভারতের জাতীয় দাবির প্রতি এইরূপ উপেক্ষা প্রদর্শনে মহাত্মা গান্ধী ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি ভারতবাসীদের শান্ত এবং নিরস্ত্রভাবে এই আইন অমান্য করিতে আহ্বান জানাইলেন। এই আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নূতন পথে এক নূতন শক্তি লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ব্রিটিশ শক্তির সহিত সংগ্রামে নিরস্ত্র ভারতবাসীর হস্তে মহাত্মা গান্ধী এক অমোঘ অস্ত্র দান করিলেন।

কুখ্যাত রাওল্যাট এ্যাক্ট, মহাত্মা গান্ধীর প্রতিবাদ

প্রতিবাদ, অনুনয়-বিনয় ও আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ হইয়া কার্যকরীভাবে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইবার এক নূতন পথের সন্ধান পাইয়া মহাত্মা গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনে অগণিত ভারতবাসী ঝাঁপাইয়া পড়িল. শান্ত, নিরস্ত্র এবং অহিংসভাবে আন্দোলন করাই ছিল গান্ধীজীর অভিপ্রায়। কিন্তু জাতীয়তার ভাবাবেগে এই গণ্ডি ভেদ করিয়া কোন কোন স্থানের জনগণ স-হিংস আন্দোলন শুরু করিল। পাঞ্জাবের অমৃতসর, গুর্জানওয়ালা এবং দিল্লীতে আন্দোলন কতক পরিমাণে স-হিংস হইয়া উঠিলে সরকার পক্ষ গুলিবারুদের ব্যবহার করিয়া উহা দমনের চেষ্টা করিলেন। প্রতিবাদ করিতে গিয়া অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত নর-নারী প্রায় দুই হাজার হতাহত হইল। জেনারেল ডায়ার নিরস্ত্র জনতার উপর সামরিক বাহিনীকে গুলি চালাইবার আদেশ দিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। সরকারি হিসাবে প্রায় চারিশত লোক গুলিবর্ষণের ফলে সেই স্থানেই প্রাণ হারাইয়াছিল। কিন্তু গিরধারীলালের মত প্রত্যক্ষদর্শীর মতে এই নির্মম ঘটনায়

সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯১৯)

জালিয়ানওয়ালাবাগ-এর হত্যাকাণ্ড

মৃতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল প্রায় এক হাজার এবং প্রায় দেড় হাজার লোক জখম হইয়াছিল। ইংরাজের এই বর্বরতায় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর উপর এই অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার-প্রদত্ত 'সার্' (Knighthood) উপাধি পরিত্যাগ করিলেন। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই হয়ত জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের প্রতি মিত্রপক্ষের (The Allies i.e., British, France and their Allies) ব্যবহার মুসলমান দেশমাত্রেরই বিরক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। ইসলামধর্মের অধিকর্তা তুরস্কের খলিফার সাম্রাজ্য-ব্যবচ্ছেদ ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের মনেও গভীর রেখাপাত করিল। আলি ভ্রাতৃদ্বয়—সৌকত আলি ও মহম্মদ আলি খলিফার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ-কল্পে 'খিলাফৎ আন্দোলন' শুরু করিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস ঘটনা ভারতীয়দিগকে অন্তত তিনটি শিক্ষা দিয়াছিল। (১) নিজেদের দেশে ইংরাজরা মুক্তির পূজারী হইলেও অন্যদেশে তাহারা অত্যাচারী মূর্তি ধারণে দ্বিধাবোধ করে না। (২) লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে চাই নিরন্তন প্রচেষ্টা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়। (৩) হিন্দু ও মুসলমান জাতীয় সংকটে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা প্রয়োজন। ইহার সুযোগও সম্মুখে উপস্থিত ছিল। সেই সময়ে খিলাফৎ আন্দোলন চলিতেছিল। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করিয়া সরকারকে অচল করিতে নির্দেশ দিলেন। ব্রিটিশ অত্যাচারে মহাত্মা গান্ধী ইতিপূর্বেই মর্মাহত হইয়াছিলেন। পূর্বে ব্রিটিশ জাতির সততায় তাঁহার যথেষ্ট আস্থা ছিল। কিন্তু রাওল্যাট এ্যাক্ট্ পাস এবং উহার ফলে আন্দোলন শুরু হইলে সেই আন্দোলন দমন করিতে গিয়া সরকার যে-বর্বরোচিত দমন-নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সরকারের প্রতি গান্ধীজীর শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস উভয়ই বিলুপ্ত হইল। 'শয়তান-সুলভ অত্যাচার' করিতে যে-সরকার কুণ্ঠিত হয় না, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা দূরের কথা উহার বিলোপসাধন করাই ন্যায় এবং ধর্ম। মহাত্মা গান্ধী দেশকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে অচল করিয়া দিবার জন্য আহবান জানাইলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সি বিজয় রাঘবাচারিয়ার সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের (Non-violent Non-co-operation Movement) কর্মসূচী গ্রহণ করিল এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত যুগ্মভাবে এই আন্দোলন পরিচালনায় নীতি অনুমোদন করিল। এই যুগ্ম আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ক সম্রাট অর্থাৎ খলিফার তথা তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের শান্তি চুক্তিতে যে-অবিচার করা হইয়াছিল তাহার প্রতিকার, পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ও অত্যাচারের প্রতিকার এবং ভারতবাসীর জন্য স্বরাজ আদায় করা। মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, হজরৎ মোহানি এবং হাকিম আজমল খানের নেতৃত্বে খিলাফৎ কমিটি নামে একটি কমিটিও গঠন করা হইল। কংগ্রেস-খিলাফৎ যুগ্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন গান্ধীজী। তাঁহার আহবানে

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'সার্' উপাধি পরিত্যাগ

কংগ্রেস-খিলাফৎ আন্দোলন (১৯২০)

কংগ্রেস-খিলাফৎ যুগ্ম আন্দোলনের উদ্দেশ্য

দেশের সর্বত্র এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়িল। খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদানকারী মুসলমান সম্প্রদায় এবং কংগ্রেস দল যুগ্মভাবে সরকারের সহিত অসহযোগিতা শুরু করিল। উকিল,ব্যারিস্টারগণ বিচারালয়ে উপস্থিতি বন্ধ করিলেন, ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিল। দেশের সর্বত্র ধর্মঘট এবং বিলাতী কাপড় ও অপরাপর সামগ্রী বর্জনের এক দারুণ উন্মাদনার সৃষ্টি হইল। 'বন্দে মাতরম্' ও 'আল্লাহু-হো-আকবর' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত বিলাতী কাপড়ে আগুন ধরান হইল। সুভাষচন্দ্র বসু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আই. সি. এস পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়াও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চাকরি ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগ দিলেন। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ টাঁকশালের অতি উচ্চপদে নিযুক্ত প্রথম ভারতীয় হইলেও সেই চাকরি ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগদান করিলেন। তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড রীডিং এই আন্দোলন দমন করিবার উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত অত্যাচার করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। দলে দলে সত্যাগ্রহী কারাবরণ করিতে লাগিল। মহাত্মা গান্ধী তাহাদের মনে যে-নির্ভীক জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে পুলিসের লাঠি, বন্দুকের গুলি, কারাবাস কোন কিছুই তাহাদের ভীতি প্রদর্শন করিতে পারিল না। এই আন্দোলন যাহাতে স্তিমিত হইয়া ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পুনরায় আনুগত্য প্রদর্শন করে সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ যুবরাজকে (Prince of Wales) ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে পাঠান হইল। কিন্তু ফল হইল ঠিক বিপরীত। তাঁহার ভারতবর্ষে পৌঁছিবার দিন সমগ্র ভারতবর্ষে হরতাল পালন করা হইল। জনশূন্য রাস্তা-ঘাট দেখিয়া ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ স্বভাবতই উৎসাহবোধ করিলেন না। হরতালের বিরোধিতা করিতে গিয়া পার্শী ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানদের সহিত মারামারি করিয়া অনেককে আহত করিলেও হরতাল সম্পূর্ণ সফল হইল। পুলিস ও সেনাবাহিনীর গুলিতে ৫৩ জন ভারতীয়ের মৃত্যু ঘটিলে যুবরাজের ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হওয়ায় হিতে বিপরীত হইল। ইংরাজী পত্র-পত্রিকাগুলি অসহযোগ আন্দোলন এবং আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতে লাগিল। ব্রিটিশ সরকার খিলাফৎ কমিটি ও খিলাফৎ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এবং কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করিলেন। ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত ভ্রমণ কালে সর্বাত্মক হরতালের শাস্তি-স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার অসহযোগ আন্দোলন বলপ্রয়োগ এবং কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা দ্বারা স্তব্ধ করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইলে বাংলা, বিহার, আসাম, পাঞ্জাব প্রভৃতি যে-সকল অঞ্চলে আন্দোলনের তীব্রতা অত্যধিক ছিল সেই সকল অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের উপর অমানুষিক অত্যাচার এবং সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি প্রভৃতি করা হইল। কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হইলে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বেআইনী ঘোষণা

ব্রিটিশ সরকারের সহিত অসহযোগিতা

সত্যাগ্রহীদের কারাবরণ ও অকথ্য অত্যাচার সহন

ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজের ভারত ভ্রমণ—উদ্দেশ্য ব্যর্থ

ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় আন্দোলনের বিরোধিতা

ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশোধ গ্রহণের মনোবৃত্তি

করা হইল। চিত্তরঞ্জন দাশ পাঁচজন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে খাদি অর্থাৎ খদ্দরের কাপড় বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন দিকে পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী বাসন্তীদেবী ও পুত্র চিররঞ্জনকে খদ্দর বিক্রয়ের জন্য পাঠাইলেন। ব্রিটিশ সরকার বাসন্তীদেবীকে গ্রেপ্তার করিলে সমগ্র বাংলাদেশে এক গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি হইল, পরের দিন মধ্য রাত্রেই বাসন্তীদেবীকে সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ব্রিটিশ অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া আইন অমান্য করিতে লাগিল এবং ব্রিটিশের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেল ও সেণ্ট্রাল জেল স্বেচ্ছাসেবকে ভরিয়া উঠিল। পরিস্থিতি এমন হইল যে, ব্রিটিশ সরকার অনেক স্বেচ্ছাসেবককে বেকসুর মুক্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু কেহ জেল হইতে বাহির হইল না। এমতাবস্থায় সরকার স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তার করা বন্ধ করিয়া তাহাদের উপর লাঠি, বন্দুকের বাঁটের আঘাত প্রভৃতি দৈহিক নির্যাতন চালাইলেন। বাংলার গভর্ণর চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে আপস-মীমাংসা করিতে চাহিলে কংগ্রেস ঘোষিত আন্দোলন বন্ধ করিতে তিনি তাঁহার অক্ষমতা জানাইলেন। এইবার চিত্তরঞ্জন আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং আইন-অমান্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে এবং কলিকাতায় যাবতীয় কংগ্রেসী এবং খিলাফতের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিলেন। ব্রিটিশ দমনমূলক নীতির কঠোরতা ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশেও সমানভাবে অনুসরণ করা হইতে লাগিল।

চিত্তরঞ্জন দাশ কর্তৃক আন্দোলনের নেতৃত্ব

বাসন্তীদেবীর গ্রেপ্তার —উহার প্রতিক্রিয়া

অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবীর কারাবরণ

চিত্তরঞ্জনের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান

আন্দোলনের প্রসার

মোতিলাল নেহরু, গোপবন্ধু দাশ, লালা লাজপৎ রায়, প্রমুখ বহুসংখ্যক কংগ্রেস নেতা কারারুদ্ধ হইলেন। ব্রিটিশ সরকারের দমন-নীতি যতই কঠোর হইতে লাগিল, আন্দোলনও ততই শক্তি-সঞ্চয় করিয়া চলিল। প্রায় চল্লিশ হাজার সত্যাগ্রহীকে ব্রিটিশ সরকার জেলে বন্দী করিয়াছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের বারদোলি নামক এক জেলা সরকারের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। এইভাবে শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাসীর এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম চলিল। সংগ্রাম সম্পূর্ণ অহিংসভাবে চালানই ছিল মহাত্মা গান্ধীর প্রতিজ্ঞা। সত্যাগ্রহীদের মধ্যেও এই আদর্শই তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তেজনার বশে গোরক্ষপুরের চৌরিচৌরা নামক স্থানে পুলিস-থানা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হইল। সেই সঙ্গে ২২ জন পুলিশের মৃত্যু ঘটিল। মহাত্মা গান্ধী এই হিংসাপরায়ণতায় অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সহিংস হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া দিলেন (১৯২২)। লর্ড রীডিং অবশ্য তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করিলেন না। ইতিপূর্বেই কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্কের সম্রাটের অপসারণ খিলাফৎ আন্দোলনের অবসান ঘটাইয়াছিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নৈতিকতা এবং শক্তিশালী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার ভবিষ্যৎ হিংসার

চৌরিচৌরা থানায় অগ্নিসংযোগ—অসহযোগ আন্দোলনের অবসান

মাধ্যমে বিনষ্ট হইবে ইহা নিশ্চিত মনে করিয়াই মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিয়াছিলেন। আন্দোলন একবার হিংসাশ্রয়ী হইয়া উঠিলে উহা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। অবশ্য আন্দোলন বন্ধ করায় কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ ও হতাশা দেখা দিয়াছিল।

আন্দোলন বন্ধ করিবার পশ্চাতে মহাত্মাজীর যুক্তি

১৯২০-২২ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলন সাফল্য লাভ না করিলেও উহা ব্যর্থ হয় নাই। এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ এই আন্দোলন ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতবাসীর এক গভীর অনাস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ভারতবাসীর যাবতীয় অভাব-অভিযোগ দূর করিবার একমাত্র পথই ছিল নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্রিটিশের বিরোধিতা করা। ইহা ভিন্ন, এই আন্দোলন এ-কথাও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল যে, ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার যতই কঠোর হউক-না-কেন আন্দোলনকারীরা তাহাতে ভীত হইবে না এবং কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহার মাধ্যমে স্বাধীনতার আন্দোলন করা এবং স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব।

আন্দোলনের সুফল

স্বরাজ্য পার্টির উদ্ভব ও কার্যকলাপ (Rise of Swarajya Party : Its work) : খিলাফৎ-কংগ্রেস আন্দোলনের সময় চিত্তরঞ্জন দাশকে আন্দোলনে অংশগ্রহণের দায়ে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। তিনি কারাগারে থাকাকালেই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন অনুসারে নির্বাচনে কংগ্রেসের অংশ গ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কাউন্সিলের অভ্যন্তরে থাকিয়া ব্রিটিশ সরকারের ভারত-বিরোধী এবং ভারতবাসীর স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সরকারকে অচল করাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। পক্ষান্তরে মহাত্মা গান্ধী কাউন্সিলে কংগ্রেসের যোগদানের বিরোধী ছিলেন, কারণ (১) কাউন্সিলে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের কোন আশা ছিল না এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারিলে কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া সরকারের বিরোধিতা বা সরকার অচল করিয়া দিবার কোন উপায়-ই থাকিবে না। (২) অধিকন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইলেও কংগ্রেসের যাবতীয় প্রস্তাব সরকার ভেটো (veto) প্রয়োগ করিয়া নাকচ করিতে পারিবে। (৩) আইনসভায় প্রবেশ করিবার নীতি কংগ্রেস গ্রহণ করিলে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা কংগ্রেস নিজ হইতেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে, এই ধারণার সৃষ্টি হইবে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন অনুসারে কাউন্সিলে প্রবেশ লইয়া মতানৈক্য :

গান্ধীজীর কাউন্সিল প্রবেশের বিরোধিতা

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রত্যুত্তরে যুক্তি দেখাইলেন যে, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের নীতি অনুসারে (১) যদিও বা আইনসভা অর্থাৎ কাউন্সিলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল, তথাপি কংগ্রেসের নরমপন্থীরা কাউন্সিল বর্জন করেন নাই। সুতরাং বর্জনের মাধ্যমে কাউন্সিল অচল করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। (২) ইহা ভিন্ন, বয়কট আন্দোলন ইতিমধ্যে স্তিমিত হইয়া গিয়া আর তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে পারিতেছিল না। এমতাবস্থায় কাউন্সিলে প্রবেশের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিলে

চিত্তরঞ্জন দাশের পাল্টা যুক্তি

জনসাধারণ কংগ্রেসকে ভোট দিয়া সমর্থন করিবে। (৩) কিন্তু কংগ্রেস নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করিলে অপরাপর দল সেই সুযোগ সহজেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। (৪) সুতরাং কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া সরকারের কাজে বাধার সৃষ্টি, সমালোচনা, সরকারের দমন-নীতি বন্ধ করা, যাহারা জেলে বন্দী তাহাদের মুক্তি—প্রভৃতির জন্য চাপ সৃষ্টি করা কর্তব্য।

কংগ্রেসে বিভেদ : "স্বরাজ্য পার্টি" গঠন

মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার মতাবলম্বী নেতৃবৃন্দ, যথা, চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ কাউন্সিল প্রবেশ নীতি মানিতে রাজী হইলেন না পক্ষান্তরে চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল, এন. সি কেলকার, সত্যমূর্তি, হাকিম আজমল খান, মদনমোহন মালব্য, জয়াকার প্রভৃতি আইনসভায় অর্থাৎ কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করা স্থির করিলেন। তাঁহারা "স্বরাজ্য পার্টি" নাম দিয়া কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই একটি পৃথক দল গঠন করিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি এবং মোতিলাল নেহরু সম্পাদক পদ গ্রহণ করিলেন। কংগ্রেসে এইভাবে বিভেদের সৃষ্টি হইল।

কংগ্রেস কর্তৃক শেষ পর্যন্ত কাউন্সিল প্রবেশের বিরোধিতা ত্যাগ

বোম্বাইয়ে বিঠলভাই প্যাটেল, বাংলা, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ-ভারতে চিত্তরঞ্জন দাশ এবং উত্তর-ভারতে মোতিলালের চেষ্টায় স্বরাজ্যপার্টি এক শক্তিশালী দলে পরিণত হইল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মৌলানা আজাদ কংগ্রেসের এই বিভেদ দূর করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন, কিন্তু ঐ বৎসরই কংগ্রেসের দিল্লী (বিশেষ) অধিবেশনে (সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯২৩) মৌলানা আজাদ সভাপতি হিসাবে কাউন্সিল প্রবেশের প্রয়োজনীয়তার উপর যুক্তিপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। ইহার ফলে স্থির হইল যে, কাউন্সিলে প্রবেশ করার বিরুদ্ধে কংগ্রেস হইতে কোন প্রকার বিরোধিতা বা প্রচার করা হইবে না। কাউন্সিল প্রবেশ সম্পর্কে কংগ্রেসের যে-নিষেধাজ্ঞা ছিল তাহা স্বভাবতই আর কার্যকর রহিল না।

নির্বাচনে সন্তোষজনক ফল

ঐ বৎসরই (১৯২৩) শেষ দিকে (নভেম্বর মাসে) সাধারণ নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টি বাংলাদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্য পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইল। বোম্বাই, আসাম, যুক্তপ্রদেশ (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) এবং অপরাপর প্রদেশে নিরঙ্কুশ বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারিলেও যথেষ্ট ভাল ফল করিল। কেন্দ্রীয় আইনসভার মোট ১০৫টি আসনের মধ্যে ৪৫টি স্বরাজ্য পার্টি দখল করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-এর নেতৃত্বে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দল ২৪টি আসন দখল করে। স্বরাজ্য পার্টি ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দল মিলিয়া সরকারের বহু প্রস্তাব এমন কি, সরকারী বাজেট বাতিল করিতে সমর্থ হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভা এই যুগ্ম-বিরোধী দলের নেতা ছিলেন মোতিলাল নেহরু। মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্য পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সেজন্য সেখানেও সরকারের প্রস্তাব ইত্যাদি বাতিল করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশেও

জিন্নাহ্-এর ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টি

স্বরাজ্য পার্টি চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে বহু প্রস্তাব পাশ করিতে এবং নানা প্রস্তাব বাতিল করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ নিজের ইচ্ছামত কোন্ কোন্ বিষয়ে স্বরাজ্য পার্টির সহিত মিলিতভাবে সরকারের বিরোধিতা করিবে তাহা স্থির করিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে স্বরাজ্য পার্টি ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির ঐক্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ঐ বৎসরই (১৯২৫) কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে আইনসভা বর্জন করিবার প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে স্বরাজ্য পার্টির সদস্যগণ আইনসভা ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসেন।

জিন্নাহ্-এর স্বরাজ্য পার্টি হইতে অপসারণ

১৯২৬ খ্রীঃ কংগ্রেসের আইনসভা বর্জন নীতি পুনরায় গ্রহণ

ইতিমধ্যে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের ১৬ তারিখ চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যু এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কোন প্রকার সংস্কার প্রবর্তনে স্বীকৃত না হওয়ায় স্বরাজ্য পার্টির সদস্যগণ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ নীতি পুনরায় গ্রহণ করিলেন। স্বরাজ্য পার্টির সহিত কংগ্রেসের ব্যবধান দূর হইয়া গেল। স্বরাজ্য পার্টির কোন কোন সদস্য তখনও অবশ্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের সমর্থন করিবার নীতি গ্রহণ করিয়া আইনসভায় রহিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু এবং ব্রিটিশ সরকার হইতে কোন প্রকার সংস্কার আদায়ে অক্ষমতার ফলে গান্ধীজীর অসহযোগ নীতির জয়

স্বরাজ্য পার্টি ব্রিটিশ সরকার হইতে বিশেষ কোন সংস্কার আদায় করিতে না পারিলেও শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কিভাবে সরকারের বিরোধিতা করা যায় সেই গণতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষের সম্মুখে ইহা এক মূল্যবান রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়া গিয়াছিল।

বিপ্লবী সন্ত্রাসের পুনঃপ্রকাশ (Reappearance of Revolutionary Terrorism): ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে ভারতের বিপ্লবীরা সেই সুযোগ গ্রহণে সচেষ্ট হইলেন। বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব তথা সমগ্র উত্তর-ভারতে একই সঙ্গে এক সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। আমেরিকা হইতে গদর পার্টি প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে কাজে লাগাইয়া লাহোর, মীরাট, রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানের সামরিক ছাউনিতে গোপনে প্রচার চালান হইতে লাগিল। স্থির হইল যে, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র উত্তর-ভারতে একই সঙ্গে এক সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করা হইবে। ভারতীয় সৈনিকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিবে স্থির হইল। প্রথমে ফরাসী বিপ্লবের অনুকরণে পাঞ্জাবের শাসনযন্ত্র হস্তগত করা হইবে এবং বিভিন্ন কারাগার হইতে বন্দীদের মুক্ত করিয়া তাহাদিগকেও বিপ্লবের সঙ্গে সংযুক্ত করা হইবে. দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করিয়া ক্রমে অপরাপর স্থানের শাসনব্যবস্থাও হস্তগত করা হইবে। পরিকল্পনার প্রস্তুতি যখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, সেই সময়ে জনৈক বিপ্লবীর বিশ্বাসঘাতকতায় সমগ্র পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল। বহু বিপ্লবীকে ধরা

উত্তর-ভারতে ব্যাপক সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা

পরিকল্পনা ব্যর্থ

হইল এবং বিনা বিচারে কারাগারে আটক রাখা হইল। কিন্তু পরিকল্পনার মূল নেতা রাসবিহারীকে ধরা গেল না। ব্রিটিশের শ্যেন চক্ষু এড়াইয়া তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইভাবে বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব—এক কথায় সমগ্র উত্তর-ভারতে বিপ্লবী প্রচেষ্টার প্রথম পর্যায়ের অবসান ঘটিল।

বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রথম পর্যায়ের অবসান

এ-দিকে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব এবং তাঁহার নেতৃত্বে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকৃতির পরিবর্তন সাময়িকভাবে বিপ্লবীদের সশস্ত্র আন্দোলনে নিরস্ত করিল। বিপ্লবীদের অনেকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে যোগদান করিলেন। কিন্তু বিপ্লবী চেতনা তখন দেশের যুবকদের অন্তস্তলে চলিয়া গিয়াছে। উহার বহিঃপ্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকিলেও গোপন প্রস্তুতিতে কোন ভাটা পড়ে নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিপ্লবীদিগকে বিনা শর্তে মুক্তি দিলে বিপ্লবের প্রস্তুতি পুনরায় পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। কিন্তু বিপ্লবীরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির দিকে নজর রাখিতে লাগিলেন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ ক্রমেই বাড়াইতে লাগিল। দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে দেশবাসীর উপর পুলিস ও সেনাবাহিনীর অত্যাচার তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন। চৌরিচৌরার ঘটনায় অহিংস আন্দোলন সহিংস হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী যখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলেন এবং আন্দোলন বিফলতায় পর্যবসিত হইল, তখন বাংলার বিপ্লবীরা চট্টগ্রামে গোপনে মিলিত হইলেন এবং বিপ্লবী সন্ত্রাসের কর্মসূচী রচনা করিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী সন্ত্রাসের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইল।

গোপন প্রস্তুতি অব্যাহত

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন—ব্রিটিশ অত্যাচার

আন্দোলনের অবসান —বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু

ঐ বৎসরই (১৯২৩) জুলাই মাসে 'লাল বাংলা' (Red Bengal) প্রচারপত্র বাংলার সর্বত্র বিতরিত হয়। এই প্রচারপত্রে অত্যাচারী পুলিস ও ব্রিটিশ কর্মচারীদের হত্যার এক কর্মসূচী ঘোষিত হয়। দ্বিতীয়বার এই প্রচারপত্রে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের নিকট বিপ্লবী কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পার্টি পূর্ণোদ্যমে এবং নূতন শক্তি লইয়া পুনরুজ্জীবিত হইল। চট্টগ্রামের সূর্য সেনের (মাষ্টারদা) নেতৃত্বে সেখানে এক বিপ্লবী সমিতি স্থাপিত হয় এবং উহার শাখা জেলার বিভিন্নাংশে গঠন করা হয়। তারপর সশস্ত্র ডাকাতির মাধ্যমে বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা চলিতে থাকে। এ-দিকে কলিকাতার পুলিস কমিশনার চার্লস্ টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা চলে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে গোপীনাথ সাহা মিঃ ডে' নামক জনৈক ইংরাজকে টেগার্ট সাহেব মনে করিয়া হত্যার চেষ্টা করিলে বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়। ফাঁসির আদেশ শুনিয়া

লাল বাংলা প্রচারপত্র

অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পার্টি পুনরুজ্জীবিত

গোপীনাথ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার শরীরের প্রতিটি কণা ভারতের ঘরে ঘরে বিপ্লবের আগুন ছড়াইয়া দিবে। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার নির্ভীক উক্তি ও আচরণ সমসাময়িক যুব সমাজকে বিপ্লবের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ঐ একই বৎসর প্রথমে দক্ষিণেশ্বর এবং পরে আরও একটি স্থানে বোমা তৈয়ারের গোপন কারখানা আবিষ্কৃত হইলে ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্র সহ মোট ১৮৭ জনকে আটক করিলেন। তারপর বিপ্লবী কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে দমন করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার অমানুষিক অত্যাচার শুরু করিলে, কাছে যে-সকল গোয়েন্দা বিপ্লবীদের সংবাদ সরবরাহ করিত তাহাদের হত্যা করিবার কর্মসূচী বিপ্লবীরা গ্রহণ করিলেন। তাহাদের চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা সাফল্য লাভ করায় ব্রিটিশ সরকারের মনে ভীতির সৃষ্টি হইয়াছিল। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেনডেণ্ট বিপ্লবীদের পরিদর্শন করিতে গেলে বিপ্লবী প্রমোদ চৌধুরী তাহাকে লোহার ডাণ্ডা দিয়া আঘাত করেন। জেল সুপারিণ্টেনডেণ্টের মৃত্যু ঘটে।

চার্লস্ টেগার্ট হত্যার চেষ্টা: গোপীনাথ সাহা

বোমা প্রস্তুতের কারখানা আবিষ্কার

ব্রিটিশ সরকারের ১৮৭ জন বিপ্লবী আটক

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেন-ডেণ্ট হত্যা

শুধু বাংলাদেশেই নহে, বিশেষত প্রবাসী বাঙালী যুবকদের চেষ্টায় যুক্তপ্রদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, সতীশ সিংহ প্রভৃতির চেষ্টায় বিপ্লবী সমিতি গড়িয়া উঠে। উহার নাম দেওয়া হয় 'হিন্দুস্থান রিপাব্‌লিকান এ্যাসোসিয়েশন' (Hindustan Republican Association)। উত্তরপ্রদেশের সর্বত্র এই সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এক স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। ক্রমে এই বিপ্লবী সমিতির শাখা বিহার, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও দিল্লীতে স্থাপিত হয়। রাজনৈতিক ডাকাতি, সরকারী অর্থ লুঠ প্রভৃতি দ্বারা অর্থ-সংগ্রহ এবং ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারী হত্যা প্রভৃতি কাজ এই সমিতি শুরু করে। রেলগাড়ী হইতে সরকারী অর্থ লুঠ করিতে গিয়া বহু বিপ্লবী ধরা পড়িলে দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাদের বিচার চলে। এই মামলা 'কাকোরি-ষড়যন্ত্রের' মামলা নামে পরিচিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচারের পর রামপ্রসাদ, রোশনলাল, আশফাক্ উল্লা প্রভৃতির ফাঁসির হুকুম হয়, অনেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

যুক্তপ্রদেশ (উত্তর-প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, দিল্লীতে হিন্দুস্থান রিপাব্‌লি-কান এ্যাসোসিয়েশনের শাখা স্থাপন

কাকোরি-ষড়যন্ত্র মামলা

ফাঁসির মঞ্চে উঠিয়া রামপ্রসাদ, রোশনলাল ও আশফাক্ উল্লা ব্রিটিশ সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে, বিপ্লবীদের প্রাণদণ্ড দিয়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করা সম্ভব হইবে না। ইহা হইতে বিপ্লবীদের মানসিক দৃঢ়তা এবং আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এইভাবে ১৯২৩ হইতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিপ্লবী সন্ত্রাসের কার্যকলাপ চলিতে থাকে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কিছু কাল বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ থাকিলে পরবৎসর বিপ্লবীদের মুক্তি দেওয়া হয়। বিপ্লবী কার্যকলাপে

বিপ্লবীদের মুক্তিলাভ (১৯২৮)

সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে সমর্থন করিবার মত সাহস তখন তেমন দেখা যাইত না। কিন্তু ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবীরা জেল হইতে বাহির হইয়া আসিলে দেশের সর্বত্র তাহাদিগকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে এই উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া বিপ্লবীরা আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে তাঁহারা দেশের বিভিন্নাংশে বহু রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন করিলেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাহাদের মুখপাত্র হইলেন সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল। তাঁহারা অবশ্য ব্রিটিশ সরকারের অধীনে স্বায়ত্তশাসন লাভের পক্ষপাতী ছিলেন না, পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ছিল তাঁহাদের আদর্শ।

পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ বিপ্লবীদের আদর্শ : সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল তাহাদের মুখপত্র

এ-দিকে অবশ্য গোপনে বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রস্তুতিও চলিতে লাগিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইনসভায় যখন ভারতের স্বার্থ-বিরোধী বাণিজ্য বিলের আলোচনা চলিতেছিল সেই সময়ে বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগবৎ সিং সেখানে বোমা নিক্ষেপ করেন। লাহোরেও বিপ্লবের প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল কিন্তু সে-কথা ব্রিটিশ সরকারের নিকট ফাঁস হইয়া গেলে বহু বিপ্লবী ধরা পড়েন। বিচারে অনেকের শাস্তি হয়। ইহা লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা নামে পরিচিত। ঐ বৎসরই (১৯২৯) কলিকাতায় বিপ্লবীদের এক গোপন সভায় চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশালের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে সূর্য সেন চট্টগ্রামে তাঁহার দলবলকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন এবং ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক সেনাবাহিনী নামে সামরিক বাহিনীর অনুকরণে একটি বিপ্লবী দল গড়িয়া তুলিলেন। এই বাহিনীর নামে এক প্রচারপত্রে সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল এবং প্রত্যেক ভারতবাসীকে এই প্রজাতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করিবার কাজে সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল সূর্য সেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের পুলিসের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইল। টেলিফোন লাইন এবং অপরাপর যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করিয়া দিয়া চট্টগ্রাম শহরকে বাংলাদেশের অপরাপর অংশ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা হইল। সেখানে এক অস্থায়ী স্বাধীন ভারতীয় সরকার স্থাপন করা হইল। এই স্বাধীন ভারতের সরকারের প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি হইলেন সূর্য সেন। ব্রিটিশ সরকার অন্যান্য অঞ্চল হইতে সৈন্য আনাইয়া বিপ্লবীদের মোকাবিলা করিতে অগ্রসর হইলে বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আক্রমণকারী সরকারী সেনাবাহিনীকে রীতিমত যুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ অপসরণে বাধ্য করিলেন (২২শে এপ্রিল, ১৯৩০)। সরকারী পক্ষের ৬৪ জন এবং বিপ্লবীদের ১২ জন এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে সরকার বৃহত্তর সংখ্যক

বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিং : লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা

বিপ্লবের প্রস্তুতি : অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরিকল্পনা

চট্টগ্রামে ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক সেনাবাহিনী গঠন : ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

স্বাধীন ভারত সরকার স্থাপন : সূর্য সেন রাষ্ট্রপতি

জালালাবাদ পাহাড় হইতে যুদ্ধ

সৈনিক লইয়া অগ্রসর হইবেন এ-কথা অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া পরদিন বিপ্লবীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া গেলেন। এইরূপ একটি দলের সঙ্গে কর্ণফুলী নদীতীরে এবং নদীবক্ষে সরকারী সশস্ত্র বাহিনীর সহিত রীতিমত যুদ্ধ হইল। ছয়জন বিপ্লবী প্রাণ হারাইলেন, দুইজন ধরা পড়িলেন। অপর একটি দল কয়েক মাস পরে চন্দননগরে ধরা পড়িল। ধরা পড়িবার আগে পুলিসের সঙ্গে তাহাদের এক খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে একজন মারা গিয়াছিলেন, অপর সকলে ধরা পড়িয়াছিলেন। মাস্টারদা সূর্য সেনকে অবশ্য তখনও ধরা গেল না। পরে তাঁহাকেও ধরা হইল। বিচারে সূর্য সেনের ফাঁসির হুকুম হইল। লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

কর্ণফুলী নদীতীরে ও নদীবক্ষে খণ্ডযুদ্ধ

চন্দননগরে খণ্ডযুদ্ধ

সূর্য সেনের ফাঁসি : অপরাপর অনেকের দ্বীপান্তর

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও বিপ্লবীদের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং সরকারী সশস্ত্র বাহিনীর সহিত তাহাদের সামরিক পদ্ধতিতে যুদ্ধ ও প্রাণদান সব কিছু সমগ্র ভারতে বিপ্লবীদের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি করিয়াছিল। সমগ্র বাংলাদেশে সেই সময়ে এক বিপ্লবী-নেশা জাগিয়া উঠিয়াছিল। বিপ্লবীদের আক্রমণে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ব্রিটিশ কর্মচারীদের অনেকে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। জীবনের বদলে জীবন, রক্তের বদলে রক্ত লইতে বিপ্লবীরা তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবী সন্ত্রাস দমনে যতই আইনের কঠোরতা ও পুলিসের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন বিপ্লবীরাও ততই মরিয়া হইয়া উঠিলেন। বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করিতে সে-যুগের তরুণীরাও পশ্চাৎপদ রহিলেন না। তাহাদের অনেকেই 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' এই দুই দলের কোন-না-কোনটির সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখিয়া এবং বিপ্লবী উপদেশ ও প্রশিক্ষণ পাইয়া আসিতেছিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বাবধি তাঁহারা বিপ্লবী যুবকদের অস্ত্র সংগ্রহ ও সেগুলি আদান-প্রদানে সাহায্য করিতেন। সরকার বিপ্লবীদের দমনে সর্বশক্তি নিয়োগ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা ভাবিতেও পারেন নাই যে, অল্প-বয়স্কা ছাত্রী ও তরুণীরাও বিপ্লবী যুবকদের ন্যায় আগ্নেয়াস্ত্র ধারণ করিয়া নির্ভীক চিত্তে বিপ্লবী সন্ত্রাসের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। স্কুলের ছাত্রী শান্তি ও সুনীতির কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্‌সন হত্যা, বীণা দাসের জ্যাক্‌সন'কে গুলি করা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের চট্টগ্রামের পাহাড়-তলি আক্রমণের নেতৃত্বদান প্রভৃতি বিপ্লবী কার্যকলাপ ইংরাজ শাসক শ্রেণীর যুগপৎ বিস্ময় ও ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল। বিপ্লবীদের সাহায্য দান করিতে গিয়া বহু মহিলা অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে অসংখ্য নামের মধ্যে কমলা চট্টোপাধ্যায়, শোভারাণী দত্ত, উজ্জ্বলা দেবী, রেণুকা সেন, বনলতা দাস, জ্যোতিকণা দাস, শান্তিসুধা ঘোষ, ইন্দুমতী সিংহ, সুহাসিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিপ্লবী সন্ত্রাসে তরুণী ও মহিলাদের অংশ গ্রহণ

তারপর বিপ্লবীরা বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের ঘাঁটি রাইটার্স বিল্ডিংস্ আক্রমণের

পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। বিনয় বসু ছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। লোম্যান ও হাড্সন্ সাহেব সেই সময়ে ঢাকার বিপ্লবীদের সংগঠন সমূলে ধ্বংস করিতে এবং বিপ্লবীদের নিশ্চিহ্ন করিতে খুবই সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। নিছক সন্দেহবশে ছাত্রদের তথা যুবকদের গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের উপর আমানুষিক অত্যাচার করিতে তাঁহারা খুবই তৎপর ছিলেন। যুব সমাজের মধ্যে একটা ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি করিয়া বিপ্লবী ধারাকে ব্যাহত করাই ছিল তাহাদের আসল উদ্দেশ্য। বিনয় বসু এই অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। ঠিক সেই সময়ে সুযোগও যেন আপনা হইতে আসিল। ঢাকার জনৈক পদস্থ পুলিস কর্মচারী অসুস্থ হইয়া মেডিক্যাল স্কুলের হাসপাতালে ভর্তি হইলে লোম্যান ও হাড্সন্ সাহেব তাঁহাকে দেখিবার জন্য হাসপাতালে আসিলে বিনয় তাঁহাদের দেখিতে পাইয়া উভয়কেই গুলি করিলেন। লোম্যান মারা গেলেন, আহত হাড্সন্ সাহেব শেষ পর্যন্ত সারিয়া উঠিলেন। এ-দিকে বিনয়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিসী তৎপরতার অন্ত রহিল না, কিন্তু বিনয় পুলিস ও গোয়েন্দার দৃষ্টি এড়াইয়া চলিয়া আসিলেন।

বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের ঘাঁটি রাইটার্স বিল্ডিংস্ আক্রমণের পরিকল্পনা

বিনয় বসু কর্তৃক লোম্যান ও হাড্সনের উপর আক্রমণ ঃ লোম্যানের মৃত্যু ঃ পলাতক বিনয়ের কলিকাতা আগমন

এ-দিকে তখন রাইটার্স বিল্ডিংস্ আক্রমণের কর্মসূচী রচিত হইতেছিল। তিনজন বিপ্লবীকে সেই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল, ইহাদের অন্যতম ছিলেন বিনয় বসু। অপর দুইজন ছিলেন বাদল (সুধীর) গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ। সাহেবী পোশাক পরিহিত বিনয়-বাদল-দীনেশ কোনপ্রকার সন্দেহ বা কৌতূহল উৎপাদন না করিয়াই রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ প্রবেশ করিলেন। তারপর কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসন সাহেবকে গুলি করিলেন। সিম্পসন সাহেব নিজের চেয়ারেই ঢলিয়া পড়িলেন। এ-দিকে গুলির শব্দ শুনিয়া নেলসন সাহেব রিভলবার হাতে বাহির হইয়া আসিলে তাঁহাকেও গুলি করা হইল। এইসব ঘটনা মুহূর্তে পার্শ্ববর্তী লালবাজার পুলিস হেড্ কোয়ার্টারসে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। পুলিস কমিশনার টেগার্ট সশস্ত্র পুলিস বাহিনী দিয়া সমগ্র রাইটার্স বিল্ডিংস্ ঘেরিয়া ফেলিলেন।

বিনয়-বাদল-দীনেশ কর্তৃক রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর অভ্যন্তরে সিম্পসন ও নেলসন সাহেবকে আক্রমণ

বিনয়-বাদল-দীনেশ পলাইয়া যাওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিয়া রাইটার্স বিল্ডিংস্-এরই এক কামরায় গিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিলেন। বাদল গুপ্তের নিকট আর গুলি না থাকায় বিষ খাইয়া তিনি আত্মহত্যা করিলেন। বিনয় ও দীনেশ নিজেদের রিভলবার হইতে নিজ নিজকে গুলি করিলেন। আহত অবস্থায় উভয়কেই মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য রাখা হইল। বিনয়ের মৃত্যু হইল, সুস্থ হইয়া উঠিলে বিচারে দীনেশের ফাঁসি হইল। ফাঁসির হুকুম হইতে ফাঁসি হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জেলখানায় দীনেশের দৈনন্দিন কর্মসূচী, তাঁহার মাকে লিখা পত্রাদি, গীতা পাঠ প্রভৃতি দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণের ভয়লেশ-শূন্যতা বাঙালী

বিনয় ও বাদলের আত্মহত্যা দীনেশের ফাঁসি

ভয়লেশহীন দীনেশ

তথা সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরে বাংলার বিপ্লবীদের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিপ্লববাদীদের অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল মেদিনীপুর। ব্রিটিশ অত্যাচারও সেখানে ছিল মাত্রাহীন। জেলাশাসক পেডি ছিলেন অত্যাচারের নির্দেশক। বিপ্লবীরা স্বভাবতই পেডিকে হত্যা করা তাহাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। বিমল দাশগুপ্ত পেডিকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। বিচারক গার্লিক তাঁহার দমনমূলক বিচার কার্যের জন্য প্রকাশ্য দিবালোকে নিজ এজলাসে কানাই ভট্টাচার্যের গুলিতে প্রাণ হারাইলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির হুকুম গার্লিক সাহেবই দিয়াছিলেন।

পেডি হত্যা

গার্লিক হত্যা

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে হিজলী জেলে বিপ্লবী বন্দীদের উপর গুলি করা হইলে দুইজন বিপ্লবী মারা যান, অনেকে আহত হন। এই ঘটনার প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে পেডি-হত্যাকারী বিমল দাশগুপ্ত ইওরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্স সাহেবকে গুলি করিয়াছিলেন। ঐ একই বৎসর শান্তি ও সুনীতি নামে দুইটি অল্প-বয়স্কা বালিকা কুমিল্লার (বর্তমানে বাংলাদেশ) জেলাশাসক স্টিভেনসনকে গুলি করিয়া হত্যা করে।

ভিলিয়ার্সের উপর আক্রমণ

স্টিভেনসন হত্যা

পর-বৎসর (১৯৩২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গবর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে বীণা দাশ গুলি করেন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় জ্যাকসন রক্ষা পান। বীণা দাশ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ঐ বৎসরই প্রভাংশু পাল ও প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য মেদিনীপুরের জেলাশাসক ডগলাসকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। পরবর্তী জেলাশাসক বার্জ সাহেবকেও হত্যা করা হয়। অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন দত্ত ছিলেন বার্জের হত্যাকারী। উভয়ই বার্জ সাহেবের দেহরক্ষীর গুলিতে ঘটনাস্থলে মারা যান।

বীণা দাশ কর্তৃক স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি

বার্জ হত্যা

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বহু বাঙালী তরুণ-তরুণী ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদকল্পে অত্যাচারী ব্রিটিশ কর্মচারীদের হত্যা করিয়া বা হত্যার চেষ্টা করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে এই আত্মত্যাগ অনেকটা বৃথা বলিয়া অনেকে মনে করিলেও তাঁহাদের আত্মবলিদান বাঙালী যে আত্মমর্যাদাহীন জাতি নহে, ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে তাঁহারা হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিতে প্রস্তুত ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত বাঙালী তথা ভারতবাসীকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড ঋজু করিয়া দাঁড়াইবার শিক্ষা, দেশের স্বাধীনতার তুলনায় জীবন কত তুচ্ছ সেই শিক্ষা বিপ্লবীরা দিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল শহীদ চিরকাল ভারতবাসীর শ্রদ্ধা লাভ করিবেন, বলা বাহুল্য। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহারা অমর হইয়া রহিয়াছেন।

বিপ্লবীদের আত্ম-বলিদানের শিক্ষা

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে অসহযোগ আন্দোলন থামিয়া গেলে আইনসভায় যোগদান হইতে বিরত থাকিবার কোন যুক্তি নাই দেখিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 'স্বরাজ্য পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন অনুসারে গঠিত আইন-সভায় প্রবেশ করিয়া সরকারের বিরোধিতা করিতে মনস্থ করিলেন। নূতন যে নির্বাচন হইল তাহাতে 'স্বরাজ্য পার্টি' বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রদেশে আশাতীতভাবে সাফল্য লাভ করিল। 'স্বরাজ্য পার্টি'র বিরোধিতায় ইংরাজ কর্তৃপক্ষ কিছুকাল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইভাবে ক্রমেই আইনসভার অভ্যন্তরে এবং জনসাধারণের মধ্যে যখন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি এক প্রবল বিরুদ্ধ ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ে লর্ড রীডিং-এর কার্যকাল উত্তীর্ণ হইল। তাঁহার স্থলে লর্ড আরউইন্ গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্রয় নিযুক্ত হইলেন। সেই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে ধাবিত হইতেছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের প্রভাবও ভারতবর্ষের শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে বিস্তারলাভ করিতেছিল।

স্বরাজ্য পার্টির আইনসভায় যোগদান

লর্ড আরউইনের নিয়োগ

লর্ড আরউইন্ শাসনভার গ্রহণ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার (ইহা মণ্টফোর্ড সংস্কার নামেও পরিচিত) অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করা সম্ভব হইবে না। শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের একান্ত প্রয়োজন, এই কথা উপলব্ধি করিয়া ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সার্ জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার কিভাবে কতদূর কার্যকরী হইয়াছে সে-বিষয়ে রিপোর্ট করাই ছিল এই তদন্ত কমিশনের দায়িত্ব। সাইমন কমিশনে কোন ভারতবাসীকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইল না। ইহাতে ভারতবাসীদের মনে স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হইল। ভারতবাসী এই কমিশন সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিল। সেই বৎসরই মাদ্রাজ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইল। পর বৎসর (১৯২৮) এক সর্বদলীয় কনফারেন্সে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কিরূপ হওয়া উচিত সে-বিষয়ে আলোচনার পর 'নেহরু রিপোর্ট' প্রস্তুত হইল। মোতিলাল নেহরুর নামানুসারে ইহার এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছিল। এই রিপোর্টে Dominion Status অর্থাৎ কানাডা প্রভৃতি ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের অনুকরণে স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হইয়াছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন পর্যায়ে উন্নীত করিলে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিতে রাজী হইল (১৯২৮)। অবশ্য সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরু ইহার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই দাবি স্বীকৃত না হইলে কংগ্রেস পুনরায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে এবং করদান বন্ধ করিবে এইরূপ ঘোষণাও করা হইল। লর্ড আরউইন্ পরিস্থিতি বিবেচনায় ঘোষণা করিলেন যে, ডোমিনিয়ন পর্যায়ে ভারতবর্ষকে উন্নীত

সাইমন কমিশন (১৯২৭)

সাইমন কমিশন বর্জন

ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ দাবি

১২২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দাবি স্বীকৃত না হইলে আন্দোলন করিবার সংকল্প (১৯২৮)

করাই ব্রিটিশ সরকারের নীতির মূল উদ্দেশ্য। এ-বিষয়ে আলোচনার জন্য স্যার্ জন সাইমনের রিপোর্ট পেশ হওয়ার পর লণ্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করা হইবে এই ঘোষণাও তিনি করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের জনমত ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়নের পক্ষপাতী ছিল না। ফলে লর্ড আর্উইনের ঘোষণা তীব্র সমালোচনা করা হইল। কংগ্রেস বুঝিতে পারিল যে, ব্রিটিশ সরকার হইতে কোন কিছু প্রত্যাশা করা নির্বুদ্ধিতার কার্য হইবে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ দাবি ত্যাগ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিল। ইহা ভিন্ন, ভাইসরয়ের ঘোষণার উল্লিখিত গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান না-করাই স্থির করিল। বলা বাহুল্য, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ দিল না।

লর্ড আর্উইনের ঘোষণার প্রতিক্রিয়া

আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৩০ **(Civil Disobedience, 1930) :** ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসরণে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ৭৯ জন অনুগামী সহ মহাত্মা গান্ধী সবরমতী আশ্রম হইতে ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা শুরু করিলেন। পায়ে হাঁটিয়া ২৪ দিনে দীর্ঘ ২৪১ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া তিনি ৫ই এপ্রিল ডাণ্ডি পৌঁছিলেন। এই অভিযান ডাণ্ডি অভিযান নামে বিখ্যাত। ইহার উদ্দেশ্য ছিল লবণ আইন অমান্য করা। ৬ই এপ্রিল ১৯৩০ খ্রীঃ লবণ তৈয়ার করিয়া মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য করিলেন। সমুদ্রের জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিবার অধিকার একমাত্র সরকারেরই ছিল, সাধারণ লোকে তাহা করা বে-আইনী ছিল।

ডাণ্ডি অভিযান (১২ই মার্চ, ১৯৩০)

ডাণ্ডি অভিযানের উদ্দেশ্য

ডাণ্ডি অভিযানের শুরুতে অনেকের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, এই অভিযানে হয়ত ব্রিটিশ সরকারের উপর কোন প্রভাবই পড়িবে না, ভারতবাসীর মনেও ইহাতে তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিবে না। কিন্তু অনুচরবৃন্দসহ মহাত্মা গান্ধীর পদযাত্রা, গ্রাম হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া যখন চলিতে লাগিল, তখন এক জীবন্ত প্রচারের মাধ্যমে যেন মানুষ জাগিয়া উঠিল। মানুষ বুঝিতে পারিল যে, দেশের সম্মুখে স্বাধীনতা অর্জনের এক নিরস্ত্র যুদ্ধ সমাগত। লবণ আইন অমান্যের মধ্যে আবেদন ছিল যেভাবে পার বিদেশী শাসকের আইন অমান্য কর।

লবণ সত্যাগ্রহের তাৎপর্য

লবণ সত্যাগ্রহ দেশের সর্বত্র এক দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। দেশের যেখানেই লবণ প্রস্তুতের সুযোগ ছিল, সেইখানেই লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া সত্যাগ্রহীরা লবণ প্রস্তুত করিতে লাগিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাময়িকভাবে সরকারের আদেশ অচল হইয়া গেল। বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলার কাঁথি এবং চব্বিশ পরগণার মহিষবাথানে লবণ আইন অমান্য করিয়া লবণ প্রস্তুত চলিল। সরকার অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাইল। আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনও চলিল। স্কুল-কলেজে ধর্মঘট শুরু হইল, অফিস-আদালতে পিকেটিং চলিল। মহাত্মা গান্ধী ধরসানা লবণ গুদাম (সুরাট জেলায়)

লবণ সত্যাগ্রহে সর্বত্র উৎসাহ-উদ্দীপনা

সত্যাগ্রহীদের উপর নির্মম অত্যাচার

ও কারখানা দখল করিবেন বলিয়া সরকারকে পথে জানাইয়া দিলেন। ইহাই ছিল সত্যাগ্রহীর নীতি। তিনি ভারতবাসীর উপর হইতে লবণ কর উঠাইয়া দিতে এবং ভারতবাসী নিজ নিজ প্রয়োজনীয় লবণ প্রস্তুতের অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে অনুরোধ জানাইলেন। সরকার মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধ রক্ষা করা দূরের কথা তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর স্থান গ্রহণ করিলেন আব্বাস তৈয়বজী। তিনিও গ্রেপ্তার হইলে সরোজিনী নাইডু সত্যাগ্রহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ধরসানা লবণ কারখানা ও গুদাম দখলের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ওখালদা লবণ গুদাম দখলের চেষ্টা করা হইল। কিন্তু পুলিসী নির্যাতন ও বর্বর অত্যাচারে কোন লবণ কারখানা বা গুদাম করা সম্ভব হইল না।

আব্বাস তৈয়বজীর নেতৃত্বঃ সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্ব

আন্দোলন যতই শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল সরকারের অত্যাচারও ততই বাড়িতে লাগিল কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইল। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অনেককেই গ্রেপ্তার করা হইল। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, মেদিনীপুর, পাঞ্জাব, বিহার, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্ত্রী-পুরুষ সকল সত্যাগ্রহীর উপর বর্বর অত্যাচার করিতে ব্রিটিশ সরকার দ্বিধাবোধ করিল না।

সরকারী অত্যাচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সত্যাগ্রহের শক্তিসঞ্চয়

আফগান নেতা খান আব্দুল গফুর খাঁ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাঁহার লাল-কুর্তাধারী খুদাই-খিদমৎগার অনুচরদের লইয়া আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে আসিয়া গফুর খাঁ অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। পাঠান জাতি চিরকালই দৈহিক শক্তি প্রদর্শনে বা হিংসাত্মক কাজে অংশগ্রহণে পশ্চাৎপদ ছিল না। কিন্তু এই দুর্ধর্ষ জাতি মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উঠে এবং আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া ব্রিটিশ সরকারের গুলি-গোলা-অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া কারাবরণ করে। আইন অমান্য আন্দোলনে আব্দুল গফুর খাঁ'র নেতৃত্বে সাফল্য তাঁহাকে দেশবাসীর শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে। ভারতবাসীর নিকট তিনি 'সীমান্ত গান্ধী' নামে পরিচিত।

খান আব্দুল গফুর খাঁ

„সীমান্ত গান্ধী"

সার্ জন সাইমন তাঁহার রিপোর্টে (মে, ১৯৩০) ভারতবর্ষে দায়িত্বমূলক শাসনব্যবস্থা স্থাপন, ভোটাধিকার বৃদ্ধি এবং সরকারী মনোনয়ন দ্বারা আইনসভার সদস্য-নিয়োগ প্রথা বাতিল করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় অবশ্য ব্রিটিশ প্রাধান্য বজায় রাখিবার কথা তিনি বলিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, ভবিষ্যতে দেশীয় রাজাসহ সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপনের কথাও এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছিল। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হইলে পর (১৯৩০) লণ্ডনে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির এক গোলটেবিল বৈঠক আহূত হইল। কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগদান করিল না। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে গোলটেবিল বৈঠক তেমন সুবিধা হইল না।

গোলটেবিল বৈঠক

একপ্রকার বাধ্য হইয়াই মহাত্মা গান্ধীকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হইল। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই গান্ধীজী আরউইনের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। ইহা গান্ধী-আরউইন্ চুক্তি (Gandhi-Irwin Pact) নামে পরিচিত। ইহার শর্তানুসারে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিলেন। আরউইন্ হিংসাত্মক কাজের জন্য অভিযুক্ত সত্যাগ্রহী ভিন্ন অপরাপর সত্যাগ্রহীদের বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন এবং অত্যাচারমূলক আইন ও অর্ডিন্যান্স নাকচ করিলেন। গান্ধীজীও গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

গান্ধীজীর মুক্তিলাভ—গান্ধী-আরউইন্ চুক্তি

গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন

গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হইলেন। এই অধিবেশনে মুসলমান প্রতিনিধিবর্গ ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হইলেন। তাঁহারা সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তুলিয়া কোনপ্রকার সমাধানে উপনীত হওয়ার পথ রুদ্ধ করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর শত চেষ্টায়ও কোন ফল হইল না। গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনও (১৯৩২) বসিল। ইহাতে মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। ইহা একপ্রকার ভাঙ্গা-হাটের ন্যায়ই সামান্য কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

গোলটেবিলের দ্বিতীয় অধিবেশনের বিফলতা

আইন অমান্য আন্দোলন ১৯৩২-৩৪ (**Civil Disobedience, 1932-34**) : দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক হইতে শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিয়া মহাত্মা গান্ধী লক্ষ্য করিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন না করিবার ফলে দেশের সর্বত্র এক ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, সুরাটে কর আদায়ের সময় যে পুলিসী নির্যাতন চলিয়াছিল গান্ধী-আরউইন্ চুক্তির শর্তানুসারে সেই ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত করা হইবে বলা হইয়াছিল। তাহা নিছক প্রহসনেই পরিণত হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কৃষকরা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল। কিন্তু আন্দোলন থামিয়া গেলে সরকার পূর্বে কৃষকদের যে কিছু কর মকুব করিয়াছিলেন, তাহা সহ সমস্ত টাকা যাহা বাকি পড়িয়াছে তাহা বলপূর্বক আদায় করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের নির্দেশে তাহারা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। এজন্য সরকার জওহরলাল নেহরু ও পুরুষোত্তমদাস টেণ্ডনকে দায়ী করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলেন। এ-দিকে খান আব্দুল গফুর খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা খান সাহেব কারারুদ্ধ হইলেন। এইভাবে ভারতের সর্বত্র ব্রিটিশ সরকারের পুলিস-বাহিনী সন্ত্রাসের রাজ্য চালাইয়াছে। এমতাবস্থায় মহাত্মা গান্ধী তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ওয়েলিংডনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি চাহিয়া ব্যর্থ হইলেন। ওয়েলিংডন গান্ধী-আরউইন্ চুক্তিতে ভাইসরয় ও গান্ধীজীর মধ্যে সমান পর্যায়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই মর্যাদা প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে

মহাত্মা গান্ধীর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক হইতে শূন্য হাতে প্রত্যাবর্তন—দেশে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব

জওহরলাল, টেণ্ডন, গফুর খাঁ, খান সাহেব কারারুদ্ধ

পুলিসী সন্ত্রাস——ভাইসরয়ের সহিত সাক্ষাত করিতে গান্ধীজী অকৃতকার্য

আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা ভিন্ন অন্য কোন পথ মহাত্মা গান্ধীর সম্মুখে খোলা ছিল না।

আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির (Working Committee) সদস্যদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল। দেশের বিভিন্ন অংশের আরও বহু নেতাকে কারারুদ্ধ করা হইল। কংগ্রেসকে বে-আইনী সংস্থা বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহার অফিস বন্ধ করা হইল এবং কংগ্রেসের তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হইল। ইহা ভিন্ন, নানা প্রকার নৃশংস অত্যাচার করিয়া কংগ্রেসের আন্দোলন দমনের যাবতীয় চেষ্টা সরকার শুরু করিলেন। বিনা বিচারে জেল, লাঠি ও গুলি চালনা, স্ত্রী-সত্যাগ্রহীদের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার, তাঁহাদের সম্মান হরণ, পাইকারী জরিমানা, আরও নানাপ্রকার নির্মম ও অমানুষিক নির্যাতন সত্যাগ্রহীদের উপর চালান হইল। সরকারের এই সব দমন নীতি বেসরকারী ইওরোপীয়গণও সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন। সত্যাগ্রহীরা সরকারী নির্যাতন উপেক্ষা করিয়া আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। এক লক্ষ বিশ হাজার সত্যাগ্রহী কারারুদ্ধ হইলেন। আন্দোলন যখন পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধী এক অতি সামান্য কারণে আমরণ অনশন শুরু করিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলন —সরকারী অত্যাচার

১,২০,০০০ সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (১৯৩২) দ্বারা ব্রিটিশ সরকার মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান এবং হিন্দুদের অনুন্নত সাম্প্রদায়কে Depressed class নাম দিয়া পৃথক নির্বাচনের সুযোগ দান করেন। ইহার ফলে এই সকল সম্প্রদায় নিজেদের মধ্য হইতে নিজেদের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার পাইয়াছিল। হিন্দু সম্প্রদায়কে এইভাবে বিভক্ত করিবার দুরভিসন্ধি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী অনশন শুরু করিয়াছিলেন (সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৩৩)। অনশনের পঞ্চম দিনে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় যে-সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক পদ ছাড়িয়া দিয়া আম্বেদকরের সহিত মহাত্মা গান্ধী "পুণা চুক্তি" স্বাক্ষর করিলেন। এইভাবে হিন্দু সমাজকে বিচ্ছিন্ন করিবার পথ বন্ধ হইল। শিখগণ অবশ্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা গ্রহণে অস্বীকার করিলেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

পুণা চুক্তি

ইহার পরও আইন অমান্য আন্দোলন চলিতে লাগিল। কিন্তু ৮ই মে, ১৯৩৩ মহাত্মা গান্ধী আত্মশুদ্ধির জন্য একুশ দিনের অনশন শুরু করিলেন। তিনি কংগ্রেস সভাপতিকে (তাঁহাকে তখন রাষ্ট্রপতি বলা হইত), সাময়িকভাবে আন্দোলন বন্ধ রাখিতে নির্দেশ দিলেন। আন্দোলন এইভাবে প্রত্যাহৃত হইলে কংগ্রেসের অনেকেই অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু অনশনরত মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে কেহ কোন প্রতিবাদ জানাইলেন না।

ইহার পর মুক্তিলাভ করিয়া গান্ধীজী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করেন। সরকার তাঁহাকে এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তারপর আরও কেহ কেহ গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করিলেন। জেলে থাকা অবস্থায় গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা দূর করিবার আন্দোলন করিতে আগ্রহী হইলে

ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন

গান্ধীজীর অনশন

সরকার তাহাতে বাধা দেয়। গান্ধীজী এজন্য অনশন শুরু করেন এবং তাঁহার অবস্থা খারাপের দিকে গেলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি তারপর হরিজনদের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বিহারের এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পে অসংখ্য প্রাণ ও সম্পত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হইলে সকলেই সেইদিকে মনযোগী হইয়া পড়িলেন। আইন অমান্য আন্দোলনের অবসান ঘটিল।

বিহারে ভূমিকম্প — আন্দোলনের অবসান (১৯৩৪ জানুয়ারি)

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইন (Govt. of India Act, 1935): সাইমন কমিশন ও গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে যে খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল, উহার নীতির উপর নির্ভর করিয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আইন (Government of India Act) পাস করা হইল। এই আইন অনুসারে ভারতবর্ষে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা হইল। প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইল। দেশীয় রাজাগুলির এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যোগদান করা ইচ্ছাধীন ছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আইন পাশ করা হইলেও প্রধানত কংগ্রেসের আপত্তির জন্য এই সংস্কার কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। কংগ্রেসের আপত্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, ইহাতে গবর্ণর-জেনারেল ও গবর্ণরদিগকে আইনসভার এবং মন্ত্রিসভার কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিবার এবং নাকচ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। লর্ড লিনলিথগাও (Lord Linlithgow) আইনসভা অথবা মন্ত্রিসভার দৈনন্দিন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবেন না প্রতিশ্রুতি দিবার পর কংগ্রেস এই শাসনতন্ত্রের কেবলমাত্র প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অংশটি কার্যকরী করিতে অগ্রসর হইল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যে সাধারণ নির্বাচন হইল তাহাতে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। সিন্ধু ও আসাম প্রদেশ সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইলেও কংগ্রেস দলই অপরাপর দল অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সদস্যপদ লাভ করিল। ফলে এই দুই প্রদেশেও কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। মোট এগারটি প্রদেশের মধ্যে কেবলমাত্র বাংলা ও পাঞ্জাবে মুস্লিম লীগের সদস্য-সংখ্যা বেশি হইল। এই সময়ে বাংলাদেশে কংগ্রেস কোয়ালিশন (Coalition) মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় উহা কার্যকরী হইল না। মুস্লিম লীগনেতা মহম্মদ আলি জিন্না আশা করিয়াছিলেন যে, ভারতে সর্বত্র কংগ্রেস-মুস্লিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হইবে। কিন্তু মুস্লিম লীগ কংগ্রেসী আদর্শ গ্রহণ করিলেই কংগ্রেস যুগ্ম-মন্ত্রিত্বে রাজী আছে—এই প্রস্তাবে জিন্না অসম্মত হইলেন। তিনি অতঃপর কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার নিন্দাবাদ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতেই মনোনিবেশ করিলেন।

ভারত-আইন (১৯৩৫)

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য

মহম্মদ আলি জিন্নার কংগ্রেস শাসনের নিন্দাবাদ

কংগ্রেসী শাসন-দক্ষতায় কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। মোট পঞ্চাশ লক্ষ লোক এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্য তালিকাভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু

অল্পকালের মধ্যেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এক 'বামপন্থী' দলের উদ্ভব ঘটিল। ইহার নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে বামপন্থী দলের সহিত গান্ধী-প্যাটেল-রাজাজী দলের মতানৈক্য ঘটিল। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া আসিয়া 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করিলেন (১৯৩৯)। ঐ বৎসরই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইল (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই ভারত-সরকার ভারতবর্ষকেও যুদ্ধে জড়াইলেন। কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে তাহাদের যুদ্ধের আদর্শ কি তাহা প্রকাশ করিতে বলিলেন। ভারতের স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্যবাদের অবসান সেই আদর্শের অন্তর্ভুক্ত কিনা সে-বিষয়ে কংগ্রেস স্পষ্টভাবে জানিতে চাহিলে সরকার পক্ষ ইহার উত্তর এড়াইয়া গেলেন। ফলে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করিল। এই পদত্যাগ কংগ্রেসী আদর্শের দিক হইতে সমর্থনযোগ্য হইলেও কার্যক্ষেত্রে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক হইয়াছিল, কারণ এই সুযোগে মুশ্লিম লীগ বিভিন্ন প্রদেশে শাসনভার হস্তগত করিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে ফলবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে (১৯৩৯) সুভাষচন্দ্রের সহিত দক্ষিণপন্থীদের মতানৈক্য—সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস ত্যাগ—ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন

ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয় মন্ত্রিসভার মতামত না লইয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ—যুদ্ধের আদর্শ ঘোষণায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অসম্মতি—কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিত্ব ত্যাগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথমভাগে (১৯৪০) জার্মানি যখন মিত্রপক্ষকে (ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি) শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া চলিয়াছে, তখন ভাবতবর্ষের জনসাধারণের ধৈর্যের সীমা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ভারতবাসী শান্ত রহিল। এমন সময়ে লর্ড লিনলিথগাও ঘোষণা করিলেন (৮ই আগস্ট, ১৯৪০) যে, ভারতবাসীর স্বার্থের (?) কথা বিবেচনা করিয়া ব্রিটিশ সরকার কোন একটি দলের নিকট শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবেন না। অর্থাৎ ভারতে প্রায় সকল প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস, আইনসভা ও মন্ত্রিসভার হস্তে ভারতের শাসনভার ত্যাগ করিতে ব্রিটিশ সরকার রাজী হইলেন না। যাহা হউক, যুদ্ধাবসানে ভারতবাসীদের প্রতিনিধি লইয়া একটি সংবিধান সভা (Constituent Assembly) আহবান করা হইবে এই প্রতিশ্রুতি তিনি অবশ্য তাঁহার আগস্ট ঘোষণায় দান করিলেন। লিনলিথগাও-এর এই ঘোষণা সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যোগাইল। মুশ্লিম লীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণায় উৎসাহিত হইয়া আকস্মিকভাবে দাবি করিলেন যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি (nation)। এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি ইহা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-এর মৌলিক আবিষ্কার নহে। সার্ সৈয়দ আহম্মদ খাঁন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মীরাট শহরে এক বক্তৃতায় প্রথম উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক কেবল দুইটি পৃথক জাতি নহে, বস্তুত, এই দুই জাতি পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষী। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কবি ইক্‌বাল প্রথম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতবর্ষ

লিনলিথগাও-এর 'আগস্ট ঘোষণা' (August Offer)

জিন্না কর্তৃক পাকিস্তান দাবি (লাহোর অধিবেশন, (১৯৪০)

দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও পাকিস্তান দাবির পূর্ব ইতিহাস

মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেন। গোলটেবিল বৈঠক যখন লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয় সেই সময়ে ক্যাম্‌ব্রিজে অধ্যয়নরত মুসলমান ছাত্র চৌধুরী রহমৎ আলি প্রমুখ কয়েকজন (১৯৩৩) "পাকিস্তান" রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করেন। পাঞ্জাব, আফগান প্রদেশ (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), কাশ্মীর, সিন্ধু এই কয়টি রাজ্যাংশের ইংরাজী বানানের আদি অক্ষর এবং বেলুচিস্তানের 'স্তান' লইয়া "পাকিস্তান" শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। সেই সময়ে দায়িত্বশীল মুসলমান মাত্রেই ইহা ছাত্রদের অপরিণত বুদ্ধিপ্রসূত পরিকল্পনা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিলেন এবং ইহার কোন গুরুত্ব দেন নাই। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি এই দ্বি-জাতি তত্ত্ব পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলেন। মিঃ জিন্নার এই উদ্ভট 'দুইজাতি মতবাদ' (Two-nation Theory) প্রগতিশীল মুসলমানগণও সমর্থন করিলেন না। জমায়েৎ-উল-উলেমা, অহ্‌রর প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলমান রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মুশ্লিম লীগ তথা নিজেকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র বলিয়া দাবি করিলেন। মুশ্লিম লীগ সেই সময়ে ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসের অবর্তমানে মন্ত্রিত্ব করিতেছিল।

লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান দাবি

স্বভাবতই জিন্নাহ্‌র এই উদ্ভট দাবির সপক্ষে লীগের অনুচরবর্গকে উন্মত্ত করিয়া তুলিবার সুযোগের অভাব হইল না। মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বেচ্ছাকৃত বিষবৃক্ষ। ব্রিটিশ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে সেই বিষবৃক্ষ আপনা হইতেই মরিয়া যাইবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার কোন ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং সাম্প্রদায়িক সমস্যার অজুহাতে এ-দেশে টিকিয়া থাকিবার চেষ্টা তাহারা শুরু করিবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশের এই মনোবৃত্তির প্রতিবাদকল্পে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিলেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: জাপানী আক্রমণ: ক্রীপ্‌স্ মিশন, ১৯৪২ (Second World War: Japanese Attack: Crips' Mission, 1942): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে কংগ্রেস ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যদানের শর্ত হিসাবে একটি জাতীয় সরকার গঠন এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সংবিধান সভা গঠনের প্রতিশ্রুতি দাবি করিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার এই সকল দাবির কোনটিই মানিয়া লইতে স্বীকৃত হয় নাই। তাহাদের স্বীকৃত না হইবার অপরাপর কারণও ছিল। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ কংগ্রেসের দাবি সমর্থন করেন নাই এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বের অবতারণা করিয়া তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত আরও দৃঢ় করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস কর্তৃক যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যদানের শর্ত ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যাখ্যান

কিন্তু জাপান আকস্মিকভাবে জার্মানি-ইতালির পক্ষে যোগদান করিলে (১৯৪১, ডিসেম্বর, ৭) যুদ্ধের গতি দ্রুত পরিবর্তিত হইতে লাগিল। সিঙ্গাপুর ও মালয়ের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া জাপান ব্রহ্মদেশের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলে ব্রিটিশ সরকারের স্বস্তির ভাব আর রহিল না। সিঙ্গাপুর ছিল ব্রিটিশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক ঘাঁটি। জাপান ক্রমে ভারতবর্ষের

জাপানের দ্বিতীয় যুদ্ধে যোগদান

দিকে অগ্রসর হইবে, এই কথা ব্রিটিশ সরকারের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল। জাপানের যুদ্ধে যোগদানের মাত্র কয়েকদিন আগে জওহরলাল নেহরু ও মৌলানা আজাদকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল (১৯৪১, ডিসেম্বর ৩)। জাপান যুদ্ধে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভাইসরয় লিনলিথগাও ভারতবাসীর নিকট এক সনির্বন্ধ আবেদনে শত্রুর বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু এই আবেদনে কোন কাজ হইল না। কংগ্রেস জানাইল যে, একমাত্র স্বাধীন ভারতই বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে। অন্য কথায়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কংগ্রেসের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যদানের একমাত্র শর্ত। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রেঙ্গুন জাপানের পদানত হইলে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সহিত একটি মীমাংসার সূত্র খুঁজিয়া বাহির করা একান্ত প্রয়োজন মনে করিলেন। ১১ মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ঘোষণা করিলেন যে, জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ সাহায্য-সহায়তা লাভের পন্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌কে ভারতবর্ষে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছেন। ব্রিটিশ সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ক্রীপ্‌স্‌ মিশন পাঠাইবার সিদ্ধান্ত লইয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হালের (Cordell Hull) মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষের সহিত একটি রফায় আসিবার জন্য চাপ দিতেছিলেন। চীনের জেনারেলেসিমো চিয়াং কাইসেকও ভারতের প্রতি ব্রিটিশ-নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে জানাইয়াছিলেন। সুতরাং ভাবতীয় জনমতের সমর্থন এবং ভারতবর্ষের জাতীয় নেতৃবর্গের সহায়তা ভারতরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া চার্চিল স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌কে ভারতবর্ষে আলাপ-আলোচনার জন্য পাঠাইলেন (১৯৪২)।

ভাইসরয় কর্তৃক ভারতবাসীর সাহায্যের জন্য আবেদন

স্বাধীনতার শর্তে কংগ্রেস সাহায্যদানে প্রস্তুত—এই কথার উল্লেখ

ক্রীপ্‌স্‌ মিশন প্রেরণের কথা ঘোষণা

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের চাপ

ক্রীপ্‌স্‌ মিশনের ভারত আগমন

সার্‌ স্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে যে শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব করিয়াছিলেন, উহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নলিখিত রূপঃ (১) যুদ্ধাবসানে নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত সংবিধান সভার উপরে ভারতের শাসনতন্ত্র গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে। (২) দেশীয় রাজ্যগুলিও যাহাতে এই সংবিধান সভায় যোগদান করে, সেই ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইবে। (৩) সংবিধান সভা কর্তৃক গৃহীত শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ সরকার সঙ্গে সঙ্গে চালু করিবেন, কিন্তু কোন প্রদেশ যদি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সেই প্রদেশ বা প্রদেশগুলিকে পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন করিতে দেওয়া হইবে এবং সেগুলিকে অপরাপর প্রদেশের সম-পর্যায়ভুক্ত করা হইবে। (৪) সংবিধান সভায় সদস্যগণ প্রাদেশিক আইনসভার নিম্নকক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। (৫) নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের পূর্বাবধি ব্রিটিশ সরকার ভারতের নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকিবেন। (৬) ব্রিটিশ সরকার সংখ্যা-

ক্রীপ্‌স্‌ প্রস্তাব

লঘু সম্প্রদায়কে যে-সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সংবিধান সভাকে ব্রিটিশ সরকারের সহিত একটি পৃথক চুক্তিতে সেগুলি মানিয়া চলিবে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্স্ জানিতেন যে, তাঁহার প্রস্তাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার সাফল্য কেবলমাত্র কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগের সম্মতির উপরই নির্ভরশীল। কংগ্রেসের পক্ষে জওহরলাল নেহরু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মুস্লিম লীগের পক্ষে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ আলোচনায় যোগ দিলেন।

সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্স্-এর প্রস্তাবে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, ভারতের শাসনতন্ত্রের আসন্ন পরিবর্তনের কোন প্রশ্ন ইহাতে ছিল না। মহাত্মা গান্ধী ক্রীপ্স্-এর প্রস্তাব পাঠ করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'It is a post-dated chaque on a crashing bank'. ইহা ভিন্ন, ক্রীপ্স্-এর প্রস্তাবে যে-সকল প্রদেশ সংবিধান সভা কর্তৃক গৃহীত শাসনতন্ত্র গ্রহণে রাজী হইবে না সেগুলিকে পৃথক শাসনতন্ত্র গঠনের অধিকার এবং সংবিধান সভা কর্তৃক গৃহীত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপিত হইবে উহাকে তাহার সম-পর্যায়ভুক্ত করা হইবে, এই শর্ত পরোক্ষভাবে পাকিস্তান দাবি-ই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

ক্রীপ্স্ প্রস্তাব 'Post-dated cheque'—কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যান

জওহরলাল নেহরু ক্রীপ্স্ প্রস্তাব সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, "উহা ভাইস্রয়ের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা চালু রাখিয়া ভারতীয়দের তাঁহার অনুগত ভৃত্য হিসাবে তাঁহার ক্যান্টিন প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিতে চায়।" কংগ্রেস স্বভাবতই ক্রীপ্স্ প্রস্তাব ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করিল। মুস্লিম লীগও পাকিস্তান দাবি সুস্পষ্টভাবে এই প্রস্তাবে গৃহীত হয় নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল।

মুস্লিম লীগের পাকিস্তান দাবি—ক্রীপ্স্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

এ-দিকে জাপানী সৈন্য ক্রমে ভারতের সীমান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে বিদেশী আক্রমণের ভীতি, ক্রীপ্স্ মিশনের ব্যর্থতা প্রভৃতি ভারতবাসীর অন্তরে এক দারুণ হতাশার সৃষ্টি করিল। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ ও ভারতবর্ষের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিয়া ব্রিটিশ সরকারের ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাওয়াই সমীচীন বলিয়া তাঁহার হরিজন পত্রিকায় লিখিলেন (এপ্রিল ১৯, ১৯৪২)। সেই সময়ে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন মানিয়া লইয়া কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার গ্রহণ করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় মহাত্মা গান্ধী তাঁহার হরিজন পত্রিকায় ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইলেন।

দেশব্যাপী ব্যাপক হতাশা

ব্রিটিশ শাসনাধীনে কোনপ্রকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার গ্রহণ অসম্ভব

'ভারত-ছাড়' আন্দোলন, ১৯৪২, আগস্ট (Quit India Movement, August, 1942): জাপানী সৈন্য যখন ভারত-সীমান্তে উপস্থিত, সেই সময়ে সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্স্ তাঁহার মিশনে অকৃতকার্য হইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। ভারতের সর্বত্র এক তীব্র হতাশা দেখা দিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বিস্মিত হইলেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার 'হরিজন' পত্রিকায় ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ

করিয়া যাইতে বলিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে 'ভারভ-ছাড়' ধ্বনি উত্থিত হইল। মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টভাবে এই কথা-ই ব্রিটিশদের জানাইলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসন বজায় থাকিলেই জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে, কিন্তু তাহারা ভারত ছাড়িয়া গেলে সেই প্রশ্ন আর থাকিবে না। এইজন্য তিনি ভারতবাসীকে বিদেশী আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার তথাকথিত 'দায়িত্ববোধ' ভুলিয়া গিয়া, ভারতবাসীদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিলে যে এক দারুণ অরাজকতা দেখা দিবে, সেই সম্ভাব্য দুর্দিনের জন্য বিচলিত না হইয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইলেন। ব্রিটিশ শাসনে যে-অরাজকতা তখন বিদ্যমান ছিল তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ভারতবাসীর জন্য কুম্ভীরাশ্রু ত্যাগ না করিতে বলিলেন। ১৪ই জুলাই, ১৯৪২, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশকে ভারত/ত্যাগের জন্য অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব পাস করিলেন এবং এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইলে কংগ্রেস ব্যাপক আন্দোলন শুরু করিতে বাধ্য হইবে; সেই কথাও স্পষ্টভাবে বলিয়া রাখিলেন। ৮ই আগস্ট (১৯৪২) বোম্বাইতে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুমোদিত হইল। পৃথিবীতে শান্তি ও স্বাধীনতা স্থাপন এবং ভারতবাসীদের জাতীয় জীবনের উন্নতি বিধানের জন্য ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া অপরিহার্য এই কথাও প্রস্তাবে বলা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে মহাত্মা গান্ধী এবং অপরাপর বহু কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইল। সরকারের ধারণা ছিল যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিলেই আন্দোলন থামিয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু নেতৃহীন ভারতবাসী সেইদিন ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে দ্বিধা করে নাই। সরকারী প্রতিষ্ঠান, সরকারী সম্পত্তি প্রভৃতি বিনাশ করিয়া ব্রিটিশের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ তাহাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল। সর্বভারতে এক বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইল। বহু রেল স্টেশন, পোস্ট অফিস ও থানা ভস্মীভূত হইল। মোট ৫৩৮ বার পুলিস ও সৈন্যদিগকে গুলিবর্ষণ করিবার আদেশ দিতে হইয়াছিল।

'ভারত ছাড়' দাবি

৮ই আগস্ট, ১৯৪২ 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক গৃহীত

সরকারী অত্যাচার

গণবিদ্রোহ

মহাত্মা গান্ধীর "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" আদর্শে অনুপ্রাণিত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ভারতের শহর, নগর, গ্রামাঞ্চল সর্বত্র এক দারুণ গণ-বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করিল। ব্রিটিশ প্রশাসন অচল করিয়া দেওয়া এবং যোগাযোগ ও সংযোগ ব্যবস্থা বিনাশ করিয়া ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটান ছিল এই গণ-বিক্ষোভের মূল লক্ষ্য। বাংলা দেশের মেদিনীপুর জেলায় এই 'ভারত ছাড়' আন্দোলন বা আগস্ট আন্দোলন এক অভূতপূর্ব সংগঠন ক্ষমতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল। আগস্ট আন্দোলন মেদিনীপুরে এক প্রকৃত বিপ্লবের রূপ ধারণ করিয়াছিল। মেদিনীপুরে কিছুকাল ব্রিটিশ শাসন বলিতে কিছু ছিল না।

বাংলা দেশের মেদিনীপুরে আন্দোলন

বীরাঙ্গনা বয়স্কা মহিলা মাতঙ্গিনী হাজরা জাতীয় পতাকা হস্তে শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিতে গিয়া পুলিসের গুলি উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত পুলিসের গুলিতেই তিনি জাতীয় পতাকা হস্তে প্রাণদান করিয়া দেশের জন্য চরম আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

(১৯৪২, ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ৮ই আগস্ট ; ১৯৪৪ পর্যন্ত)

উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, বিহারের ভাগলপুরে স্বাধীনতা ঘোষণা

মেদিনীপুরের ন্যায় বর্তমান উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলায় এবং বিহারের ভাগলপুর জেলায় সাময়িকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইয়াছিল। কয়েক মাস এই স্বাধীনতা বজায় ছিল।

এই বিদ্রোহ দমন করিতে ব্রিটিশ সরকার মরিয়া হইয়া সর্বপ্রকার দমনমূলক অত্যাচারী নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। প্রায় দশ হাজার লোক পুলিস ও মিলিটারির গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছিল এবং অসংখ্য লোক কারারুদ্ধ হইয়াছিল। নেতৃবিহীন জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্রোহ স্বাভাবিকভাবেই হিংসাশ্রয়ী হইয়া পড়িয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধী এই হিংসাত্মক কার্যের জন্য গণ-আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন না। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া-ই নেতৃহীন জনতা এইরূপ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, এই ছিল মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য। যাহা হউক, মহাত্মা গান্ধী হিংসাত্মক কার্যাবলীর বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ হিসাবে-ই দীর্ঘ তিন সপ্তাহ অনশনে ব্রতী হইলেন। ৭৩ বৎসর বয়সে এই অনশনকালে তাঁহার জীবন যখন সংকটাপন্ন হইয়া উঠিল, তখন লর্ড লিন্‌লিথগাও তাঁহার এক্‌সিকিউটিভ সভার সদস্যদের একাংশের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া মহাত্মা গান্ধীকে বিনাশর্তে মুক্তিদানে অস্বীকৃত হইলে তিনজন সদস্য পদত্যাগ করিলেন। সমগ্র দেশবাসীর প্রার্থনায় মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ তিন সপ্তাহের কঠোর অনশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

মহাত্মা গান্ধীর অনশন

ঠিক ঐ সময়ে (১৯৪৩) মুশ্লিম লীগ মন্ত্রিসভার অকর্মণ্যতায় বাংলাদেশে এক ভীষণ ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট ব্যবসায়ীদের কয়েকজন এই সময়ে মানুষের জীবনের বিনিময়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া লইতে কুণ্ঠাবোধ করিল না। কলিকাতা মহানগরীর পথে পথে দীর্ঘ অনশনে অস্থিচর্মসার জীবন্ত কঙ্কালের ন্যায় অসংখ্য লোক খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাইল। জগতের আধুনিক ইতিহাসে মানুষের স্বার্থলোলুপতা এবং শাসনকার্যে অকর্মণ্যতার ফলে এইরূপ নিদারুণ দুর্ভিক্ষ কোথাও ঘটে নাই, আর এত বিশাল সংখ্যক লোকও প্রাণ হারায় নাই। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে, বাংলা সন ১১৭৬-এর পর এইরূপ দুর্ভিক্ষ ভারতের কোন স্থানে দেখা দেয় নাই।

বাংলায় দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩)

আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ (Indian National Army)* **:** ঐ বৎসর (১৯৪৩) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মালয় ও ব্রহ্মদেশস্থ ভারতীয়দের এবং জাপানের হস্তে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া তাঁহার বিখ্যাত আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ (Indian National Army) গঠন করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে মনস্থ করেন। তিনি সিঙ্গাপুরে 'আজাদ্ হিন্দ্ সরকার' নামে স্বাধীন ভারত সরকার স্থাপন করিলেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলকে লইয়া গঠিত তাঁহার স্বাধীন ভারত সরকার ও আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ জিন্নার ভারতের হিন্দু-মুসলমানগণ দুইটি ভিন্ন জাতি এই মতবাদের (Tow-nation Theory) অসারতা প্রমাণ করিল। আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ আসামের কোহিমা, বিষেণপুর (কাছাড় জিলার শিলচর হইতে অনতিদূরে) পর্যন্ত অগ্রসর হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আসামের ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়া খাদ্য সরবরাহের অসুবিধাহেতু আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের অগ্রগতি ব্যাহত হইল। অবশেষে এই সেনাবাহিনী ইংরেজদের হস্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁহার আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনী মাতৃভূমির মুক্তির জন্য ভারতীয়গণ কি পরিমাণ আত্মত্যাগ, কতদূর দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত, সেই প্রমাণ পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। ব্রিটিশ শক্তি এই সেনাবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইল না সত্য, কিন্তু নৈতিকতার দিক দিয়া ইহা তাহাদের একপ্রকার পরাজয়ের সামিল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে না পারিলেও ইহাই ছিল সুভাষচন্দ্রের ব্রিটিশের উপর নৈতিক জয়লাভ। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ না হইলেও সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনী ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন ভারতের অভ্যন্তরীণ প্রশ্ন হইতে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রশ্নে পরিণত করিয়াছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের গভীর প্রভাব ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি এড়ায় নাই। ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্বাধীন সংগঠনী শক্তি, তাহাদের দেশাত্মবোধ, হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, তাহাদের আন্তরিক ঐক্যবোধ, ব্রিটিশ নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিভাবে তাহারা প্রতিবাদ করিতে সক্ষম, সেই সমস্ত পরিচয় ব্রিটিশ সরকার পাইলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য রক্ষা করা এবং যে-কোন অবস্থায়ই তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয়

নেতাজী সুভাষ—আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ

আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের ভারতের একাংশে প্রবেশ

আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের আত্মসমর্পণ—আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের গুরুত্ব

* ভারতীয় সৈনিক জেনারেল মোহন সিং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ১৫ই সিঙ্গাপুরে জাপানী সৈন্যদের হস্তে ধৃত ব্রিটিশ বাহিনীর অধীন ভারতীয় সৈনিকদের লইয়া "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মি" (Indian National Army) নামে এক সামরিক বাহিনী গঠন করেন। অন্যদিকে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ" (Indian Independence League) নামে অপর এক সেনাবাহিনী গঠন করেন। সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়া ঐ বৎসরই ২৬শে আগস্ট মোহন সিং ও রাসবিহারী বসুর সেনাদল দুইটিকে একত্রিত করিয়া উহার নামকরণ করিলেন আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ এবং নিজে উহার সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। এই বাহিনীতে আরও প্রবাসী ভারতবাসীকে সৈনিক হিসাবে গ্রহণ করা হইল। Mohan Singh, *Soldiers' Contributions to Indian Independence* p.p. IX, XIII-XV. 74, 243, 245.

জনমতের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ শাসন করা যে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, এই সত্য সেই দিন ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণের সম্মুখে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃবর্গের প্রকাশ্য বিচার করিয়া তাঁহাদের শাস্তিদানের মাধ্যমে ভারতবাসীকে ভীতি প্রদর্শন করিতে চাহিলেন। আই. এন. এ. অর্থাৎ আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃবর্গের বিচার ব্রিটিশ রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার চরম প্রকাশ সন্দেহ নাই। ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর লালকেল্লায় তাঁহাদের বিচার হইল। কংগ্রেস তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল। বিচারে মেজর জেনারেল শাহ্‌নওয়াজ, কর্ণেল ধিলন প্রভৃতির মুক্তিলাভ ভারত-ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের সংগঠক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট তারিখে এক বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু এ-বিষয়ে এ-যাবৎ কোন সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই।

আই. এন. এ.-র বিচার

সি. আর. সূত্র, ১৯৪৪ : ওয়াভেল পরিকল্পনা, ১৯৪৫ (C. R. Formula 1944, Wavel Plan, 1945) : মহম্মদ আলি জিন্না ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশবিভাগ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে ভারতের ঐক্য বলি দেওয়া অপেক্ষা তাঁহার দাবি মূলত স্বীকার করিয়া লইয়া ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ রাখাই উচিত হইবে মনে করিয়া চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী (C. R.) একটি সূত্র বা Formula রচনা করিলেন। ইহাতে বলা হইল যে, মুস্লিম লীগ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিবে ; যুদ্ধের অবসানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে সকল অধিবাসীর ভোট গ্রহণ করিয়া তাহারা পৃথক রাষ্ট্র-গঠনে স্বীকৃত আছে কিনা দেখা হইবে ; যদি এই সকল অঞ্চল পৃথক রাষ্ট্র-গঠনের সপক্ষে মত দান করে তাহা হইলে যে-পৃথক দুইটি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিবে, সেগুলির মধ্যে প্রতিরক্ষা, পরিবহন এবং অপরাপর কয়েকটি বিষয় (যেগুলি সম্পর্কে উভয় অংশই সমভাবে সংশ্লিষ্ট, সেই সকল বিষয়) যুগ্মভাবে পরিচালিত হইবে। অবশ্য সেই সকল শর্ত ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিলেই কার্যকরী করা চলিবে। কারামুক্তির পর (৬ই মে, ১৯৪৪) প্রথমেই মহাত্মা গান্ধী এ-বিষয়ে মিঃ জিন্নার সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে চাহিলেন। জিন্না অবশ্য এই সকল শর্ত মানিলেন না। তিনি সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বায়ত্তশাসন দিবার আগ্রহ দেখাইতেন বটে, কিন্তু মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে পৃথক রাজ্য গঠন সম্পর্কে ভোটাধিকার দিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। যাহা হউক, সি. আর সূত্রটি বিফল হইল।

সি. আর. সূত্র (C. R. Formula)

জিন্নার বিরোধিতা

তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়াভেল (১৯৪৩-৪৭, মার্চ) ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হইলেন। তিনি ভারত-উপমহাদেশের ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং মৌলিক ঐক্যের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতের শাসনতান্ত্রিক উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন। কিন্তু জিন্না ভারতবর্ষ ব্যবচ্ছেদের দাবি ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। এ-বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর যাবতীয় চেষ্টা বিফল হইল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে

জিন্নার ভারত-ব্যবচ্ছেদের প্রতিজ্ঞা

লর্ড ওয়াভেল ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র প্রস্তুতির পূর্বাবধি ভারতীয় নেতৃবর্গকে লইয়া গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিল গঠনের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন।

ওয়াভেল পরিকল্পনা (**Wavel Plan**): লর্ড ওয়াভেল যে-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন তাঁহার প্রধান শর্তগুলি ছিল, প্রথমত, ভারতের নিজস্ব সংবিধান রচিত হইবার পূর্বাবধি একটি অন্তর্বর্তী সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে লইয়া গঠন করা হইবে। দ্বিতীয়ত, ভাইসরয়-গবর্ণর-জেনারেল-এর কার্যকরী সভার সদস্যদের মোট সংখ্যার হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা সমান সমান হইবে। তৃতীয়ত, গবর্ণর-জেনারেল এবং সেনাধ্যক্ষ ভিন্ন অপরাপর সদস্য ভারতীয়দের মধ্য হইতে লওয়া হইবে। অর্থাৎ গবর্ণর-জেনারেল ও সেনাধ্যক্ষ ব্রিটিশ হইবেন। চতুর্থত, ক্ষমতা ভারতীয়দের হস্তে হস্তান্তরিত হইবার পূর্বাবধি ব্রিটিশ সেনাপতির উপর দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নাস্ত থাকিবে।

ওয়াভেল পরিকল্পনার শর্তাদি

এ বিষয়ে সিমলায় এক কনফারেন্স আহূত হইল। কিন্তু জিন্নার আপত্তিতে এই কনফারেন্সও বানচাল হইয়া গেল। পৃথক রাষ্ট্রের 'সুলতানি' ভিন্ন অপর কোন যুক্তি বা প্রস্তাবই তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হইল না। ইতিপূর্বেই লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে মুক্তি দিয়াছিল।

সিমলা কনফারেন্স (জুন, ১৯৪৫)—জিন্নার আপত্তিতে বিফল

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান : সাধারণ নির্বাচন, ১৯৪৫-৪৬ (**End of World War II : General Election, 1945-46**) : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাসমূহ অতি দ্রুতগতিতে চলিল। আন্তর্জাতিক চাপে ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রতি তাঁহাদের পরিবর্তনে বাধ্য হইলেন। অপরদিকে কংগ্রেস আই. এন. এ.-র সামরিক কর্মচারিবর্গকে সর্বতোভাবে সাহায্যদান করিয়া দেশবাসীর অধিকতর শ্রদ্ধা অর্জন করিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের পতন ঘটিল। সেই স্থলে Labour Party'র নেতা মিঃ ক্লিমেণ্ট এটলী প্রধানমন্ত্রী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমস্যা সমাধানে নবগঠিত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা মনোনিবেশ করিলেন। সেই বৎসরই (১৯৪৫) সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করিলেন যে, ঐ বৎসরের শেষ দিকে যে-সাধারণ নির্বাচন হইবে উহাতে নির্বাচিত সদস্যবর্গ লইয়া সংবিধান সভা গঠিত হইবে এবং গবর্ণর-জেনারেল একজিকিউটিভ সভা ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া গঠন করা হইবে। সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থিগণ ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের যাবতীয় অ-মুসলমান পদগুলিতে নির্বাচিত হইলেন। এমন কি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অধিকাংশ মুসলমান সদস্য-পদেও কংগ্রেস প্রার্থিগণ জয়যুক্ত হইলেন। আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশেও কংগ্রেস কয়েকটি মুসলমান সদস্য-পদ অধিকার করিল। বাংলাদেশ ও সিন্ধুপ্রদেশ ভিন্ন অপরাপর সকল প্রদেশেই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। পাঞ্জাবে অবশ্য কোয়ালিশন (Coalition) মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচন

ব্রিটিশ সরকারের আর ভ্রম রহিল না যে, কংগ্রেসই ভারতীয় জনসাধারণের মুখপাত্র। ইতিপূর্বে আই. এন. এ.-র বিচার করিতে গিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের মনে ভীতির সঞ্চার করা দূরের কথা, ঘৃণাই অর্জন করিয়াছিলেন। এই সময়ে অপর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বোম্বাইতে 'রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভি' (Royal Indian Navy)-এর ভারতীয় কর্মচারিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করিলেন যে, ভারতবর্ষে আর বিদেশী শাসন টিকাইয়া রাখা চলিবে না। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ আর. আই. এন. (R. I. N.)-এর বিদ্রোহের পরদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী কমন্স সভায় ঘোষণা করিলেন যে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রিবর্গের তিন জনকে—লর্ড পেথিক্ লরেন্স (Lord Pethcik Lawrence), স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্স্ (Sir Stafford Cripps), এবং মিঃ এ. ভি. আলেকজাণ্ডার (Mr A. V. Alexander)-কে ভারতবর্ষে সংবিধান সভা গঠন এবং গবর্ণর জেনারেলের এক্জিকিউটিভ কাউন্সিলে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রেরণ করা হইবে। এই কমিশন 'ক্যাবিনেট মিশন' (Cabinet Mission) নামে পরিচিত। ইহার কয়েকদিন পর মিঃ এটলী কমন্স সভায় এ-কথাও স্পষ্টভাবে বলিলেন যে, ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনতান্ত্রিক উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করিতে দেওয়া হইবে না।

ব্রিটিশ ভারতীয় নীতির পরিবর্তন

নৌসেনা বিদ্রোহ R. I. N. Mutiny

ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬)

ক্যাবিনেট মিশন (Cabinet Mission): ২৩শে মার্চ, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ এক মাস ধরিয়া তাঁহারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনা করিলেন। কিন্তু মুস্লিম লীগ নেতা জিন্না তাঁহার পাকিস্তান দাবি ত্যাগ করিলেন না। ফলে কোন সর্বদল-সমর্থিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইল না। যাহা হউক, মে মাসের ১৬ তারিখের ঘোষণায় ক্যাবিনেট মিশন মুস্লিম লীগের পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য করিলেন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিক হইতে বিচারে পাকিস্তান দাবি অযৌক্তিক, একথাও বলিলেন। পরিবহন, পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ, রেলপথ প্রভৃতিকে বিভক্ত করিলে ভারতবর্ষের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে; সমরবাহিনীকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে সমূহ বিপদ দেখা দিবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন অংশ লইয়া গঠিত পাকিস্তান শান্তি বা যুদ্ধের কালে অসুবিধাগ্রস্ত হইবে। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পরিকল্পনা পেশ করিলেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী (১) সর্বভারতীয় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হইবে এবং প্রদেশগুলি স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিবে। (২) ভারতীয় প্রদেশগুলি ক, খ ও গ—এই তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। 'ক' ভাগে থাকিবে হিন্দুপ্রধান মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ), বিহার ও উড়িষ্যা। 'খ' ভাগে থাকিবে মুসলমান-প্রধান পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান। 'গ' বিভাগে থাকিবে

পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রস্তাব

বাংলাদেশ ও আসাম। (৩) সংবিধান সভার সদস্য-নির্বাচনের জন্য এক অতি জটিল পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হইল। প্রত্যেক ভাগ নিজ নিজ এলাকার জন্য শাসনতন্ত্র স্থির করিবে, কিন্তু সকল ভাগ হইতেই প্রতিনিধিগণ এবং যে-সকল দেশীয় রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যোগদানে স্বীকৃত হইবে সেই সকল রাজ্যের প্রতিনিধিগণ সমবেত-ভাবে ভারত ইউনিয়নের শাসনতন্ত্র স্থির করিবেন। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম নির্বাচনের পর যে-কোন প্রদেশ এক ভাগ হইতে অপর ভাগে যোগদান করিতে পারিবে। প্রয়োজনবোধে প্রথম দশ বৎসরের পর শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা চলিবে। (৪) ভারতীয় প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি লইয়া অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিতে হইবে।

ভারতে শাসনতান্ত্রিক জটিলতার সমাধানে ক্যাবিনেট মিশনের আন্তরিকতা

ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা জটিলতা-দোষে দুষ্ট ছিল বটে, কিন্তু আশু পরিস্থিতি বিবেচনায় ক্যাবিনেট মিশন যে আন্তরিকভাবে একটি কার্যকরী সমাধান বাহির করিতে চাহিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নাই। কংগ্রেস মুস্লিম লীগের দাবি এবং হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা যে এই পরিকল্পনায় করা হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার-গঠনের প্রস্তাবে রাজী হইল না, তথাপি সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে সংবিধান পরিষদে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইল। মুস্লিম লীগ উপরি-উক্ত পরিকল্পনায় পাকিস্তান একপ্রকার স্বীকৃত হইয়াছে দেখিয়া উহা গ্রহণ করিল এবং কংগ্রেসী প্রতিনিধিদের বাদ দিয়াই অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য গবর্ণর-জেনারেলকে চাপ দিতে লাগিল। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসী প্রতিনিধিবর্গের অসম্মতিতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে রাজী হইলেন না। মুস্লিম লীগ হইতে হতাশ হইয়া ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে না বলিয়া জানাইল। এমন কি, প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন (Direct Action) করিবে বলিয়াও ভীতি প্রদর্শন করিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সংবিধান সভার নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত হইলে জিন্না তাঁহার হতাশাজনিত বিদ্বেষ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি মুস্লিম লীগের সমর্থক গুণ্ডাদলকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উস্কাইতে লাগিলেন। ব্রিটিশের সহিত চিরকাল সহযোগিতা করিয়াও ব্রিটিশের নিকট হইতে পাকিস্তান লাভ করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে মুস্লিম লীগ প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট শহীদ সুরাবর্দীর কুখ্যাত মন্ত্রিসভার প্ররোচনায় কলিকাতায় মুস্লিম লীগ কর্তৃক Direct Action-এর নামে এক বীভৎস দাঙ্গা ও গুণ্ডাবাজী অনুষ্ঠিত হইল। এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব হইতেই বাংলার বাহির হইতে অবাঞ্ছিত গুণ্ডাদের কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। সেইদিন কলিকাতা মহানগরী সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার শাসনাধীনে থাকিয়াও এক বাস্তব নরকে পরিণত হইয়াছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার ও নৃশংস হত্যালীলা থামাইবার মত শক্তি সেই সময়ে সুসভ্য ব্রিটিশ জাতিও হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ফলে দাঙ্গার দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্ন হইতে হিন্দু সম্প্রদায় নিজ হস্তে আত্মরক্ষার দায়িত্ব

মুস্লিম লীগ কর্তৃক প্রত্যক্ষ আন্দোলন (Direct Action)-এর হুমকি

১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার প্ররোচনায় কলিকাতায় নারকীয় হত্যাকাণ্ড

গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। দীর্ঘ চারি দিন ধরিয়া কলিকাতা মহানগরীতে এই নারকীয় হত্যালীলা চলিল। নগরের পথে মৃতদেহ ও রক্তের লোভে শৃগাল না আসিলেও শকুনিদল নামিয়া আসিয়াছিল। এই চারি দিনে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের প্রাণনাশ এবং প্রায় পনর হাজার লোক আহত হইয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্ণর ও ব্রিটিশ ভাইসরয় সেই চারি দিন তাঁহাদের দায়িত্ব ভুলিয়া থাকিয়া ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিলেন। এই সাম্প্রদায়িক বর্বরতার সূত্র ধরিয়া নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান অঞ্চলসমূহে নির্দোষ হিন্দু নরনারীর হত্যা, বলপূর্বক ইসলামধর্মে ধর্মান্তর, স্ত্রী-জাতির উপর অত্যাচার প্রভৃতি অমানুষিক বর্বরতা শুরু হইল। পরে বিহারে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে হিন্দুদের উপর গুলিবর্ষণ করিতেও দ্বিধা করা হইল না, এবং অবস্থা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্তাধীনে আনা সম্ভব হইল। এমতাবস্থায় মুসলমান-প্রধান অঞ্চল—বাংলাদেশের পূর্বাংশ ও পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ—পৃথক করিয়া দিয়া সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটান ভিন্ন কোন গত্যন্তর রহিল না। কারণ, মুশ্লিম লীগের শাসনাধীনে অমুসলমানদের ধন-মান-প্রাণ কিছুই নিরাপদ নহে, এই ধারণাই সকলের মনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিমধ্যে (২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) জওহরলাল নেহরু অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিয়াছিলেন জিন্না অবশ্য এই সরকারের সহিত সহযোগিতা করিলেন না। যাহা হউক, লর্ড ওয়াভেল মুশ্লিম লীগকে শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে রাজী করাইলেন। এই সূত্রে লর্ড ওয়াভেলের আচরণে মুশ্লিম লীগের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব জওহরলাল প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিল। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, মুশ্লিম লীগের যে-সকল সদস্য অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রিটিশের তাঁবেদারে পরিণত হইয়াছেন। তদুপরি মুশ্লিম লীগ সংবিধান সভায় যোগদানে অস্বীকৃত হইলে পরিস্থিতি অধিকতর জটিল হইয়া উঠিল। মুশ্লিম লীগ দেশের অগ্রগতির প্রতি পদক্ষেপেই বাধার সৃষ্টি করিতে থাকিলে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী এইরূপ সমস্যা-সংকুল অবস্থার অবসানকল্পে ঘোষণা করিলেন যে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন ভারতীয় নেতৃবর্গের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবেন। দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন নেতৃবর্গ বলিতে মুশ্লিম লীগের নেতৃবর্গকে যে মিঃ এটলী বুঝান নাই সেকথা মুশ্লিম লীগের স্পষ্টভাবেই জানা ছিল। কারণ দায়িত্ববোধের পরিচয় মুশ্লিম লীগ দিতে পারে নাই। সুতরাং মুশ্লিম লীগের একমাত্র অস্ত্র —হিন্দুহত্যা শুরু হইল। মুশ্লিম লীগ সরকারের সংরক্ষণাধীন মুসলমান পুলিস ও মুশ্লিম লীগের গুণ্ডাদল কর্তৃক পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অনুষ্ঠিত অমানুষিক অত্যাচার ও পৈশাচিকতা পিশাচকেও হার মানাইয়াছিল। প্রায় পৌনে

ব্রিটিশ গবর্ণর ও ভাইসরয়ের নির্লিপ্ত ভাব—ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক লেপন

বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা

কংগ্রেস কর্তৃক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন —লর্ড ওয়াভেলের চেষ্টায় মুশ্লিম লীগের যোগদান—মুশ্লিম লীগ মন্ত্রিগণ ব্রিটিশের তাঁবেদারে পরিণত

মিঃ এটলী কর্তৃক ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুনের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন অবসানের ঘোষণা (২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭)

এক কোটি হিন্দু ও শিখ পশ্চিম-পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়া পূর্ব-পাঞ্জাব এবং অপরাপর হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্ত্রী-জাতির উপর অত্যাচার, হত্যা পাশবিকতায় মুস্লিম লীগ শাসন ও মুস্লিম লীগের গুণ্ডাদল একমাত্র নিজেদের সহিত-ই তুলনীয় ছিল। বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু-প্রধান অঞ্চলগুলিকে এই বর্বরতার হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু এবং শিখগণ এই দুই প্রদেশের ব্যবচ্ছেদ দাবি করিল।

বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের ব্যবচ্ছেদ দাবি

ইতিমধ্যে জওহরলাল নেহরু কর্তৃক গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যকালে লর্ড ওয়াভেল মুস্লিম লীগ মনোনীত মন্ত্রীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব শুরু করিলেন। এই ব্যাপার লইয়া কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে যে-অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল উহার পরোক্ষ ফল হিসাবেই লর্ড ওয়াভেলকে অপসারিত করিয়া ভারতবাসীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের কার্যাদি সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয়-পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইল। শাসনভার গ্রহণ করিবার (মার্চ, ১৯৪৭) অত্যল্পকালের মধ্যেই (জুন ৩, ১৯৪৭) লর্ড মাউন্টব্যাটেন এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণায় বলা হইল যে, (১) মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলির বাসিন্দাগণ যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহারা পৃথক ডোমিনিয়ন গঠন করিতে পারিবে, কিন্তু সে-ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব ব্যবচ্ছেদ করা প্রয়োজন হইবে। (২) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে যোগদান করিতে চায় কিনা তাহা তথাকার জনসাধারণের গণভোট (referendum) দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। (৩) শ্রীহট্ট জেলা পাকিস্তানে যোগদান করিবে কিনা তাহাও গণভোট দ্বারা স্থির হইবে। (৪) বাংলা ও পাঞ্জাবের কোন্ কোন্ অংশ পাকিস্তানের সহিত সংযুক্ত হইবে তাহা নির্ধারণের জন্য একটি সীমা নির্ধারণ কমিশন নিয়োগ করা হইবে। (৫) ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষকে একটি—এবং পাকিস্তান গঠন করিবার সপক্ষে মত হইলে দুইটি ডোমিনিয়নে পরিণত করিবার পক্ষে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিবে। প্রয়োজনবোধে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলের সদস্যগণ পৃথক সংবিধান সভা গঠন করিতে পারিবেন। তদানীন্তন পরিস্থিতি অনুযায়ী মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যান বা পরিকল্পনা গ্রহণ করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। ভারতবর্ষ ব্যবচ্ছেদ অনেকেরই মনঃপূত ছিল না, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে সম্প্রদায়িকতার যে-বর্বর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল উহার অবসানকল্পে-ই হিন্দু ও মুসলমান সকলে এই ঘোষণা অনুমোদন করিল। মিঃ জিন্না এই ঘোষণায় বর্ণিত পাকিস্তানের স্বরূপের কথা উল্লেখ করিয়া ইহাকে 'বিকলাঙ্গ ও কীটদষ্ট' (truncated nad moth-eaten) পাকিস্তান বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলেন। যাহা হউক, কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগ মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে বাংলা ও পাঞ্জাব ব্যবচ্ছেদের জন্য সার্ সাইরিল র‍্যাড্‌ক্লিফ (Sir Cyril Radcliffe)-এর সভাপতিত্বে দুইটি সীমা নির্ধারণ কমিশন নিযুক্ত করা হইল।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন-এর গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিয়োগ (মার্চ, ১৯৪৭)

মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা (২রা জুন, ১৯৪৭)

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট 'ভারতের স্বাধীনতা আইন' (The Indian Independence Act) পাস করিয়া ১৫ই আগস্ট ভারতের শাসনভার ভারতবাসীদের হস্তে ন্যস্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রিতে দিল্লীতে সংবিধান সভার (Constituent Assembly) অধিবেশনে ব্রিটিশ 'কমনওয়েল্‌থ্‌' (Commonwealth)-এর অংশ হিসাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইল। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত করিয়া সংবিধান সভা এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। মিঃ জিন্না পাকিস্তানের সর্বপ্রথম গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। পাকিস্তানের জন্যও পৃথক সংবিধান সভা গঠন করা হইল।

'ভারতের স্বাধীনতা আইন' (The Indian Independence Act)

এইভাবে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট দীর্ঘ পৌনে দুইশত বৎসরেরও অধিক কালের পরাধীনতার পর ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতা-সূর্য পুনরায় উদিত হইল। হিমালয় হইতে কুমারিকা, আসাম হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল যাবৎ কংগ্রেস-সেবীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম জয়যুক্ত হইল। অসংখ্য কংগ্রেস-সেবী, সন্ত্রাসবাদী, আজাদ্ হিন্দ্ সৈনিক ও নৌসেনার আত্মবলিদান এবং সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে আহূত অসংখ্য নরনারীর রক্ত অশ্রুস্নাত স্বাধীনতা-সূর্য ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হইল। কিন্তু এই স্বাধীনতার শেষ মূল্য দিতে হইল ভারতভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া।

১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ —স্বাধীনতা দিবস

জাতীয় নেতৃবর্গের কয়েকজন (Some of the National Leaders) :

মহাত্মা গান্ধী (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী) (Mahatma Gandhi) : ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত পোরবন্দরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম হয়। রাজকোট ও ভবনগরে স্কুল ও কলেজী শিক্ষালাভের পর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পড়িবার জন্য গমন করেন। স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই অতি অল্পবয়সে কস্তুরবাঈ-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। বোম্বাই ও রাজকোটের বিচারালয়ে দুই বৎসর তিনি আইনজীবীর কাজ করিয়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক মুসলমান ব্যবসায়ীর এক মামলা চালাইবার জন্য দক্ষিণ-আফ্রিকায় গমন করেন। এখানে কিছুকাল তিনি নাটালের বিচারালয়ে আইনজীবীর কাজ করিতে থাকেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ দক্ষিণ-আফ্রিকায় পৌঁছিবার দুই বৎসরের মধ্যে অক্লান্ত চেষ্টায় নাটালের প্রবাসী ভারতীয়দের লইয়া তিনি নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁহার কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা। কিন্তু প্রথম হইতেই দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গগণ তাঁহার প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজ পরিবারকে দক্ষিণ-আফ্রিকায় লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে অল্পকালের জন্য তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

জন্ম ও শিক্ষা

দক্ষিণ-আফ্রিকায় অবস্থান

শ্বেতাঙ্গদের আক্রোশ

সেই সময় দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে-সকল বিবৃতি দান করিয়াছিলেন, উহাতে দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গগণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছিল এবং সেই বৎসরই (১৮৯৬) তিনি নাটালে ফিরিয়া গেলে উন্মত্ত জনতা তাঁহাকে হত্যা করিবার উপক্রম করিয়াছিল। যাহা হউক, তথাকার কর্তৃপক্ষ ও বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্যে তিনি রক্ষা পাইলেন।

বুয়োর (Boer) যুদ্ধে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একটি ভারতীয় এ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করিয়া যুদ্ধাহত ও যুদ্ধক্ষেত্রে অসুস্থ সৈনিকদের শুশ্রূষা করেন। ইহার পর ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ফিরিবার পর পুনরায় তাঁহাকে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাইবার অনুরোধ করিয়া জরুরী তার (Telegram) আসিলে তিনি তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৯০২ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের তথা 'কালা আদমী'দের সেবা-শুশ্রূষা করিতে থাকেন।

বুয়োর যুদ্ধে এ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠন

দক্ষিণ-আফ্রিকায়-ই গান্ধীজী তাঁহার সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রথম শুরু করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ট্রান্সভাল গবর্ণমেন্ট এশিয়াবাসিগণ যাহাতে দক্ষিণ-আফ্রিকায় অবাধভাবে বসবাস না করিতে পারে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য স্থাপন বা সম্পত্তি ভোগদখল করিতে না পারে সেইজন্য এশিয়াটিক অর্ডিন্যান্স (Asiatic Ordinance) নামে একটি জরুরী আইন পাস করিলে গান্ধীজী ইহার প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করিলেন। সেখানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী (Colonial Secretary)-র নিকট প্রতিকার দাবি করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তারপর আফ্রিকায় ফিরিয়া তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করিলেন। ফলে তাঁহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল (১৯০৮)। কিন্তু জেনারেল স্মাট্স (Smuts)এ-বিষয়ে গান্ধীজীর সহিত একটা মিটমাট করিয়া লইলেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় এশিয়াবাসীদের কতক কতক সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার স্বীকৃত হইল। কিন্তু পর বৎসরই জেনারেল স্মাট্স এ-মীমাংসার শর্ত ভঙ্গ করিলে পুনরায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হইল এবং পুনরায় গান্ধীজী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয়দের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ফিরিয়া আসিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকায় টলস্টয় ফার্ম নামে একটি আরোগ্য নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। এ-দিকে দক্ষিণ-আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের অন্যায় অত্যাচারে তথাকার এশিয়াবাসীদের অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া তিনি এক ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রায় আড়াই হাজার লোক তাঁহার এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। এই আন্দোলনের ফলে এশিয়াবাসীদের উপর অন্যায়-অবিচার কতকটা হ্রাস পাইয়াছিল।

ট্রান্সভাল সরকারের 'এশিয়াটিক আইন'-এর প্রতিবাদ—আন্দোলন ও কারাবাস

টলস্টয় ফার্ম

দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে (১৯১৫) গান্ধীজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে ভারতবাসী ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য দান করিয়াছিল। এইজন্য গান্ধীজীকে ব্রিটিশ সরকার 'কাইজার-ই-হিন্দ্' সুবর্ণ পদক

পুরস্কার দিয়াছিলেন। গান্ধীজীর আশা ছিল যে, যুদ্ধাবসানে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু যুদ্ধাবসানে ব্রিটিশ সরকার সেই কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন প্রয়োজন মনে করিলেন না। এ-দিকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশের চম্পারণ নামক স্থানে নীলচাষীদের উপর অত্যাচারের সংবাদ পাইয়া গান্ধীজী 'চম্পারণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন' শুরু করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এজন্য কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিলে নীলচাষীদের দাবি পূরণ করিয়া গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হয়। পর বৎসর আহ্‌মদাবাদের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তিনি অনশন করিয়াছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্যদান

চম্পারণ সত্যাগ্রহ—আহ্‌মদাবাদে অনশন

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের জাতীয় দাবি মিটাইবার মত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা দূরের কথা ভারতবাসীদের উপর দমন-নীতি চালাইলেন। 'রাওলাট আইন' এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এই দমনমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে গিয়া অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র নরনারীকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইলে গান্ধীজী 'কাইজার-ই-হিন্দ' পদক এবং জুলু বিদ্রোহ ও বুয়োর যুদ্ধে প্রাপ্ত পদকগুলি বড়লাটের নিকট ফিরাইয়া দিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গান্ধীজীর উপরই ন্যস্ত হইল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করিয়া গান্ধীজী ভারতের জনসাধারণকে তাঁহার উপর আস্থাবান করিয়া তুলিলেন। ইহার পর হইতে স্বাধীনতা লাভের পূর্বাবধি তিনিই ছিলেন ভারতীয় জাতীয় জীবনের নিয়ামক। তাঁহার অধিনায়কত্বে এবং সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে বারদৌলি সত্যাগ্রহের সাফল্য সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল। কিন্তু চৌরিচৌরায় সত্যাগ্রহীরা সহিংস হইয়া উঠিয়া তথাকার থানার কয়েকজন পুলিস কর্মচারীকে অগ্নিসংযোগে হত্যা করিলে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই সময়ে তাঁহাকে ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল, অবশ্য দুই বৎসর পরই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং 'নিখিল ভারত চরখা সংঘ' স্থাপন করেন। ভারতবর্ষের গ্রামগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলা-ই ছিল মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক মতবাদের মূলকথা।

জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদ

অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১)

কারাদণ্ড

মহাত্মা গান্ধীর অর্থনৈতিক মতবাদ

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল মহাত্মা গান্ধীর লবণ আইন অমান্য। এই সূত্রে দেশময় এক প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীকে কারারুদ্ধ করিতে বিলম্ব করিল না। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে সত্যাগ্রহীদেরও মুক্তি দেওয়া হইল। মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ভারতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব

লবণ আইন অমান্য

হইল না। ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে তাঁহার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইল। ইহার পর কংগ্রেসের পক্ষে আন্দোলন শুরু করা ভিন্ন কোন গত্যন্তর রহিল না। পুনরায় আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতে গিয়া মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ হইলেন। সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা কেবল হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি নহে, হিন্দু সম্প্রদায়কেও বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিলে মহাত্মা গান্ধী অনশন শুরু করিলেন। পুণা চুক্তিতেও অবশ্য হিন্দু সম্প্রদায় হইতে 'Depressed class' বা অনুন্নত সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করা তিনি বন্ধ করিলেন।

গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা

পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি হরিজনদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। হরিজনদের উন্নয়নের জন্য তিনি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পদব্রজে প্রচারকার্য করিয়া বেড়াইলেন। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার। তারপর তিনি মিঃ জিন্নার সহিত আপস-মীমাংসার নানা চেষ্টা করেন। কিন্তু মিঃ জিন্না তাঁহার পাকিস্তান-দাবি কোন অবস্থায়-ই ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। যাহা হউক, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে গান্ধীজী ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিলেন। বিনোবা ভাবে-কে তিনি যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারকার্য চালাইয়া আইন অমান্য করিতে প্রেরণ করেন। এইভাবে কয়েক হাজার সত্যাগ্রহী ভারতের বিভিন্ন অংশে সত্যাগ্রহের অপরাধে কারারুদ্ধ হইলেন।

ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৪০)

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্বেষের মাত্রা যখন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিল সেই সময়ে স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ এক শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব লইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, 'It is a post-dated cheque on a crashing bank'. ইহার পর মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই আগস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মহাত্মা গান্ধী সহ দেশের নেতৃবর্গ প্রায় সকলেই কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ইহার ফলে সমগ্র দেশে এক দারুণ বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সহধর্মিণী কস্তুরবা-কে পুণার 'আগা খাঁ' প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখা হয়। এইখানেই কস্তুরবা দেহত্যাগ করেন (২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪)। ঐ বৎসরই কয়েক মাস পরে মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হয়। তারপর মিঃ জিন্নার সহিত সাম্প্রদায়িক মিটমাটের চেষ্টা করিয়া তিনি অকৃতকার্য হন।

ক্রীপ্‌স্ মিশন

'ভারত-ছাড়' আন্দোলন

মন্ত্রিমিশন ভারতবর্ষে আসিলে মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন (১৯৪৬)। ঐ বৎসর বাংলার মুস্লিম লীগ মন্ত্রিসভার প্ররোচনায় কলিকাতায় হত্যালীলার সূত্র ধরিয়া নোয়াখালিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর পৈশাচিক অত্যাচার শুরু হইলে মহাত্মা গান্ধী সেই অঞ্চলে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন। বিহারেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী সেই

নোয়াখালি পরিক্রমা

স্থানও পরিদর্শন করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে শান্তি ও সাহসের সঞ্চার করিলেন।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-ব্যবচ্ছেদ মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করেন নাই। ভারতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান হইল দেশব্যবচ্ছেদ, এবথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। পর বৎসর (১৯৪৮) ১৩ই জানুয়ারি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উদ্দেশ্যে তিনি অনশন শুরু করেন। হিন্দু-মুসলমান শান্তি কমিটি এই দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যবৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইলে ১৮ই জানুয়ারি তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। ইহার দুইদিন পর (২০শে জানুয়ারি) তাঁহার প্রার্থনা সভায় এক বিস্ফোরণ ঘটে। ইহার ফলে তাঁহার নিরাপত্তার জন্য পুলিস ব্যবস্থা করা হইলে মহাত্মা গান্ধীর ঘোর আপত্তিতে উহা উঠাইয়া লওয়া হয়।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য অনশন

ইহার কয়েক দিন পরে (৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪৮) প্রার্থনা-সভায় প্রবেশকালে নাথুরাম গডসে নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় যুবকের গুলিতে মহাত্মা গান্ধী 'হা রাম' এই শেষ বথা উচ্চারণ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সেইদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে অহিংসার সাধক ভারতীয় ধর্ম ও কৃষ্টির মূর্তবিগ্রহ মহাত্মা গান্ধী ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার নশ্বর দেহ রাজঘাটের মহাশ্মশানে ভস্মীভূত করা হইল।

মহাপ্রয়াণ (৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪৮)

ভারতের জাতীয় জীবনে মহাত্মা গান্ধীর জীবন-ই একটি বিরাট 'শিক্ষা'স্বরূপ। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলির এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল গান্ধীজীর চরিত্রে। জাতিকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে যে জাতীয়তাবোধের প্রয়োজন, মহাত্মা গান্ধী তাহা ভারতীয়দের মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যেক গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভে মহাত্মা গান্ধীর দান অপরিসীম। মহাত্মা গান্ধী সত্যই মহান আত্মার যুগপুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথ ধরিয়া চলিতে পারিলে শুধু ভারতের নহে, সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল সাধিত হইবে। তিনিই ভারতীয় জাতির জনক।

তাঁহার অবদান

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (Netaji Subhas Chandra Bose): ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি কটক শহরে সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শের অনুরাগী সুভাষচন্দ্র বাল্য বয়স হইতেই অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান করেন। অধ্যাপক ওটেন বাঙালী জাতির বিরুদ্ধে কটূক্তি করিলে সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি. এ. পাস করেন (১৯১৯)। বিলাতে আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া তিনি চাকরি পান বটে, কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া দেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নির্দেশে তিনি বাংলার কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক

জন্ম ও শিক্ষা

বাহিনী গঠন করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে তাঁহার কারাদণ্ড হয়। ইহার পর চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য পার্টির সংগঠন কার্যের ভারও তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে উত্তরবঙ্গে বন্যার্তদের সেবা-কার্যে এবং 'বাংলার কথা' ও 'ফরোয়ার্ড' নামক পত্রিকাদ্বয়ের পরিচালনায় তিনি অনন্যসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

সংগঠন-ক্ষমতা

সুভাষচন্দ্র চিরকাল ছিলেন একজন নির্ভীক বিপ্লবী। দেশসেবার দুঃসাহসিকতা, নূতন পন্থা উদ্ভাবন প্রভৃতি প্রতিভার সহিত এক অসাধারণ সংগঠনী শক্তি তাঁহাকে অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র ভারতের জনপ্রিয় নেতার আসনলাভে সাহায্য করিয়াছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনি পূর্ণ-স্বাধীনতা কংগ্রেসের আদর্শ এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিত্বের পর বৎসর ত্রিপুরী কংগ্রেসেরও সভাপতি-পদে তাঁহার নির্বাচন তাঁহার জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী-নেতৃবর্গ সুভাষচন্দ্রের অগ্রসর-নীতি সমর্থন করিলেন না। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করিবার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের সহিত এ-বিষয় লইয়া মতানৈক্য ঘটিলে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি-পদ ত্যাগ করেন। 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নূতন দল গঠনের ফলে তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী দলের নেতা ছিলেন তিনি এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। পরবর্তী কালে অবশ্য পণ্ডিত নেহরু মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যদিও সমাজতন্ত্রবাদে তাহার আস্থা অটল ছিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে নিরাপত্তা আইনের বলে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখা হয়। জেলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে তাঁহাকে পুলিস প্রহরায় নিজ বাড়ীতে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। সেই সময়ে পুলিস ও গোয়েন্দাদের চোখে ধুলা দিয়া সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে দেশ হইতে পলায়ন করেন। তারপর তিনি আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া জার্মানিতে গিয়া উপস্থিত হন। হিট্‌লারের সহায়তায় তিনি জার্মানির সেনাবাহিনী কর্তৃক ধৃত ভারতীয় সৈনাদের লইয়া এক স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনী গঠন করেন। অতঃপর তিনি জাপান এবং তথা-হইতে জাপান অধিকৃত সিঙ্গাপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে রাসবিহারী বসু প্রমুখ বহু ভারতবাসী তাঁহাকে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ গঠনে সাহায্য করেন। জাপানের হস্তে বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের লইয়া সুভাষচন্দ্র তাঁহার আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনী গড়িয়া তোলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈনিকগণ তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল। সাম্প্রদায়িক একতার এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিলেন। আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের তিনি হইলেন 'নেতাজী'। সিঙ্গাপুরে আজাদ্ হিন্দ্ সরকারও গঠিত হইল। আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনী লইয়া নেতাজী আসামের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া কোহিমা ও শিলচরের নিকটবর্তী বিষেণপুর অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু রসদের অভাব এবং অপরাপর নানাপ্রকার প্রতিকূল

তাঁহার জনপ্রিয়তা

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে নিরাপত্তা আইনে আটক

পলায়ন—জার্মানি ও জাপান হইয়া সিঙ্গাপুরে উপস্থিতি

আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ গঠন

অবস্থায় তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রত্যাগ করিতে হইল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট এক বিমান-দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন স্থির এবং সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (Sardar Vallabhbhai Patel): সর্দার প্যাটেল গুজরাটের এক রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (৩১শে অক্টোবর, ১৮৭৫)। তাঁহার পিতা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে আইন পরীক্ষায় পাস করিয়া তিনি খেদা নামক স্থানে আইনজীবীর ব্যবসায় গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর তিনি ইংলণ্ড হইতে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় পাস করিয়া আসিয়া আহম্মদাবাদে আইন ব্যবসায় শুরু করেন।

প্রথম জীবন

আইন ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করায় তিনি প্রভূত পরিমাণ অর্থ উপার্জন করিতে থাকেন। কিন্তু ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে আসিয়া তিনি রাজনীতিতে যোগদান করিলেন। দুই বৎসরের মধ্যেই গুজরাটে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে প্যাটেল তাঁহার অনন্যসাধারণ সংগঠনী-শক্তির পরিচয় দান করেন। ইহার পর কৈরা সত্যাগ্রহ, নাগপুরের জাতীয় পতাকা আন্দোলন এবং বারদৌলিতে সরকারী খাজনা না-দেওয়ার আন্দোলনে তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের পরিচয় দান করেন। বারদৌলি আন্দোলনে তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে 'সর্দার' উপাধিতে ভূষিত করেন। জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়া সর্দার প্যাটেল বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন।

অসাধারণ সংগঠনী-শক্তি

'সর্দার' উপাধি লাভ

রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি গণতান্ত্রিকতার সমর্থক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন ঘোর দক্ষিণপন্থী। কিন্তু তাঁহার ন্যায় দৃঢ়চেতা কর্তব্যনিষ্ঠ নেতা কংগ্রেসে খুব কমই ছিলেন। দীর্ঘকাল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি কংগ্রেসকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন তিনি কংগ্রেসের Iron Man নামে পরিচিত ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর সর্দার প্যাটেল দীর্ঘকাল অভিজ্ঞ শাসক অপেক্ষাও অধিকতর দক্ষতা সহকারে ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও রক্ষণশীল নীতির ফলে বিনা বিপ্লবে ভারতবর্ষে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। অসংখ্য দেশীয় রাজ্যকে তিনি ভারতরাষ্ট্রে যোগদানে স্বীকৃত করাইয়া ভারত-ইতিহাসে প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক-এর ন্যায় কার্য করিয়া গিয়াছেন। এজন্য তিনি যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। সর্দার প্যাটেল ছিলেন লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞা, অকপট দেশপ্রেম ও অবিচলিত ব্যক্তিত্বের এক মূর্ত প্রতীক। স্বাধীন ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশসেবা করিয়া ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কংগ্রেসের 'Iron man'

ভারতের বিসমার্ক

মৃত্যু, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫০

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (Maulana Abul Kalam Azad) : মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। কায়রোর আল্‌হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রে এবং আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া তিনি ভারতবর্ষে স্থায়িভাবে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসেন। অতঃপর তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিয়া ভারতের জাতীয় সংগ্রামে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সৌকত আলি ও মহম্মদ আলির সহিত একই সঙ্গে কারারুদ্ধ হন। প্রায় ৩৬ বৎসর যাবৎ তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন এবং ১৯২৩, ১৯৩০ এবং ১৯৪০ হইতে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিদের মধ্যে অপর কেহ এত দীর্ঘকাল এই সম্মান ভোগ করেন নাই। আগস্ট আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী ও অপরাপর নেতৃবর্গের সঙ্গে তিনিও কারারুদ্ধ হন এবং ১৯৪২ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের সহিত কংগ্রেসের পক্ষে তিনিই আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছিলেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের সহিত দেশপ্রেমের অতি সুন্দর সমন্বয়ের প্রতীকস্বরূপ। স্বাধীনতা-লাভের পর হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮ মধ্যরাত্রিতে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি
(Society, Economy, Education, Literature & Culture)

উনবিংশ শতকে সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (Indian Society, Economy, Education, Literature and Culture in the 19th Century) ঃ
সমাজ (Society) ঃ ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হইবার পূর্বাবধি কয়েক শত বৎসর মুসলমান শাসনের পরও ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্পর্ক নিবিড় কিংবা সামাজিক আদান-প্রদান-ভিত্তিক হইয়া উঠে নাই। মুসলমানরা বহিরাগত জাতি এবং হিন্দুদের স্বাধীনতা-হরণকারী এই ধারণা সামাজিক একতা-বিরোধী মনোভাবের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল, একথা অনস্বীকার্য। ইহা ভিন্ন, মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নতম শ্রেণীর ধর্মান্তরিত ব্যক্তি, এই ধারণাও হিন্দু সম্প্রদায়কে মুসলমান সম্প্রদায় হইতে সামাজিক দিক দিয়া পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহারিক সম্প্রীতির অভাব ছিল না বটে, কিন্তু, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে আমরা সামাজিক আদান-প্রদান বলিতে যাহা বর্তমান কালে বুঝি সেইরূপ কিছু হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ছিল না। হিন্দুদের পক্ষে মুসলমানদের হাতে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ জাতিভ্রষ্ট হইবার কারণ ছিল। কিন্তু একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে হিন্দু অভ্যাগতদের জন্য হিন্দু পাচক দ্বারা পরিচালিত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকিত। হিন্দু ধর্মগুরু, মুসলমান পীর, লোকগীতি মুসলমান বা হিন্দুধর্ম-সংক্রান্তই হউক, কতক কতক সামাজিক আদব-কায়দা উভয় সম্প্রদায়ের লোকই মানিয়া চলিতেন।

সমাজ

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদানের অভাব

হিন্দু সমাজের জাতিগত ছুৎমার্গ

অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে রচিত সৈয়দ গোলাম হোসেনের সিয়ার-উল-মুতাখেরিণ গ্রন্থে উল্লিখিত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সামাজিক আচারণ উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে অপরিবর্তিত ছিল, বলা যাইতে পারে। তাঁহার মতে হিন্দুরা অপরাপর জাতি হইতে নিজেদের সম্পূর্ণ পৃথক মনে করিত, তাহাদের সামাজিক আচার-আচরণ, ধর্মীয় রীতি-নীতি এমন ছিল যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে তাহারা বিদেশী ও ধর্মের দিক দিয়া পরিত্যাজ্য বলিয়া বিবেচনা করিত তথাপি দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল যে, তাহারা নিজেদের একই মা'র সন্তান, পরস্পর ভাই ভাই, যেন একই পরিবারের লোক এরূপ মনে করিত। এই দুই জাতি—হিন্দু ও মুসলমান 'দুধের সঙ্গে যেমন চিনি'

সিয়ার-উল-মুতাখেরিণে গোলাম হোসেনের মন্তব্য

সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায়, এরূপ মিশিয়া গিয়াছিল।* গোলাম হুসেনের মন্তব্যের অতিশয়োক্তি বাদ দিলে একথাই বলা চলে যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের অভাব ছিল না।

হিন্দু সমাজের মধ্যেও জ্যাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, অস্পৃশ্যতা, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতাহীনতা, কুসংস্কার প্রভৃতি সমাজের পশ্চাৎপদতার কারণ হিসাবে বিদ্যমান ছিল। বর্ণ-হিন্দুদের অর্থাৎ উচ্চ জাতির হিন্দুদের নিকট নীচ জাতির হিন্দুরা অস্পৃশ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক দূরের কথা অস্পৃশ্যদের ছায়া স্পর্শ করাও দূষণীয় ছিল। এই ধরনের জাতিভেদ প্রথা এবং হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ বৈষম্য ও স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বাছ-বিচার বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বত্র বিদ্যমান ছিল।

হিন্দু সমাজের জাতিভেদ-প্রথা ও শ্রেণীবৈষম্য

ইংরেজ শাসন কায়েম হইবার পর মুসলমান শাসকদের ক্ষমতার অবসান ঘটিলে শাসকসুলভ ঔদ্ধত্যও তাহাদের হ্রাস পাইল। ফলে ধর্মের গোঁড়ামির জন্য পূর্বে হিন্দু সমাজের প্রতি তাহাদের যে বিরোধিতা ও অবজ্ঞার ভাব ছিল তাহা ক্রমে দূরীভূত হইতে লাগিল। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই সমানভাবে বিদেশী ইংরেজদের পদানত এই ধারণা এবং ইংরেজ শাসনে উভয় সম্প্রদায়ের সমভাবে অভাব-অসুবিধা-ভোগ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্বাভাবিকভাবেই বাড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক পার্থক্য কোনভাবেই দূরীভূত হয় নাই।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ব্রিটিশ শাসনের সমপরিমাণ অভাব-অভিযোগের ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত—ধর্মীয় ও সামাজিক পার্থক্য অটুট

হিন্দু-মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায় ভিন্ন এক তৃতীয় সম্প্রদায় তখন গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা হইল ইংরেজ সম্প্রদায়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে ইংরেজগণ এক নূতন সম্প্রদায় হিসাবে দেখা দিয়াছিল। সংখ্যার দিক দিয়া অপর দুই সম্প্রদায় অপেক্ষা তাহারা অনেক কম ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের পদমর্যাদা এবং শাসকদের স্বজাতি হিসাবে তাহাদের অভিমান সংখ্যার দুর্বলতা দূর করিয়াছিল। ক্রমে বাঙালীদের সহিত ইংরাজদের সামাজিক সম্পর্ক অনেকটা সৌহার্দ্যমূলক হইয়া উঠিয়াছিল। সাহেবরা হিন্দুদের পূজা-পার্বণে যোগদান করিয়া গায়ে তেল মাখিয়া এবং হুকায় তামাক খাইয়া বাঙালীত্বের অনেকটা রপ্ত করিয়া লইয়াছিল। বাঙালীদের সহিত সাহেবদের বন্ধুসুলভ ব্যবহার, বাংলা ভাষায় কথা বলা এই সময়ে ইংরেজদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। মিশনারী সাহেবদের ভারতে আসায় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইনের বলে যখন আর বাধা রহিল না সেই সময় হইতে মিশনারীগণ বাঙালীদের সমাজ-জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করিল। ভারতীয়দের প্রতি মিশনারীরা অন্যান্য ইওরোপীয়দের অপেক্ষা অধিকতর সহানুভূতিশীল ছিল।

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় ভিন্ন এক তৃতীয় সম্প্রদায় ছিল ইংরেজগণ

মিশনারীদের ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীলতা

* "We see that this dissimilarity and alienation have terminated in friendship and union, and that the two nations have come to coalesce together into one whole, like milk and sugar that has received a simmering." *Siyar-ul-Mutakherin* Tr. by Cambray & Co., vol. iii, p. 188-9.

বাঙালীদের চরিত্র ও ব্যবহার সম্পর্কে কোন কোন জাত্যাভিমানী ইংরেজ কটূক্তি করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। চার্লস্ গ্রান্টের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাঙালীদের চরিত্র মসিলিপ্ত করিয়াছেন। বাঙালীরা ইওরোপে সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষাও অধিকতর অনগ্রসর; অসাধুতা, দুর্নীতিপরায়ণতা, স্বার্থপরতা এবং বিবেকহীনতা বাঙালীর মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে গ্রান্ট সাহেব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস, লর্ড ম্যাকলে, মিঃ ওয়ার্ড প্রভৃতি আরও অনেকেই এই ধরনের মন্তব্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিশপ হার্বারের মন্তব্য অনুধাবন করিলে এই সব মন্তব্য যে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। হার্বারের মতে ভারতীয়দের দোষ-ত্রুটি যাহাই থাকুক না কেন, তাহাদের সঙ্গে কিছুকাল বাস করিলে তাহাদিগকে ভাল না বাসিয়া পারা যায় না। ভারতীয়রা নম্রস্বভাব জাতি, সাধারণ মানব সমাজ অপেক্ষা ভারতীয়দের বুদ্ধিমত্তা অনেক বেশি, তাহাদের জ্ঞানস্পৃহা গ্রীসের আথেন্সবাসী অপেক্ষা কম নহে।*

ভারতীয়দের ও বাঙালীদের চরিত্র সম্পর্কে ইংরেজদের পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য

রাজা রামমোহন রায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষী দিবার কালে ভারতবাসীর নৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় কৃষক ও সাধারণ মানুষ যাহারা শহর-নগর হইতে দূরে, বিচারালয়, বিদেশীদের সংস্পর্শ হইতে দূরে গ্রামাঞ্চলে বাস করে তাহারা নির্দোষ, সংযমী এবং যে-কোন দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নৈতিক নহে। উত্তর ও পশ্চিম-ভারতের লোকেদের সাধুতা ও আড়ম্বরহীনতা, নৈতিকতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা আরও বেশি। শহরবাসী যাহারা বিচারালয় এবং নানাপ্রকার বিদেশী, বিভিন্ন ধরনের আচার-আচরণ ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসে তাহাদের মধ্যে কুটিলতা, নীতিহীনতা, মিথ্যাবাদিতা ও ধর্মহীনতা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। গ্রামাঞ্চলের লোকের তুলনায় ইহারা চরিত্রের দিক দিয়া অনেক নিম্নমানের। আবার যাহারা উকিল-মোক্তারদের মোহরারের কাজ করে এবং যাহারা চালাকি দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিয়া থাকে ইহাদের সততা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি কোনপ্রকার চারিত্রিক বলের বালাই নাই। কিন্তু সাধারণভাবে এরূপ মন্তব্য করা গেলেও রামমোহন একথা উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, শহরের লোকদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, এমনকি উপরি-উক্ত তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে এমন অনেক আছেন যাঁহারা সৎ, সত্যবাদী, চারিত্রিক বলে বলীয়ান এবং নানাপ্রকার সম্মানজনক বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন।†

পার্লামেণ্ট সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে ভারতবাসী সম্পর্কে রামমোহন রায়ের মন্তব্য

* "They (the Indians) are a nation, with whom whatever their faults, I, for one, shall think it impossible to live long without loving them.—a race of gentle and temperate habits, with a natural talent and acuteness beyond the ordinary level of mankind and with a thirst of general knowledge which even the renowned and the inquisitive Athenians can hardly have surpassed or equalled." Bishop Herber, Vide, British Paramountcy and Indian Renaissance, part II, pp. 24-25.

† *Ibid*, p. 25 ff.

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঊনবিংশ শতকের শ্রুতে বাঙালী তথা ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে যে সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার পরিলক্ষিত হইয়াছিল ঊনবিংশ শতকের পরবর্তী পর্যায়ে এই সৌহার্দ্য ক্রমেই হ্রাস পাইয়া শাসকসুলভ ঔদ্ধত্য ইংরেজদের পাইয়া বসিয়াছিল।

ইংরেজদের সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহারের পরিবর্তন

মধ্যবিত্ত শ্রেণী: ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার আইনের দ্বারা ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ হইতে বিরত করিবার ফলে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যিক এবং বিদেশী মূলধনীদের বিভিন্ন শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়, ফলে ভারতের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়া যায়। এই সব শিল্প ও বাণিজ্যের কর্মকাণ্ডে ভারতীয়দের নিজস্ব অংশ ছিল অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু যেটুকু ছিল তাহার সিংহভাগ ছিল মাড়ওয়াড়ী, মুঘল ও পার্শীদের হাতে। এই তিন সম্প্রদায়ের পর ছিল বাঙালীদের স্থান। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নায়েব, গোমস্তা, দালাল, হিসাবরক্ষক প্রভৃতির যেমন উদ্ভব ঘটিল, তেমনি মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যাবৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতির ফলে উকিল-মোক্তার, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমাজের এক শক্তিশালী অংশে পরিণত হইল। সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরেজ শাসনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ফল ছিল পূর্বেকার শাসকশ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও গুরুত্বের অবসান, বিদ্বান ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের গুরুত্ব হ্রাস এবং ক্রমে নূতন শ্রেণীবিন্যাসের উদ্ভব।

শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার: মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রসার

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন স্থাপিত হইবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে, বিশেষভাবে ইওরোপীয় বণিক সম্প্রদায় মিশনারীদের সান্নিধ্যে আসিবার ফলে ভারতবাসীর সামাজিক আচার-আচরণ, মানসিকতা সব কিছুরই পরিবর্তন শুরু হয়। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে শুরু হইয়া ঊনবিংশ শতক-ব্যাপী এই পরিবর্তন অবাধভাবে চলিতে থাকে। ভারতীয় সমাজের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমেই গভীরতর ও ব্যাপকতর হইতে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তন

বাংলাদেশেই এই পরিবর্তন সর্বপ্রথম শুরু হয় এবং ক্রমে ভারতের অপরাপর অংশে বিস্তার লাভ করে। পূর্বেকার সমাজ-বিভাগের স্থলে নূতন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের উদ্ভব ঘটে। অর্থ, শিক্ষা, বৃত্তি বা পেশাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির লোক এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। ইহা মধ্যবিত্তশ্রেণী বা সম্প্রদায় নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য জগতে যেমন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সামন্ততন্ত্রের ও যাজকতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, অবাধ প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য আনিয়াছিল, ঠিক অনুরূপ সাফল্য ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজ আনিতে সমর্থ না হইলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে এবং জাতীয়তাবোধের প্রসারের ক্ষেত্রে ভারতীয় মধ্যবিত্তের অবদান ছিল অপরিসীম।

বিভিন্ন পেশাগত পার্থক্য সত্ত্বেও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতির লোক লইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবের দুইটি প্রধান এবং মূল কারণ ছিল। একটি হইল পূর্বেকার শাসক শ্রেণীর বিলুপ্তির ফলে সামন্তসুলভ মনোভাব ও আচরণের অবসান, অপরটি হইল নূতন ভূস্বামী, নূতন ব্যবসায়ী ও বণিক এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব। বলা বাহুল্য, এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে ইওরোপীয়দের বাণিজ্য-শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়া। স্বাভাবিকভাবেই কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রথম উৎপত্তি ঘটে, কারণ এই সকল শহর কেবল ব্যবসায়-বাণিজ্য বা শিল্পোৎপাদনের কেন্দ্র বলিয়াই নহে, এগুলি সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য জগতের নাগরিক জীবনের আস্বাদ পাইয়াছিল, নূতন চিন্তাধারা, শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই ব্যাপারে কলিকাতার গুরুত্বই ছিল সর্বাধিক। বণিক, শিল্পোদ্যোগী, মহাজন শ্রেণী, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি, আমদানি-রপ্তানির কাজে পারদর্শী ব্যবসায়ী— সকল প্রকার লোকের সমাবেশ ঘটিয়াছিল কলিকাতা নগরীতে।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কারণ

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ মধ্যবিত্তের উৎপত্তি স্থল — কলিকাতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

মুঘল শাসনে পতনোন্মুখতা, মারাঠা আক্রমণ প্রভৃতির ফলে বাংলাদেশে যে-নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে অনেকেই কলিকাতা শহরে আশ্রয় লইয়াছিল। কর্মসংস্থানের জন্যও বহু লোক আসিয়াছিল। সাতগাঁও, হালিশহর, বাটোর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যবসায়ী, দালাল, কারিগর, শ্রমজীবী প্রভৃতি কলিকাতায় আসিয়াছিল। শেঠ, বসাক প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা বাটোর হইতে কলিকাতায় আসিয়া সুতানুটিতে কাপড়ের সুতা এবং ব্যবসায় চালু করিয়াছিল। ক্রমে কলিকাতা শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য সকল দিক দিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে। পাকা বাড়ী, ভাল রাস্তাঘাট কলিকাতার পৌর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তির আদিপর্ব

সর্বপ্রথম ইংরাজ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রয়োজনে, পরে প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাঙালীর সাহায্য-সহায়তা তাহাদের প্রয়োজন ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অধিক সংখ্যক ভারতীয়কে কাজে লাগান প্রয়োজন হইয়াছিল। ফলে ভারতীয়রা (বাঙালীরা) দাদনী বণিক, শ্রফ্, বানিয়ান কনট্রাক্টর, আড়তদার, কোম্পানির কর্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিল। কোন কোন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার আবার কোন কোন বণিককে দেওয়া হইত। এই সকল বিভিন্ন পেশার লোক লইয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল।

বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের সুযোগ সৃষ্টি

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ফলে যে-সামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা চিরাচরিত জাতিভেদ প্রথার সহিত সম্পৃক্ত ছিল না। পেশা বা বৃত্তির সহিত জাতির কোন সম্পর্ক না থাকায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক ঐক্য দেখা দিয়াছিল। বিভিন্ন পেশায় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর লোক নিযুক্ত হওয়া তখন আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কায়স্থ, বৈদ্য, সুবর্ণবণিক, সদ্‌গোপ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাণিজ্য, চাকরি প্রভৃতিতে প্রবেশ করিবার ফলে

পূর্বেকার সামাজিক বিভাগ অকার্যকর

পূর্বেকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতিগত বিভেদ এখন আর কার্যকরী ছিল না।

শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি প্রথমে ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে স্বাভাবিক কারণেই গ্রামাঞ্চলেও এই শ্রেণীর উৎপত্তি হয়।

ভারতীয় সমাজ-জীবনের উপর প্রভাব

ইংরাজ শাসনের প্রভাব ভারতীয়, বিশেষভাবে বাঙালী সমাজ-জীবনের উপর ব্যাপক-ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইংরেজ শাসনের পূর্বেও ভারতবর্ষের শহর-নগরের সংখ্যা ছিল প্রচুর। কিন্তু এগুলির সমাজ-জীবন ও অর্থনীতি ছিল ইওরোপীয় শিল্প-ভিত্তিক শহর-নগর অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতবর্ষের শহর-নগরগুলির অতি অল্প-সংখ্যক অর্থনীতিকে ভিত্তি করিয়া অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্যকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। অধিকাংশই ছিল গ্রাম-ভিত্তিক।

শহর ও নগরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব: মজুর, শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি

ইংরেজ শাসনের প্রয়োজনে প্রথমে এক শতাব্দী ধরিয়া তাহারা কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ মহানগরী তিনটি ভিন্ন বহু শহর নির্মাণ, সেগুলির রাস্তাঘাট, বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিল। প্রশাসনিক প্রয়োজনে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার এবং ভারতীয়দিগকে বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি দানের ফলে ক্রমে শহরগুলিতে আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজের উৎপত্তি ঘটে। চাকরির আশা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে রোজগার, অন্যান্য নানাবিধ কাজে যেমন, রাস্তাঘাট, বাড়ী প্রভৃতি নির্মাণে কাজ পাইবার সুযোগ সব কিছু গ্রামাঞ্চলের লোকদিগকে শহরাভিমুখী করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, নাগরিক জীবনের প্রলোভনও গ্রামবাসীদের অনেককে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ফলে নায়েব, বেনিয়ান, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী এবং ধনিক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপর দিকে মজুর খাটিবার বা অপরাপর ধরনের কাজ করিবার সুযোগ গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীকেও শহর-নগরে চলিয়া আসিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। এইভাবে শহর ও নগরাঞ্চলে যেমন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়াছিল, তেমনি মজুর ও শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত সমাজ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমির মালিকানা লাভ করিলে বিত্তশালী জমিদারদের অনেকেই গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করিয়া শহর-নগরে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জমিদারগণ, যেমন তালুকদার, মিরাশদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্ব-ভোগী শ্রেণী গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হিসাবে গড়িয়া উঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে যে মধ্যস্বত্বভোগী গ্রামাঞ্চলে ছিল না এমন নহে, কিন্তু তখন তাহারা কোন শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠে নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর মধ্যস্বত্ব-ভোগীর সংখ্যা এমন বৃদ্ধি পায় যে, কেবলমাত্র বাংলাদেশেই ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে বড় জমিদারের সংখ্যা যেখানে মাত্র বিশ হাজার ছিল, সেই স্থলে ছোট ভূস্বামী বা মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজারে। এই মধ্যস্বত্বভোগীরাই ছিল গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। জমিদারদের নায়েব গোমস্তা, গ্রামের মহাজন, দারোগা, মোড়ল প্রভৃতিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রসার নূতন নূতন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা, সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চাকরি লাভ, ইংরাজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের দালাল, বেনিয়ান হিসাবে কাজ করা, ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ঠিকাদারি প্রভৃতি নাগরিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি করিতেছিল। এই সকল বিভিন্ন পেশার লোকদের মধ্য হইতে 'বাবু-সম্প্রদায়' নামে চিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র বিলাসী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক দিয়া উন্নত না হইলেও অর্থের দিক দিয়া এই গোষ্ঠী খুবই সমৃদ্ধ ছিল। এই আর্থিক প্রাচুর্য নানাবিধ বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিত, ফলে অর্থের অপচয়ের সীমা থাকিত না।

শহর-নগরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরাজরা ভারতবাসীর মধ্য হইতে বুদ্ধিজীবী, দূরদর্শী রাজনীতিক, জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন ব্যক্তি বা সামরিক ক্ষেত্রে সুদক্ষ নেতার উদ্ভব ঘটুক, ইহা চাহে নাই। থ্যাকারে সাহেব মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইংলন্ডের বিত্তশালী জমিদারদের আর্থিক প্রাচুর্য তাহাদিগকে নানা আদর্শ সম্পর্কে স্বাধীন চিন্তা করিবার অবসর ও সুযোগ দিয়াছিল। ফলে ইংলন্ডে দূরদর্শী রাজনীতিক, চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী, সুদক্ষ সমরনেতা ও জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে, এমন বহু লোকের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে দক্ষ সমর অধিনায়ক, দূরদর্শী রাজনীতিক, আইন-প্রণেতাদের উৎপত্তি হউক ইহা ইংরাজগণ চাহিত না।* ভারতবাসীর উপর ইংরাজ প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য এই ধরনের লোকের উৎপত্তি ঘটুক, ইহা ইংরাজ শাসকদের কাম্য ছিল না, বলা বাহুল্য।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎকর্ষে ইংরাজদের বাধা সৃষ্টি

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পর শিক্ষিত ভারতীয় এবং বিশেষভাবে শিক্ষিত বাঙালী সমাজ ডাক্তারী, এঞ্জিনীয়ারিং, ওকালতি, মোক্তারি, শিক্ষকতা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্যোগ, সরকারী ও বেসরকারী চাকরিজীবী প্রভৃতি বাঙালী তথা ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণতা ঘটাইয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে শিক্ষকতা, রাজনীতি, আইন-প্রণয়ন, ব্যবসায়-বাণিজ্য স্থাপন, শিল্প স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রমেই যে সচেতন এক নূতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিতে লাগিল উহা দমন করিয়া রাখিতে ইংরাজ শাসক শ্রেণীর চেষ্টার অন্ত ছিল না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মপ্রত্যয়, আত্মমর্যাদা, প্রগতির ইচ্ছা তাহাদের মধ্যে এক বলিষ্ঠ মানসিকতার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের আত্মপ্রকাশে শাসক শ্রেণীর বাধাদান স্বভাবতই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের সূচনা করে। কারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, বিদেশী শাসনের অবসানই ভারতবাসীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির একমাত্র পথ। বাঙালী "ভদ্রলোক শ্রেণী" বলিতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল, শিক্ষকতা, রাজনীতি, আইন-প্রণয়ন সমাজ-সংস্কার, দেশসেবা, শিল্প,

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা: ইংরাজদের শাসনাবসান একমাত্র মুক্তির পথ

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশের গুরুত্ব

* "We do not want generals, statesmen and legislators" from among the Indians—Thackeray. Vide, Tarachand: *History of the Freedom Movement in India*, p. 301.

বাণিজ্য, প্রশাসনক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ স্থান গ্রহণে আগ্রহী এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেই বুঝায়। বাংলা তথা ভারতবর্ষের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা, সকল ক্ষেত্রেই এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশলাভ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

অর্থনীতি (Economy) ঃ ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকার বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়াই বিস্তার লাভ করিয়াছিল। স্বাভাবিকভাবেই ইস্ট ইণ্ডিয়া বণিক কোম্পানির হাত হইতে ব্রিটিশ সরকারের হাতে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা হস্তান্তরিত হইবার পূর্বাবধি বণিকসুলভ মনোবৃত্তিই যে ইংরেজ শাসনের মূল নীতি হিসাবে চালু থাকিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন-না-কোন অর্থনৈতিক নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে এবং সেই নীতির উদ্দেশ্যই থাকে প্রজার মঙ্গল সাধন করা। কিন্তু ইংরাজ বণিক কোম্পানির ক্ষেত্রে সেই ধরনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতবাসীর দেশাত্মবোধের অভাব, তাহাদের পরস্পর বিভেদ ও মতানৈক্য প্রভৃতি ইংরাজ বণিকদিগকে স্বার্থসিদ্ধি করিবার সুযোগই বাড়াইয়া দিয়াছিল এবং এই সুযোগে বণিক কোম্পানি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিল। বণিক-সুলভ স্বার্থলোলুপতা ইংরাজদের ভারতবাসীকে শোষণ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। স্বভাবতই প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থক অর্থনৈতিক কোন নীতি তাহারা অনুসরণ করে নাই। কোম্পানির রাজত্বকালে তাহাদের অর্থনৈতিক নীতি বলিতে কিছু থাকিলে উহা ছিল শোষণের নীতি। ভারতবর্ষ ইংরাজদের শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। ভারতবর্ষের কৃষি বা শিল্পের উন্নয়ন তাহাদের স্বার্থ-বিরোধী ছিল, স্বভাবতই তাহাদের কার্যকলাপ অর্থনৈতিক নীতি-বহির্ভূত ছিল। কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া সেগুলি নানাবিধ সামগ্রীতে রূপান্তরিত করিয়া পুনরায় ভারতবাসীর নিকট বিক্রয় করা ছিল তাহাদের নীতি। তাহাদের আমদানিকৃত সামগ্রীর প্রতিযোগিতায় দেশী শিল্প আঁটিয়া উঠিতে না পারায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অপমৃত্যু ঘটিলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইল। সকলেই কৃষির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। ইহাতে জমির উপর চাপবৃদ্ধির ফলে কৃষিও ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। ইহা ভিন্ন, জোর করিয়া নীল, আফিং প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করিতে কৃষকদিগকে বাধ্য করিবার ফলে একদিকে যেমন ইংরাজ বণিকদের লাভের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছিল, অন্যদিকে কৃষকদিগকে ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে দারিদ্র্যের চরমে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শোষণ-নীতি একমাত্র অর্থনৈতিক নীতি

ভারতবর্ষ ইংরাজদের কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিণত ঃ ভারতীয় শিল্পের অপমৃত্যু

কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে ইংরাজরা নীলচাষের জন্য মূলধন বিনিয়োগ করিয়া প্রচুর লাভ করিতে লাগিল। নীলশিল্পের উন্নতি ভারতবর্ষের কৃষকদের সমৃদ্ধি আনয়ন না করিয়া তাহাদের দুর্দশা চরমে পৌঁছাইয়াছিল। ১৭৮২-৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ও বিহারে ইংরাজ বণিকরা নীলচাষ শুরু করে এবং ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সেই সময়কার হিসাবে বৎসরে ৬২ লক্ষ টাকার নীল বিদেশে রপ্তানি করা হয়। নীলচাষের ইতিহাস নীলকর সাহেবদের ভারতীয় কৃষকদের উপর এক নিষ্ঠুর অত্যাচার ও শোষণের ইতিহাস। নীলচাষ ও নীলকর সাহেবদের আচরণ বাংলা তথা ভারত-ইতিহাসে এক

নীলচাষ—নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার

বিভীষিকার প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার শেষ পর্যন্ত 'নীলবিদ্রোহে'র সৃষ্টি করিয়াছিল। উনবিংশ শতকের শেষদিকে (১৮৯৫) রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল উৎপাদন শুরু হইলে নীলচাষের ক্রমে বিলুপ্তি ঘটে। কৃষির ক্ষেত্রে নীলচাষ প্রায় এক শতক ধরিয়া নীলকর সাহেবদের সমৃদ্ধি বাড়াইলেও ভারতীয় কৃষকদের কাছে নীলচাষ আর্থিক ও ব্যক্তিগত দিক দিয়া সর্বনাশাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয়রা নীল ভিন্ন পাট, আফিং, চা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনে উৎসাহী ছিল। ইহার অপর কারণ ছিল বিলাতী সামগ্রীর অসম প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির শিল্পের অপমৃত্যু এবং তাহার ফলে কৃষিজমির উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমির প্রতি আকর্ষণ বাড়াইয়া দিয়াছিল। ফলে জমির খাজনাভোগী এক শ্রেণীর মূলধনীর সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বাণিজ্যিক ফসল ক্রয় করিয়া তাহা বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপায়কারী এক শ্রেণীর মূলধনী গ্রামে উদ্ভূত হইয়াছিল। ইহারা কৃষকদিগকে ঋণ দিয়া, তাহাদের বাণিজ্যিক ফসল ক্রয় করিয়া অর্থ উপায় করিত। কোম্পানির আমলে ভারতীয় জমি বিলি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পূর্বেই ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা অর্থনৈতিক দিক দিয়া লাভজনক ছিল না। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায়ের জবরদস্তিমূলকভাবে কৃষকদের নিকট হইতে খাজনা আদায়, মহাজন শ্রেণীর শোষণমূলক ঋণদান পদ্ধতি কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির পথে কঠিন বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কৃষির উপর চাপ

মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব

কৃষি-উন্নয়নের বাধা

শহর-নগর অঞ্চলে অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বলিয়া আখ্যায়িত করা অযৌক্তিক হইবে না। ভারতীয় কারিগর, ভারতীয় কুটির শিল্প প্রভৃতির বিনাশের ফলে ভারতবাসী বিদেশে রপ্তানি করিয়া পূর্বে যে-অর্থ আয় করিত, তাহা বন্ধ হইয়া গেলে পূর্বে যে-সকল স্থান বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুতের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল এবং রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। এই সকল উৎপাদন এবং বাণিজ্যকেন্দ্র বিনাশপ্রাপ্ত হইলে বেকার কারিগর ও অপরাপর ব্যক্তি সেই সকল স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। এই সকল অসংখ্য শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্রের পরিবর্তে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি মহানগরী ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প সব কিছুর কেন্দ্র হইয়া উঠিল। সরকারের কর্মকেন্দ্রও এই তিনটি মহানগরীতেই স্থাপিত ছিল। এই সকল নগরের জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন ইস্ট্ ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক ও ইংরাজ এবং অপরাপর বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়া পড়িল। সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলেও ইওরোপীয়রাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ঔপনিবেশিক শোষণ যথেচ্ছভাবে চলিতে লাগিল।

পূর্বেকার শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহের অবলুপ্তি

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইওরোপীয়দের অর্থনৈতিক প্রাধান্য—ঔপনিবেশিক শোষণ

ইস্ট্ ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় কৃষির উন্নয়নের দিকে বা ভারতবাসীর অর্থনৈতিক

কাঠামোর মূলভিত্তি কুটির ও কারিগরি শিল্পের উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিল না। বিলাতী সামগ্রী বিক্রয়ের লাভজনক বাজার হিসাবেই ভারতবর্ষকে রাখা তাহারা স্বার্থের দিক দিয়া শ্রেয় মনে করিল। অর্থনৈতিক উন্নতির পরিপূরক হিসাবে পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকেও স্বাভাবিকভাবেই তাহারা দৃষ্টিপাত করিল না। রাস্তাঘাট নির্মাণ অবহেলিত হইল। এমতাবস্থায় কৃষক সম্প্রদায় যেমন গ্রামের জমিদার ও মহাজন কর্তৃক শোষিত হইতে লাগিল শহরাঞ্চলে কারিগর ও শিল্প-শ্রমিকরা বণিক সম্প্রদায় কর্তৃক তেমনি শোষিত হইতে থাকিল। এল. এইচ্. জেঙক্‌স্-এর মতে ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রথম একশত বৎসরের নীট ফল ছিল বস্ত্র-শিল্প, কৃষি প্রভৃতির সর্বনাশ, রাজস্ব ও করের অধিক চাপ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রসরহীনতা।* ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার যখন ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারতের শাসনভার সরাসরি নিজ হস্তে গ্রহণ করেন, সেই সময় ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে দৃক্‌পাত করিলে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই সময়ে ভারতীয় অর্থনীতি অগ্রগতির মূল শক্তিই হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কৃষকদের কৃষি উন্নয়নের আর্থিক ক্ষমতা ছিল না, নূতন পদ্ধতিতে চাষ করা বা চাষের উপযুক্ত বলদ বা যন্ত্রপাতি ক্রয় করা প্রভৃতি তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মহাজনের নিকট তাহাদের ঋণগ্রস্ততা, জমিদারের রাজস্ব আদায় দিবার কঠিন চাপ সব কিছুর ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল শক্তি কৃষক সমাজ তখন নিপীড়িত, নিঃশেষিত ও হতাশায় নিমজ্জিত।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদাসীনতা

শিল্প, কৃষির সর্বনাশ : অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা

কৃষক শ্রেণীর আর্থিক দুরবস্থা

শহরাঞ্চলে ভারতীয় বণিক শ্রেণীর মূলধনের অভাব হেতু কোনপ্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা কারখানা স্থাপন তাহাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত ছিল। স্থানীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য, দোকানদারি, দালালি, মহাজনি প্রভৃতি কাজই তখন অর্থ উপায়ের পথ ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলিতে তখন যাহাদের বুঝাইত, তাহাদের মধ্যে উপরি-উক্ত শ্রেণী ভিন্ন উকিল, মোক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি পেশাধারী ব্যক্তিরাও ছিলেন।

বণিকদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি হইতে ভারতবর্ষের শাসন-ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি অধীন হইবার পরও ভারতীয় প্রশাসন যাহা ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্য পরিবর্তন ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। এই পরিবর্তনের ফলে যে-অর্থাগম হইতেছিল, তাহার সিংহভাগই ইওরোপীয় বণিক, শিল্প-মালিক ভোগ করিতেন। খুব সামান্য সংখ্যক ভারতীয় হয়ত বিত্তশালী হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ-ই দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক নীতি ভারতবাসীর আয়বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে নাই। তাহাদের বাণিজ্যিক নীতির ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের কতক সুবিধা হইলেও মূল উৎপাদকের অবস্থা শোচনীয়ই

অর্থনৈতিক পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য : ভারতবাসীর পক্ষে সেই উন্নতি মূল্যহীন

* Jenks H. L. *Migration of British Capital*—to 1875, p. 209

রহিয়া গিয়াছিল। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ইংলণ্ডের সম্পদ বৃদ্ধি করা।

১৮৫৮ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে ভারতবাসীর ৯০ শতাংশই গ্রামে বসবাস করিত। এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু কৃষি ভিন্ন অন্যান্য শিল্প বা বৃত্তিতে নিয়োগ করিবার সুযোগ তৈয়ার করা সরকারী নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ফলে কৃষিজমির উপর চাপ বৃদ্ধি, কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা, কৃষিপদ্ধতির পশ্চাৎপদতা ভারতীয় কৃষকদের উপর জগদ্দল পাথরের মতই চাপিয়া রহিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশের হিসাবমত এক বর্গমাইল কৃষিজমি ২৫০ জন লোকের মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে প্রয়োজন। অথচ সেই সময়েই ভারতবর্ষে এক বর্গ-মাইল পরিমাণ জমিতে ৬০০ লোকের বসবাস ছিল।* গ্রামীণ শিল্পের অকালমৃত্যু কৃষি-জমির উপর চাপ ক্রমেই বাড়াইয়া দিয়াছিল, ফলে কৃষি আর লাভজনক ছিল না। এই পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল মানুষের অনুপযোগী জীবনযাত্রার মান কৃষক সমাজের বজায় রাখিয়া কোনভাবে প্রাণ ধারণ করা।

সরকারী অর্থনৈতিক নীতি কৃষিজীবী ভারতবাসীর অধিকতর দুর্দশার কারণ ছিল

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৮ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কৃষিজমির পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু কৃষকদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছিল। ইহা আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হইলেও ইহার কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল। বাণিজ্য-ফসল (Commercial Crop) অর্থাৎ যে-সকল ফসল কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা যায়, সেগুলির উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যশস্য চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল। ফলে বাণিজ্য ফসল উৎপাদনকারী কৃষকদের কেহ কেহ লাভবান হইলেও খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হাওয়ায় খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছিল। সেচব্যবস্থার অভাব, জমির উৎকর্ষ-বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব কৃষিকার্য৺ লাভহীন বৃত্তিতে পরিণত করিয়াছিল। অনেকে কৃষিকাজ ছাড়িয়া দিবার ফলে জমিহীন শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল।

কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে কৃষক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি ঘটে নাই : বাণিজ্য-ফসল উৎপাদন : খাদ্য-শস্য উৎপাদন হ্রাস

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সরকার কৃষিবিভাগ নামে একটি নূতন বিভাগ প্রবর্তন করেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ ভয়েলকার নামে জনৈক কৃষিবিজ্ঞানীকে আনাইয়া ভারতীয় কৃষির উন্নতি সম্পর্কে সুপারিশ করিতে বলা হয়। তাঁহার সুপারিশ অনুসারে একজন 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অব্ এগ্রিকালচার' নিয়োগ করা হয়। তাঁহার কাজ ছিল বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের কৃষিবিভাগের কাজকর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। এ-দিকে মার্কিন দানশীল মিঃ ফিলিপস্-এর অর্থানুকূল্যে পুষা রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা আশানুরূপ উন্নতি সাধনে ব্যর্থ হয়। যেটুকু সুফল পাওয়া গিয়াছিল, তাহা কৃষকদের ভাগ্য-পরিবর্তনে সাহায্য করে নাই।

কৃষিবিভাগ সৃষ্টি

পুষা রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন

* Taracband : *History of the Freedom Movement in India*, vol. ii, p. 284.

সাধারণত রেলপথ নির্মাণ কৃষিজাত ফসল পরিবহন প্রভৃতির সহায়ক হইয়া থাকে। এক স্থানের উৎপন্ন ফসল অন্যত্র অর্থাৎ যেখানে বেশি দামে বিক্রয় করা যায় সেখানে বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় রেলপথের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে দ্রুত এক স্থান হইতে প্রয়োজনবোধে অন্যত্র প্রেরণে সুবিধা সৃষ্টি করা এবং ভারতে উৎপন্ন কাঁচামাল নিকটবর্তী বন্দরে রপ্তানির জন্য প্রেরণ করা। ভারতীয়দের উন্নতির সহায়ক ইহা হয় নাই।

রেলপথ ভারতীয় কৃষির সহায়ক হয় নাই

ভারতে কৃষিজীবী ও মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক অবস্থার শোচনীয়তা ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের মনোভাব স্বভাবতই জাগাইয়া তুলিয়াছিল। পরাধীনতাই এজন্য দায়ী এই ধারণা জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

আর্থিক দুরবস্থা জাতীয়তাবোধ-বৃদ্ধির সহায়ক

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই কংগ্রেস ভারতের অগণিত অধিবাসীর দারিদ্র্যের জন্য ব্রিটিশ সরকারকেই দায়ী করিতে লাগিল। সরকারী রাজস্ব ব্যবস্থা এজন্য প্রধানত দায়ী, এ-কথা কংগ্রেস স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিল। আর. সি. দত্ত ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কার্জনকে লেখা এক পত্রে ভারতীয় রায়তের উপর অত্যধিক রাজস্বের চাপ তাহাদের দারিদ্র্যের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ব্রিটিশের প্রবর্তিত রাজস্ব-নীতি, রাজস্বের চাপ,—এই দুইয়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সোচ্চার হইয়া উঠিলে কৃষিজীবী ভারতবাসী কংগ্রেসের সমর্থনে দাঁড়াইল। এইভাবে ভারতের জাতীয়তাবোধ ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতির জন্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিল।

কংগ্রেস কর্তৃক কৃষি-ব্যবস্থার নিন্দা

আর. সি. দত্তের চিঠি

জাতীয়তাবোধের প্রসার

ব্রিটিশ শাসকদের যথেচ্ছভাবে শাসন-সংক্রান্ত ব্যয়বৃদ্ধির ফলে ভারতবাসীর দুর্দশা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের গভর্ণর ট্রেভেলিয়ান সাহেব সরকারের ব্যয় বাহুল্যের বিরোধিতা করেন। কিন্তু ভাইসরয়ের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের অর্থদপ্তরে ভারপ্রাপ্ত উইলসন সাহেব ট্রেভেলিয়ানের মতের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন। ব্রিটিশ সরকার উইলসনের নীতিই অনুসরণ করিতে থাকেন। ফলে সরকারের ব্যয়ের অঙ্ক ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সরকারের ব্যয়বৃদ্ধি প্রজাবর্গের ক্ষতির কারণ হয় না, যদি সেই ব্যয় উৎপাদনমূলক এবং জনহিতকর কাজের জন্য করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের ব্যয়ের সিংহভাগ সামরিক বাহিনী, পদস্থ ইংরাজ কর্মচারীর মাহিনা, সরকারী ঋণের সুদ প্রভৃতির জন্য করা হইত। এই সকল ব্যয়ের কোন অংশই ভারতবাসীর জন্য করা হইত না, অথচ এই অর্থ যোগাড় করা হইত ভারতবাসীর উপর কর স্থাপন করিয়া।

শাসক শ্রেণীর জন্য ব্যয় ভারতীয়দের উপর কর স্থাপন

ভারতবাসীর উপর কর স্থাপন করিয়া সেই অর্থ বিদেশীদের স্বার্থে প্রধানত ব্যয় করিবার নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন দাদাভাই নৌরোজী। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সিলেকট্ কমিটির নিকট এক প্রতিবেদনে তিনি দরিদ্র ভারতবাসী যে-সম্পদ উৎপাদন করে, তাহা হইতে এক বিরাট অংশ বিদেশে প্রেরণ করা সম্ভব কি—এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। ডিউক অব্ ডেভনশায়ার, স্যার্ উইলিয়াম হাণ্টার প্রভৃতির সহিত একমত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, সরকারী ব্যয় দেশবাসীর পক্ষে ক্ষতিকারক নহে। কিন্তু সেই ব্যয় যদি বিদেশীদের স্বার্থে করা হয়, তাহা হইলে দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িবে ইহা নিশ্চিত। তাই তিনি বলিয়াছিলেন যে, অসংখ্য ভারতবাসী যখন অনাহারে, অর্ধাহারে কালাতিপাত করিতেছে, অনেকে যখন মারা যাইতেছে সেই পরিস্থিতিতে তাহাদের উৎপাদিত সম্পদের এক বিরাট অংশ বিদেশে অর্থাৎ ইংলণ্ডে চলিয়া যাওয়া ব্রিটিশ প্রশাসনের কলঙ্কের কথা। ইতিপূর্বে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার্ উইলিয়াম হাণ্টার বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী ইংরাজ প্রশাসনের ব্যয় বিলাতের সম-অনুপাতে করিতে সক্ষম নহে। কারণ সেই সময়ে বিলাতে প্রশাসনের কাজের ব্যয় ছিল সকল দেশ অপেক্ষা বেশি। ভারতবাসী প্রশাসনিক ব্যয় অর্থাৎ পদস্থ কর্মচারী প্রভৃতির জন্য ব্যয় ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মানের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই করিতে পারে, তাহার বেশি নহে। অথচ সেই সময়ে প্রত্যেক ইংরাজ কর্মচারীর (সামরিক ও বেসামরিক) পশ্চাতে এক বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইত।*

বিদেশীদের স্বার্থে ভারতীয়দের উৎপন্ন সম্পদ ব্যয়

ডিউক অব্ ডেভন-শায়ার, স্যার্ উইলিয়াম হাণ্টার ও দাদাভাই নৌরোজীর প্রতিবাদ

হাণ্টারের মতে বিলাতের সম-অনুপাতে প্রশাসনিক ব্যয় ভারতবর্ষে করা অন্যায়মূলক

ইংরাজ প্রশাসনিক ব্যয় দ্রুতগতিতে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহা সুস্পষ্ট হয় যখন আমরা দেখি যে, ১৮৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে মোট ব্যয় ছিল ২৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা তাহা দশ বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৬০-৬১-তে ৪৬ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা এবং ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে ১০১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। মোটামুটি পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে প্রশাসনিক ব্যয় প্রায় চারিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ব্রিটেনে যেখানে সরকারের আয়ের মাত্র ৫½ ভাগ প্রশাসনিক কাজে ব্যয়িত হইত, সেখানে ভারতে সেজন্য ব্যয় করা হইত ১৪%।

দ্রুতগতিতে প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি

রেলপথ স্থাপনে বিলাতী মূলধন ব্যয়িত হইয়াছিল, ফলে রেলপথের দরুন যে লাভ হইত এবং মূলধনের উপর সুদ বিলাতে চলিয়া যাইত। শুধু তাহাই নহে, ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে নূতন রাজ্যজয়ের জন্য খরচ, প্রশাসনিক ব্যয়, ভারত সরকারের নামে গৃহীত ঋণের সুদ, ইংলণ্ডে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আফিসের ব্যয়, সব কিছু মিলিয়া এক বিরাট পরিমাণ অর্থ বিলাতে প্রতি বৎসর পাঠান হইত। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির হাত হইতে ব্রিটিশ সরকার যখন ভারতের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন, তখন কোম্পানিকে যে-ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল তাহাও ভারত সরকারের ঋণ হিসাবে ধরা হইয়াছিল। ঋণের অর্থ

হোম চার্জেস্ (Home charges)

* Vide, *England's Work in India*, p. 118-19.

ইংলণ্ডে যোগাড় করা হইত। সুদও স্বভাবতই সেই দেশে পাঠাইতে হইত। এই সকল কারণে প্রতি বৎসর 'হোম চার্জেস্' (Home charges) নাম দিয়া এক বিশাল পরিমাণ অর্থ বিলাতে প্রেরণ করা হইত।

দাদাভাই নৌরোজীর ব্রিটিশ ঐতিহ্য-বিরোধী শাসনের (Un-British Rule) প্রতিবাদ

ভারতবাসীর অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন দাদাভাই নৌরোজী। ভারতবাসীর মতামত গ্রহণ না করিয়া এবং তাহাদের মতামত উপেক্ষা করিয়া ভারতবাসীর উপর কর স্থাপন, রাজস্বের সিংহভাগ বিদেশীদের স্বার্থে ব্যয় প্রভৃতি ব্রিটিশ ঐতিহ্য-বিরোধী (Un-British) কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দাদাভাই সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অযৌক্তিক অর্থনৈতিক নীতির বিরোধিতা

এ-দিকে জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে সম্পদ প্রেরণ, রাজস্ব ও করের অসহনীয় চাপ, সরকারের ঋণ বৃদ্ধি, দেশে খাদ্যাভাব, চরম দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ-দুর্দশা সকল কিছুর বিরুদ্ধে পুনঃপুনঃ প্রতিবাদ করিতেছিল। চিন্তাশীল ভারতবাসী মাত্রেই এই পরিস্থিতির প্রতিকারকল্পে রাজস্বের হ্রাস, সুতীবস্ত্রের উপর কর বিলোপ, লবণের উপর কর হ্রাস, দুর্ভিক্ষ বা অন্যান্য দুর্দৈবের বৎসর রাজস্ব মকুব, রাজস্বের উদ্‌বৃত্ত অংশ জনসাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করা প্রভৃতি কংগ্রেসের দাবির সঙ্গে সহমত ছিলেন। আর. সি. দত্ত, গোখলে ব্রিটিশ সরকারের অযৌক্তিক অর্থনৈতিক নীতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সহায়ক

এই অর্থনৈতিক দুর্দশা লাঘবের একমাত্র পথই ছিল বিদেশী শাসনের অবসান এই উপলব্ধি ভারতবাসীকে জাতীয়তা আন্দোলনের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছিল।

পাটচাষ ও পাটশিল্প

ইংরাজদের আমলে স্থাপিত শিল্পগুলির মধ্যে পাটচাষ ও পাটের বস্তা প্রস্তুত খুবই উন্নত শিল্প হইয়া উঠে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ডাণ্ডির (Dundee) অনুকরণে ভারতে সর্বপ্রথম যন্ত্র-চালিত পাটের বস্তা বয়নের ব্যবস্থা শুরু হয়। পাটশিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন স্থানে পাটের কল স্থাপিত হইতে থাকে। রিষড়া, বরাহনগর, গৌরীপুর, সিরাজগঞ্জ, ভারত জুট মিল প্রভৃতি নানাস্থানে পাটকল স্থাপিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাটচাষেরও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরিকল্পনাবিহীন পাটকলের সম্প্রসারণ পাটশিল্পের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিলে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়ান জুট মিল এ্যাসোসিয়েশন" (Indian Jute Mill Association) জুট মিলগুলির নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করে। ইহার পর হইতে পাটশিল্প সময় সময় নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইলেও মোটামুটিভাবে অগ্রগতির পথে আগাইয়া চলে। ভারতবর্ষের অর্থনীতির ক্ষেত্রে উনবিংশ শতকে পাটশিল্পের অগ্রগতি ভারতীয় কৃষকদের কতকটা সমৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে।

চা ও কফি

ভারতবর্ষে চা ও কফি উৎপাদন ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলির অন্যতম প্রধান। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আসামের জঙ্গলে চা গাছ রবার্ট ব্রুস্ নামক এক সাহেব আবিষ্কার করিলে ভারতে চা চাষের ইতিহাস শুরু হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ভারতে মোট ৮,৭২,৪৩১ পাউণ্ড পরিমাণ চা উৎপাদন করা সম্ভব হয়। দশ বৎসরের মধ্যে উহার পরিমাণ ৬০ লক্ষ পাউণ্ডে পৌঁছায়

এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে চা উৎপাদনের পরিমাণ ৩৪½ কোটি পাউণ্ডে পৌঁছায়। চা-শিল্পের উন্নতিজনিত লভ্যাংশ সাহেবদেরই সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল। চা বাগানে ভারতীয় শ্রমিক ও করণিক ভিন্ন পদস্থ কর্মচারী সাহেবদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইত।

অপরাপর শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প, লোহা ও ইস্পাতশিল্প প্রধানত ভারতীয় উদ্যোগে গড়িয়া উঠিয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে সূতীবস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা হইত। একমাত্র বাংলা হইতে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মোট ৬৭½ লক্ষ টাকার ছাপা সূতীবস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ঘটিলে সেই দেশ হইতে মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প টিকিতে পারিল না। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ভারতবাসী যন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্র প্রস্তুত করা ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবনের একমাত্র পন্থা বিবেচনা করিয়া কাপড়ের কল স্থাপন করিতে শুরু করে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কাওয়াসজী নানাভাই বোম্বাইয়ে সর্বপ্রথম কাপড়ের কল স্থাপন করেন। সাত বৎসরের মধ্যেই বোম্বাইয়ে মোট দশটি এবং আহম্মদাবাদে তিনটি কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে অবশ্য বোম্বাইয়ের তুলনায় কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল কম। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে যখন মোট ১৮টি কাপড়ের কল চলিতেছিল সেই সময়ে বাংলায় ছিল মাত্র দুইটি। পরবর্তী পনর বৎসরের মধ্যে বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট উন্নত হইয়া উঠে এবং ভারতের মোট কাপড়ের কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৭। এগুলির মধ্যে মোট ৯৪টি বোম্বাইতে। ইংরাজ শাসকরা ইংলণ্ড হইতে বস্ত্র আমদানি শুল্ক হ্রাস করিয়া দিয়া বিলাতী কাপড় যাহাতে ভারতবর্ষের বাজারে অপেক্ষাকৃত সস্তায় বিক্রয় হয়, সেই ব্যবস্থা করিয়া ভারতের বস্ত্রশিল্পোন্নয়নের বাধা সৃষ্টি করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ইংলণ্ড হইতে কাপড় আমদানির অসুবিধা ঘটিলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্প্রসারণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ইহার পর হইতে ভারতের বস্ত্রশিল্প ক্রমে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

বস্ত্রশিল্প

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উন্নতির পথে বাধা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সুযোগ

ভারতের লোহা ও ইস্পাতশিল্প ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়। প্রাথমিক চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই শিল্প ক্রমে প্রসারলাভ করে। ঐ বৎসর বরাকর লোহা ও ইস্পাত কারখানা, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কারখানা, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জামসেদপুরের টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। টাটা কোম্পানি লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুত শুরু করিলে ভারতের লোহা ও ইস্পাতশিল্পের এক বিরাট উন্নয়নের সূত্রপাত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে সেই সুযোগ আরও বৃদ্ধি পায়।

লোহা ও ইস্পাতশিল্প

উপরি-উক্ত শিল্প ভিন্ন খনিশিল্প, কাগজ ও চিনিশিল্প ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয়। চিনি প্রস্তুত অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে যন্ত্রের সাহায্যে চিনি প্রস্তুত বিংশ শতকের প্রথম দিকে শুরু হয়। কাগজের কল ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে টিটাগড় পেপার

খনিশিল্প, চিনি ও কাগজশিল্প

মিল্‌স্‌ এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল পেপার মিল্‌স্‌ স্থাপিত হইলে ভারতে কাগজশিল্পের ক্রমোন্নতি ঘটিতে থাকে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশাল দেশ ভারতবর্ষের সুবিশাল জনসংখ্যার প্রয়োজনের অনুপাতে এবং ভারতে কাঁচামালের প্রাচুর্যের দিক হইতে বিচারে ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষে শিল্পোন্নয়ন ছিল অকিঞ্চিৎকর। ভারতবাসীর দারিদ্র্য, কৃষির অনগ্রসরতা প্রভৃতির জন্য শিল্পোন্নয়নে ব্রিটিশ সরকারের অনীহা এবং ব্রিটিশ সরকারের শোষণনীতিই প্রধানত দায়ী ছিল, বলা যাইতে পারে।

ভারতবাসীর দারিদ্র্যের কারণ—কৃষি ও শিল্পের পশ্চাৎপদতা ও ব্রিটিশ সরকারের শোষণনীতি

শিক্ষা (Education) : ভারতের জাতীয় জীবনে ইংরাজ শাসনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল শিক্ষার প্রসার। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বিশেষভাবে বাংলাদেশে চিরাচরিত মূল্যবোধের ক্ষেত্রে—ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সৌন্দর্যবোধ—সকল ক্ষেত্রেই এক নূতন এবং বিরাট পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজ শাসনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান

পূর্বে ভারতের চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থা বিত্তশালী হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের অর্থানুকূল্যে স্থাপিত পাঠশালা, মক্তবে পরিচালিত হইতেছিল। কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের হিসাবপত্র রাখিবার ক্ষমতা অর্জন করা ছিল সেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সংস্কৃত টোলের মাধ্যমে অবশ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন, ন্যায়, তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুর্বেদশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়, মক্তব, টোল

মুসলমান শাসনকালে যেমন রাজকর্মচারি-পদ লাভের আশায় বহু হিন্দু-মুসলমান নিজ নিজ চেষ্টায় ফারসী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন অনুরূপ ব্রিটিশ শাসনকালেও একই উদ্দেশ্যে অনেকে, বিশেষভাবে হিন্দুদের মধ্যে অনেকে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ভারতের বিভিন্নাঞ্চলের স্থানীয় রাজগণের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। হেবার সাহেবের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, অযোধ্যার সাদাত আলি, ঢাকার নবাব সামসুদ্দৌলা ইংরাজীতে কথা বলিতে পারিতেন। সামসুদ্দৌলা মোটামুটিভাবে ইংরাজী লিখিতেও পারিতেন।*

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার আগ্রহ

ইংরাজদের সান্নিধ্য, ইংরাজ শাসনে ব্যক্তিগত উন্নতি সাধনে, রাজকার্য, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইংরাজী ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করিয়া সর্বপ্রথমে বাঙালীদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাংলাদেশেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল এই কারণে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে

বাঙালীদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ

* "Speaks and writes English very tolerably, and even fancies himself a critic in Shakespeare." Herber. Vide, *British Paramountcy and Indian Renaissance*. vol. ii, p. 31.

দেখা দিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল স্থাপনের ধারণা সর্বপ্রথম চার্লস্ গ্রান্ট নামক কোম্পানির জনৈক সিভিল সার্ভেন্টের মনে উদিত হয়। তিনি তাঁহার এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, ভারতবাসীর ব্যাপক জ্ঞানান্ধতা তাহাদের নৈতিক অধঃপতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমেই সেই জ্ঞানান্ধকার দূর করা সম্ভব। কিন্তু চার্লস্ গ্রান্ট ডাইরেক্টর সভার সদস্যদিগকে তাঁহার পরিকল্পনা গ্রহণ করাইতে সমর্থ হইলেন না। তিনি যাহা পারিলেন না, তাহা বাংলা ও মাদ্রাজে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ সম্পন্ন করিলেন। উইলিয়াম কেরী সরকারী সাহায্য না লইয়াই ইংরাজী শিক্ষার স্কুল স্থাপন করিলেন এবং বাংলা ভাষায় বাইবেল-এর অনুবাদ প্রকাশ করিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুরে ইংরাজী শিক্ষার একটি স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ফরবেস সাহেব ইংরাজী শিক্ষার একটি স্কুল সেখানে স্থাপন করেন। তিন বৎসর পর (১৮১৭) কলিকাতার হিন্দু স্কুল (বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ) স্থাপিত হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার স্কুল বুক সোসাইটির অবদানও নেহাত কম ছিল না। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয় ভাল বই বাহির করা ছিল স্কুল বুক সোসাইটির উদ্দেশ্য ও কাজ। পর বৎসর এই সোসাইটি নূতন স্কুল স্থাপন, প্রচলিত স্কুলের উন্নতি সাধন প্রভৃতি উহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিল এবং স্কুল বুক সোসাইটির নাম পরিবর্তন করিয়া "কলিকাতা স্কুল সোসাইটি" নামকরণ করিল। এই সোসাইটির ইওরোপীয় সম্পাদক হইলেন ডেভিড্ হেয়ার এবং ভারতীয় সম্পাদক হইলেন রাজা রাধাকান্ত দেব।

চার্লস্ গ্রান্টের চেষ্টা —ব্যর্থ

উইলিয়াম কেরী

ভবানীপুরে স্কুল, চুঁচুড়া স্কুল

হিন্দু স্কুল

স্কুল বুক সোসাইটির নাম ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন

বাঙালীদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজের অবদান ছিল সর্বাধিক। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি এই স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ মুখার্জী নামে তখনকার এক গণ্যমান্য ব্যক্তির চেষ্টায় এই স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড্ ইস্ট্-এর সঙ্গে দেখা করিয়া বাঙালী জাতির মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার আগ্রহের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেই সূত্রেই ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট্ সাহেবের বাড়িতে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্মিলিত হন এবং সেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা তোলা হয়। সেই সকল চেষ্টার ফলশ্রুতি ছিল পর বৎসর হিন্দু স্কুলের প্রতিষ্ঠা। রাজা রামমোহন রায় এই স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এ-কথার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বস্তুত সার্ হাইড্ ইস্ট্ রামমোহন রায়কে চিনিতেন না।*

হিন্দু স্কুল স্থাপনের ইতিহাস: বৈদ্যনাথ মুখার্জীর অবদান

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ শাসকরা ইংরাজী শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করা যখন নীতিগতভাবে স্বীকার করিয়া লইলেন, সেই সময়ে একমাত্র কলিকাতায়ই চিশটি ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতার বাহিরেও এই ধরনের বহু স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকলে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে,

কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরে বহু ইংরাজী স্কুল স্থাপন

* *Ibid*, p. 32-33.

বাংলাদেশের একটিমাত্র শহরেই ১400 ছাত্রকে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করিতে তিনি দেখিয়াছিলেন।*

ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের পশ্চাতে কারণ

ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার পশ্চাতে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টারে উল্লিখিত বৎসরে অন্তত এক লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করিবার দায়িত্ব ভিন্ন আরও কতকগুলি কারণ ছিল। ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের মধ্যে একটি নৈতিক, রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। ইহা ভিন্ন, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারিত হওয়ার আনুষঙ্গিক প্রশাসনিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যেও ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন ছিল।

শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন কলেজ, আলেকজান্ডার ডাফ্ কর্তৃক জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশন স্থাপন

এ-দিকে খ্রীষ্টান মিশনারীরা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট্ মিশন কলেজ নামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্কটিশ মিশনারী আলেকজান্ডার ডাফ্ কর্তৃক জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইন্স্টিটিউশন (পরবর্তী কালের স্কটিশ চার্চ কলেজ) স্থাপন করেন। এই কাজে রাজা রামমোহন তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য রামমোহন রায়ের আগ্রহ: লর্ড আমহার্স্টের নিকট প্রতিবেদন

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতীয়দের শিক্ষা ও নীতির উন্নতির জন্য বৎসরে অন্তত এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার নির্দেশ ছিল। কিন্তু ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বাবধি এ-বিষয়ে কোন কিছুই করা হয় নাই। ঐ বৎসর কমিটি অব্ পাব্লিক ইনস্ট্রাকশন নামে একটি কমিটি বাংলাদেশে স্থাপিত হয়। এই কমিটির চেষ্টায় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। রাজা রামমোহন রায় গবর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের নিকট এক যুক্তিপূর্ণ অথচ দৃঢ় প্রতিবেদনে সংস্কৃত শিক্ষার স্থলে পাশ্চাত্য ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দাবি উত্থাপন করিলেন। ইংরাজ সরকার অবশ্য রাজা রামমোহনের প্রতিবেদনের যৌক্তিকতা উপেক্ষা করিয়া সংস্কৃত, আর্বী, ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের উপরই মনোযোগ দিলেন। কিন্তু ক্রমে ভারতীয়দের পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের আগ্রহ কমিটি অব্ পাব্লিক ইনস্ট্রাকশনের উপর প্রভাব প্রতিফলিত করিল। উহার সদস্যদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক এই

কমিটি অব্ পাব্লিক ইনস্ট্রাকশন ওরিয়েন্টেলিস্টস্ ও এংলিসিস্ট্স্—দুই দলে বিভক্ত

দুই দলের সৃষ্টি হইল। ইঁহারা যথাক্রমে Orientalists ও Anglicists নামে অভিহিত হইলেন। প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থকগণ যাঁহারা Orientalists নামে অভিহিত ছিলেন তাঁহারা প্রচলিত শিক্ষার অর্থাৎ সংস্কৃত, ফার্সী, আর্বী ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কোম্পানির বরাদ্দ ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। এইচ. টি প্রিন্সেপ, ঐতিহাসিক উইলসন প্রমুখ অনেকেই ছিলেন প্রাচ্য শিক্ষার প্রবক্তা। পক্ষান্তরে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রসারের জন্য

* *Ibid*, p. 33.

অর্থ ব্যয় করিবার সপক্ষে ছিলেন আলেকজান্ডার ডাফ্, ম্যাকলে প্রভৃতি Anglicists। স্কটিশ মিশনারী আলেকজান্ডার ডাফ্‌কে সেই সময়ে কমিটি অব্ পাব্লিক ইন্‌স্ট্রাকশনের সদস্য করা হইলে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের প্রবক্তাদের (Anglicists) পক্ষ দৃঢ়তর হইল। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকলে এই কমিটির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত হইল। লর্ড ম্যাকলে ছিলেন Anglicists অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সমর্থক। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অবশ্য তাঁহার এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। তিনিএই বিষয়ে এক হাস্যকর উক্তি করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এক শেলফ্ (shelf) ভাল ইওরোপীয় সাহিত্যের বই সমগ্র ভারতীয় ও আর্‌বী সাহিত্যের সমান মূল্যবান "a single shelf of good European library is worth the whole native leterature of India and Arabia. ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক্ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করিলেন। ঐ বৎসরই গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিল স্থির করিলেন শিক্ষার জন্য বরাদ্দ সরকারী অর্থ শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয়িত হইবে। ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রসারের নীতি গৃহীত হইল।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫; ইংরাজী ভাষা, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত, ১৮৩৫

ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে লর্ড হার্ডিং-এর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী চাকুরিতে লোক নিয়োগের নিয়ম প্রবর্তন আরও সহায়ক হইয়াছিল। ক্রমে উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান, এমন কি, একমাত্র শর্ত ছিল ইংরাজী শিক্ষা অর্জন।

ইংরাজী শিক্ষা সরকারী চাকরি লাভের একমাত্র শর্ত

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, সাধারণ লোকের মধ্যে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের উপর তেমন জোর না দিয়া মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিবার ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের তুলনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হইয়াছিল। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে উইলিয়াম এ্যাডামকে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত ও রিপোর্ট করিতে বলা হইলে তিনি ১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩৮ এই তিন বৎসর তিনটি রিপোর্ট পেশ করেন। এই সকল রিপোর্টে দেশীয় ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা এবং সাধারণ মানুষের নিরক্ষরতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সরকার Filtration মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, এইজন্য এই সকল রিপোর্টের ভিত্তিতে কোন কিছুই করা হইল না। এই মতবাদ অনুসারে ক্রমে ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার অনুপ্রবেশ ঘটিবে বলিয়া মনে করা হইত।

ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রধান ত্রুটি

দেশীয় ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা

উইলিয়াম এ্যাডাম সাহেবের রিপোর্ট

এ-দিকে কমিটি অব্ পাব্লিক ইন্‌স্ট্রাকশনের পরিবর্তে কাউন্সিল অব্ এডুকেশন (Council of Education) স্থাপিত হইয়াছে। সরকারী-পদে নিয়োগের জন্য

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এই কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানেই গ্রহণ করা হইত। বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) একই পদ্ধতিতে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু সেই সকল অঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ বাংলাদেশের জনসাধারণের মত ততটা গভীর না থাকায় সেখানে দেশীয় ভাষায় স্কুলগুলির মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের কাজও চলিতেছিল। বাঙালী জাতির ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই দেশীয় ভাষায় অর্থাৎ বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তারের উৎসাহ হ্রাস পাইয়াছিল। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাও সেই হেতু শোচনীয় ও পশ্চাৎপদ রহিয়াছিল।

বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় ভাষায় শিক্ষার বিস্তার

১৮৩৫ হইতে প্রায় কুড়ি বৎসরকাল ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কোনপ্রকার সাংগঠনিক ব্যবস্থা স্থাপনের বা পরিকল্পনা রচনার কাজে হাত দেওয়া হইল না। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে অবস্থিত বোর্ড অব্ কন্ট্রোল (Board of Control)-এর সভাপতি সার্ চার্লস্ উড্ ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার ভবিষ্যৎ রূপায়ণের এক বিশদ পরিকল্পনা রচনা করিলেন। তাঁহার এই পরিকল্পনা উডের নির্দেশনামা (Wood's Despatch) নামে অভিহিত। উড্ সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইংরাজ জাতি ভারতীয়দের তথা অপরাপর যে-কোন জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জাতি এবং ইংরাজদের শিক্ষা-সংক্রান্ত বা অপরাপর যে-কোন ব্যবস্থাই অপরাপর জাতির অনুকরণীয়। ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার পরিকল্পনা অর্থাৎ উডের ডেস্‌পাচ্‌কে ভারতে ইংরাজী শিক্ষার মহাসনদ (Magna Carta) বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে।

উড্-এর ডেস্‌পাচ্ (১৮৫৪)

উডের নির্দেশনামা বা ডেস্‌পাচে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরাজ সরকারের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল আদর্শ হইল পাশ্চাত্যের উন্নত ধরনের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলার অর্থাৎ ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতীয়দের মধ্যে প্রসারিত করা। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারে ইংরাজী ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সর্বাধিক উপযুক্ত। ক্রমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবাসীদের মধ্যে প্রসারের উপায় হিসাবে দেশীয় ভাষার গুরুত্বও অত্যধিক সে-কথাও উড্ সাহেব উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই কারণে তাঁহার ডেস্‌পাচে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, সর্বনিম্নে গ্রামে গ্রামে দেশীয় ভাষায় প্রাথমিক, তাহার উপর স্তরে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষা-ভিত্তিক হাই স্কুল এবং তাহার উপরের স্তরে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে প্রত্যেক জেলায় কলেজীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বেসরকারী উদ্যোগে যাহাতে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হইতে পারে সেজন্য সরকারী অনুদান (grant-in-aid) দিবার ব্যবস্থা করিবার নির্দেশও ডেস্‌পাচে ছিল। অবশ্য সেই সকল স্কুল-কলেজে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা এবং শিক্ষার মান বজায় রাখিবার দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। কোম্পানির অধীন তখনকার পাঁচটি প্রদেশের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া শিক্ষা অধিকর্তা বিভাগ (Department of Public Instruction) এবং একজন শিক্ষা অধিকর্তা (Director of Public

উড্ সাহেবের নির্দেশ-নামার নির্দেশাবলী

Instruction) নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই তিনটি প্রেসিডেন্সী শহরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশও উড্ সাহেবের ডেস্‌পাচে দেওয়া হয়। একজন আচার্য, একজন উপাচার্য, একটি সিনেট ও ফেলো প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিবে এবং প্রত্যেকেই সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণ, ডিগ্রী দেওয়া প্রভৃতি কাজ করিবে। বিভিন্ন বিভাগের লেক্‌চারার ও প্রফেসর নিয়োগ করিবে। উডের ডেস্‌পাচে কারিগরি বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপনের উপরও জোর দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে প্রচলিত রীতি অনুসারে শিক্ষক-শিক্ষণ স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও ডেস্‌পাচে উল্লেখ করা হয়। স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কেও ডেস্‌পাচে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

উড্-এর ডেস্‌পাচ্ অনুসারে শিক্ষা-ব্যবস্থা - কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

উড্ সাহেবের ডেস্‌পাচের নির্দেশ অনুসারে ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা হয়। কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের পরিবর্তে প্রত্যেক প্রদেশে একজন ডিরেক্টর বা অধিকর্তার অধীনে এক-একটি শিক্ষা অধিকর্তা বিভাগ বা ডিপার্টমেন্ট অব্ পাব্লিক ইন্‌স্ট্রাকশন স্থাপন করা হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি আইন পাস করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮ জুলাই বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। প্রত্যেক প্রদেশের গবর্ণরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্‌সেলর বা আচার্য নিয়োগ করা হয়।

স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

উড্-এর ডেস্‌পাচে যে-ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ শিক্ষা-ব্যবস্থার অনুকরণ ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শিক্ষা-ব্যবস্থাই স্বাধীনতার পূর্বাবধি সামান্য পরিবর্তিতভাবে চালু ছিল। স্বাধীন ভারতেও এই কাঠামো সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে বলা চলে না। ১৮৫৪ হইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে বহু স্কুল-কলেজ প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির ছাত্রসংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে সমগ্র ভারতে মাত্র ২৭টি কলেজ ছিল, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৭২টিতে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যেই লাহোর ও এলাহাবাদে আরও দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

হাণ্টার কমিশন (১৮৮২-৮৩)

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার সার্ উইলিয়াম হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উড্ সাহেবের ডেস্‌পাচ্ কতদূর কার্যকরী করা হইয়াছে সে-বিষয়ে তদন্ত করা এবং সেগুলি সম্পর্কে উন্নতি কিভাবে করা যাইতে পারে সে-বিষয়ে সুপারিশ করা ছিল এই কমিশনের উদ্দেশ্য। অবশ্য এই কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার পরিস্থিতি কিরূপ এবং কিভাবে উহার উন্নতি সাধন করা যায় সে-বিষয়ে সুপারিশ করিবার কথা উল্লিখিত ছিল।

হাণ্টার কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলির মধ্যে সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার দিকে অধিকতর নজর দিবার কথা বলা হইয়াছিল। প্রাথমিক শিক্ষাই হইল জনসাধারণের শিক্ষার একমাত্র সুযোগ। অথচ এই শিক্ষা-ব্যবস্থাই উপেক্ষিত রহিয়া গিয়াছে বলিয়া এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছিল। কারণ সমগ্র দেশের পুরুষ জনসাধারণের মাত্র ১৫ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেসরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উপর নির্ভর না করিয়া সরকারী উদ্যোগে উহার প্রসার সাধন একান্ত প্রয়োজন এ-কথা রিপোর্টে বলা হয়। জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির উপর প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত করিবার সুপারিশ হাণ্টার কমিশন করিয়াছিলেন। এজন্য এই সকল স্থানীয় সংস্থাকে কর স্থাপনের অধিকার দেওয়া উচিত এ-কথাও রিপোর্টে বলা হইয়াছিল।

হাণ্টার কমিশনের সুপারিশ

প্রাথমিক শিক্ষা

হাণ্টার কমিশনের রিপোর্টে সাধারণ শিক্ষা অর্থাৎ স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা ভিন্ন বাণিজ্যিক এবং কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দিবার সুপারিশ করা হইয়াছিল।

বাণিজ্যিক ও কারিগরি শিক্ষার উপর জোর

বেসরকারী উদ্যোগে যাহাতে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসার ঘটিতে পারে এবং বিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হইতে পারে, সেজন্য সরকারকে অনুদান দিবার ব্যাপারে আরও মুক্ত হস্ত হইতে বলা হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সরকার মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন হইতে যথাসম্ভব শীঘ্র সরিয়া আসা উচিত এ-কথাও রিপোর্টে বলা হইয়াছিল।

অনুদান ব্যবস্থাকে আরও উদার করিবার সুপারিশ

স্ত্রী-শিক্ষা ব্যবস্থা যে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ হইয়া আছে সে-বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কমিশন স্ত্রী-শিক্ষার সুযোগ, বিশেষভাবে মফঃস্বল অঞ্চলে, বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন।

স্ত্রী-শিক্ষা উপেক্ষিত : উন্নয়নের সুপারিশ

পরবর্তী বিশ বৎসর ভারতের মাধ্যমিক ও কলেজীয় শিক্ষার এক ব্যাপক প্রসার পরিলক্ষিত হয়। স্কুল-কলেজের স্থাপন, অধিকতর সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষারও প্রসার ঘটে। কিন্তু এই শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্বপ্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা উপেক্ষিত ছিল। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি না করিয়া বা অতি সামান্যভাবে কেবল মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিস্তারের যে-নীতি তদানীন্তন সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে শিক্ষার ভিত্তি দুর্বল রহিয়া গিয়াছিল। এজন্য এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে 'উল্টা পীরামিড' Inverted Pyramid) বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা উপেক্ষা করিয়া উচ্চ শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ (Inverted Pyramid)

উনবিংশ শতকের শেষদিকে এবং বিংশ শতকের প্রারম্ভে আমরা ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা দেখিতে পাই। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনাবিহীনভাবে এবং প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগে যে-প্রসার ঘটিয়াছিল তাহার ফলে ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার মান (Standard), বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। পরীক্ষা-ভিত্তিক শিক্ষা কেবলমাত্র ডিগ্রিলাভের উপায় হিসাবে বিবেচিত হইবার ফলে স্কুল-কলেজগুলি ডিগ্রিধারী উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হইয়াছিল। সেই সময়ে দেশের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার লাভ করিতেছিল। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে স্কুল-কলেজ বিপ্লবী প্রস্তুতের প্রশস্ত ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল।

উনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের প্রারম্ভে প্রাথমিক শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা : উচ্চশিক্ষা ডিগ্রিলাভের পন্থায় পরিণত : স্কুল-কলেজ বিপ্লবী প্রস্তুতের প্রশস্ত ভূমি

তুলনামূলকভাবে দেখিতে গেলে বিত্তশালী ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ তেমন ছিল না। শিক্ষার সুযোগ প্রধানত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় এভাবে যখন নিজের পশ্চাৎপদতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল তখন স্বভাবতই বিদেশী শাসনকে দেশের যাবতীয় অভাব-অভিযোগের জন্য দায়ী করিল। জাতীয়-আন্দোলন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জাতীয় চেতনায় ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় হইতে লাগিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর এই রাজনৈতিক চেতনার ঘাত-প্রতিঘাত স্বভাবতই পরিলক্ষিত হইল।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব : জাতীয়তা-বোধের প্রসার

লর্ড কার্জন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন যে, উহা শৃঙ্খলাহীনতা, অসন্তোষ ও সরকারের প্রতি বিরোধিতা সৃষ্টির উপায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয়দের হস্তে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব থাকিবার ফলে ভারতীয়রা সরকারের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচক অর্থাৎ সরকার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। ম্যাকলে সাহেব ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করিতে গিয়া প্রাথমিক শিক্ষাকে সংকীর্ণ রাখিয়া কেবল মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার প্রসারের বৃদ্ধির সুযোগ দিয়া যে 'উল্টা পিরামিড' (Inverted Pyramid) সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার কঠোর সমালোচনা তিনি করিলেন। শিক্ষার মান উন্নয়ন, শৃঙ্খলার প্রবর্তন, শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অধিকতর ফলপ্রসূ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি কতকগুলি আইন পাস করিলেন। বস্তুত, তাঁহার এই সকল কাজ ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং উচ্চশিক্ষা সংকোচন। তিনি শিক্ষার মধ্য দিয়া সরকারের প্রতি আনুগত্য লাভের চেষ্টা শুরু করিলেন। সাম্রাজ্যবাদের শক্তি বৃদ্ধি এবং জাতীয়তাবোধের প্রভাব বিস্তৃতি রোধ করা ছিল কার্জনের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।

লর্ড কার্জনের শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্যকলাপ

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কার্জন সিমলায় এক কনফারেন্স আহবান করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা উন্নয়নের ব্যাপারে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করাইলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সার্ টমাস

রেলেকে সভাপতি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভারতবর্ষে চালু শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিস্থিতি কি তাহা বিবেচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গঠনতন্ত্র ও কার্য-কলাপের উন্নয়ন সম্পর্কে সুপারিশ করিতে বলা হইল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এই কমিশনের আওতার বাহিরে রাখা হইল। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করা হইল। এই আইনের উল্লেখযোগ্য শর্তগুলি ছিল কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (Fellow) অর্থাৎ সেনেটের সদস্য-সংখ্যা পঞ্চাশের কম এবং এক শতের বেশি হইবে না এবং তাহাদের কার্যকাল ছয় বৎসরের বেশি হইবে না। পূর্বে ফেলোগণ যাবজ্জীবন ফেলো-পদে আসীন থাকিতে পারিতেন। ফেলোদের মধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন করিয়া নির্বাচিত এবং অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন নির্বাচিত সদস্য হইবেন। বাকী সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন। সরকারকে সেনেট কর্তৃক গৃহীত বিধি-নিয়ম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার ক্ষমতা এই আইনে দেওয়া হইল। বেসরকারী কলেজের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইল। কলেজের অনুমোদন-সংক্রান্ত আইন-কানুন আরও কঠোর করা হইল। ইহা ভিন্ন, অনুমোদন ব্যাপারে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হইল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাহাতে কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানও করে সেই ব্যবস্থাও এই আইনে করা হইয়াছিল। কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর নিয়ন্ত্রণে আনিবার উদ্দেশ্যে ইন্‌স্‌পেক্টর অব্‌ কলেজেস্‌ (Inspector of Colleges) নিয়োগের এবং নিয়মিতভাবে কলেজ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হইল।

সার্‌ টমাস রেলে কমিশন

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের উপর অধিকতর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু

কলেজ ইন্‌স্‌পেক্টরের পদ সৃষ্টি

লর্ড কার্জনের আইন ভারতের আইন পরিষদের (Legislative Council) অভ্যন্তরে এবং বাহিরের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইল। গোপালকৃষ্ণ গোখলে এই আইনকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করিলেন। সার্‌ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন এবং সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম চালাইলেন। অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সুযোগ তিনি গ্রহণে ত্রুটি করিলেন না। তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল।

কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিরোধিতা

স্ত্রী-শিক্ষা : যে-সকল প্রভাব ও প্রবণতা আধুনিক ভারতবর্ষ রচনার সহায়ক ছিল সেগুলির মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে মিশনারী ও ভারতীয় কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের চেষ্টায় স্ত্রী-শিক্ষার কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু রক্ষণশীল পরিবার

স্ত্রী-শিক্ষা

মাত্রেই স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উদার মতাবলম্বী ব্যক্তিদের চেষ্টায় স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা হয়। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে অবশ্য স্ত্রী-শিক্ষা তেমন বিস্তার লাভ করে নাই। রাজা রামমোহন রায় স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এ-বিষয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের অবদানও খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও মানসিকতা সৃষ্টিতে উমেশচন্দ্র দত্তের 'বামাবোধিনী', দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির 'অবলাবান্ধব', গিরিশচন্দ্র সেনের 'মহিলা', স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী' এবং কুমুদিনী ও বাসন্তী মিত্রের 'সুপ্রভাত' ও 'ভারত মহিলা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার অবদান ছিল অত্যধিক। আর্যসমাজ কর্তৃক জলন্ধরে প্রতিষ্ঠিত মহাকন্যা বিদ্যালয় এবং ভারতের অন্যান্য অংশে আরও বহু মহিলা বিদ্যালয় স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। এ-বিষয়ে প্রার্থনা সমাজ, দাক্ষিণাত্য এডুকেশন সোসাইটির অবদানও নেহাত কম ছিল না।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা

পত্র-পত্রিকার অবদান

আর্যসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, দাক্ষিণাত্য এডুকেশন সোসাইটির অবদান

গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের আইন সদস্য ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। এই স্কুলই পরে বেথুন স্কুল নামে নামান্তরিত হয় এবং বেথুন কলেজ নামে একটি কলেজও স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উড্ সাহেবের ডেস্‌পাচ-এ স্ত্রী-শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের নির্দেশ ছিল, কিন্তু সরকার বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়ের অনুদান অর্থাৎ আর্থিক সাহায্য দিয়াই নিজ কর্তব্য শেষ করিতে লাগিলেন যাহা হউক, প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১৬৪০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী দশ বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৩ হইতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অবশ্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। হাণ্টার কমিশন স্ত্রী-শিক্ষার পশ্চাৎপদতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে জেলা বোর্ড, পৌরসভা এবং সরকারকে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে সুপারিশ করেন। ইহার পর সরকার কতকটা উদার হস্তে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে থাকেন। কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষান্তরে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সঙ্গেই পড়াশুনা করিতে শুরু করেন। অবশ্য স্ত্রীলোকের জন্য পৃথক মহিলা কলেজ স্থাপনও চলিতে থাকে। ১৯০১-২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মহিলা কলেজের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ১২টি। এগুলির তিনটি বাংলাদেশে, তিনটি মাদ্রাজে ও ছয়টি উত্তরপ্রদেশে স্থাপিত হইয়াছিল।

বেথুন সাহেব ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ

প্রধানত বেসরকারী চেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন

স্ত্রী-শিক্ষার ক্রমপ্রসার

ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার এবং কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে কারিগরি শিক্ষালাভের স্পৃহা স্বাভাবিকভাবেই জাগিয়াছিল। এই কারণে ব্রিটিশ শাসনকালে কারিগরি শিক্ষার প্রসার যৎসামান্য হইলেও এই ধরনের শিক্ষাকে

একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রুরকিতে একটি এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ একটি এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয়। পরে অবশ্য শেষোক্ত কলেজটি প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত সংযুক্ত হয়। পরে শিবপুরে স্থানান্তরিত হইলে উহার নাম হয় শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কামান পরিবহনের জন্য গাড়ী নির্মাণের কারখানাকে গিণ্ডি এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ নাম দিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পরিণত করা হয়। এই কলেজটিকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্থাপন করা হয়। পুণার ওভারসিয়ার স্কুলকে ঐ একই বৎসর পুনা এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ নাম দিয়া উহাকে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কারিগরি শিক্ষার প্রসার

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব (Impact of Western Education): মিশনারী ও অপরাপর বেসরকারী প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং সর্বোপরি সরকারী চেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের নীতি অনুসরণের পরও ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের তেমন প্রসার ভারতবাসীদের মধ্যে ঘটে নাই। অতি সামান্য সংখ্যক ভারতবাসীর মধ্যেই এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। তথাপি এইকথা অনস্বীকার্য যে, পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান, ও কারিগরি বিদ্যার জ্ঞানের প্রসারের ফলে এক নব-চেতনার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহা ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যক ভারতবাসীকে এক নূতন আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের নিকট এইকথা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, ভারতবাসীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অপরাপর ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা দূর করিবার জন্য সামাজিক সংস্কার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রবর্তনের একান্ত প্রয়োজন। মিল, বেন্থাম, পেইন প্রভৃতির রচনা পাঠের ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর অন্তরে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা এবং মানুষে মানুষে বিভেদ সব কিছুর বিরোধিতা করিবার এক মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইল। এই মনোবৃত্তি হইতে ভারতবাসী যেখানেই অত্যাচারিত বা বঞ্চিত সেইখানেই বলিষ্ঠ প্রতিবাদের ক্ষমতা দেখা দিল। নিজের দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের ফলে ভারতের নিজস্ব যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু গর্বের তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ভারতবাসীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জাগরিত হইল। ইংরাজী শিক্ষার ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর অন্তরে সেই পরিবর্তনই আসিল যে পরিবর্তন রেনেসাঁসের ফলে ইওরোপীয়দের মধ্যে জন্মিয়াছিল। ভারতবাসীর প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা, ইহার ফলে বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির অবদান এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ্য। এশিয়াটিক সোসাইটি ভারতবর্ষের তথা এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা এবং অতিশয় মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। এই সকল কারণে ভারতীয় সব কিছুর প্রতিই এক বিশেষ শ্রদ্ধা উপজাত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ ভারতবাসী

সংস্কার সাধনের মনোবৃত্তি

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার দাবি করিবার সাহসিকতা

ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা

বলিষ্ঠ মানসিকতা, আত্মপ্রত্যয়ের সৃষ্টি

ক্রমে ভারতবাসী তাহাদের হতাশা, হীনমন্যতা অতিক্রম করিয়া এক আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন, বলিষ্ঠ মানসিকতার অধিকারী হইয়া উঠিল।

বাঙালীর উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব

পাশ্চাত্য শিক্ষা শিক্ষিত বাঙালীর উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহাদের অন্তরে পাশ্চাত্যের উদারপন্থী মতবাদ, চিন্তার স্বাধীনতা, যুক্তিবাদী ধ্যান-ধারণা এবং আধুনিক যুগের সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য স্থিতিলাভ করিয়াছিল।

উনবিংশ শতকে ইওরোপে উদারপন্থী আন্দোলনে ভারতে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি

পাশ্চাত্য ইতিহাস, যথা আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, গ্রীকদের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ইতালি ও জার্মানির জাতীয় ঐক্য প্রভৃতির বিবরণ ভারতীয়দের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিদেশী শাসনের প্রতি ভারতীয়দের অশ্রদ্ধা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দী ইওরোপের ইতিহাস উদারনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস। সেই ইতিহাস সমসাময়িক ভারতবাসীর মনে জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জন্মাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি! ইহা ভিন্ন, ক্ষুদ্র দেশ জাপান ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অভ্যন্তরীণ বিপ্লব সাধন করিয়া দেশে জাতীয়তাবাদী-নীতি-ভিত্তিক শাসনের মাধ্যমে আধুনিক দেশে পরিণত করিয়া তুলিবার যে-চেষ্টা শুরু করিয়াছিল, তাহা ভারতবাসীর যুগপৎ বিস্ময় ও উৎসাহের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

জাপানের বিপ্লব — ভারতে বিস্ময় ও উৎসাহ

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব : জাতীয়তাবোধের প্রসার—শাসন হস্তগত করা

পাশ্চাত্য শিক্ষার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল ভারতবাসীর বিশেষভাবে বাঙালীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রসার এবং সামাজিক, শিক্ষা-সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের আগ্রহ এবং ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের উপায় হিসাবে ভারতবাসীর হস্তে শাসন ক্ষমতা আনা।

সাহিত্য-সংস্কৃতি নূতন সাহিত্যিক চিন্তাধারা, জীবনাদর্শ

সাহিত্য (Leterature) : পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ভারতের আধুনিক ভাষা ও সংস্কৃতিতে পরিলক্ষিত হয়। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে ভারতীয় সাহিত্যিক চিন্তাধারা, জীবনাদর্শ সব কিছুর এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। এই প্রভাব সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে দেখা গিয়াছিল। গদ্য-সাহিত্য, নাটক, নভেল, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ভিন্ন পাশ্চাত্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দও যে বাংলার সাহিত্য-কীর্তিতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা উনবিংশ শতকের সপ্তম দশকের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে বাংলা সাহিত্যে যে চিন্তাধারার মুক্তি এবং সাহিত্যের প্রতি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিয়াছিল তাহা ক্রমে ভারতবর্ষের অপরাপর আঞ্চলিক সাহিত্যেও প্রসারিত হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টিতে ইংরাজী সাহিত্যের পরই বাংলা সাহিত্যের প্রভাব ছিল বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্তির প্রভাব বাংলা সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের উপর এই প্রভাব এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও সাহিত্য-চেতনার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিভিন্ন ভারতীয়

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী

ভাষায় বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ সাহিত্য অনূদিত হইয়াছিল। ফলে সেই সকল ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, এ-কথা বলা যাইতে পারে। শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টান মিশনারীদের ছাপাখানা স্থাপন বাংলা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতির এক সুবর্ণ সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল। কলিকাতা এবং ক্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে পরবর্তী বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবাসী ও ইওরোপীয়দের চেষ্টায় বহু ছাপাখানা স্থাপিত হইলে ভারতীয় সাহিত্য সৃষ্টির সুযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে-ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছিল তাহাতে কল্পনাজগতের যে-মুক্তি সাধিত হইয়াছিল এবং জ্ঞানের পরিধি যেভাবে প্রসারিত হইয়াছিল তাহা ভারতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ আনিয়াছিল, বলা বাহুল্য। খ্রীষ্টান মিশনারীদের খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার করিতে গিয়া স্বভাবতই বাইবেলের অনুবাদ, টীকা প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে হইয়াছিল। এজন্য গদ্য-সাহিত্যের সাহায্য প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া মিশনারীরা ব্যাকরণ, শব্দযোজনা প্রভৃতি সম্পর্কে পুস্তক ভারতীয় ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। ভারতীয় বিশেষভাবে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি রচনায় মিশনারী সাহেবদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামপুরের উইলিয়াম কেরি সাহেব বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, শব্দযোজনা প্রভৃতির উপর নজর দিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বাংলা ব্যাকরণ এবং বাংলা-ইংরাজী অভিধান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথ্য ভাষায় বাংলা পুস্তক রচনা করিয়া তিনি প্যারীচাঁদ মিত্রের সাবলীল বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নামও এ-বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেরি সাহেব রচিত 'ইতিহাসমালা' সহজ, সাবলীল বাংলা গদ্যের একটি উদাহরণস্বরূপ। ঊনবিংশ শতকে বাংলা পুস্তক প্রথমত সংস্কৃত, ইংরাজী ও ফার্সী ভাষার পুস্তক হইতে অনূদিত হইয়াছিল। কিন্তু রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রাচীনকাল হইতে ওয়ারেন হেস্টিংস্ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস—এই কয়খানি গ্রন্থ ছিল মৌলিক রচনা।

বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের অবদান

খ্রীষ্টান মিশনারীদের অবদান

মিশনারীরা গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি রচয়িতা

বাংলা গদ্য : কেরী, প্যারীচাঁদ ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অবদান

বাংলা কবিতা-সাহিত্যে ঊনবিংশ শতক বিশেষ উল্লেখ্য। দাশরথি রায় হইতে শুরু করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বাংলা কবিতা-সাহিত্যকে সেই যুগে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল, কামিনী রায় প্রভৃতির নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই সকল সাহিত্য-কীর্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে চরম স্বার্থকতা ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতকের কবিগণ

উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র

তারকনাথ গাঙ্গুলী, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের রচনা বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন মধুসূদন দত্ত তাঁহার "ক্যাপটিভ্ লেডী" (Captive Ladie) কাব্য এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ্' (Rajmohon's wife) নামে উপন্যাস ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়া ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের গভীর অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। নাটকের দিক দিয়া সেই যুগ পশ্চাৎপদ ছিল না। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব', মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাট্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন সেই যুগের শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় নাট্যকার। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, দেশাত্মবোধক নানাবিষয়ের উপর তাঁহার রচনা বাংলা নাট্য-সাহিত্য ও বাংলার নাট্যমঞ্চ উভয়েরই অগ্রগতি সাধন করিয়াছিল। অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নামও নাট্যকার হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপন্যাস

নাট্য-সাহিত্য

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার অবদান নেহাত কম ছিল না। এ-বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পরে স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার অবদানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছিল। সেই সময়কার লেখকদের মধ্যে কলীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আরও অনেকে এবং ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কীর্তি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পৃথিবীর সারস্বত সমাজে শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে।

সে-যুগের সাহিত্যিকদের কয়েকজন

বাংলা ভিন্ন হিন্দি, উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সে-যুগে ঘটিয়াছিল। উর্দু সাহিত্যে স্যার মহম্মদ ইক্‌বালের অবদান হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে রামপ্রসাদ নিরঞ্জনী, পণ্ডিত দৌলতরাম, লাল্লুজী লাল, সদল মিশ্র, হরিশচন্দ্র বাণারসী, মথুরা লাল, শ্রীনিবাস দাস প্রভৃতি হিন্দি সাহিত্যিকদের রচনা হিন্দি সাহিত্য ও ভাষার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। উর্দু ও হিন্দি ভিন্ন আসামী, তেলেগু, মারাঠী, ওড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিও সেই যুগে ঘটিয়াছিল।

উর্দু ও হিন্দি সাহিত্য

অপরাপর ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি

বিংশ শতকে (১৯৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত) ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (Indian Society, Economy, Literature and Culture till 1947): পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতে যে-নবযুগের সৃষ্টি হইয়াছিল উহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অপর দিকে তেমনি সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া ভারতীয় সমাজের

জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থার উন্নয়নের চেষ্টা উৎসাহিত

পশ্চাৎপদতা দূর করিবার এক ব্যাপক চেষ্টা শুরু হইয়াছিল। এ-বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি সংস্থার কার্যকলাপের আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে সমাজ সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বলা বাহুল্য। ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, প্রার্থনা সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু করিয়াছিল এবং কুসংস্কার দূরীকরণ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন, জাতিভেদ প্রথা বিলোপের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভৃতি অনেক কিছু সংস্কার সাধনে সমর্থ হইয়াছিল তাহারই অনুসরণ বিংশ শতকের প্রথমার্ধে চলিতে থাকে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক জাতীয়তাবোধের প্রসার প্রভৃতি ভারতীয় সমাজের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিলে জাতিভেদ প্রথা, সমাজের উচ্চনিচ ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি দূরীকরণের চেষ্টা আরও শক্তি অর্জন করে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণ মল্হার যোশী বোম্বাইতে 'সোশিয়েল সার্ভিস লীগ' (Social Service League) স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্য উন্নত এবং যথাযোগ্য জীবনযাপনের মান স্থাপনের কাজ শুরু করেন। বহু সংখ্যক সান্ধ্য-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দরিদ্র ও উপেক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার শুরু করেন। বহু সংখ্যক সমবায় সমিতি স্থাপন, বস্তিবাসী ও শ্রমিকদের জন্য খেলাধুলা, শরীর-চর্চার ব্যবস্থা করিয়া সোশিয়েল সার্ভিস লীগ দরিদ্র শ্রেণীর জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন করিয়াছিল। যোশী ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রমিক কল্যাণের কাজ শুরু করেন। হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, শ্রীরাম বাজপাই প্রভৃতির সমাজ উন্নয়নের চেষ্টা ভারতীয় জাতীয় জীবনে উন্নতি সাধনের কাজ অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। এ-বিষয়ে গোখ্‌লের নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন। পার্শী, মুসলমান, শিখ সম্প্রদায়ের সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেহ্‌রামজী মালাবারি, খাল্‌সা দেওয়ান নামক শিখ সংস্থা, সৈয়দ আমির আলী, সার্ মহম্মদ ইক্‌বাল, চিরাগ আলী, অধ্যাপক ক্ষুদাবক্স প্রভৃতির অবদান উল্লেখযোগ্য।

কুসংস্কার দূরীকরণ, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের চেষ্টা অব্যাহত

সোশিয়েল সার্ভিস লীগের প্রতিষ্ঠা

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নতি

ভারতে নবজাগরণের সূত্র ধরিয়া ভারতীয় সমাজে রক্ষণশীলতা দূর করিবার চেষ্টা শুরু হয়। বাংলাদেশে সর্বজনীন দুর্গোৎসবের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যবোধ জাগাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতা, পর্দা প্রথার বিলোপ প্রভৃতি ভারতীয় নারীদের সামাজিক শৃঙ্খলমুক্তির পথ প্রশস্ত করে।

জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়ন

হিন্দু সমাজের চিরাচরিত জাতিভেদ প্রথা বিংশ শতকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া জাতিগত ছুৎমার্গের অবসান ঘটে। অসবর্ণ বিবাহ, সামাজিক

অনুষ্ঠানে, পূজাপার্বণে বিভিন্ন জাতির লোকের অংশগ্রহণ প্রভৃতিতে এক নূতন সমাজ চেতনার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-জাতির মধ্যে সমাজ উন্নয়ন ও রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। বিংশ শতকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের উন্নয়ন। আর্য-সমাজের শুদ্ধি আন্দোলন এ-বিষয়ে এক নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত করিয়াছিল। এই সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বিংশ শতকে হিন্দুসমাজ ক্রমেই দীর্ঘকালের রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতামুক্ত হইতেছিল।

জাতিগত রক্ষণশীলতার স্থলে উদারতা পরিলক্ষিত

শিক্ষা: শিক্ষার ক্ষেত্রে বিংশ শতকের গোড়ার দিকের যে-সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল সে-বিষয়ে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বরোদা রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইলে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে অনুরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকারের উপর চাপ দিলেন। গোখলে ভারতের আইন পরিষদে এই দাবির সমর্থনে দৃঢ়ভাবে বক্তব্য রাখিলেন। কিন্তু সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিতে রাজী হইলেন না। তাঁহারা প্রাদেশিক সরকারসমূহকে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের মধ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করিবার নির্দেশ দিলেন। এইভাবে ভারতের অগণিত জনসাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত রহিল।

সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সম্পর্কে ডঃ এম. ই. স্যাড্‌লারকে সভাপতি করিয়া একটি কমিশন নিয়োগ করিলেন। ডঃ স্যাড্‌লার ছিলেন লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ জিয়া-উদ্-দিন আহম্মদ ছিলেন এই কমিশনের ভারতীয় সদস্য। এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর তাঁহাদের অনুসন্ধান ও সুপারিশ প্রকাশিত করিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষার ভিত্তি, এই মূল যুক্তির উপরই তাঁহারা তাঁহাদের কাজের নীতি নির্ধারণ করিলেন। এই কমিশন ১২ বৎসর স্কুলে পড়াশুনার পর ছাত্ররা কলেজে ভর্তি হইবে এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার স্থলে এই পরীক্ষাকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা নামকরণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে বলিলেন। কলেজীয় পড়াশুনার কাল তিন বৎসর করা এবং পাস কোর্স এবং অনার্স কোর্সের পাঠ্যসূচী এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে অধিকতর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী অনার্স কোর্সে পড়িবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে এই সুপারিশ করিলেন। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া বিক্ষিপ্তভাবে স্থাপিত কলেজের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব অপেক্ষা আবাসিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া কমিশন ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি বোর্ড অব্ উইমেন এডুকেশন স্থাপনের সুপারিশ এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞান বিষয়সমূহ কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা কলিকাতা

স্যাড্‌লার কমিশন (১৯১৭-১৯)

কমিশনের সুপারিশ

যে-সুযোগ লাভ করিয়াছিল, তাহা দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতিতেও প্রকাশ পাইয়াছিল।

দর্শন

দর্শনের ক্ষেত্রে সার্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান প্রভৃতি পৃথিবীর দরবারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও প্রসারে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান সমগ্র পৃথিবীতে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। বিজ্ঞানী সার্ জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সার্ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন, ডঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রায় বাহাদুর এস. সি. রায়, ডঃ ভাবা বিজ্ঞানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহাদের মৌলিক গবেষণা দ্বারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সার্ সি. ভি. রমন তাঁহার মৌলিক গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞান

চিত্রশিল্পে ভারতীয় নবজাগরণের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর ভারতীয় প্রভাব ও প্রবণতার মধ্যে। আব্দুর রহমান চাঘতাই, কুমারস্বামী প্রভৃতির নামও এই দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে বোম্বাইয়ে চিত্রশিল্পে পাশ্চাত্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতের নিজস্ব চিত্রকলার পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে কলিকাতা আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ হাভেল (Mr E. B. Havell) এবং কুমারস্বামীর অবদান ছিল অপরিসীম। চিত্রশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পেরপুনরুজ্জীবন ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে ঘটিয়াছিল। রাজপুতানা অঞ্চলে সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের প্রভাব সেখানকার শিল্পকার্যে পরিলক্ষিত হয়। বিংশ শতকে ভারতের নিজস্ব শিল্পরীতির পুনরুজ্জীবনের প্রতি ভারতীয় শিল্পীদের আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রে সঙ্গীতে স্বাদেশিকতা বিশেষভাবে বাংলাদেশে প্রকাশ পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' রবীন্দ্রনাথের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', কাজী নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল' প্রভৃতি গান বাংলাদেশে স্বাদেশিকতার বন্যা আনিয়াছিল। চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গান বিশেষভাবে গ্রাম বাংলার মানুষকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। সঙ্গীত ভিন্ন ভারতীয় নৃত্যশিল্পের পুনরুজ্জীবন ভারতে নবজাগরণের অপর একটি দিক। ভারতীয় নৃত্যশিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং নৃত্যশিল্পকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম অবদান রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলার অনুশীলনে নৃত্যশিল্পের পুনরুজ্জীবন পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী, ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়, আসামের কামরূপ নৃত্য সঙ্ঘ, কেরালার কলা মণ্ডল প্রভৃতি বিভিন্ন

স্বদেশী সঙ্গীত

নৃত্যশিল্প

সংস্থার চেষ্টায় ভারতের প্রাচীন নৃত্যকলা পুনরুজ্জীবিত ও উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। মণিপুরী, পাহাড়ী, ভারতনাট্যম, কথাকলি ও ছৌনৃত্য এ-বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিস্মৃত এবং ভারতের প্রায়-অবলুপ্ত নিজস্ব বহু ধরনের নৃত্যশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও অনুশীলন এক নূতন আনন্দের উৎস স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইহা এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীতে, কলিকাতা, বোম্বাই, পুণা, লক্ষ্ণৌ, বরোদা এবং অপরাপর অঞ্চলের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীত

অর্থনীতি: ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করিতে গিয়া আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা, গ্রামীণ এবং কুটির শিল্পের অপমৃত্যু, বেকারত্ব বৃদ্ধি, ভূমিহীন শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি ভারতীয় জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্বলতার অর্থাৎ চরম দারিদ্র্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইংরাজ শাসকদের পক্ষে ভারতবর্ষে শিল্পোন্নয়ন মোটেই কাম্য ছিল না। ভারতবর্ষকে কাঁচামাল রপ্তানির দেশে পরিণত করাই ছিল ইংরাজদের অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূল। কৃষির ক্ষেত্রে যেটুকু উন্নতি তাহাদের চেষ্টায় হইয়াছিল, তাহার ফলে ভারতবাসীর দারিদ্র্যের লাঘব হয় নাই। কারণ বাণিজ্যিক ফসল (Commercial crops) উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে দুই-একজন কৃষক বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করিয়া লাভবান হইলেও সাধারণভাবে বলিতে গেলে কৃষি ভারতের অগণিত গ্রামবাসীদের দারিদ্র্যের অবসান ঘটাইবার মত উন্নত না হওয়ায় গ্রামের কৃষিজীবীদের ঋণগ্রস্ততা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছিল। লগ্নী মহাজন তখন গ্রামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে পরিণত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের জমি মালিকানার ধারণা-প্রসূত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল কৃষক সমাজের চরম দারিদ্র্য, কৃষি-ব্যবস্থার অনগ্রসরতা, কৃষিজমি উন্নয়নের ব্যাপারে উদাসীনতা এবং কৃষকদের ঋণগ্রস্ততায় দেখা দিয়াছিল।

কৃষির পশ্চাৎপদতা

কৃষকদের শোচনীয় দারিদ্র্য

লর্ড কার্জনের আমলে কৃষি উন্নয়নের কতক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল। তিনিই সরকারের কৃষি বিভাগের জন্মদাতা। তাঁহারই শাসনকালে পুসা রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্‌ স্থাপিত হইয়াছিল (১৯০৩)। সমবায় সমিতি স্থাপন, পাঞ্জাব ভূমি হস্তান্তর আইন প্রভৃতি নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ তাঁহার শাসনকালে করা হইয়াছিল। তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কৃষি কৃত্যক (Indian Agricultural Service) প্রবর্তিত হয় এবং প্রথমে পুণায় এবং পরে কানপুর, নাগপুর, কোয়েম্বাটোর, লায়েলপুর প্রভৃতি স্থানে কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অব্‌ এগ্রিকালচার পদটি উঠাইয়া দিয়া পুসা রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের ডিরেক্টরকে ভারত সরকারের কৃষি-উপদেষ্টার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এইভাবে ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতক অগ্রগতি হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন দ্বারা কৃষিকে প্রাদেশিক সরকারের হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু অর্থদপ্তর গবর্ণরের এক্‌সিকিউটিভ্‌ কাউন্সিলের সদস্যের হস্তে থাকায় প্রয়োজনীয়

কার্জন কর্তৃক কৃষি-উন্নয়নের কাজ পরবর্তী কালে অনুসৃত

অর্থ বরাদ্দে অনীহা সব সময়ই পরিলক্ষিত হইত। কৃষি উন্নয়ন আশানুরূপ না হওয়া ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃষির উপর যে রয়েল কমিশন (Royal Commission on Agriculture) স্থাপিত হইয়াছিল, উহার রিপোর্টে ভারতবর্ষের কৃষির ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় উন্নতির সম্ভাবনা আছে এই মন্তব্য করা হয় এবং ভারতের কৃষির বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ অগ্রিকালচারেল রিসার্চ নামে এক সংস্থা স্থাপন করিয়া উহার উপর কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে নির্দেশ ও পরামর্শ দান, বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি-ব্যবস্থার মধ্যে উন্নয়নের সামঞ্জস্য রক্ষা, পশুসংক্রান্ত গবেষণা প্রভৃতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও কৃষিজীবীদের অবস্থা দিন-দিনই শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতে থাকে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিশন সুস্পষ্টভাবে ভারতীয় কৃষি-ব্যবস্থার সমস্যাসমূহের কথা তুলিয়া ধরেন। কৃষি গবেষণার সহিত কৃষকদের যোগাযোগের অভাব হেতু গবেষণার সুফল কৃষকদের নিকট না পৌঁছান এই সবল সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া এই কমিশন উল্লেখ করেন। ইহা ভিন্ন, কৃষক সমাজের ঋণগ্রস্ততা তাহাদিগকে চিরকালের মত মহাজন শ্রেণীর একপ্রকার ক্রীতদাসে রূপান্তরিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই কথাও তাহারা রিপোর্টে বলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কৃষকদের মোট ঋণগ্রস্ততা ছিল ৯০০ কোটি টাকা। এই সকল কারণে ভারতের কৃষি যেমন উন্নয়নমূলক কতক চেষ্টা সত্ত্বেও পশ্চাৎপদ রহিয়া গিয়াছিল, কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। অবশ্য ভারত সরকার ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী এক বৎসরে গ্রামের উন্নতির জন্য দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন এবং সমবায়-সমিতির মাধ্যমে কৃষি ঋণদান প্রভৃতি দ্বারা কৃষকদের ঋণগ্রস্ততার সমাধানে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

রয়েল কমিশন

ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচার স্থাপন

কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা

কৃষি ও কৃষকের শোচনীয় অবস্থা

কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে কৃষি সেচের গুরুত্ব যে খুব বেশি তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন রাখে না। চিরাচরিত প্রথায় পুষ্করিণী, কূপ, নালা, বারমাস জল থাকে এরূপ খাল, বর্ষাকালে জল থাকে এরূপ খাল প্রভৃতি হইতে সেচের কাজ করা হইত। ১৮৯৬ ও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কৃষির উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে লর্ড কার্জন এক দুর্ভিক্ষ কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন দাক্ষিণাত্য, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও বুন্দেলখণ্ডে সেচের ব্যবস্থা করিতে সুপারিশ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সেচ প্রাদেশিক সরকারের হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই সময় প্রাদেশিক সরকারগুলি সেচের ব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হইলেন। ১৯২৬ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই-এর লায়েড্ বাঁধ, পাঞ্জাবের শতদ্রু পরিকল্পনা, সিন্ধুর সুক্কুর বাঁধ, যুক্তপ্রদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশের) সারদা-অযোধ্যা সেচ পরিকল্পনা, কাবেরী ও মেট্টুর পরিকল্পনা, নিজামসাগর পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়।

সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি

ইংরাজ জাতির স্বার্থের দিক দিয়াই ভারতবর্ষে শিল্পোন্নয়ন বা শিল্পস্থাপন কাম্য

ছিল না, বলা বাহুল্য। কিন্তু এক্ষেত্রে লর্ড কার্জনই সর্বপ্রথম ইংরাজদের সম্পূর্ণ উপেক্ষার নীতির পরিবর্তনের সূচনা করেন। তাঁহার চেষ্টায় সর্বপ্রথম 'ইম্পিরিয়াল ডিপার্টমেণ্ট অব্ কমার্স এ্যাণ্ড ইন্‌ডাস্ট্রিজ' স্থাপন করা হয়। স্বদেশী আন্দোলনের ফলেও ভারতীয় শিল্পোন্নয়ন ও নূতন শিল্প স্থাপনের এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মোরলে ভারত সরকারের নিকট এক নির্দেশে ভারতবর্ষে শিল্পোন্নয়নের দিকে মনোযোগ না দিতে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে ভারতীয় শিল্প সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও বেসরকারী উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল রহিয়া গেল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে ভারতবর্ষের শিল্পের অভাবহেতু যে-অসুবিধা দেখা গেল তাহাতে ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়িল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'মিউনিশন বোর্ড' স্থাপিত হইল। এই বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধের গোলাবারুদ প্রস্তুত করা, তথাপি এই শিল্প স্থাপনের ফলে ভারতীয় শিল্প উদ্যোগ অনেক পরিমাণে উৎসাহিত হইয়াছিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শিল্প কমিশন নামে কমিশনের উপর শিল্পোন্নয়নের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করিবার দায়িত্ব দিলে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এক কমিশন ভারতবর্ষে শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিলেন। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের এক-একটি শিল্প-বিভাগ খুলিবার সুপারিশ করা হয়। এই বিভাগের দায়িত্ব হইবে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য ও কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কে উপদেশ দান, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবায়ের ব্যবস্থা এবং পরিবহনের উন্নতি সাধন প্রভৃতি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিবার সুপারিশ করা হইল। সরকার এই সকল সুপারিশ গ্রহণ করিলেন এবং সেগুলি কার্যকরী করিতে চেষ্টা শুরু করিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠা ও শিল্পোন্নয়ন উৎসাহিত

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের শিল্প কমিশন

শিল্প কমিশনের সুপারিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত

শুল্কনীতি : শিল্পোন্নয়নের চেষ্টা শুরু হইবার অল্পকালের মধ্যেই বহিরাগত সামগ্রীর অসম প্রতিযোগিতার ফলে ভারতের নিজস্ব শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। এই কারণে ভারতবর্ষের শিল্প সংরক্ষণের জন্য শুল্কনীতি প্রবর্তনের প্রয়োজন হইল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারকে নিজস্ব শুল্কনীতি নির্ধারণ ও প্রবর্তনের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইল। পূর্বে এ-বিষয়ে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকারই ছিলেন ক্ষমতাপ্রাপ্ত। শুল্ক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে শুল্ক কমিশন (Fiscal Commission) স্থাপন করা হইল। এই কমিশন বিচারমূলক সংরক্ষণ (Discriminating Protection) নীতি গ্রহণের অর্থাৎ কোন্ শিল্পকে কি পরিমাণ সংরক্ষণ দেওয়া উচিত এবং যুক্তিযুক্ত সেই সকল বিচার-বিবেচনা করিবার পর সংরক্ষণ (Protection)-এর অধীনে আনিবার কথা বলিলেন। বিভিন্ন শিল্পের সংরক্ষণ লাভের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য একটি ট্যারিফ্ বোর্ড (Tariff Board) বা শুল্ক বোর্ড গঠনের সুপারিশও এই কমিশন করিল। ভারত

বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন

সরকার এই কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিলে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি ট্যারিফ্ বোর্ড স্থাপিত হইল। এই বোর্ড শুল্ক কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন শিল্পের সংরক্ষণলাভের যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া তুলা, লোহা ও ইস্পাত, কাগজ, চিনি, নুন, দিয়াশলাই এবং অপরাপর ভারতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ দান করিলেন অর্থাৎ ভারতে উৎপন্ন শিল্প দ্রব্যাদি যাহাতে আমদানিকৃত বিদেশী সামগ্রীর প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য বিদেশ হইতে আমদানিকৃত সামগ্রীর উপর শুল্ক স্থাপন করা হইল। এইভাবে ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণের ব্যবস্থা শুরু হইল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ওটোয়া চুক্তি দ্বারা ইংলণ্ড বা ইংলণ্ডের অধীন উপনিবেশসমূহ হইতে আমদানিকৃত সামগ্রীর উপর শুল্ক অপরাপর দেশের তুলনায় সামান্য কম করা হইল। এইভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুন্ন করিয়া নিজ স্বার্থ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ট্যারিফ্ বা শুল্ক বোর্ড স্থাপন

বিভিন্ন শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান : ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের উপনিবেশের জন্য বিশেষ সুযোগ— ভারতের স্বার্থ ক্ষুন্ন

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষভাবে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খাল খননের পর এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ পরিবহন-ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে ভারতের দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমে উন্নত হইতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে অবশ্য বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়। যুদ্ধোত্তর যুগে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে-মন্দা দেখা দেয় তাহার ফল ভারতবর্ষেও স্বভাবতই পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অবশ্য ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে অবশ্য বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়। এইভাবে হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্য দিয়া ভারতের দেশীয় অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য চলিতে থাকে।

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি

ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ ব্রিটিশ আমলে সব সময়ই দারিদ্র্যক্লিষ্ট, শোচনীয় জীবন যাপন করিতেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব হইতে শুরু করিয়া যুদ্ধ চলাকালে এবং শেষে তাহারা অত্যধিক আর্থিক কষ্টে পতিত হইয়াছিল। দৈনন্দিন জীবন ধারণের সামগ্রী, খাদ্য, বস্ত্র সব কিছুর দাম বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়া সাধারণ লোকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং বহু লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতা, কোন কোন ব্যক্তির অর্থলোলুপতার ঘৃণ্যতম দিক পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল। মুনাফাবাজী, কালোবাজারী প্রভৃতি সব কিছুর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে কৃষকদের দুরবস্থা চরমে পৌঁছিয়াছিল। সরকার কর্তৃক মূল্যমান স্থিতিশীল রাখিবার অক্ষমতা, সরকারের মজুত শস্যভাণ্ডার না রাখিবার কুফল, মুনাফাবাজী রোধ করিবার অক্ষমতা ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের শোচনীয় অবস্থা

———

অধ্যায় ২০

ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া
(Reaction of British Rule)

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলন (Rebellious Movements against the British Rule) : ভারতবর্ষে ইংরাজদের রাজনৈতিক অধিকারের সূচনা হইয়াছিল বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশেই ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সর্বপ্রথম শুরু হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশে ইংরাজগণ নবাব-মেকারের (Nawab-making) ক্ষমতা অর্জন করে এবং নবাবের মসনদের পশ্চাতে প্রকৃত শক্তি হইয়া দাঁড়ায়। প্রায় তখন হইতেই তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। মিরজাফরের মত হীনচেতা, দেশাত্মবোধহীন, স্বার্থপর ব্যক্তিও শেষ পর্যন্ত ইংরাজ প্রাধান্যমুক্ত হইবার জন্য ওলন্দাজদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছিলেন। মিরকাশিমকে মিরজাফরের স্থলে বাংলার নবাব-পদে স্থাপন ইংরাজদের পক্ষে মিরকাশিমের চরিত্র সম্পর্কে ভুল ধারণার ফলেই ঘটিয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর মতে মিরকাশিমের ভীরুতা এবং যুদ্ধের প্রতি অনীহা ইংরাজদের নিকট তাঁহাকে গ্রহণযোগ্য করিয়াছিল।* কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি-সম্পন্ন ইংরাজগণ এখানেই ভুল করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। মিরকাশিম ইংরাজদের সাহায্য লইয়া বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদ লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সহিতই ইংরাজদের সর্বপ্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মিরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা প্রজাহিতৈষী নবাব। ইংরাজ বণিকদের শুল্ক ফাঁকি দিয়া দেশীয় বণিকদের সর্বনাশ সাধনের অবৈধ কার্যকলাপ মিরকাশিম সহ্য করিলেন না। এই সূত্রে কলিকাতা কাউন্সিলের সহিত মিরকাশিমের মতানৈক্য শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। তিনি অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা ও বাদশাহ শাহ আলমের সাহায্য লইয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত ইংরাজ বাহিনীর সহিত বক্সারের যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিল (১৭৬৪)।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

মিরকাশিমের ব্রিটিশ বিরোধিতা : বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪)

মিরকাশিমের পরাজয়

মিরকাশিম পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ইংরাজ-বিরোধিতার অবসান ঘটে নাই। ইংরাজদের শোষণমূলক রাজস্বনীতি, চিরাচরিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, দেশীয় বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ, দেশীয় রীতিনীতি-বিরোধী কার্যকলাপ বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাংলাদেশের জেলাসমূহে, বিহারের বিভিন্ন স্থানে, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। রংপুর ও দিনাজপুরে ইংরাজ কোম্পানি নিযুক্ত রাজস্ব-আদায়কারীদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ দেখা দিলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া উহা দমন করিতে হয়। বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের রাজাদের প্রতি

বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে ছোটখাট বিদ্রোহ

---

* "...his timidity, the little inclination he had ever shown for war" were his qualifications for the post. Vide, *Tarachand* : ***History of the Freedom Movement in India***

ইংরাজদের দুর্ব্যবহার, দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়া সত্ত্বেও রাজস্ব আদায়ের কঠোরতা প্রভৃতির ফলে যে-অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল সেই সুযোগে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই অঞ্চলে ব্যাপক চুরি, ডাকাতি, খুন প্রভৃতি শুরু হইলে সাময়িকভাবে ইংরাজ শাসন প্রায় উৎখাত হইয়া গিয়াছিল। এই সকল স্থানে ইংরাজ শাসন পুনঃস্থাপন করিতে বহু সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

আদিবাসীদের বিদ্রোহ

আদিবাসীদের মধ্যে ইংরাজ শাসনের বিরোধিতা সব সময়ই লাগিয়া রহিয়াছিল। পশ্চিম-মেদিনীপুর হইতে শুরু করিয়া দক্ষিণ-বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে চোয়াড়দের বিদ্রোহ পুনঃপুনঃ দেখা দিয়াছিল। মেদিনীপুরের জঙ্গল মহল, সিংহভূমের হোজ, ছোটনাগপুরের কোল ও মুণ্ডা, মানভূমের ভূমিজ, রাজমহলের সাঁওতাল বিদ্রোহ, আসামের খাসিয়া ও উড়িষ্যার খোন্দ্ বিদ্রোহ ইংরাজ শাসকদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মেদিনীপুর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ অধীনে গিয়াছিল এবং জঙ্গল মহলে ইংরাজ অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু সেই সকল অঞ্চলে ইংরাজ শাসন কার্যকরী হইতে দীর্ঘকাল সময় লাগিয়াছিল। স্থানীয় ভূস্বামীরা ইংরাজ শাসন সহজে মানিয়া লয় নাই। ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ধলের নেতৃত্বে চোয়াড়গণ এবং কইলাপাল, ডোলকা, বড়ভূম প্রভৃতি স্থানের রাজগণ যুগ্মভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। নবাবগঞ্জের এবং ঝরিয়ার জমিদারগণ ইংরাজদের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই বিদ্রোহ লাগিয়াছিল এবং পরে ক্রমে উহা স্তিমিত হইয়া পড়ে।

ধলভূমের রাজার নেতৃত্বে বিদ্রোহ

কিন্তু ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গানারায়ণ নামে জনৈক নেতার নেতৃত্বে সিংভূমের হোজ সম্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সরকারী অফিস আক্রমণ করিয়া সাময়িকভাবে বড়ভূম নামক স্থান দখল করিয়া লইয়াছিল। অনুরূপ ছোটনাগপুর, সিংভূম, মালভূম প্রভৃতি অঞ্চলের আদিবাসীরাও ঐ সময়ে বিদ্রোহ করিয়াছিল। এই বিদ্রোহে মুণ্ডা ও হোজ সম্প্রদায় যোগদান করে। প্রায় একই সময়ে (১৮৩১-৩২ খ্রীঃ) ইংরাজগণ শিখ ও মুসলমানদের নিকট আদিবাসীদের জমি হস্তান্তরিত করিলে রাঁচি, সিংভূম, হাজারিবাগ, পালামৌ, মানভূমের কতকাংশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইংরাজ সরকার সামরিক বাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহ বহু চেষ্টায় দমন করিতে সমর্থ হন।

গঙ্গানারায়ণের বিদ্রোহ

রাঁচি, সিংভূম, হাজারিবাগ, পালামৌ প্রভৃতিতে বিদ্রোহ

সহজ প্রকৃতির সাঁওতালরাও ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। হাজারিবাগ, মানভূম প্রভৃতি স্থান হইতে সাঁওতালরা রাজমহল পাহাড়ীয় অঞ্চলে চলিয়া আসিয়া বসবাস শুরু করে। তাহাদের দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া মহাজনরা তাহাদিগকে শোষণ করিতে থাকে। ইহা ভিন্ন, সরকারী খাজনা-আদায়কারী, রেলকর্মচারী প্রভৃতি সকলে তাহাদের উপর নানাপ্রকার জুলুম শুরু করে। সাঁওতালী স্ত্রীলোকদের মান-সম্ভ্রম নষ্ট করিতেও তাহারা ছাড়ে না। এই সকল কারণে তাহারা মহাজন, পুলিস, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। সাহেবদের হাত হইতে জমি

সাঁওতালদের প্রতি শোষণমূলক অত্যাচারী নীতি

মুক্ত করিতে না পারিলে এই অসহনীয় অবস্থার অবসান ঘটিবে না এ-কথা তাদের জনৈক ধর্মগুরু প্রচার করিলে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু তীর-ধনুক লইয়া সরকারের বন্দুকধারী সেনাবাহিনীর সহিত তাহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু তাহাদের বিদ্রোহ আংশিকভাবে সফল হইল। সাঁওতাল পরগণা নামে একটি পৃথক অঞ্চল গঠন করিয়া এক বিশেষ ধরনের প্রশাসন সেখানে চালু করিতে ইংরাজরা বাধ্য হয়।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহ : সাঁওতাল পরগণা গঠন

ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে (১৮০৩) উড়িষ্যা ইংরাজদের অধীনে আসে। কিন্তু স্থানীয় রাজাদের অনেকেই ইংরাজদের শাসন সহজ মনে গ্রহণ করিল না। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে খুরদার রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই 'পাইক'রা সরাকারী রাজস্ব-আদায়কারীদের এবং পুলিসকে আক্রমণ শুরু করিয়া সরকারী খাজাঞ্চীখানা জ্বালাইয়া দেয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘকাল চেষ্টার পর খুরদায় ইংরাজ শাসন পুনঃস্থাপিত হয়। পারী তখনও ইংরাজদের অধিকার অমান্য করিয়া চলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব হয়। খুরদার রাজা জগবন্ধুকে বাৎসরিক পেন্সন দিয়া কটকে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

উড়িষ্যার খুরদা নামক স্থানের জমিদারের বিদ্রোহ

বিদ্রোহ দমন (১৮২৫)

খোন্দদের বাসস্থান খোন্দমহল মাদ্রাজের অধীন ছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে গুমসুর নামক স্থানের রাজা ধনঞ্জয় ভাঁরি ও ইংরাজদের মধ্যে বিবাদ শুরু হইলে প্রথমে ধনঞ্জয় ভাঁরিকে ইংরাজরা গ্রেপ্তার করে এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া লয়। ধনঞ্জয় খোন্দমহলের খোন্দ জাতির সাহায্য চাহিলে ডোরা বিষয়ী নামে জনৈক নেতার অধীনে তাহারা 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ অবশ্য ইংরাজরা দমন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু চক্র বিষয়ীর নেতৃত্বে খোন্দ জাতি আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে (১৮৪৬)। আঙ্গুল নামক রাজ্যের রাজাও এই বিদ্রোহের সমর্থন করিলে আঙ্গুল রাজ্যটিও ইংরাজরা দখল করিয়া লয়। চক্র বিষয়ী সেই সময়ে পাহাড়ী অঞ্চলে গোপনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছয় বৎসর কাল চুপচাপ থাকেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তিনি বিদ্রোহ শুরু করিলে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে খোন্দমহল হইতে বিতাড়িত করা হয় এবং বিদ্রোহ দমন করা হয়। পর বৎসর খোন্দমহলে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত উহা দমন করিয়া খোন্দমহল মাদ্রাজের অধীন হইতে সরাইয়া লইয়া কটকের অধীনে স্থাপন করা হয়।

খোন্দ বিদ্রোহ

খোন্দমহল কটকের অধীনে স্থাপন

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের কালে ইংরাজরা অহোম রাজ্যের মধ্য দিয়া সৈন্য প্রেরণ করে। সেই সূত্রে অহোম রাজ্যের সহিত স্থির হয় যে, ব্রহ্ম যুদ্ধ অবসানে অহোম রাজ্যকে ইংরাজ নিরাপত্তাধীন স্থাপন করা হইবে এবং অহোম রাজ্য অহোম রাজার অধীনেই থাকিবে। কিন্তু ব্রহ্ম যুদ্ধ শেষ হইলে ইংরাজরা অহোম রাজ্য হইতে রাজস্ব আদায় এবং সেইখানে প্রশাসনিক কার্যকলাপ

অহোম বিদ্রোহ

শুরু করে। অহোম রাজ-সভার সর্বপ্রকার ক্ষমতাও খর্ব করা হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে অসমীয়ারা অহোম রাজ-পরিবারের গোমধর কনওয়ারকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া এক বিদ্রোহের সূচনা করে। কিন্তু ইহা ব্যর্থ হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এক দ্বিতীয় বিদ্রোহের পরিকল্পনা রচিত হয়। ইহাতে খামতি, সিংপো, মণিপুরী, গারো, খাসিয়া সকল জাতির লোক যোগদান করিবে বলিয়া স্থির হয়। রূপচাঁদ কনওয়ারকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া বিদ্রোহের শুরু হয়। অহোম রাজবংশের বিভিন্ন শাখা এই বিদ্রোহে যোগদান করে। কিন্তু বিদ্রোহীদের পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা ইংরাজরা পূর্বাহ্নেই জানিতে পারে। ফলে এই বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হয়।

খাসিয়া পাহাড়ের একদিকে সিলেট ও অপর দিকে কামরূপ ইংরাজ অধীনে আসিলে এই দুয়ের মধ্যে সংযোগ পথ খাসিয়া পাহাড়ের মধ্য দিয়া তৈয়ার করিবার জন্য ইংরাজরা সচেষ্ট হয়। ব্রহ্মদেশে সৈন্য প্রেরণের সুবিধার জন্যও এই রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজন ছিল। ডেভিড্ স্কট নামে জনৈক ইংরাজ কর্মচারী খাসিয়া রাজা তিরাৎ সিংকে এই রাস্তা নির্মাণের অনুমতি দিতে রাজী করাইলেন। রাস্তা নির্মাণের অছিলায় বহু সৈন্য আমদানি করা হইলে তিরাৎ সিং ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহা ভিন্ন, ইংরাজরা খাসিয়াদের নিকট হইতে কর আদায় করিবে এই গুজব ছড়াইয়া পড়িলে তিরাৎ সিং একদল অনুচর লইয়া ইংরাজদের আক্রমণ করিলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ শুরু হইল। তিরাৎ সিংয়ের নেতৃত্বে খাসিয়ারা গারো ও খামতিদের সাহায্য লইয়া বীরবিক্রমে ইংরাজ বাহিনীর সহিত যুঝিয়া চলিল। কিন্তু ইংরাজ শক্তির সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা সম্ভব হইল না। তিরাৎ সিং আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরাজ প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এই প্রস্তাব ইংরাজরা তাঁহাকে দিলে তিনি ক্রীতদাস রাজা অপেক্ষা দরিদ্র স্বাধীন সাধারণ ব্যক্তির পদমর্যদা বহুগুণে বেশি এই উত্তর দিয়া ইংরাজ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর খাসিয়া রাজ্যে প্রকৃত শান্তি স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছিল।

খাসিয়া বিদ্রোহ

তিরাৎ সিং-এর নেতৃত্ব

তিরাৎ সিং-এর স্বাধীন চেতনা

মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন (Anti-British Movement among the Muslims): বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। মুসলমান শাসকদের নিকট হইতে ইংরাজরা বাংলার শাসনভার হস্তগত করিয়া লইলে এবং শাসনব্যবস্থাকে ইংরাজ-অধ্যুষিত করিয়া তুলিলে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও রাজকর্মচারী মর্যাদাহীন ও কর্মচ্যুত হইলেন। ইংরাজদের প্রবর্তিত ভূমি-বণ্টন ব্যবস্থায় বহু বনিয়াদী জমিদার পরিবার জমিদারি হারাইলে সেই স্থলে ভাগ্যান্বেষী, অভিজ্ঞতাহীন কতিপয় ব্যক্তি রাজস্ব-আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইল। নবাবের সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিবার ফলে এক বিরাট সংখ্যক সৈনিক বেকার হইয়া পড়িল। সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে কর্মচ্যুত হইলেন। বিলাতী সূতীবস্ত্রের

আমদানির ফলে বয়নশিল্প ক্রমেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে বহু তাঁতী সুতা প্রস্তুতকারী বৃত্তিচ্যুত হইলেন। ইহা ভিন্ন, ইংরাজদের মুসলমান ধর্ম-বিরোধী জীবনযাত্রার ধরন সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তাহাদের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করিল। তদুপরি নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, নূতন জমিদার শ্রেণীর শোষণ, নায়েব, গোমস্তাদের জবরদস্তিমূলক আচরণ সবকিছু মিলিয়া বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়কে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। এইভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক দিক দিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ ক্রমেই বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ

এই সময়ে (১৭৭৬-৭৭) মজনু শাহ্ নামে জনৈক ফকির নেতার নেতৃত্বে বাংলার বিভিন্নাংশে মুসলমান ফকিরগণ বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ শুরু করেন। ইঁহাদের কর্মকেন্দ্র ছিল নেপালের তরাই অঞ্চলের মকওয়ানপুর। বাংলার অভ্যন্তরে তাঁহাদের প্রধান কর্মস্থল ছিল বগুড়া জেলার মাদারগঞ্জ ও মহাস্থান। তাঁহারা সেখানে একটি দুর্গও নির্মাণ করেন। ব্রিটিশ সরকারের অধিকার উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা জমিদার, রায়ত প্রভৃতির নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে থাকেন। মজনু শাহ্-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র চিরাগ আলি ফকিরদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৭৮৮-৯০ খ্রীষ্টাব্দে ফকিরদল উত্তরবঙ্গের সর্বত্র তাহাদের কার্যকলাপ বিস্তার করে। ব্রিটিশ-বিরোধী এবং স্বাধীনতাকামী ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি ফকির বিদ্রোহের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে পাঠান, রাজপুত প্রভৃতি ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা সেনাবাহিনী হইতে কর্মচ্যুত হইয়াছিল তাহারাও ফকিরদের সঙ্গে যোগদান করে। ১৭৯৩ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহারা ইংরাজ সেনাবাহিনীর সহিত খণ্ডযুদ্ধ চালাইতে থাকে। তাহাদের বিদ্রোহাত্মক কার্যের ফলে সরকারের রাজস্ব আদায় করা কঠিন হইয়া পড়ে। নেপালের তরাই অঞ্চল হইতে যাহাতে ফকিরগণ তাহাদের কর্মকাণ্ড চালাইতে না পারে, এজন্য ব্রিটিশ সরকার নেপালের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে পরে ক্রমে ফকির বিদ্রোহের শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে।

মজনু শাহ্ঃ ফকির বিদ্রোহ

চিরাগ আলির নেতৃত্ব

নেপালের সহিত চুক্তির পর ক্রমে বিদ্রোহের প্রকোপ নাশ

ফকির বিদ্রোহের অনুরূপ বিদ্রোহ 'পাগলপন্থী' নামে মুসলমানদের এক সম্প্রদায় কর্তৃক শুরু হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন টিপু। টিপুর পিতা করম্ শাহ্ সুসং নামক স্থানে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বসবাস শুরু করেন। তিনিই ছিলেন পাগলপন্থী মতবাদের মূল উদ্গাতা। তিনি মানুষের মধ্যে সত্যবাদিতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের নীতি প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব অনেকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুচরদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, হাজং, গারো প্রভৃতি নানা জাতির লোক ছিল। করম্ শাহের মৃত্যুর পর টিপু তাঁহার সশস্ত্র অনুচর লইয়া জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাবর্গকে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি শেরপুরের জমিদারের প্রধান কাছারিবাড়ী আক্রমণ করিয়া উহা দখল করেন। কিছু কালের জন্য তিনি জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ করিয়া এক

পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ ঃ করম্ শাহ্ ও টিপু

সম্পূর্ণ স্বাধীন শাসন চালু করেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহার কর্মকেন্দ্রগুলি সরকার দখল করিয়া লইলেন।

ব্রিটিশ-বিরোধী অপর একটি আন্দোলন ফরিদপুরের হাজী শরিয়ৎ উল্লার নেতৃত্বে শুরু হয়। শরিয়ৎ উল্লা ইস্‌লাম ধর্মের মৌলিক সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। মূল ইসলাম ধর্মে পরবর্তী কালে যে-সকল রাজনীতি সংযুক্ত হইয়াছিল সেগুলি দূর করিয়া ইসলামধর্মের শুদ্ধিকরণ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন ছিল তাঁহার আন্দোলনের উদ্দেশ্য। তিনি জমিদারগণ কর্তৃক কৃষক সম্প্রদায়ের শোষণের বিরোধী ছিলেন। ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটাইয়া তিনি বাংলাদেশে পুনরায় মুসলমান শাসন ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট ছিলেন। এই আন্দোলনে ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় এবং ইহা ফরাইজী আন্দোলন নামে পরিচিত। তাঁহার পুত্র দাদু মিঞা বা মহম্মদ মহসীন ব্রিটিশ শাসনের অবসানকল্পে কর দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য প্রচার শুরু করেন। ব্রিটিশ বিচারালয়ে না গিয়া গ্রামের পারস্পরিক বিবাদ গ্রামেই বিচার করিবার জন্য অভিজ্ঞ এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের লইয়া তিনি বিচারালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। জমিদারদের অবৈধভাবে রায়তদের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে রুখিয়া দাঁড়াইতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শক্তি লইয়া চলিয়াছিল। এই আন্দোলনে ওহাবী আন্দোলনের মূল নীতির পূর্বাভাস পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ওহাবী আন্দোলন বাংলাদেশে শুরু হইলে ফরাইজী আন্দোলন ওহাবী আন্দোলনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া এক শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল।

ফরাইজী আন্দোলন: শরিয়ৎ উল্লা ও দাদু মিঞা

ফরাইজী আন্দোলনে ওহাবী আন্দোলনের পূর্বাভাস

আরবদেশের নেজ্‌দ নামক স্থানে ইসলাম ধর্মজ্ঞানী আব্দুল ওহাবের জন্ম হয়। তিনিই ছিলেন ওহাবী ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবন সাধন ছিল ওহাবের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য। তাঁহার মতবাদের অনুসরণকারী মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও পবিত্রীকরণ তাহাদের আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তাহাদের এই আন্দোলন ওহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত। কিন্তু ওহাবীরা ইসলাম ধর্মের পবিত্রীকরণ ও পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে যে-মতবাদ পোষণ করিত তাহা অপেক্ষা অধিকতর উদার ধর্মমত একই সময়ে দিল্লীতে অপর এক ধর্মজ্ঞানী প্রচার করেন। ইঁহার নাম ছিল ওয়ালি উল্লা। ওয়ালি উল্লার ধর্মমতের উদারতা তাঁহার সিয়া-সুন্নীদের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদাভেদ জ্ঞান না করিবার মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ওয়ালি উল্লার পুত্র আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও পবিত্রীকরণের আন্দোলন অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে। আব্দুল আজিজ ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বাসস্থান (দার-উল-ইসলাম) নহে, কারণ এখানে বিদেশীরা (ইংরাজ) শাসন ক্ষমতার অধিকারী। এজন্য ভারতবর্ষকে দার-উল-ইসলাম অর্থাৎ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের

আব্দুল ওহাব—ওহাবী আন্দোলনের মূল নেতা

ওহাবী আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য

দিল্লীর ওয়ালি উল্লার ধর্মমত ওহাবী আন্দোলনের সমধর্ম কিন্তু অধিকতর উদার

পবিত্র বাসস্থানে পরিণত করিতে হইলে প্রথম শর্ত-ই হইল মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। ইহা ভিন্ন, ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের অনেকের প্রবেশের ফলে মুসলমান সমাজ ও ধর্মের মধ্যে ইসলাম ধর্মসম্মত নহে এরূপ বহু আচার-আচরণ প্রবেশ করিয়াছে। এজন্য হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত খাঁটি ইসলাম ধর্মমত পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ভারতবর্ষকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র বাসস্থানে পরিণত করিবার আন্দোলন শুরু হয়। সুতরাং এই আন্দোলন রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক উভয় প্রকার আন্দোলনের মিশ্র আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়।

আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে আন্দোলন অধিকতর শক্তিশালী

আন্দোলনের রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক —মিশ্র চরিত্র

রায়বেরিলি নামক স্থানে সৈয়দ আহম্মদ এই মিশ্র আন্দোলনের নেতৃত্বে দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র বাসস্থানে পরিণত করিতে হইলে অর্থাৎ দার-উল-ইসলামে পরিণত করিতে হইলে পাঞ্জাবে শিখদের শাসন এবং বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটান প্রয়োজন ছিল। এজন্য তিনি আন্দোলন শুরু করেন। সৈয়দ আহম্মদ ছিলেন ওয়ালি উল্লা, আব্দুল আজিজ এবং বিশেষভাবে আরবে ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক আব্দুল ওহাবের মতবাদের প্রভাবে প্রভাবিত। সৈয়দ আহম্মদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে যে-আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল উহা ওহাবী আন্দোলন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আরব দেশে হজ করিতে গিয়া সেখানকার ওহাবী সম্প্রদায় ইসলামধর্মের পুনরুজ্জীবন ও পবিত্রকরণের যে-আন্দোলন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন এবং আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহার নেতৃত্বাধীন আন্দোলনও ওহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রভাবের দিক দিয়া বিচার করিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেই সৈয়দ আহম্মদ পরিচালিত আন্দোলন ওহাবী আন্দোলন অপেক্ষা ওয়ালি উল্লা ও আব্দুল আজিজের আন্দোলনের আদর্শে অধিকতর প্রভাবিত ছিল মনে করেন। এই কারণে অনেকে এই আন্দোলনকে ওয়ালি উল্লা আন্দোলন নামে অভিহিত করিবার পক্ষপাতী।

সৈয়দ আহম্মদের নেতৃত্ব গ্রহণ

সৈয়দ আহম্মদের উপর ওহাবী আন্দোলনের প্রভাব

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মত

এই আন্দোলন অর্থাৎ ভারতের ওহাবী বা ওয়ালি উল্লা আন্দোলন রায়বেরিলি, মিরাট, দিল্লী এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলাদেশে সৈয়দ আহম্মদের আন্দোলন সমধর্মী ফরাইজী আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল। সৈয়দ আহম্মদের অনুগামী শিষ্য মির নাসির আলি, সাধারণত তিতুমির নামে পরিচিত— প্রথমে তিনি বারাসতে আন্দোলন শুরু করেন এবং ক্রমে যশোহর ও নদীয়ায় বহু তাঁতজীবী ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক তাঁহার আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। জমিদার কৃষ্ণ রায় তাঁহার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত এলাকায় যে-সকল ব্যক্তি ওহাবী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল শাস্তি হিসাবে তাহাদের খাজনা দুই টাকা আট আনা করিয়া বাড়াইয়া

ভারতের ওহাবী আন্দোলন রায়বেরিলি, মিরাট, দিল্লী ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রসারিত

তিতুমির

দিলে তিতুমিরের নেতৃত্বে তাঁহার অনুচরগণ জমিদারের সহিত সংঘর্ষ শুরু করে। আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে তিতুমির নারকেলবেড়িয়া নামক স্থানে এক বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করিয়া পাঁচশত অনুচর সেখানে মোতায়েন করেন। তারপর তিনি হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহার অনুচরগণ পুর্ণা নামক গ্রাম আক্রমণ করিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে হত্যা করে, হিন্দু মন্দির কলুষিত করে এবং হিন্দুদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করে। এমন কি, যে-সকল মুসলমান তাহাদের পক্ষ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে দ্বিধা করে নাই। পুর্ণা গ্রাম আক্রমণের পর তাঁহারা ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়াছে এবং মুসলমানদের শাসন ফিরিয়া আসিয়াছে। চব্বিশ পরগণা, ফরিদপুর ও নদীয়ায় তিতুমিরের অনুচরগণ সাময়িকভাবে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠে। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইলে তাহাদের হস্তে অনেক বিদ্রোহী প্রাণ হারায়, অনেকে বন্দী হয়। নারকেলবেড়িয়ায় তিতুমিরের দুর্গ—বাঁশের কেল্লা, ব্রিটিশ সৈন্য দখল করিয়া লইল। অনেকে প্রাণ হারাইল আবার অনেকে বন্দী হইল। নারকেলবেড়িয়ার যুদ্ধে ইংরাজদের হস্তে তিতুমিরকে প্রাণ হারাইতে হইল। তাঁহার প্রধান অনুচর ও সহকারী গুলাম রসুল ৩৫০ জন অনুচরসহ বন্দী হইলেন। গুলাম রসুলকে পরে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল।

তিতুমিরের বাঁশের কেল্লা

হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে তিতুমিরের যুদ্ধ ঘোষণা : পুর্ণা গ্রাম আক্রমণ

চব্বিশ পরগণা, ফরিদপুর, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে তিতুমিরের আন্দোলনের প্রসার

ইংরাজদের হাতে শেষ পর্যন্ত তিতুমিরের পরাজয় ও মৃত্যু

ওহাবী আন্দোলন কোন কোন স্থানে কতকটা সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং সাম্প্রদায়িক অত্যাচারে পর্যবসিত হইয়াছিল। কিন্তু এই আন্দোলন মুসলমান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পুরণ করিতে গিয়া স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে পরবর্তী কালে ওহাবী আন্দোলন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই আন্দোলন ধর্ম-আন্দোলন হিসাবে কেবলমাত্র নিম্ন-মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে উহা কতকটা সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করিলে বর্ধিষ্ণু মুসলমান রায়তগণও এই আন্দোলনে যোগদান করেন। এ-বিষয়ে মালদহ, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে এই আন্দোলনের কথা দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ক্রমে এই আন্দোলন মুসলমান ধর্মপ্রচারক, ধর্মজ্ঞানী, জমিদার, অর্থশালী বণিক প্রভৃতির মধ্যে বিস্তৃত হয় এবং মোটামুটিভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের সকলেরই সমর্থন লাভ করে। এজন্য আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী সংগ্রহ করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় প্রমাণের অভাবে ওহাবী আন্দোলনের নামে নানাপ্রকার অবৈধ ও অত্যাচারী কার্যকলাপের কোন শাস্তি দেওয়া গেল না। প্রথমদিকে ওহাবী আন্দোলন কতকটা সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের দিকে অগ্রসর হইলে হিন্দু সমাজ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে শিখ রাজ্য পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িলে ওহাবী আন্দোলন যখন পাঞ্জাবে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করিতে সচেষ্ট হইল, তখন ইহা হিন্দু সম্প্রদায়ের সহানুভূতি

ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত

আন্দোলনের প্রকৃতি

হিন্দু সম্প্রদায়ের ওহাবী আন্দোলন সমর্থন

ও সমর্থন লাভ করিল। এই আন্দোলন তখন ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ওহাবী আন্দোলন জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণীর বিদ্রোহে পরিণত হয়। জমিদার হিন্দু কি মুসলমান সে-বিষয়ে কোন পার্থক্য করা হইত না। বাংলাদেশে এই আন্দোলন কতকটা শ্রেণীসংগ্রামের চরিত্র ধারণ করিয়াছিল। ওহাবী আন্দোলন বাংলা, বিহার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অঞ্চলে অল্প-বিস্তর প্রসারিত হইয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ওহাবী আন্দোলন শেষ পর্যায়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের সমর্থন কোন কোন স্থানে লাভ করিলেও মূলত ইহা মুসলমানদের দ্বারা, মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের আন্দোলন ছিল।* এই আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা চলে না। কিন্তু আন্দোলন জাতীয় চরিত্র লাভ না করিলেও সুসংগঠিত হইলে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন যে যথেষ্ট শক্তিশালি হইতে পারিত, তাহা ওহাবী আন্দোলনের ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়াছে।

আন্দোলনের বিস্তৃতি ও প্রকৃতি

ওহাবী আন্দোলনের সহধর্মী অপর এক আন্দোলন পশ্চিম-পাঞ্জাবে ভগৎ জওহরমল (সাধারণ্যে সিঁয়া সাহেব নামে পরিচিত) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিখধর্মে যে-সকল অনাচার, কুসংস্কার, বিধবাদের জীবনযাপনে কঠোরতা, মূর্তিপূজা প্রভৃতি যাহা কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল সেগুলি দূর করিয়া শিখধর্মকে পবিত্রকরণ। সিঁয়া সাহেব ও তাঁহার প্রধান অনুচর বালক সিংহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজরো নামক স্থানে এই আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই আন্দোলন 'কুকা বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।

কুকা বিদ্রোহ

আন্দোলনকারীরা গুরু গোবিন্দ সিংহকেই একমাত্র প্রকৃত গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। জাতিভেদ না-মানা, অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন, মাদক দ্রব্য গ্রহণ না-করা প্রভৃতি ছিল তাহাদের আন্দোলনের কয়েকটি মূল সূত্র। কিন্তু তাহাদের আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাবকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করা। ক্রমে তাহাদের এই আন্দোলন শিখধর্ম পবিত্রকরণ অপেক্ষা ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটান—এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। বালক সিংহের মৃত্যুর পর রাম সিংহ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং এক সেনাবাহিনী গঠন করেন। তিনি প্রথমে গুরু গোবিন্দ সিংহের অবতার বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিলেন। তারপর ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করিবার জন্য সরকারের আইন-আদালত না-মানা, স্কুল ত্যাগ করা, সরকারী চাকরি না-করা, বিলাতী সামগ্রী বর্জন করা প্রভৃতির মাধ্যমে এক 'অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করিলেন। তিনি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার অনুচর লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার সংকল্প ঘোষণা করিলেন। তিনি লুধিয়ানার নিকট ভাইনিআলা নামক স্থানে তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তাঁহার অনুচরদিগকে সামরিক শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সুবা, নায়েব সুবা প্রভৃতি পদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া তিনি পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় কুকা সংগঠনকে শক্তিশালী

আন্দোলনের বা বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য

রাম সিংহের নেতৃত্ব গ্রহণ এবং সামরিক বাহিনী গঠন

* Vide, *British Paramountcy and Indian Renaissance*, vol. ix, p. 901.

করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এই সংগঠনে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে দেখা দিলে অনেকেই এই আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

কুকা আন্দোলনে ব্রিটিশ অধিকার উৎখাত করিবার উদ্দেশ্য স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ সরকারের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। রাম সিংহ নেপালের মহারাজার সহিত গোপন সংযোগ স্থাপন করিয়া জম্মুতে কুকা সামরিক বাহিনী গঠন করিতেছেন এই সংবাদে ব্রিটিশ সরকার আরও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার সংগঠনের উপর কড়া নজর রাখিলেন। ব্রিটিশ সরকার যখন পাঞ্জাব অধিকার করেন সেই সময়ে তাহারা পাঞ্জাবের শিখ দরবারের ইচ্ছানুক্রমে গোহত্যা নিষিদ্ধ করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি ইংরাজ সরকার রাখেন নাই। তদুপরি পাঞ্জাবে গোহত্যা, গোমাংস বিক্রয়, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের সন্নিকটে কসাইখানা স্থাপন প্রভৃতি কুকা সম্প্রদায়কে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। তাহারা কসাইদের হত্যা করিতে শুরু করিল। এজন্য নয়জন কুকা বিদ্রোহীকে সরকার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন এবং দুইজনকে দ্বীপান্তরিত করিলেন। ইহাতে কুকা সম্প্রদায় আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং মালাউধের নবাবের খাজাঞ্চীখানা আক্রমণ করিয়া উহা দখল করিতে ব্যর্থ হইল। মালাউধ ও কোটলা নামক স্থানে তাহারা অনেককে হত্যা করিলে লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনার মিঃ কোয়ান ৪৯ জন কুকা বিদ্রোহীকে কামানের গোলার মুখে ফেলিয়া হত্যা করিলেন। রাম সিংহকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়া রেঙ্গুনে রাজবন্দী হিসাবে আটক রাখা হইল। এইভাবে কুকা বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

কুকা বিদ্রোহের গতি

মিঃ কোয়ানের নৃশংসতা

কুকা বিদ্রোহের অবসান

ওহাবী ও কুকা আন্দোলনের মতই মুণ্ডা উপজাতির শ্রীবিস্রার নেতৃত্বে ছোটনাগপুরে বিস্রা আন্দোলন শুরু হয়। ইংরাজী শিক্ষায় কতকটা শিক্ষিত শ্রীবিস্রা প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতে অন্তরের শান্তি না আসিলে তিনি পুনরায় মুণ্ডাদের ধর্মে ফিরিয়া আসেন। তিনি একমাত্র সিংবঙ্গা অর্থাৎ প্রধান দেবতার উপাসনা ভিন্ন অন্য কোন দেবতার উপাসনা না করিবার জন্য তাঁহার মুণ্ডা অনুচরদের বলিলেন। তিনি অন্তরের শুদ্ধি, চারিত্রিক পবিত্রতা, মাদক পানীয় বর্জন করা প্রভৃতির উপর জোর দিলেন। ক্রমে মুণ্ডা উপজাতির কাছে শ্রীবিস্রা ভগবানের অবতার এবং পৃথিবীর পিতা ('ধরতি আবা') বলিয়া বিবেচিত হইলেন। বিস্রার জনপ্রিয়তা ব্রিটিশ সরকারের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই ধরনের আন্দোলনই পরে ব্রিটিশ-বিরোধী হইয়া উঠে সেই অভিজ্ঞতা তাহাদের ছিল। ব্রিটিশ সরকার ভাবিলেন মুণ্ডা উপজাতি ব্রিটিশ অধিকার উৎখাত করিয়া স্বাধীন মুণ্ডা রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করিয়াছে। রাঁচির ডেপুটি কমিশনার বিস্রাকে গোপনে গ্রেপ্তার করিলেন। সঙ্গে তাঁহার পনের জন অনুচরকেও ধরা হইল। বিস্রার দুই বৎসর জেল হইল। জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিস্রা সমসাময়িক দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি নানাপ্রকার দুঃখ-দুর্দশায় পতিত

বিস্রা আন্দোলন

ধর্মীয় চরিত্র

ব্রিটিশ সরকারের ভীতি

বিস্রার কারাদণ্ড

মুণ্ডা জাতিকে সংগঠিত করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিতে সশস্ত্র আন্দোলন প্রয়োজন মনে করিয়া তীর, ধনুক, তরবারি প্রভৃতিতে তাঁহার অনুচরদিগকে শিখাইয়া তুলিতে লাগিলেন। বিরসার আন্দোলনে মুণ্ডাজাতির দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণ, ন্যায়-বিচারের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রচার শেষ পর্যন্ত তাঁহার অনুচরবর্গকে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত করিল। সরকারী পুলিস বাহিনী অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারা খুঁটি পুলিস থানা আক্রমণ করিয়া একজন কনস্টেবলকে হত্যা করিল এবং কয়েকটি ঘরে আগুন লাগাইল। রাঁচির ডেপুটি কমিশনার সেখানে উপস্থিত হইলে ২০০০ মুণ্ডা তাহাকে বাধা দিল। প্রথমে তিনি মুণ্ডাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হইলে সেনাবাহিনীকে গুলি করিতে আদেশ দিলেন। ফলে প্রায় ২০০ জন মারা গেল। বিরসাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে রাখা হইল। সেখানে তিনি কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মারা গেলেন (১৯০০)।

বিরসার পুনরায় আন্দোলন শুরু

সেনাবাহিনীর সাহায্যে মুণ্ডাদের দমন: বিরসার মৃত্যু

বোম্বাই প্রদেশে পাঁচমহল অঞ্চলের নাইকদাস উপদল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে তাহাদিগকে ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত অস্ত্র ত্যাগ করিতে সম্মত করান। কিন্তু ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তাহারা রূপ সিং বা রূপা নাইকের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়। রূপ সিং রাজগড়ের রাজস্বের একাংশ দাবি করেন। কিন্তু ইহা প্রত্যাখ্যাত হইলে রূপ সিং রাজগড় আক্রমণ করেন এবং কিছু অর্থ বন্দুক ইত্যাদি রাজগড়ের পুলিস থানা হইতে দখল করেন। ইহার পর জম্বুগোদা লুণ্ঠন করা হয়। হালোল নামক অপর একটি স্থানও তাঁহারা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। ইহার পর আরও কয়েকটি স্থান আক্রমণ করিবার পর শেষ পর্যন্ত রূপ সিং তাঁহার প্রধান সহকারী জোরিয়া ভগৎ রূপ সিংয়ের পুত্র গালালিয়াকে ব্রিটিশবাহিনী গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়। তাঁহাদের তিনজনেরই মৃত্যুদণ্ড হয়।

নাইকদাস বিদ্রোহ

বিদ্রোহ দমন: নেতৃবৃন্দের ফাঁসি

কৃষক বিদ্রোহ (Peasants' Revolt): ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারতের শাসনব্যবস্থা সরাসরি নিজেদের হাতে লইবার অল্পকালের মধ্যেই ভারতবাসী ও ইংরাজদের মধ্যে নানাধরনের সংঘর্ষ এমন কি, নানাধরনের ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন শুরু হইয়াছিল।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পর হইতে নানাধরনের বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল হইতেই নীলচাষ এক অতি লাভবান ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছিল। নীলগাছের চাষ করিয়া সেগুলি হইতে নীল প্রস্তুত করা হইত। নীল বিদেশে রপ্তানি করিয়া সাহেবরা প্রচুর অর্থ উপায় করিত। নীল ব্যবসায়ের অত্যধিক লাভের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সরাসরি নীলচাষে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (West Indies) হইতে নীলকরদের আনাইয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক সরাসরি নীল-চাষে অংশ গ্রহণ

দিয়া নীলচাষের পরিমাণ বাড়াইল। ক্রমে নীলকর নামে এক শ্রেণীর নীল উৎপাদনকারী সাহেব বাংলাদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় কৃষকদের কাজে লাগাইয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নীলচাষ শুরু করে। নীলকর সাহেবরা নিজেরা জমি ক্রয় করিয়া যেমন চাষীদের খাটাইয়া নীল উৎপাদন করিত তেমনি আবার ভারতীয় চাষীদিগকে দাদন দিয়া চাষীদের জমিতে নীলচাষের ব্যবস্থা করিত। যে-সকল চাষী দাদন অর্থাৎ নীলচাষ করিবার এবং উৎপন্ন নীল নীলকর সাহেবদের কুঠীতে বিক্রয় করিতে চুক্তিবন্ধ হইয়া অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করিত, তাহারা নীলকর সাহেবদের একপ্রকার ভূমিদাসে পরিণত হইয়া যাইত। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে চুক্তি অনুসারে নীলগাছ নীলকুঠীতে জমা না দিতে পারিলে তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া নীলকুঠীতে আটক রাখা হইত এবং তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইত।

নীলকর সাহেবদের নিজ খামার এবং দাদন দিয়া চাষীদের জমিতে নীলচাষের ব্যবস্থা

কৃত্রিম উপায়ে নীল উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বাবধি নীলচাষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে নীলচাষীদের উপর জুলুম-জবরদস্তির মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতেছিল। সেই সময়কার ইংরাজ সরকারও নীলকর সাহেবদের সমর্থন করিতেন। ফলে নীলকুঠীর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। নীলকর সাহেবরা তাহাদের কুঠীতে বেতনভুক্ লাঠিয়াল রাখিত। নীলচাষীরা উৎপন্ন নীল বা চুক্তির পরিমাণ মত নীল জমা না দিলে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের উপর দৈহিক নিপীড়নের কাজে এই সকল লাঠিয়ালকে ব্যবহার করা হইত।

নীলকর সাহেবদের স্বার্থে আইন চালু

নীলকুঠীর লাঠিয়ালদের কার্যকলাপ

নীলকর সাহেবরা নীলচাষীদিগকে ক্রীতদাসের ন্যায় অত্যাচার করিত এবং নানাপ্রকার অসদুপায়ে নীলচাষীদিগকে তাহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। উৎপন্ন নীলের দাম কৃষকদের খরচ কি হইয়াছে সে-কথা বিবেচনা না করিয়া নীলকর সাহেবরাই ধার্য করিত। ফলে তাহাদের লাভের পরিমাণ যেমন হইত খুব বেশি, চাষীদের ভাগ্যে থাকিত লোকসান। কিন্তু নীলচাষ ছাড়িবার উপায়ও নীলচাষীদের ছিল না। একবার দাদন লইয়া নীলচাষ শুরু করিলে আর তাহা হইতে নিষ্কৃতির পথ ছিল না। স্বার্থ-লোলুপ নীলকর সাহেবরা জোর করিয়া কৃষকদের জমি দখল করিয়া নীলচাষ শুরু করিতেও দ্বিধাবোধ করিত না। ম্যাকলে সাহেব নীলচাষের ব্যাপারে যে অসহনীয় অমানুষিক ব্যবস্থা চালু ছিল তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, অত্যধিক অন্যায় বা অবিচার সর্বদাই লাগিয়াছিল, নীলকর সাহেবরা আইনের মাধ্যমে চাষীদের উপর যেটুকু অন্যায় বা অবিচার করিতে পারিত তাহা ত' করিতই তদুপরি আইন-বহির্ভূতভাবে আরও অধিক অন্যায়-অবিচার করিয়া নীলচাষীদের ভূমিদাসে পরিণত করিয়াছিল।*

নীলচাষীদিগকে ভূমিদাসে রূপান্তর

* "......that great evils exist, that great injustice is frequently committed, that many ryots have been brought partly by the operation of the laws and partly by acts committed in defiance of law, into a state not far removed from that of predial slavery"—Macaulay. Vide, L. C, Mitra: *History of Indigo Disturbances in Bengal*, p. 3.

নদীয়া জেলার চৌগাছা নামক স্থানের নীলকুঠীতে সেখানকার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই দেওয়ানের কাজ করিতেন।

বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাসের নেতৃত্বে চৌগাছার নীল-বিদ্রোহের সূচনা : বিদ্রোহের বিস্তৃতি

নীলকর সাহেবদের নীলচাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহারা এত মর্মাহত হইয়াছিলেন যে, দুই ভাই-ই দেওয়ানের চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চৌগাছার নীলচাষীদের সংঘবদ্ধ করিয়া নীলচাষ বন্ধ করিয়া দিলেন। নীলকর সাহেবরা তাহাদের লাঠিয়াল পাঠাইয়া নীলচাষীদের শাস্তি দিতে চাহিলেন। উভয়পক্ষে যে-সংঘর্ষ হইল তাহাতে একজন চাষী প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু তাহাতে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিদ্রোহের আকার ধারণ করিল (১৮০৯)। নীলচাষীরা দাদন গ্রহণ করিল না, সরকারী অফিস, নীলকুঠী ও নীলকর সাহেবদের বাড়ী আক্রমণ শুরু করিল। সাহেবদের আঘাত করা, নীলচাষ করা জমির নীলগাছ নষ্ট করা, নীলকুঠী লুঠ করা অবাধে চলিতে লাগিল। নীলবিদ্রোহীরা বর্শা, বাঁশের লাঠি, তলোয়ার তাহাদের অস্ত্রহিসাবে ব্যবহার করিতে লাগিল। মধ্য-বাংলায় এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিলেন বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস এবং উত্তরবঙ্গে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন ওহাবী নেতা রফিক মণ্ডল।

নীলবিদ্রোহীদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ

নীলবিদ্রোহ শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই সময়কার পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা-আলোচনায় নীলবিদ্রোহের সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলচাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের বর্বরোচিত অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করিয়া নীলকর সাহেবদের মুখোশ খুলিয়া ধরিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' নীলচাষীদের বর্বরতার কাহিনীর বিবরণ সর্বত্র এক আলোড়নের সৃষ্টি করিল। রেভারেণ্ড লং মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দিয়া নীল-দর্পণের ইংরাজী অনুবাদ করাইবার অপরাধে এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং একমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে সর্বত্র ইংরাজদের বিরুদ্ধে ধিক্কার সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল।

নীলবিদ্রোহের সমর্থন : হিন্দু পেট্রিয়ট : নীলদর্পণ

সরকার এই বিদ্রোহ দমন করিতে সর্বপ্রকার দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু এই বিদ্রোহ স্বয়ং ভাইসরয় ও গবর্ণর-জেনারেল ক্যানিং সাহেবেরও দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই বিদ্রোহ নদীয়া জেলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে বিদ্রোহের আগুন যশোহর, পাবনা, মালদহ, রাজসাহী প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত হইল।

সরকার কর্তৃক বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পরিস্থিতি ক্রমশই জটিল হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া ইংরাজ সরকার এক 'নীল তদন্ত কমিশন' গঠন করিলেন। এই কমিশনের নিকট সাক্ষী দিতে গিয়া ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লু. ই. ডি. ল্যাটুর (W, E. De. Latour) সাহেব বলিয়াছিলেন যে, নীলচাষ একটি 'রক্তপাতের ব্যবস্থা' (System of bloodshed)*। নীল তদন্ত কমিশন তাহাদের রিপোর্টে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, চাষীদের উৎপন্ন ফসলের জন্য যে-দাম দেওয়া হয় তাহা তাহাদের পক্ষে মোটেই লাভজনক নহে। তদুপরি তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

নীল তদন্ত কমিশন (১৮৬২)

* *Ibid*, p. 4.

জবরদস্তিমূলকভাবে তাহাদিগকে এই লাভহীন কাজে লাগিয়া থাকিতে বাধ্য করা হইতেছে। নীল তদন্ত কমিশন নীল চাষীদের উপর জোর-জুলুম বন্ধ করিবার সুপারিশ করিলেন। এই সুপারিশ অনুযায়ী সরকার জোর-জুলুম, ভীতি প্রদর্শন বন্ধের আদেশ দিলেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্রিম উপায়ে নীল প্রস্তুত শুরু হইলে নীলচাষের অবসান

বাংলাদেশে নীলচাষের ভবিষ্যৎ প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে উপলব্ধি করিয়া ইংরাজরা বারাণসী, দোয়াব অঞ্চল, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে নীলচাষের উপর জোর দিয়াছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে বিহারেও নীলবিদ্রোহ দেখা দিলে সেখানেও নীলচাষ বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত প্রণালী আবিস্কৃত হইলে নীলচাষ সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়।

নীলবিদ্রোহ সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন

নীলবিদ্রোহ ভারতবর্ষের একাংশে কৃষকদের উপর নির্যাতনের ফলে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই বিদ্রোহ হইতে ভারতের কৃষকদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল তাহার একটি মোটামুটি ধারণা করা যায়। সংগঠিত হইলে নিরক্ষর, নিরীহ কৃষকগণও যে তাহাদের অভিযোগের প্রতিকার করিতে পারে সে-কথা কৃষকদের নীলবিদ্রোহে প্রমাণিত হইয়াছিল। বস্তুত, বাংলার নীলবিদ্রোহ-ই ছিল ইংরাজদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন। দমনমূলক আইন প্রয়োগ করিয়া এবং বিদ্রোহীদিগকে শক্তি প্রয়োগের দ্বারা দমন করিতে ইংরাজদের ব্যর্থতা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি যে কি হইতে পারে, তাহা প্রমাণিত করিয়াছিল। প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয়ভাবে শক্তিশালী ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনের সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতাই ছিল নীল বিদ্রোহ। পরবর্তী কালে মহাত্মা গান্ধী এই আইন অমান্য আন্দোলনই, অবশ্য অহিংসভাবে, ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সামরিক বিদ্রোহ (Army Revolt Prior to the Revolt of 1857): ব্রিটিশ শাসনের ফলে যে-অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নানাপ্রকার আন্দোলন ও বিদ্রোহাত্মক ঘটনার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। এই

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ

অসন্তোষ কৃষক, ধর্মসম্প্রদায়, ভূস্বামী, উপদলীয় ব্যক্তিবর্গ প্রভৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সিপাহীদের মধ্যেও এই অসন্তোষ ক্রমেই ধূমায়িত হইতেছিল। যে-সিপাহীদের কাজে লাগাইয়া ব্রিটিশরা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, সেই সিপাহীদের প্রতি পদস্থ ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারীদের অসৌজন্যমূলক এবং অশোভন আচরণ, সিপাহীদের সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র ইংরাজ সামরিক কর্মচারী ও সৈনিকদের বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতির ক্ষেত্রে ভারতীয় সামরিক কর্মচারীদের দাবি উপেক্ষা প্রভৃতি সিপাহীদের অসন্তোষকে বিদ্রোহের পর্যায়ে লইয়া গিয়াছিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ যাহা সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইয়াছিল তাহা

কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। দীর্ঘকাল পূর্ব হইতে এই বিদ্রোহের পথ প্রস্তুত হইতেছিল। সিপাহীদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসর ভারতীয় সৈনিক যাহারা 'সিপাহী' নামে অভিহিত হইত, তাহারা ইংরাজ সেনাপতি মনরোর পক্ষ ত্যাগ করিয়া নবাব মিরকাশিমের পক্ষে চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সিপাহীদেরই অপর এক অংশ যাহারা মনরোর প্রতি অনুগত ছিল তাহারা ইহাদের ধরিতে সমর্থ হয়। বিচারে তাহাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় এবং নেতৃত্ব যাহারা দিয়াছিল সেই রকম ২৪ জনকে কামানের গোলা দ্বারা ছিন্নভিন্ন করা হয়।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

সিপাহীদের বিদ্রোহের পরবর্তী ঘটনা ঘটে ভেলোরের সামরিক ছাউনিতে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করা হয় কিন্তু সিপাহীরা সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকে। ইহা ভিন্ন, হিন্দু-মুসলমান সকলকেই দাড়ি কামাইতে ও চামড়ার টুপি মাথায় দিতে আদেশ করা হয়। কপালে তিলক, ফোঁটা প্রভৃতি কোনপ্রকার ধর্মীয় চিহ্ন আঁকা নিষিদ্ধ করা হয়। এই সকল ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ভেলোরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে উহা দমন করেন। কিন্তু ইহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া দুই মাস পরই সিপাহীরা পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী ও পাহারাদারদের হত্যা করে। কিন্তু এইবারও এই বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হইল। বিদ্রোহী সিপাহীদের সংখ্যাল্পতা ও শৃঙ্খলাহীনতা তাহাদের পরাজয় সহজ করিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

ভেলোরের সিপাহী বিদ্রোহ (১৮০৬, মে মাস)

ভেলোরের দ্বিতীয় বিদ্রোহ (১৮০৬, জুলাই মাস)

ভেলোরের সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারাকপুরে বাঙালী সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের পশ্চাতেও ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ ছিল মূল কারণ। নূতন সামরিক নিয়মকানুন প্রবর্তন, ইংরাজ সামরিক কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে বাঙালী সৈনিকরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ইংরাজ সেনাপতি একদল ইংরাজ সৈন্য লইয়া ব্যারাকপুরে উপস্থিত হন এবং তাঁহার আদেশে বিদ্রোহী বাঙালী সিপাহীদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। যাহারা সেই সময়ে রক্ষা পাইয়াছিল তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া সামরিক বিচারের পর ফাঁসি দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর বাঙালী সিপাহী বাহিনী তুলিয়া দেওয়া হয়। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সিপাহীদের ছোটখাট বিদ্রোহ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। [১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য]।

ব্যারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহ (১৮২৪)

ছোটখাট বিদ্রোহ: ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পটভূমিকা রচনা

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সমাজ-সংস্কার (Social Reforms in the 19th & 20th Centuries): পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতবাসী, বিশেষভাবে

বাঙালীর দৃষ্টি নিজ সমাজের পশ্চাৎপদতার দিকে পতিত হইল। পাশ্চাত্য সমাজের তুলনায় ভারতীয় সমাজের অনগ্রসরতা, কুসংস্কার-আচ্ছন্নতা স্বভাবতই শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে অত্যন্ত অবমাননাকর ও পীড়াদায়ক মনে হইল। মিল, বেকন, বেন্থাম, কোঁথ প্রভৃতির রচনার প্রভাবে ভারতীয়দের মনের যে-প্রসার সাধিত হইয়া নূতন জীবনাদর্শ, মানবিকতা ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা হইতেই ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সামাজিক সংস্কারের আগ্রহ জন্মিয়াছিল। এ-দিক দিয়া বিচার করিলে রাজা রামমোহন রায়কে ভারতের সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে স্মরণ করিতে হইবে। অবশ্য ভারতীয় সমাজ ধর্ম-ভিত্তিক ছিল বলিয়া সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ধর্মান্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনাসমাজ, আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, থিওসোফিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতি এবং মুসলমান, পার্শী ও শিখ সম্প্রদায় কর্তৃক সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ধর্মকে বাহন করিয়া চলিয়াছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সমাজ-সংস্কারের আগ্রহ

সমাজ-সংস্কার প্রধানত ধর্ম-ভিত্তিক

ভারতের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক কুসংস্কারজনিত যুক্তিহীন রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ হইতে স্ত্রী-পুরুষ সকলকে মুক্ত করা এবং সমাজ ও ব্যক্তির হিতার্থে স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় তখন নারীজাতির জীবন সুখকর ছিল না। বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ, বিধবাদের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহারের অভাব, পর্দাপ্রথা সবকিছু নারীজাতির জীবন প্রায় দুর্বিষহ করিয়া রাখিয়াছিল। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাই সর্বপ্রথম চিন্তাশীল, শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কেবলমাত্র নারীজাতির মুক্তিসাধনই মননশীল, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শ ছিল না। সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, অস্পৃশ্যতা সমাজের এক বিরাট সংখ্যক নর-নারীকে এক অপমানকর হীনমন্যতায় নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের সামাজিক উন্নয়নের জন্যও তাঁহারা সচেষ্ট ছিলেন।

সমাজ-সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষকে কুসংস্কার-মুক্ত করা

নারীজাতির প্রতি সামাজিক কঠোরতা দূর করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন বলিয়া স্বীকৃত

ঊনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত হিন্দু নারীদের প্রতি অমানুষিক সামাজিক বর্বরতা ছিল সতীদাহ। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিতে হইত। এই সহ-মৃতা হওয়া স্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত না।

সতীদাহ প্রথা—অমানুষিক সামাজিক বর্বরতা

সম্রাট আকবরের ন্যায় উদারচেতা শাসকদের দৃষ্টিতে সতীদাহ প্রথার নির্মমতা বহু পূর্বে ধরা পড়িয়াছিল। এই নৃশংস প্রথার অবসানকল্পে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা সেই সময়েই অনুভূত হইয়াছিল। আকবর সতীদাহ প্রথার উপর কতকগুলি বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়াছিলেন। বাল্য-বিবাহ বন্ধ করিবার জন্যও তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক হিন্দু সমাজের উগ্র রক্ষণশীলতার ফলে এই দুইয়ের কোনটিকেই নির্মূল করা সম্ভব হয় নাই। সতীদাহ প্রথার নৃশংসতা ইংরাজ গবর্ণর-জেনারেল মিণ্টো, লর্ড হেস্টিংস্ প্রভৃতির দৃষ্টি আকর্ষণ

সতীদাহ প্রথার নির্মমতা

আকবর ও ইংরাজ গবর্ণর-জেনারেলদের এই প্রথা নিবারণের চেষ্টা

করিয়াছিল। ভারতীয়দের ধর্মীয় বা সামাজিক রীতি-নীতিতে হস্তক্ষেপ ব্রিটিশ সরকারের শাসন-নীতি বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও সরকার ১৮১২, ১৮১৫ ও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ-বিরোধী কতকগুলি নিয়ম-কানুন চালু করিয়াছিলেন। মৃত স্বামীর স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ষোল বৎসর বয়সের কম বয়স্কা বিধবা, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের স্বামীর সহ-মৃতা হইবার অর্থাৎ 'সতী' হইবার বিরুদ্ধে নিয়ম-কানুন চালু হইয়াছিল। মাদক দ্রব্যাদি সেবন করাইয়া স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় নিক্ষেপ করাও নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। এই সকল নিয়ম-কানুন অমান্য করিয়া যাহাতে 'সতীদাহ' না করা হয় সেইজন্য সতীদাহের সময় পুলিসের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের সতীদাহ-বিরোধী নিয়ম-কানুন নাকচ করিবার জন্য তদানীন্তন রক্ষণশীল হিন্দুগণ সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামমোহনের নেতৃত্বে একদল উদারচেতা শিক্ষিত বাঙালী সতীদাহ নিবারণের জন্য সোচ্চার হইয়া উঠিলেন। রামমোহন সতীদাহ প্রথার বীভৎসতা বর্ণনা করিয়া 'সতীদাহ' প্রথাকে হত্যাকাণ্ডের সামিল বলিয়া উল্লেখ করিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দুদের নেতা। তিনি রামমোহনের সহিত এক অতিশয় তীব্র বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন কি, রক্ষণশীলদল রামমোহনের জীবনহানিব ভীতি প্রদর্শনেও পশ্চাৎপদ হইলেন না।

১৮১২, ১৮১৫ ও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের নিয়ম-কানুন বা রেগুলেশন

সতীদাহের উপর বাধা-নিষেধ

সতীদাহ লইয়া রাধাকান্ত দেব ও রামমোহনের পারস্পরিক বিতণ্ডা

এইরূপ পরিস্থিতিতে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। কোর্ট-অব্-ডিরেক্টরস্ (Court of Directors) সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কে বেণ্টিঙ্ককে পরিস্থিতি বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে অথবা ক্রমপর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছিল। লর্ড বেণ্টিঙ্ক বিলম্ব করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ১৭ নং রেগুলেশন (Regulation XVII) দ্বারা তিনি সতীদাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং এই আইন অমান্যকারীকে বিচারালয়ে অপরাধী হিসাবে বিচার করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সতীদাহ নিবারণ আইন রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদের সৃষ্টি করিল। ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকারের নিকট পর্যন্ত এই আইন নাকচ করিবার আবেদন করা হইল। পক্ষান্তরে রাজা রামমোহন কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তিনশত জনের স্বাক্ষরিত এক প্রতিবেদনে গবর্ণর-জেনারেলকে সতীদাহ নিবারণ আইন প্রবর্তনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিং গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিয়া বেণ্টিঙ্কের আইন কার্যকরী করেন এবং সতীদাহ প্রথা দেশ হইতে উচ্ছেদ করেন। শিশুহত্যারও তিনি অবসান ঘটান। পূর্বে বাংলা ও রাজপুতানা পরিবারের মেয়ে জন্মগ্রহণ করাটা পছন্দ করা হইত না। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পশ্চাৎপদ, অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়ে জন্মাইলে উহাকে হত্যা করিয়া ফেলা হইত। ১৭৯৫ ও ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেশন দ্বারা এই নৃশংস ব্যবস্থাকে

লর্ড বেণ্টিঙ্ক ভারতের গবর্ণর-জেনারেল

কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্-দের সুস্পষ্ট নির্দেশ

রক্ষণশীলদের প্রতিবাদ

লর্ড হার্ডিং কর্তৃক এই প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন

শিশুহত্যা-বিরোধী আইন লর্ড হার্ডিং কর্তৃক কার্যকরীকরণ

বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই আইন লর্ড হার্ডিং-এর আমলেই পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী হইয়াছিল।

সতীদাহ ভিন্ন হিন্দু সমাজের অপর একটি অন্যায়মূলক কুসংস্কার ছিল বিধবাদের বিবাহ নিষেধ। ইহার ফলে বিধবাদিগকে মৃত স্বামীর পরিবার অথবা পিতা বা ভ্রাতার পরিবারে গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইত। বিধবাদের সম্পত্তি অধিকারেও বাধা ছিল। কোন বিধবার যদি আবার বিবাহ হইত তাহা হইলে সেই বিবাহ এবং সেই বিবাহজাত সন্তানরা আইনের বা সমাজের স্বীকৃতি পাইত না। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহের আইনগত অধিকার দেওয়া হয়।

বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তন (১৮৫৬)

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় স্ত্রীজাতি পারিবারিক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন। বর্ধিষ্ণু পরিবারের কয়েকজন মহিলা ভিন্ন শিক্ষার সুযোগ হইতে অনেকই বঞ্চিত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করা সমাজ-সংস্কারের অঙ্গ হিসাবেই বিবেচ্য। এ-বিষয়ে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিশনারীগণ 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' (Female Juvenile Society) স্থাপন করিয়া কলিকাতায় স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা করেন। কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ড্রিংকওয়াটার বেথুনের নাম বাংলার স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের চেষ্টায় কলিকাতায় একটি মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। সেই স্কুলই পরবর্তী কালে বেথুন স্কুল ও কলেজে রূপান্তরিত হইয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের মনোযোগ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস্ উড্ সাহেবের ডেস্‌পাচ্ (Wood's Despatch)-এর নির্দেশের ফলে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

স্ত্রী-শিক্ষা

ভারতবর্ষে সুলতানি আমলে ক্রীতদাস বা দাসপ্রথার প্রচলন থাকিলেও ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে সেই ধরনের দাসপ্রথা পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য দাসপ্রথার সমগোত্রীয় ব্যবস্থা কিছু কিছু ছিল। শ্রমিকরা মালিকের কাজ আজীবন এমন কি, বংশ-পরম্পরায় করিবে এই ধরনের চুক্তিবদ্ধ (Bonded) শ্রমিক নিয়োগের প্রথা অবশ্য আরও দীর্ঘকাল চালু ছিল।

উত্তর-ভারতে 'গোলাম শ্রেণী' বলিতে পরিবারের বসবাসকারী চাকর ও তাহার সন্তানদিগকেই বুঝাইত। ইহারা বংশ-পরম্পরায় নিজ মালিক পরিবারের কাজকর্ম করিত। দক্ষিণ-ভারতে দাসরা প্রধানত মালিকের কৃষিজমি চাষ করিত। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দাসপ্রথার বিলোপ সাধিত হইলে ঐ বৎসর ভারতের চার্টার আইনে গবর্ণর-জেনারেলকে দাসপ্রথার বিলোপ সাধনের নির্দেশ দেওয়া হয়। দশ বছর পর (১৮৪৩ খ্রীঃ) ভারতে দাসপ্রথা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। অবশ্য চুক্তিবদ্ধ হইয়া শ্রমিকগণ যাবজ্জীবন এমন কি, বংশ-পরম্পরায় মালিক শ্রেণীর কাজ করিতে দেখা যায় (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যবস্থার অবসান ঘটান হয়)।

দাসপ্রথার বিলুপ্তি (১৮৩৩, ১৮৪৩)

সংবাদপত্র ও জনমত (The Press and Public Opinion): অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে স্থাপিত হইয়াছে এই ব্রিটিশ অধিকার বিস্তারের কাজ চলিতেছে সেই সময় স্বাধীন সাংবাদিকতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ইংরাজদের নিজ দেশ ইংলণ্ডেও ছিল না। 'দি টাইমস্' (The Times)-এর মত পত্রিকা সরকারের নিকট হইতে নিয়মিত পেনসন পাইত এবং বিনিময়ে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করিয়া যাইত। সেই যুগে ইংলণ্ডেও সাংবাদিকতা তেমন সম্মানজনক পেশা হিসাবে বিবেচিত হইত না।

অষ্টাদশ শতকে সাংবাদিকতার অবস্থা

সেই যুগে ভারতবর্ষে সাংবাদিকতা স্বভাবতই যেমন ছিল অনগ্রসর তেমনি অত্যন্ত নিম্ন মানের। সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকা সেই সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত ভারতে কয়েকজন ইংরাজ ভাগ্যান্বেষীর চেষ্টায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন নীতি বা আদর্শ মানিয়া চলা এই সকল পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল না। পরনিন্দা এবং ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার, বিশেষ ভাবে পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের আক্রমণ করিয়া এবং সরকারের দুর্নীতি সম্পর্কে লিখিয়া জনসাধারণকে কিছুটা আনন্দ দেওয়া ছিল এই সকল সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য। ইহার মূল কারণ ছিল ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে তাহাদের অধিকৃত স্থানকে নিজেদের জমিদারি বলিয়া মনে করিত। এজন্য কোম্পানির কর্মচারী নহে এরূপ ইংরাজ তথা ইওরোপীয়দিগকে তাহারা অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া মনে করিত। ফলে একদিকে যেমন কোম্পানির কর্মচারীরা সাংবাদিকদিগকে রীতিমত শত্রু বলিয়া মনে করিত এবং ঘৃণা করিত, অপরদিকে সাংবাদিকরা সেই সকল কর্মচারীর কাজকর্মের ত্রুটির সমালোচনা এবং এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের পারিবারিক জীবন লইয়া নানাপ্রকার কটূক্তি করিতে দ্বিধা করিত না। ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের সূ[illegible] ইংরাজগণ ইংরাজী ভাষায় প্রথম শুরু করিয়াছিল। কিন্তু সকলেরই সাংবাদিকতার ধরন ছিল একই রকমের। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বোল্টস্ নামে জনৈক ইংরাজ একটি পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা করিলে তাহাকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন জেম্স্ অগাস্টাস্ হিকি। তিনি সরকারের অনুমতি লইয়া ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল এড্ভারটাইজার' (Bengal Gazette or Calcutta General Advertiser) নাম দিয়া একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। হিকি স্বয়ং গবর্ণর-জেনারেল হইতে শুরু করিয়া, মিশনারী, প্রধান বিচারপতি, সরকারী কর্মচারী, এমন কি, গবর্ণর-জেনারেলের স্ত্রীকে আক্রমণ করিয়া লিখিতে শুরু করেন। সরকার কলিকাতা জেনারেল পোস্ট অফিসের মাধ্যমে এই পত্রিকা প্রেরণ নিষেধ করিয়া দিলে, হিকি সরকারের এই নিষেধাজ্ঞাকে স্বৈরাচারী ক্ষমতার প্রকাশ বলিয়া তীব্র নিন্দা করিলেন। গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ ও প্রধান

ইংরাজ ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তিদের চেষ্টায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ

সাংবাদিকতার নীতি ও উদ্দেশ্য: ব্যক্তিগত কুৎসা, সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা, কর্মচারীদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কটূক্তি করা

বোল্টস্ নামক জনৈক ইংরাজকে পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টার জন্য দেশ হইতে বহিষ্কার

হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' (১৭৮০)

বিচারপতি সার্ এলিজা ইম্পেকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিলেন। ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আদায়ের চেষ্টায় হিকির নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। তিনি ইংরাজ জাতির জীবনধারণের পক্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপরিহার্য এই কথাই সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন।* জনসাধারণকে নিজস্ব মতামত, নীতি প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং যদি সেই স্বাধীনতা বলপূর্বক খর্ব করা হয় তাহা হইলে উহা অত্যাচারের সামিল হইবে এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে এই স্পষ্টোক্তি তিনি করিয়াছিলেন।† ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর-জেনারেল স্বয়ং এবং জনৈক মিশনারী ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচারের জন্য হিকির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিলে হিকির কারাদণ্ড হইল এবং তাঁহার পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেল।

হিকির কারাদণ্ড—বেঙ্গল গেজেট প্রকাশ বন্ধ

সমসাময়িক কালে অর্থাৎ ১৭৮০ হইতে ১৭৯৩ খ্রীঃ এই কয় বৎসরের মধ্যে হিকির গেজেট ভিন্ন আরও ছয়খানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলির একটি প্রকাশ করিয়াছিলেন সার্ জন শোর। ইঁহাকেও ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল। এই সকল পত্রিকার মধ্যে 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট' ও 'হরকারু' উল্লেখযোগ্য। অনুরূপ মাদ্রাজে 'মাদ্রাজ কৌরিয়ার' (Madras Courier) ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাখানি অবশ্য সরকারী সমর্থন লাভ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পরে (১৭৯৫) প্রকাশিত আরও দুইটি পত্রিকার মধ্যে 'ইণ্ডিয়া হেরাল্ডের' সম্পাদককে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কার করা হইল। সরকারের এবং বিশেষত ইংলণ্ডের রাজকুমার প্রিন্স-অব্-ওয়েলসের কঠোর সমালোচনার জন্য তাঁহাকে এই দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশের পূর্বে সরকারী অনুমোদন গ্রহণের নীতির প্রয়োগ দেখা যায় 'উইক্লি মাদ্রাজ গেজেট'-এর ক্ষেত্রে। সরকারের সামরিক সেক্রেটারীকে না দেখাইয়া কোন সংবাদ প্রকাশ না করিতে এই পত্রিকাকে আদেশ করা হইয়াছিল। অল্পকাল পর সকল পত্র-পত্রিকার উপর মাদ্রাজ সরকার এক নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রয়োগ করেন।

মাদ্রাজের ইংরাজদের পত্র-পত্রিকা

সংবাদ প্রকাশের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ

বোম্বাই প্রদেশে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বোম্বাই হেরাল্ড' প্রকাশিত হয়, পরে 'বোম্বে কৌরিয়ার' (১৭৯০) এবং 'বোম্বে গেজেট' (১৭৯১) প্রকাশিত হয়। সরকারের পুলিস বিভাগের কঠোর সমালোচনার জন্য 'বোম্বে গেজেট'-এর উপর সরকারের অনুমোদনের পর সংবাদ প্রকাশের আদেশ দেওয়া হয়। সুতরাং ভারতে ইংরাজদের সম্পাদনায় ইংরাজী ভাষার পত্র-পত্রিকাকে ইংরাজ শাসনের ও ইংরাজ কর্মচারীর কাজের সমালোচনার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। একাধিক সম্পাদককে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কার করাও হইয়াছিল। সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া সেই যুগেই 'সেন্সর' প্রথা (Censor) সরকার চালু

বোম্বাই প্রদেশের পত্র-পত্রিকা

সরকার সমালোচনার সম্মুখীন হইতে অরাজী

---

* Vide, *History and Culture of the Indian People*, vol. x, part ii. p. 223.

† *Idem.*

করিয়াছিলেন। ইহা হইতে ইংরাজ সরকার কৃত কাজের ত্রুটির সমালোচনা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, এ-কথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায়।

উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে (১৮১৮) সর্বপ্রথম দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের প্রকাশ শুরু হয়। ঐ বৎসর সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সম্পাদিত পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশিত হয়। জে সি মার্শম্যান ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। এই পত্রিকা অবশ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ঐ বৎসরই মার্শম্যান সাহেব 'সমাচার দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল এবং বাংলার জনগণের একটি শক্তিশালী মুখপত্রে পরিণত হইয়াছিল। মার্শম্যান সাহেব এই পত্রিকার সম্পাদক নামেমাত্রই ছিলেন। বস্তুত এই পত্রিকার সম্পাদনার কাজ তদানীন্তন বাংলার একাধিক পণ্ডিত করিতেছিলেন। প্রায় একই সময়ে কলিকাতা হইতে 'বাংলা গেজেটি' নামে অপর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হয়। হরচন্দ্র রায় ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। বাঙালীর সম্পাদনায় বাংলা ভাষার পত্রিকা হিসাবে 'বাংলা গেজেটির' নাম উল্লেখ্য। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ কৌমুদী' নামে সম্পূর্ণ বাঙালী সম্পাদনায় বাংলা ভাষায় অপর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকার মূল শক্তি ছিলেন রাজা রামমোহন।

দেশীয় ভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা শুরু

দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ, বাংলা গেজেটি, সংবাদ কৌমুদী প্রভৃতি

এই পত্রিকায় রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া রচনা প্রকাশ করিতে থাকিলে সতীদাহ যাঁহারা সমর্থন করিতেন সেইরূপ রক্ষণশীলরা 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটি পাল্টা পত্রিকা প্রকাশ করিতে শুরু করেন। ফলে সতীদাহ সমর্থনকারী রক্ষণশীল ব্যক্তিরা সংবাদ কৌমুদী হইতে তাঁহাদের সাহায্য-সহায়তা উঠাইয়া লন। শেষ পর্যন্ত রামমোহন রায়কে এই পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। প্রায় আট বৎসর পর রামমোহন এই পত্রিকাকে 'দ্বিসাপ্তাহিক' পত্রিকা হিসাবে পুনরায় প্রকাশ করেন।

সংবাদ কৌমুদীর পাল্টা পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা

বাংলা ভাষা ভিন্ন অন্যান্য মাতৃভাষায়ও পত্রিকা সেই যুগে প্রকাশিত হইতে থাকে। রামমোহন রায় ফার্সী ভাষায় 'মীরাত-উল-আখ্‌বর' পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮২২)। কলিকাতার এক বিলাতী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 'জাম-ই-জাহানুমা' নামে এক উর্দু পত্রিকা বাহির করে। কিছুকাল পর হইতে এই পত্রিকা উর্দু ও ফার্সী একত্রে এই দুই ভাষায়ই প্রকাশিত হইতে থাকে। অনুরূপ 'বঙ্গ দূত' নামে একটি পত্রিকা বাংলা, ইংরাজী, ফার্সী ও হিন্দী এই চারিটি ভাষায় প্রকাশিত হয়। মণ্টগোমারি মার্টিন নামে এক ইংরাজ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি মনীষীরা এই পত্রিকা প্রকাশের এবং উহার নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোম্বাইতে গুজরাতি ভাষায় 'বোম্বে সমাচার', দিল্লীতে উর্দু ভাষায় 'সৈয়দ-উল-আখ্‌বর', 'দিল্লী আখ্‌বর' এবং আরও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। বোম্বাই শহরে 'বোম্বে কৌরিয়ার' নামক ইংরাজী পত্রিকা প্রথমে 'বোম্বে টাইমস্'-এ নামান্তরিত হয় এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া' নামে পরিচিত হয়।

ফার্সী, উর্দু ও হিন্দী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ

দেশীয় ভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা ভারতের বিভিন্নাংশে উনবিংশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সকল পত্রিকার মধ্যে কলিকাতায় হরিশচন্দ্র মুখার্জী সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ, তাহাদের স্বার্থের প্রতি সরকারী উপেক্ষা, সেগুলির প্রতিকার এবং ভারতবর্ষের জন্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের এক শক্তিশালী মুখপত্রে পরিণত হইয়াছিল।

দেশীয় ভাষায় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি

হিন্দু পেট্রিয়ট

অন্যান্য প্রদেশেও দেশীয় ভাষায় আরও কয়েকটি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। দাদাভাই নৌরোজী সম্পাদিত গুজরাতি 'রাস্ত গুফ্তর' দ্বিপাক্ষিক পত্রিকা, দাদাভাই কাভাসজী সম্পাদিত গুজরাতি ত্রি-সপ্তাহিক পত্রিকা 'আখবার উও সোদাগর' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দাদাভাই নৌরোজীর রাস্ত গুফ্তর ও দাদাভাই কাভাসজীর আখ্বার উও সোদাগর

দেশীয় পত্রিকাগুলির আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় সংবাদ বিতরণ এবং জনসাধারণের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা। রাজা রামমোহন তাঁহার 'মিরাত্-উল-আখ্বার' পত্রিকায় সুস্পষ্টভাবে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল জনসাধারণের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করা, সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি এবং শাসক শ্রেণীকে জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা, জনসাধারণের মধ্যে আইন-কানুন, সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসার এবং সর্বোপরি শাসকবর্গের নিকট হইতে অভাব-অভিযোগের প্রতিকার আদায় করা। ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে আবার ইংরাজী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সরকারের নিকট দেশীয় ভাষায়ই হউক আর ইংরাজী ভাষায়ই হউক এগুলি ভারতীয় পত্রিকা এবং সাহেবদের পরিচালিত পত্রিকা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অর্থাৎ ভারতের ইংরাজদের পত্রিকা এইরূপ বিবেচিত হইত। ইংরাজদের পত্র-পত্রিকার মতামতকে শাসকশ্রেণী ভারতীয় মতামত বলিয়া বিবেচনা করিত। তাই আমরা ম্যাকলেকে মন্তব্য করিতে দেখি যে, ভারতীয়দের জনমত বলিতে পাঁচশত ইংরাজদের মতামতকেই বুঝায়। এই মুষ্টিমেয় ইংরাজগণ আচার-আচরণ, রুচিতে অগণিত ভারতবাসী যাহাদের মধ্যে তাহারা বসবাস করে তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং তাহাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উদ্দেশ্য হইল ভারতবাসীর প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করা। এই মুষ্টিমেয় ইংরাজদের মতই তখন সরকারের নিকট ভারতীয়দের জনমত হিসাবে বিবেচিত হইত।* জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছিলেন যে, ভারতের ইংরাজী সংবাদপত্র কেবলমাত্র ভারতে বসবাসকারী ইংরাজদের মুখপত্র। ভারতীয়দের মতামত ও স্বার্থের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

দেশীয় পত্রিকার উদ্দেশ্য ও আদর্শ

ভারতবাসীর জনমত বলিতে মুষ্টিমেয় ইংরাজদের জনমত বুঝাইত

এমতাবস্থায় উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে দেশীয় পত্রিকার প্রভাব ভারতীয়দের মধ্যে গভীর হইতে পারে নাই। ইহার অন্যতম কারণ ছিল দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির গ্রাহক সংখ্যার স্বল্পতা। অবশ্য লং সাহেবের বক্তব্য হইতে জানা যায় যে, বাংলা-

* Vide, *British Paramountcy and Indian Renaissance*, vol. ix. part ii. p. 227.

দেশের পত্রিকা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এমন কি, সুদূর পাঞ্জাবেও প্রেরিত হইত। দেশীয় পত্রিকার প্রভাব যাহাই হউক-না-কেন ইংরাজ শাসকদের নিকট সেগুলি দারুণ ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে যখন দেশীয় পত্রিকার সংখ্যা নগণ্য ছিল সেই সময়ে (১৮১১) বিলাতের বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট্ ডান্ডাস লিখিয়াছিলেন যে, ভারতীয় পত্রিকাগুলিকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়িতে দিলে ইংরাজ সরকারের ভিত্তিই নড়িয়া যাইবে। মুনরো, এল্‌ফিন্‌স্টোন-এর ন্যায় ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ইংরাজ কর্মচারিগণও ভারতীয় পত্রিকার অবাধ স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না। অপর দিকে লীস্টার স্টেন্‌হোপ, ফ্রান্সিস্ হোমস্ ভারতের পত্রিকাগুলির স্বাধীনতার সপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া ইংলণ্ডে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় পত্রিকার অবাধ স্বাধীনতার বিরোধী ইংরাজ মত: কাহারও কাহারও সমর্থন

ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না দিবার ব্রিটিশ পক্ষের প্রধান কারণই ছিল ভীতি। দেশীয় পত্রিকাগুলি অবাধভাবে মতামত প্রকাশ করিলে ভারতীয়রা ইংরাজ শাসকদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিবে এবং ক্রমে এই বিরূপ মনোভাব ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যেও সংক্রামিত হইবে এই ছিল তাহাদের ধারণা। চার্লস্ মেট্‌কাফ্ অবশ্য বিপরীত যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর জ্ঞানের প্রসার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস-সাধন না করিয়া বরং দৃঢ়তর করিবে। ব্রিটিশ সরকার টিকিবে কিনা তাহা ভবিতব্যের উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজ সরকারের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করা উচিত হইবে না। তিনি বলিয়াছিলেন, ব্রিটিশ শাসন যদি ভারতবাসীর নিকট অভিশাপস্বরূপ হয় তাহা হইলে সেই শাসনের অবসান ঘটাই বাঞ্ছনীয়। ভারতবাসীর জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন বাধা না দেওয়াই একমাত্র পথ। কিন্তু চার্লস্ মেট্‌কাফের ন্যায় উদারচেতা যুক্তিবাদী ইংরাজ তখন আর কয়জন ছিলেন?

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় ভারতীয় সংবাদপত্র সরকারের কোপানলে পতিত হইবার ভয়ে কতকটা সংযত থাকিলেও হাতে-লেখা পত্রিকার মাধ্যমে বিদ্রোহের উৎসাহ দেওয়া, বিদ্রোহ দমনে সরকারের নৃশংসতার কাল্পনিক বিবরণ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। এই কারণে লর্ড ক্যানিং আইন পাস করিয়া (১৮৫৭) প্রত্যেক ছাপাখানাকে লাইসেন্স লইতে বাধ্য করিলেন। এক বৎসরের জন্য সকল রকমের ছাপা পুস্তক ছাপান নিষিদ্ধ করা হইল। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী অবশ্য সাংবাদিকতার মূলনীতি অনুসরণ করিয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সংবাদ সম্পূর্ণ সত্যের ভিত্তিতে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইংরাজগণ কর্তৃক বিদ্রোহের অপরাধে ভারতবাসীদের উপর অত্যাচার করিতে চেষ্টা করিলে তিনি ইংরাজগণের এই অযৌক্তিক ও অন্যায়মূলক কাজের প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য সাংবাদিকতা লর্ড ক্যানিং-এর নীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং ইংরাজদের প্রতিহিংসাপরায়ণ নীতি হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করিয়াছিল।

সংবাদপত্র কর্তৃক বিদ্রোহের উস্কানি

হরিশচন্দ্র মুখার্জীর সৎ-সাংবাদিকতা

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালে ভারতের সাংবাদিকতা (The Press after 1858): ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ভারতবাসীর সম্পাদনায় দেশীয় ও ইংরাজী

ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। তিন বৎসর পর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট' (Indian Councils Act) পাস হইলে ভারতীয় জনমত অনেকটা সচেতন হইয়া উঠে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনাবলী এবং রাজনীতি এই দুইয়ের প্রতিই ভারতবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সেই সময় হইতেই ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবোধ প্রসারে সচেষ্ট হয়। ভারতবাসী জাতীয়তাবোধেও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। এ-দিকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র মুখার্জীর মৃত্যু ঘটিলে সাময়িকভাবে 'হিন্দু পেট্রিয়টের' প্রভাব কতকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কৃষ্ণদাস পাল হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদনার ভার লইলে হিন্দু পেট্রিয়ট পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। কিন্তু ইংরাজ শাসনের গুণগ্রাহী কৃষ্ণদাস পাল ইংরাজ জাতির স্বাভাবিক উদারতা এবং যুক্তিবাদিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই কারণে ইংরাজ শাসনের সমালোচনা এই পত্রিকায় তেমন করা হইত না। তাঁহার আমলে হিন্দু পেট্রিয়ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়। কিন্তু ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গলী' পত্রিকা বাহির হইলে ক্রমে উহাতে কৃষক ও রায়তদের অভাব-অভিযোগ ও মতামত প্রকাশ করিয়া তিনি এই পত্রিকাকে সাধারণ মানুষের মুখপত্র করিয়া তোলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক হইলে উহা সরকারী কার্যকলাপের নির্ভীক সমালোচক এবং ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগের প্রতিকার দাবির অন্যতম প্রবক্তা হইয়া উঠে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের অর্থে এবং মনমোহন ঘোষের সম্পাদনায় 'ইন্ডিয়ান মিরর' (Indian Mirror) নামে পত্রিকা বাহির হয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিন ভ্রাতা—শিশিরকুমার, হেমন্তকুমার ও বসন্তকুমার ঘোষের চেষ্টায় 'অমৃতবাজার' পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। প্রথমে ইহা যশোহরে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে উহা কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের আইন দ্বারা (Vernacular Press Act) দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করিলে এক রাত্রিতে অমৃতবাজার পত্রিকা বাংলা হইতে ইংরাজী পত্রিকায় অনূদিত হয়। এই সকল পত্রিকার প্রগতিশীল সাংবাদিকতা ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের প্রসার সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

সংবাদপত্র ও রাজনীতির প্রতি আগ্রহ

কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদনায় হিন্দু পেট্রিয়ট

লিটনের দেশীয় ভাষায় পত্রিকা আইন

বস্তুত, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়াংশে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা মাত্রেই জনসাধারণের স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার মনোভাব জাগাইয়া তোলে এবং স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিলেই ভারতবাসীর দুর্দশার অবসান ঘটিবে এই মনোবৃত্তির সৃষ্টি করে। সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, সংবাদসার, শিক্ষাদর্পণ প্রভৃতি পত্রিকার নাম এ-বিষয়ে উল্লেখ্য।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের প্রসার

বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব এবং অন্যান্য অঞ্চলে ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্রের প্রকাশ ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষের রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ

বৈশিষ্ট্য। মাদ্রাজে 'নেটিভ্ পাব্লিক ওপিনিয়ন' (Native Public Opinion), 'ক্রিসেণ্ট' (Crescent), 'মাদ্রাজ স্ট্যানডার্ড', 'মাদ্রাজী', 'ইণ্ডিয়ান সোশিয়্যাল রিফর্মার' প্রভৃতি, বোম্বাইয়ে দাদাভাই নৌরোজীর 'ভয়েস অব্ ইণ্ডিয়া', তিলকের 'মারাঠা ও ইন্দুপ্রকাশ', 'সুধাকর', 'জ্ঞানপ্রকাশ' ও অন্যান্য পত্রিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাঞ্জাবের 'লাহোর ট্রিবিউন', ইউনাইটেড প্রভিন্সেসের (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) 'পাইওনীয়ার', 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন', 'ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড' প্রভৃতি পত্রিকার প্রকাশ দেশী পত্রিকার ক্রমবিকাশের পরিচায়ক।

দেশীয় সাংবাদিকতার ক্রমবিকাশ

ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত দেশীয় ভাষা ও ইংরাজীতে যে-সকল পত্রিকা ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত হইত সেগুলির রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী চরিত্র ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়তার যে-মূল আদর্শ ভারতীয় পত্রিকাগুলির ছিল সে-আদর্শ অটুট রাখিয়া ভারতবাসীর মধ্যে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি সেই সময়কার পত্রিকাগুলির উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। এ-বিষয়ে দ্বারকানাথ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'শিক্ষাদর্পণ, ও 'সংবাদসার', অক্ষয় সরকারের 'সাধারণী', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'আর্য-দর্শন' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসনের কঠোর এবং নির্ভীক সমালোচনা 'সোমপ্রকাশ', 'সহচর', 'সাধারণী', ঢাকার 'হিন্দু হিতৈষিণী', ময়মনসিংহের 'ভারত মিহির' ছিল অগ্রণী। অমৃতবাজার পত্রিকা ব্রিটিশ শাসনের অকর্মণ্যতা, ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা প্রকাশ করিয়া এবং ভারতবাসীর জন্য পার্লামেণ্টারী শাসন চালু করিবার দাবি উত্থাপন করিয়া জাতীয়তাবোধ প্রসারে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রিটিশ শাসন বিরোধিতার জন্য সম্পাদক ও অপরাপর কর্মচারীকে শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার নির্ভীক ও কঠোর সমালোচনার নীতি অবশ্য দমন করা সম্ভব হয় নাই। 'বাঙালী জাতি ইংরাজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতি পদেই রুখিয়া দাঁড়াইবে' এই দৃপ্ত ঘোষণা অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক করিতে দ্বিধা করেন নাই। অমৃতবাজার ভিন্ন 'বেঙ্গলী' নামক পত্রিকাও ভারতীয়দের ইংরাজ-বিরোধিতা এবং জাতীয়তাবোধের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বাংলার তথা ভারতের জাতীয় জাগরণে অমৃতবাজার পত্রিকা ও 'বেঙ্গলী'র অবদান অবিস্মরণীয়।

ভারতীয় পত্রিকার জাতীয়তাবাদী চরিত্র

অমৃতবাজার পত্রিকা

'বেঙ্গলী'

ভারতীয়দের পরিচালিত দেশীয় ভাষায় অসংখ্য পত্রিকা বাংলা ভাষা ভিন্ন মারাঠী, গুজরাতী, হিন্দুস্তানী, ফার্সী, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় ঊনবিংশ শতকের অষ্টম দশকে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একমাত্র বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যাই ছিল ৩৮।

ভারতীয়দের পরিচালনাধীন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি

ইংরাজগণ পরিচালিত পত্রিকাগুলি ভারতীয় জনমতের মুখপত্র বলিয়া দাবি করিত।

ইংরাজ সরকারও তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল পত্রিকায় ভারতবাসী ও ভারতবর্ষ-বিরোধী মনোভাব প্রথম হইতেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজদের সম্পাদিত পত্রিকাগুলির প্রকৃত চরিত্র জন স্টুয়ার্ট মিল, ম্যাকলে প্রভৃতি চিন্তাশীল ইংরাজগণের উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় নাই, এ-কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইংরাজদের সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্রিকাগুলির মধ্যে বোম্বে স্ট্যানডার্ড, বোম্বে টাইমস্, কোরিয়ার (পরবর্তী কালে টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া), স্টেটস্‌ম্যান, মাদ্রাজ মেইল, পাইওনীয়ার, লাহোর সিভিল এ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট, ইংলিশম্যান (পূর্বেকার জন বুল) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

ইংরাজগণ সম্পাদিত ও পরিচালিত সংবাদপত্র

ভারতীয় বিশেষভাবে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভারতের শাসকদের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভারতের ইংরাজ শাসনের ভিত্তিই কাঁপাইয়া দিবে এই ধারণা তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর হইতে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির ইংরাজ শাসনের দোষত্রুটির কঠোর সমালোচনা, ভারতীয়দের মধ্যে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি কোন কিছুই ব্রিটিশ শাসকদের মনঃপূত ছিল না। অমৃতবাজার পত্রিকা ও বেঙ্গলী তখন ইংরাজদের শাসনের সমালোচনা ও পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার দাবিতে সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। এমতাবস্থায় গবর্ণর-জেনারেল লর্ড লিটন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন' (Vernacular Press Act) পাস করিয়া সেগুলির সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনার অধিকার নাকচ করিলেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটনের 'দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন' (Vernacular Press Act) প্রবর্তন

লিটন কর্তৃক দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন পাসের পরও ভারতে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের প্রসার কোন অংশে হ্রাস পায় নাই। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবাসী, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সঞ্জীবনী, সুলভ সমাচার প্রভৃতি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। গুজরাতী, তামিল, তেলুগু, ফার্সী, হিন্দুস্তানী প্রভৃতি নানা ভাষায় পত্রিকার প্রকাশ ভারতবাসীর মধ্যে সংবাদ-পত্রের প্রতি আকর্ষণের দৃষ্টান্তস্বরূপ। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে ইংরাজী পত্রিকাগুলি সমর্থনসূচক মনোভাব গ্রহণ করিলেও যে-মুহূর্তে কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা ও ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার দাবি করিতে শুরু করিল সেই সময় হইতে ইংরাজদের সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্রিকা কংগ্রেসের বিরোধিতা শুরু করে। ভারতীয় পত্রিকায় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ সমর্থন এবং উহা রূপায়ণে ভারতবাসীকে আহ্বান ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী এবং ইংরাজ পরিচালিত পত্রিকাগুলির বিদ্বেষ ও বিরোধিতার সৃষ্টি করে। ইলবার্ট বিলের বিরোধিতার সূত্রে ইংরাজদের পত্রিকাগুলিতে ভারতীয় ও ইংরাজদের জাতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে এবং শাসিত ও শাসকের সম্পর্কের বিচারে ইংরাজগণ শ্রেষ্ঠতর এই ধারণা ভারতবাসীকে তাহারা দিতে দ্বিধাবোধ করিল না। জাত্যাভিমানী ইংরাজদের এই আচরণ ভারতবাসীর মনে ইংরাজ বিদ্বেষ এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে জাতীয়তাবোধ

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লিটনের দেশীয় পত্রিকা সংক্রান্ত আইন পাসের পরও দেশীয় পত্রিকার সংখ্যাবৃদ্ধি

ইংরাজ শাসক ও ইংরাজদের পত্রিকা বিরোধিতা

বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা যখন দেশীয় পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইত তখন ইংরাজদের পত্রিকায় নির্লজ্জভাবে সেই বর্বরতার সমর্থন করা হইত। কিন্তু তাহার ফল ব্রিটিশ সরকার বা ইংরাজদের পত্রিকার পক্ষে ভাল হয় নাই। ক্রমেই জাতীয়তাবোধের প্রসার ঘটিতে থাকিলে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি ব্রিটিশ শাসন এবং ইংরাজ পরিচালিত পত্রিকাগুলির একদেশদর্শী, সংকীর্ণ, স্বার্থপর ব্যবহার জনসমক্ষে আরও নির্ভীক ও সুস্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিতে লাগিল। এইভাবে ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী তথা রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে বিকশিত করিয়া এবং ভারতের জনমত গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করিয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর উদাসীনতা, হীনমন্যতা দূর করিয়া এক শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী ভারত গঠনে সংবাদপত্রগুলির অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

দেশীয় পত্রিকাগুলির অবদান

১৮৫৮ হইতে ১৯০৫ (ক্যানিং হইতে কার্জন পর্যন্ত) খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন (Constitutional changes from 1858-1905 : From Canning to Curzon) : ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইন ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটাইয়া ইংলন্ডের রাণীর উপর অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের উপর ভারতের শাসনভার ন্যস্ত করিয়াছিল। এই আইন দ্বারা ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাণী, পার্লামেন্ট এবং একজন ভারত সচিবের হাতে রাখা হইয়াছিল। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের যে প্রয়োজনীয়তা ছিল সে-কথা ব্রিটিশ সরকার অনুভব করেন নাই। বোম্বাইয়ের গবর্ণর স্যার্ বার্টল ফেরার (Sir Bartle Ferer) স্পষ্টভাবেই বলিয়াছিলেন যে, ভারতের অভ্যন্তরে একটি পরিষদ স্থাপন করিয়া শাসন পরিচালনা না করিলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মত অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্মুখীন ব্রিটিশ সরকারকে হইতে হইবে। বস্তুত, লন্ডনে বসিয়া অগণিত ভারতবাসীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ও তাহাদের জন্য আইন প্রবর্তনের মত অযৌক্তিক কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। স্যার্ সৈয়দ আহম্মদও ভারতীয়দের ও ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন, এ-কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে ভারতীয়দের আইন-প্রণয়নের সহিত যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি আইন পরিষদ গঠনের কথা ভাবা হইলেও ভারতবাসীর প্রতি সন্দেহবশত শেষ পর্যন্ত উহা কার্যকরী করা হয় নাই। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনদে গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের উপর সমগ্র ভারতবর্ষের আইন-প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে কেন্দ্রীভূত এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরাজের উপর সমগ্র ভারতবর্ষের আইন রচনার দায়িত্ব দানের অযৌক্তিকতা দূর করিবার জন্যও ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে শাসন-সংক্রান্ত সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আইনে তাহা কিছু করা হয় নাই। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে গবর্ণর-জেনারেলকে রাণীর প্রতিনিধি হিসাবে ভাইসরয় (Viceroy) নামকরণ করা হইল। তিনি সেই সময় হইতে ভারতের

ইংলন্ডের রাণী অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের উপর ভারতের শাসনভার ন্যস্ত : কোম্পানির শাসনের অবসান

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আইন ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ শাসনে কোন পরিবর্তন ঘটায় নাই

গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয় হিসাবে পরিচিত হইলেন। গবর্ণর-জেনারেলের কার্যনির্বাহক সমিতির (Executive Council) অবশ্য কোন পরিবর্তন করা হইল না। একজন আইন সদস্যসহ উহার মোট সংখ্যা ছিল পূর্বের মতই মাত্র চার। সেনাধ্যক্ষ ছিলেন বিশেষ সদস্য। ইহা ভিন্ন, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যা ১২ করা হইলে উহা আইনসভার ন্যায় বিলের আলোচনা প্রকাশ্যভাবে শুরু করিল। পার্লামেন্টারী পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সদস্যরা সুদীর্ঘ বক্তৃতায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কোন কোন সময় তাঁহারা সরকারের ব্যয় বরাদ্দ বন্ধ করিয়া দিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। চার্লস্ উড্ যে-উদ্দেশ্য লইয়া ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট্ বা সনন্দ রচনা করিয়াছিলেন ভারতের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল বা আইন পরিষদ তাহা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নীল বিদ্রোহ প্রধানত শাসন-সংক্রান্ত অব্যবস্থারই ফলশ্রুতি তাহা সার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ ও সমসাময়িক শিক্ষিত ভারতবাসী যেমন বুঝিয়াছিলেন সার্ বার্টল্ ফেরার এবং চার্লস্ উড্ প্রভৃতি ইংরাজরাও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই কারণে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে একটি নূতন আইন পাস করিবার চেষ্টা চলিল।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে চার্টার আইন প্রবর্তনের যুক্তি

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ (Councils Act, 1861): ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ ভারতের আইন-প্রণয়ন ব্যবস্থার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। এই আইন অনুসারে ভাইস্‌রয় ও গবর্ণর-জেনারেলের কার্যনির্বাহক সভার (Executive Council) সদস্য সংখ্যা চার হইতে বাড়াইয়া পাঁচ করা হয়। ভারতের সেনাপতিকে বিশেষ সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

কার্যনির্বাহক সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি

গবর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কাউন্সিলের অনুমতি লইয়া গবর্ণর-জেনারেল প্রশাসনিক সর্বপ্রকার কাজ করিতে পারিতেন। কাউন্সিলের কার্যপদ্ধতি-সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন তৈয়ারের ভার তাঁহার উপরই ছিল। লর্ড ক্যানিং অবশ্য তাঁহার কার্যনির্বাহক পরিষদ অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের প্রত্যেককে এক বা একাধিক দপ্তরের (Portfolio) ভার দিয়া মন্ত্রিসভা অর্থাৎ ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সদস্যরা সমগ্র কাউন্সিলের মতামত গ্রহণ করিলেই চলিত। অপরাপর সাধারণ বিষয়ের দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আদেশ দান করিতে পারিতেন।

দপ্তর বণ্টন: ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল। আইন-প্রণয়নের জন্য অর্থাৎ ভাইস্‌রয়ের কাউন্সিল আরও অন্তত ছয় জন এবং অনধিক বার জন সদস্য লইয়া আইনসভা গঠিত হইবে। ইহাদের অন্তত অর্ধেক সংখ্যা সরকারী কর্মচারী নহেন এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। এই অধিক সংখ্যক সদস্যগণ ভাইস্‌রস কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন। আইনসভা হিসাবে কাউন্সিলের আইন-প্রণয়ন ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার

আইনসভার কর্তব্য সম্পাদনকালে আরও অন্তত ছয় জন অনধিক বার জন সদস্য গ্রহণ

কাজ করিবার অধিকার ছিল না। আইনসভা ভারতীয়, বিদেশী যাহারা ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে বসবাস করে এবং সরকারী সকল শ্রেণীর কর্মচারীর উপর প্রয়োগের জন্য এবং যে-সকল দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশের সহিত চুক্তিবদ্ধ তাহাদের প্রজাবর্গের জন্য আইন-প্রণয়ন করিতে পারিবে। প্রশাসনের বা অর্থ ব্যয় বরাদ্দের উপর আইনসভার কোন ক্ষমতা থাকিবে না। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইনের পর কাউন্সিল অর্থ, প্রশাসন সব কিছুর উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্র সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত কাউন্সিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুরূপ ক্ষমতা ভোগ করিতে শুরু করিয়াছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কাউন্সিলের আইন-প্রণয়ন ভিন্ন অন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

আইনসভার আইন-প্রণয়ন ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ নিষিদ্ধকরণ

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গবর্ণরের কাউন্সিলের আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা ফিরাইয়া দিয়াছিল। অবশ্য গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিল যে-সকল বাধা-নিষেধ আরোপ করিবেন সেগুলি মানিয়া তাহারা আইন প্রণয়ন করিবেন। সর্বভারতীয় কোন বিষয়ে যেমন মুদ্রাব্যবস্থা, কপিরাইট, পোস্ট্ ও টেলিগ্রাফ্ প্রভৃতি সম্পর্কে কোন আইন পাস করিবার পূর্বে বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে গবর্ণর-জেনারেলের অনুমতি লইতে হইত। গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিল আইনসভার কাজ করিবার জন্য অন্তত আরও চারিজন এবং অনধিক আটজন সদস্য গ্রহণ করিতে হইত। ইহাদের অন্তত অর্ধেক সংখ্যা বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে লইতে হইবে। এই সকল সদস্য গবর্ণর কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাউন্সিলের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আইন বাংলা, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ) জন্য প্রাদেশিক কাউন্সিল স্থাপনের ক্ষমতা দিয়াছিল। সেই অনুসারে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা প্রদেশ, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক গবর্ণরের কাউন্সিল স্থাপন করা হইয়াছিল।

অপরাপর প্রদেশে গবর্ণরের কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের এ্যাক্ট্ আইনসভার উপর আইন প্রণয়নের যে-ক্ষমতা দিয়াছিল তাহা নানাদিক দিয়া অত্যন্ত সীমিত ছিল। (১) সরকারী ঋণ গ্রহণ, রাজস্ব, ভারতীয়দের ধর্ম এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতি সামরিক ও রাজনৈতিক নীতি-সংক্রান্ত কোন আইন-প্রণয়নের পূর্বে গবর্ণর-জেনারেলের অনুমতি আইনসভাকে লইতে হইত।

সমালোচনা

সীমিত আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা

(২) আইনসভা বা লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইন অথবা ব্রিটিশ সরকারের কোন অধিকার বা ক্ষমতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এরূপ আইন পাস করিবার অধিকারী ছিল না।

ব্রিটিশ সরকার বা পার্লামেন্টের আইনের বিরোধী আইন-প্রণয়ন নিষিদ্ধ

গবর্ণর-জেনারেলের ভেটো ক্ষমতা : অর্ডিনান্স জারির ক্ষমতা

(৩) গবর্ণর-জেনারেল লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত আইন 'ভেটো' (veto) অর্থাৎ নিজ ক্ষমতাবলে নাকচ করিয়া দিতে পারিতেন। ইহা ভিন্ন, জরুরী পরিস্থিতিতে সামরিক আইন বা অর্ডিনান্স নিজেই জারি করিতে পারিতেন। এগুলি আইনের মতই বলবৎ হইত।

রাণীর আইন নাকচের ক্ষমতা

(৪) সর্বোপরি কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত আইন ব্রিটিশ রাণী নাকচ করিয়া দিতে পারিতেন।

(৫) ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইনের বলে গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিল আইন-প্রণয়নে যে-স্বাধীনতা ভোগ করিতেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আইনে এই ধরনের কোন ক্ষমতা যাহাতে আইনসভা প্রয়োগ করিতে না পারে সেই নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হইয়াছিল। আইনসভার অধিকার ও কর্তব্য সম্পাদনের দিক দিয়া ইহা পশ্চাৎপসরণ বলা যাইতে পারে। প্রশাসনের উপর অর্থাৎ কার্যনির্বাহক বিভাগ (Executive)-এর উপর অথবা অর্থ ব্যয় বরাদ্দের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আইনসভার না থাকায় আইনসভার মূল নীতির দিক দিয়া ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আইন ত্রুটিপূর্ণ বলা যাইতে পারে।

আইনসভার প্রশাসন বা অর্থের উপর ক্ষমতাহীনতা

বেসরকারী সদস্যদের প্রাধান্য : দেশীয় রাজগণের দরবার স্বরূপ

(৬) আইনসভার সদস্যদের অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী হওয়ায় বেসরকারী সংখ্যালঘু সদস্যদের কোন ক্ষমতা ছিল না বলিলেই চলে। বস্তুত কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলি দেশীয় রাজা বা জমিদারদের দরবার ভিন্ন অপর কোন কিছু ছিল না।

তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, উপরি-উক্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ ভারতে আইন-প্রণয়ন ও প্রাশাসনের যে-কাঠামো তৈয়ার করিয়াছিল উহা ব্রিটিশ শাসনের শেষ অবধি স্থায়ী ছিল। ইহা ভারতে পার্লামেণ্টারী শাসনের দুর্বল হইলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে স্মরণীয়। গবর্ণর-জেনারেলের কার্যনির্বাহক পরিষদ (Executive Council) যেমন ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত করিয়াছিল, আইনসভা (Legislative Council) তেমন পার্লামেন্টের সূচনা করিয়াছিল। মনোনীত সদস্য লইয়া আইনসভা গঠনের নীতিতে বেসরকারী সদস্য কাহারা হইবেন সেইরূপ কোন নির্দেশ না থাকায় ভারতীয়দের সদস্য হিসাবে গ্রহণের কোন বাধা ছিল না। বস্তুত লর্ড ক্যানিং বারাণসীর রাজা, পাতিয়ালার মহারাজা এবং স্যর্ দিনকর রাও—এই তিনজন ভারতীয়কে আইন-সভার সদস্য মনোনীত করিয়াছিলেন। ভারতীয়দের আইন-প্রণয়নের কাজে সম্পৃক্ত হইবার ইহাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আইনের গুরুত্ব

১৮৬১-১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালের আইনসমূহ (Legislative Measures between 1861 and 1891 :) শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে ১৮৬১ হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রবর্তিত আইন তেমন কোন পরিবর্তন আনে নাই। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-আইন

আইন (Government of India Act) দ্বারা ভারতে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন ভারতে ব্রিটিশ নাগরিকদের উপর সমভাবে প্রযোজ্য করা হয়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ দ্বারা গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলকে আইনসভাকে না জানাইয়া রেগুলেশন বা প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন পাস করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা, শান্তি অথবা ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থের বিঘ্ন ঘটিতে পারে এরূপ কোন আইন আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে পাস হইলেও গবর্ণর-জেনারেলকে উহা গ্রহণ না করিবার, কার্যকরী না করিবার, সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার এমন কি, প্রত্যাখ্যান করিবার বিশদ অধিকার দেওয়া হয়। পূর্বে এই ক্ষমতা এরূপ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা ছিল না বলিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের আইনে উহা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্

ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির অবসান (১৮৭৩ খ্রীঃ)

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন পাস করিয়া ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি আইনত এবং আনুষ্ঠানিকভাবে উঠাইয়া দেওয়া হয়।

গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন পাস করিয়া গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যা পাঁচের স্থলে ছয় করা হয়। ষষ্ঠ সদস্য পাব্লিক ওয়ার্ক্‌স বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের সাম্রাজ্ঞী (১৮৭৬ খ্রীঃ)

১৮৬১ হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন ছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ভারতের সাম্রাজ্ঞী' উপাধি দান করা। ঐ সময়ের মধ্যেই ভারতের জাতীয়তাবাদী ধারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তা-বোধের মনোভাব ভারতবাসীর মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় সেই জাতীয়তাবোধের সাংগঠনিক রূপ দেওয়া হয়। অল্পকালের মধ্যেই জাতীয় কংগ্রেস গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলে অধিকতর নির্বাচিত ভারতবাসীকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ, আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কার্যনির্বাহক বিভাগের (Executive) কার্য-কলাপের সমালোচনা, বাজেট পাস করা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলা ভিন্ন পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) প্রাদেশিক কাউন্সিল স্থাপনের দাবি উত্থাপন করে। এই সকল দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ প্রবর্তিত হয়।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা : শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবি

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ পাস

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ (Councils Act of 1892) : ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইলে প্রথম দিকে সরকার কংগ্রেসের প্রতি মিত্রতাপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কংগ্রেস ভারতবাসীর নানাবিধ অভাব-অভিযোগের প্রতিকার দাবি করিলে সরকার কংগ্রেসের প্রতি রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। লর্ড ডাফ্‌রিণ কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার পূর্বেকার মিত্রতা নীতি ত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে মুষ্টিমেয় ভারতীয়দের কংগ্রেসকে জাতীয় প্রতিনিধি সংস্থা হিসাবে গ্রহণের অযৌক্তিকতা এবং

প্রথম দিকে কংগ্রেসের প্রতি সরকারের মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার

কংগ্রেসের শাসনতান্ত্রিক দাবি—সরকার রুষ্ট

তাহাদের শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা দাবি করা বাতুলতা বলিয়া মন্তব্য করিলেন। কিন্তু লর্ড ডাফরিণ ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক। মুখে উড়াইয়া দিলেও কার্যত জাতীয় কংগ্রেসের দাবির ন্যায্যতা তিনি উপলব্ধি করিলেন। তিনি গোপনে ইংলণ্ডে ব্রিটিশ সরকারকে কাউন্সিলের গঠনতন্ত্রের প্রসার সাধনের যুক্তি দেখাইয়া লিখিলেন। নিজেও একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া উহার উপর প্রাদেশিক কাউন্সিলের সম্প্রসারণ, সেগুলির ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুতের দায়িত্ব দিলেন। এই কমিটির রিপোর্ট লর্ড ডাফরিণের মন্তব্যসহ ইংলণ্ডস্থ ব্রিটিশ সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইল। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সচিব (Secretary of State for India) লর্ড ক্রসের চেষ্টায় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে একটি আইনের প্রস্তাব পেশ করা হইল। এই প্রস্তাবই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ নামে গৃহীত হয়। এই আইন 'লর্ড ক্রসের আইন' (Lord Cross's Act) নামেও পরিচিত।

লর্ড ডাফ্রিণের মুখে বিরোধী বক্তব্য—গোপনে ভারতীয়দের শাসনতান্ত্রিক অধিকারের যৌক্তিকতা স্বীকার

ভারত সচিব লর্ড ক্রসের আইন—কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ (১৮৯২)

এই আইন দ্বারা ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে যে-সকল অতিরিক্ত সংখ্যা মনোনীত করা হইত সেই সংখ্যা ন্যূনতম দশ এবং অনধিক ষোল করা হইল। এই সকল সদস্যের মনোনয়ন ভারত সচিবের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। এই সকল সদস্য মনোনয়নের পদ্ধতি-সংক্রান্ত আইন-কানুন গবর্ণর-জেনারেলকে রচনা করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল। এই আইনে এ-কথাও বলা হইল যে, মোট সদস্য-সংখ্যার দুই-পঞ্চমাংশ ($\frac{2}{5}$) বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হইতে লইতে হইবে। এই বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন নির্বাচিত, অপর কয়েকজন মনোনীত হইবেন। বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক কাউন্সিলের অতিরিক্ত সদস্য-সংখ্যা অন্তত আট এবং অনধিক কুড়ি জন করা হইল। অপরাপর প্রদেশের ক্ষেত্রে পনর জনের অধিক হইবে না বলা হইল।

লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি

নির্বাচন নীতি সীমিতভাবে স্বীকৃত

প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি

(১) ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য গ্রহণের নীতি গ্রহণ না করিলেও আংশিকভাবে (৫ জন) নির্বাচন নীতি মানিয়া লইয়া আইনসভার গঠনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল। আইনসভার সদস্যদের অধিকার এবং ক্ষমতাও পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

নির্বাচনের নীতি আংশিকভাবে স্বীকৃত

(২) সদস্যগণ সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর আইনসভায় আলোচনা করিতে, নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিতে পারিবে বলা হইল। এখন হইতে আয়-ব্যয়ের হিসাব আইনসভায় পেশ করা বাধ্যতামূলক হইল। অবশ্য আর্থিক ক্ষেত্রে কোনপ্রকার ভোট দেওয়া বা প্রস্তাব গ্রহণ করা তাহাদের অধিকার-বহির্ভূত ছিল। কার্জনের মতে আইনসভাকে সরকারের আর্থিক নীতি বা আয়-ব্যয়ের হিসাব ভোটের দ্বারা সমর্থন বা বর্জন করিবার বা সে-বিষয়ে কোনপ্রকার প্রস্তাব পাস করিবার ক্ষমতা না দেওয়া হইলেও সরকারের

সদস্যদের আয়-ব্যয়ের হিসাব সমালোচনার অধিকার

অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে খোলাখুলি সমালোচনা করিবার, নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার এই আইনে স্বীকৃত হইয়াছিল।

(৩) ইহা ভিন্ন, ছয় দিনের আগাম নোটিশ দিয়া সদস্যগণ প্রশাসনিক কার্যকলাপ সম্পর্কে জনস্বার্থ এবং সরকারের স্বার্থে সরকারকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে পারিবেন। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদিগকেও প্রশ্ন করিবার, সরকারী নীতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার অধিকার দেওয়া হইল। অবশ্য এগুলি জনস্বার্থে করিতে হইবে।

প্রশ্ন করিবার অধিকার

(৪) নির্বাচনের নীতিও খুবই সীমিতভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছিল। যে-পাঁচজন সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে আসিবেন তাঁহাদের মধ্যে একজন করিয়া বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আইনসভার বেসরকারী সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। বাকী একজন নির্বাচিত হইবেন 'এ্যাসোসিয়েটেড্ চেম্বার অব্ কমার্স' দ্বারা। প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষেত্রে নির্বাচিত সদস্যরা মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় ও চেম্বার্স অব্ কমার্স দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

জটিল নির্বাচন-পদ্ধতি

এই আইনে যে-জটিল পদ্ধতিতে বেসরকারী সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিয়াছিলেন। ফিরোজশাহ মেহতা, দাদাভাই নৌরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি জাতীয় নেতৃবৃন্দের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, এই আইন সীমিত, জটিল পদ্ধতিতে হইলেও (১) নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করিয়া, (২) সদস্যগণকে প্রশাসন বিভাগকে প্রশ্নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার দিয়া ভারতের শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল।

জাতীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সমালোচিত

গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ বা মোর্লে-মিণ্টো সংস্কার (Councils Act of 1909 or Morley-Minto Reforms): শাসনকার্যের কঠোরতা সত্ত্বেও লর্ড কার্জনের কার্যকাল ভারতের জাতীয়তাবাদের ধারাকে প্রতিহত করিতে পারে নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন, শাসনসংস্কার প্রবর্তন, ইংলণ্ডে অবস্থিত ভারত সচিব (Secretary of State for India)-এর কাউন্সিলের বিলোপ সাধন প্রভৃতি নানাবিধ দাবি সোচ্চার হইয়া উঠে। ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হইয়া ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সচিবের কাউন্সিলে দুইজন ভারতীয়কে গ্রহণ করেন।

সংস্কার দাবি

ভারত সচিবের কাউন্সিলে ভারতীয় সদস্য গ্রহণ

এ-দিকে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন ভাইসরয় ও গবর্ণর-জেনারেল লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে আগা খাঁ শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায় আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না, ইহাই ছিল পৃথক নির্বাচনের দাবির পশ্চাতে আগা খাঁর যুক্তি। লর্ড মিণ্টো ভারতে ইংরাজ শাসন টিকাইয়া রাখিবার সাম্রাজ্যবাদী

আগা খাঁর মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি (১৯০৬)

নীতির পক্ষে আগা খাঁর মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবির সুযোগ গ্রহণে ত্রুটি করিলেন না। তিনি এই দাবি বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হইল। ঐ বৎসরই ঢাকার নবাব সলিম-উল্লাহ্ মুসলিম লীগ নামে মুসলমানদের একটি স্থায়ী সংগঠন স্থাপন করিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগ একটি সাম্প্রদায়িক দলে পরিণত হইল। মুসলমানদের এই পৃথক সংগঠন স্থাপন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুযোগ বৃদ্ধি করিল। বিভেদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের নিরাপত্তা ভারতবাসীই ব্রিটিশ সরকারকে আনিয়া দিল। এইভাবে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপিত হইলে ব্রিটিশ অনুগ্রহে উহা সিঞ্চিত হইতে থাকিল।

ঢাকার নবাব সলিম-উল্লাহ্ কর্তৃক মুসলিম লীগ স্থাপন (১৯০৬)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুযোগ

সেই সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা, জাতীয়তাবোধের প্রসার, সন্ত্রাসের উদ্ভব সব কিছু মিলিয়া ব্রিটিশ সরকারকে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার গ্রহণে বাধ্য করিল। সেই সময়ে লিবারেল দলের নেতা গ্লাডস্টোন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হইলে উদারনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী লর্ড মোর্লে ভারত সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মোর্লে এবং ভাইস্রয় লর্ড মিণ্টোর মধ্যে মতের আদান-প্রদানের পর উভয়েই ভারতীয়দের জন্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রয়োজন সম্পর্কে একমত হইলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে (ফেব্রুয়ারি) পার্লামেণ্ট যে কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ পাস করিলেন তাহাই মোর্লে-মিণ্টো সংস্কার নামে পরিচিত।

ভারত সচিব লর্ড মোর্লের উদারতা

মোর্লে-মিণ্টো মত বিনিময়

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন

এই সংস্কার আইনে কেন্দ্রীয় আইনসভার অতিরিক্ত (Additional) সদস্য-সংখ্যা অনধিক ৬০ করা হইল। গবর্ণর-জেনারেলের কার্যনির্বাহক সদস্যসহ আইনসভার মোট সদস্য-সংখ্যা দাঁড়াইল ৬৯। ইঁহাদের মধ্যে ৩৭ জন সরকারী কর্মচারী এবং ৩২ জন বেসরকারী ব্যক্তি হইবেন। সরকারী সদস্যদের একজন হইলেন গবর্ণর-জেনারেল স্বয়ং, ৭ জন কার্যনির্বাহক কাউন্সিলের সাধারণ সদস্য, একজন বিশেষ সদস্য এই ৯ জন ভিন্ন অন্য ২৮ জন সরকারী সদস্য, গবর্ণর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হইবেন। বেসরকারী সদস্যদের ৩২ জনের মধ্যে পাঁচজন গবর্ণর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হইবেন, বাকী ২৭ জন নির্বাচিত হইবেন। এই ২৭ জন আবার আঞ্চলিক লোকসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত না হইয়া তাঁহাদের মধ্যে আটজন আসিবেন বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ইউনাইটেড্ প্রভিন্সেস্-এর প্রত্যেকটি আইনসভার বেসরকারী সদস্যগণ কর্তৃক ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইয়া। মধ্যপ্রদেশ, আসাম, বিহার-উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশ* হইতে একজন করিয়া একই নির্বাচন পদ্ধতিতে পাঁচজন নির্বাচিত হইয়া

কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি—সদস্য-সংখ্যা ৬৯

মোট ৩২ জন বেসরকারী সদস্য ঃ ৩৭ জন সরকারী কর্মচারী

বেসরকারী সদস্যদের ৫ জন গবর্ণর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত ২৭ জন নির্বাচিত

* ব্রহ্মদেশ তখন ব্রিটিশ ভারতের অংশ ছিল।

আসিবেন। অবশিষ্ট ১৪ জনের ৬ জন বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলা, ইউনাইটেড্ প্রভিন্সেস্, মধ্যপ্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা প্রত্যেকটির জমিদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া আসিবেন। মুসলমানগণকে পৃথক নির্বাচন অধিকার দিবার যে আশ্বাস লর্ড মিণ্টো ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে দিয়াছিলেন উহা কার্যকরী করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে ৬ জন সদস্য নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হইল। এই ছয়জনের ২ জন বাংলাদেশ হইতে অপর চারিজন মাদ্রাজ, বোম্বাই, ইউনাইটেড্ প্রভিন্সেস্ এবং বিহার ও উড়িষ্যা হইতে একজন করিয়া নির্বাচিত হইবেন। ১৪ জনের অবশিষ্ট ২ জন বোম্বাই ও বাংলাদেশের চেম্বার অব্ কমার্স কর্তৃক একজন করিয়া নির্বাচিত হইয়া আসিবেন।

নির্বাচনের নীতি

মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন স্বীকৃত

প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সদস্য-সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইল। মাদ্রাজ, বোম্বাই, ইউনাইটেড্ প্রভিন্সেস্ প্রত্যেকটি ৪৭ করিয়া, বাংলাদেশ ৫২, ইস্টার্ণ বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম ৪১, ব্রহ্মদেশ ১৬ এবং পাঞ্জাব ২৫। বেসরকারী সদস্য-সংখ্যা সরকারী সদস্য-সংখ্যা হইতে প্রাদেশিক আইনসভায় অধিক করা হইল। বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যা বাড়াইয়া ৪ করা হইল এবং লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর শাসিত প্রদেশেও কাউন্সিল স্থাপনের অধিকার ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারকে দেওয়া হইল।

প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের আইনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। সদস্যগণ সরকারের যে-দপ্তরের যিনি ভারপ্রাপ্ত তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে অর্থাৎ জবাবদিহি করিতে পারিতেন। বাজেট আলোচনাকালে ভোট গ্রহণ বা বর্জন করিবার অধিকার অবশ্য সদস্যদিগকে দেওয়া হইল না, তবে প্রস্তাব পাস করিয়া কোন পরিবর্তন বা পরিবর্জনের জন্য অভিমত দিবার অধিকার দেওয়া হইল। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করিবার পূর্বে একটি কমিটি তাহা বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবে। এই কমিটি গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের অর্থ-বিষয়ক সদস্যের সভাপতিত্বে অর্ধেক সরকারী এবং অর্ধেক বেসরকারী সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত বিষয়াদি সম্পর্কে আইনসভা প্রস্তাব পাস করিতে পারিবে কিন্তু আইনসভার প্রেসিডেণ্ট সেই প্রস্তাব সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে নাকচ করিতে পারিবেন। অবশ্য প্রস্তাব গৃহীত হইলেই সরকার সেই অনুযায়ী কাজ করিবেন এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। বাজেট পাসের সময় ভোট দেওয়া বা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করা—এই দুইটি গণতান্ত্রিক অধিকার এই আইনে আইনসভাকে দেওয়া হইল না। ইহা ভিন্ন, পররাষ্ট্র-নীতি, দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত সরকারের সম্পর্ক, রেলপথের ব্যয়, সরকারী ঋণের সুদ, বিচারাধীন বিষয় প্রভৃতি সম্পর্কে কোন আলোচনা করা নিষিদ্ধ ছিল।

আইনসভার ক্ষমতা

ইহা সত্য যে, আইনসভায় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, অথবা প্রস্তাবাকারে কোনপ্রকার সুপারিশ প্রশাসনের নিকট করিয়া, বাজেট এবং অন্যান্য জনস্বার্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা-সমালোচনা করিয়া এই আইনসভাকে শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের জন্য

সমালোচনা

পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি মানিয়া লইয়া ইহা ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করিয়াছিল। শিখরা ব্রিটিশ সরকারের জন্য যথেষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের ক্ষেত্রে সরকার কোন সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই কারণে শিখরা তাহাদের অধিকার দাবি করিতে লাগিল এবং পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আইনে তাহাদের পৃথক নির্বাচনের দাবি স্বীকৃত হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ ছিল মোর্লে-মিণ্টো সংস্কারের সর্বাধিক সর্বনাশাত্মক ত্রুটি। মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন-ই ভারতের সর্বনাশের কারণ ছিল। ভারতের উদীয়মান গণতন্ত্রের বুকে এই আইন ছুরিকাঘাত করিয়াছিল—এ-কথা কে. এম. মুন্সী বলিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এই ধরনের প্রভেদ ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিরোধী ছিল। লর্ড মোর্লে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের বিরোধী ছিলেন। তিনি মিণ্টোকে লিখিয়াছিলেন, "We are sowing dragon's teeth and the harvest will be better."

সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ

ভারতবাসী ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। ভারতীয়রা চাহিয়াছিল দায়িত্বমূলক সরকার স্থাপন করিতে। অর্থাৎ সরকার ভারতবাসীর নিকট তাহাদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী থাকিবেন। কিন্তু ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন উদারনৈতিক স্বৈরাচারী শাসন স্থাপন করিয়াছিল। পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতি ভারতে স্থাপন করিবার ইচ্ছা যে ব্রিটিশ সরকারের ছিল না, তাহা এই সংস্কার আইনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। উপরন্তু এই সংস্কার ব্রিটিশ সরকার ও ভারতবাসীর এবং ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বৈরীভাব বৃদ্ধির পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

দায়িত্বশীল সরকার গঠনে অনীহা

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন (Government of India Act of 1919): মোর্লে-মিণ্টো সংস্কার ভারতবর্ষে প্রকৃত পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা স্থাপনের দিকে অগ্রসর হয় নাই। বস্তুত ব্রিটিশ কর্মচারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন স্থায়ী করিবার চেষ্টাই এই সংস্কারে পরিলক্ষিত হয়। ভারত সচিব লর্ড মোর্লে পার্লামেণ্টে সুস্পষ্টভাবেই এ-কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হইল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী, স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী এবং সরকারের সহিত সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি—এই তিন ধরনের ভারতীয়দের কথা স্মরণ রাখিয়া শাসনব্যবস্থার কতক পরিবর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু এই তিন দলের কোনটিকেই ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ সন্ত্রাসবাদীদের দমনের জন্য ব্রিটিশ আমলা শ্রেণীর হাতেই প্রশাসনের চাবিকাঠি দেওয়া হইয়াছিল। আইনসভায় তাহাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখা হইয়াছিল। কংগ্রেসের স্বায়ত্তশাসন দাবি আইনসভার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এবং সদস্যদিগকে কতক অধিকার দিয়া বাহ্যত গণতন্ত্রের একটি আবরণ দেওয়া হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে উহা 'উদারনৈতিক স্বৈরাচার' ভিন্ন কিছুই ছিল না। মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথক নির্বাচন অধিকার দিয়া ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করা হইয়াছিল,

মোর্লে-মিণ্টো সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য : ভারতবাসী মাত্রেই অসন্তুষ্ট

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনের পূর্বাবধি ঘটনা প্রবাহ

কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই মুসলিম লীগ ভারতের স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের দাবি উত্থাপন করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ব্রিটিশ সরকারের তুরস্ক ও ইতালির মধ্যে যুদ্ধে তুরস্কের বিপক্ষে যাওয়া, বলকান যুদ্ধে খ্রীষ্টানদের পক্ষ অবলম্বন করা প্রভৃতি, আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ব্যাপারে সরকারের সহিত মুসলিম লীগের মতানৈক্য এবং সর্বশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের তুরস্কের বিপক্ষে যোগদান মুসলিম লীগ এবং ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে কতক পরিমাণে ব্রিটিশ-বিরোধী করিয়া তুলিল। ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই যুগ্মভাবে ভারতে স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা স্থাপনের দাবি উত্থাপন করিল।

এ-দিকে সন্ত্রাসবাদীরাও চুপ করিয়া রহিলেন না। পাঞ্জাবে গদর পার্টির কার্যকলাপ, বাংলাদেশে কামাগাতামারু ঘটনা সব কিছু মিলিয়া ব্রিটিশ সরকারের ভীতির সঞ্চার করিল।

ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক ব্যবস্থা

সরকার দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীর অসন্তোষ চাপা দিতে চাহিলেন। এজন্য পত্রিকাগুলির উপরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করা হইল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের সংবাদপত্র আইন, সরকার-বিরোধী সভা নিষিদ্ধকরণ আইন (১৯১১), ফৌজদারি সংশোধন আইন (১৯১৩) এবং ভারতরক্ষা আইন (১৯১৫) সরকারের দমনমূলক ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষকেও জড়াইলেন। এই বিপদে ভারতবাসী মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যে দাঁড়াইল। যুদ্ধাবসানে ভারতবাসী সেইজন্য উপযুক্ত শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দ্বারা পুরস্কৃত হইবে আশা করিয়াছিল। এ-দিকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট বা লক্ষ্ণৌ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ: কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের স্বায়ত্তশাসন দাবি, ১৯১৬

চুক্তির মাধ্যমে একত্রিতভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ভারতে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রচলন করা ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য, এই ঘোষণা সরকার করুন এই দাবি জানাইল। ইহার পর বৎসর (১৯১৭) মেসোপটামিয়ায় তুরস্কের বিরুদ্ধে এক ভারতীয় বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হইলে ব্রিটিশ সরকার এই ব্যর্থতার কারণ নির্ণয়ের জন্য 'মেসোপটামিয়া কমিশন' নামে একটি কমিশন নিয়োগ করিলেন। মিঃ মন্টাগু ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি। এই কমিশনের রিপোর্টে মেসোপটামিয়ায় বিপর্যয়ের জন্য ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার ত্রুটির কথা তিনি দৃঢ় ভাষায় উল্লেখ করিলেন এবং সেই

মেসোপটামিয়ার ঘটনা: মিঃ মন্টাগুর মন্তব্য

ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন না ঘটাইলে ভারত-সাম্রাজ্যের উপর ব্রিটিশ প্রাধান্য বজায় রাখিবার অধিকার ব্রিটিশ সরকার হারাইবে। তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লায়েড্ জর্জ মিঃ মন্টাগুকে ভারত সচিব নিযুক্ত করিলেন (১৯১৭)। মন্টাগু নিজের বিচার-বুদ্ধি মত কাজ করিবার স্বাধীনতা ভোগ করিবেন এই শর্তে ভারত সচিবের পদ গ্রহণ করিলেন।

অল্পদিনের মধ্যে মিঃ মন্টাগু ব্রিটিশ কমন্স সভায় ঘোষণা করিলেন যে, "ব্রিটিশ

মিঃ মন্টাগুর ঘোষণা (২০শে আগস্ট, ১৯১৭)

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ভারতবাসী যাহাতে অধিকমাত্রায় ভারতের শাসনব্যবস্থার সকল বিভাগে সম্পৃক্ত হইয়া ক্রমে ভারতে

দায়িত্বমূলক স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারে তাই-ই হইল ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য ও নীতি"।*

মিঃ মণ্টাগু ঐ বৎসরই ভারতবর্ষে আসিলেন এবং তদানীন্তন ভাইস্রয় ও গবর্ণর-জেনারেল লর্ড চেম্স্ফোর্ডের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া মণ্টাগু-চেম্স্ফোর্ড রিপোর্ট প্রস্তুত করিলেন। লর্ড চেম্স্ফোর্ড আর্ল অব্ মণ্টফোর্ড ছিলেন, এই কারণে এই রিপোর্ট মণ্টফোর্ড রিপোর্ট নামেও উল্লিখিত হয়। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন প্রবর্তিত হয়।

মণ্টাগু-চেমস্ফোর্ড (মণ্টফোর্ড) রিপোর্ট

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনের প্রস্তাবনায় মিঃ মণ্টাগু ২০শে আগস্ট, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কমন্স সভায় যে-ঘোষণা করিয়াছিলেন সেই সংস্কার নীতিগুলির উল্লেখ করিলেন। যেমন, ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা হইবে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে থাকিবে, দায়িত্বশীল সরকার ক্রমপর্যায়ে চালু করা হইবে, ভারতবাসীকে অধিকতর মাত্রায় প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে যোগদানের সুযোগ দিয়া স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন সংস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশকে শাসন ব্যাপারে স্বাধীনতা দিতে হইবে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনের প্রস্তাবনা

এই আইনে ইংলণ্ডে ভারত সরকার পরিচালনার জন্য যে-ব্যবস্থা ছিল তাহার কতক পরিবর্তন করা হইল। পূর্বে ভারত সচিবের মাহিনা ভারত সরকারকে বহন করিতে হইত। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনে ভারত সচিবের মাহিনা ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব হইল। ইংলণ্ডে ভারত সরকারের পক্ষে একজন হাই কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইল। ইনি ভারতের গবর্ণর-জেনারেলের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিবেন এবং ভারত সরকার তাঁহার মাহিনা দিবেন। ভারত সচিবের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা কতকটা হ্রাস করা হইল। তাঁহার ক্ষমতা ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির উপর আর রহিল না, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অবশ্য তাঁহার ক্ষমতা পূর্ববৎই রহিল। ভারত সচিবের পদ উঠাইয়া দিবার যে-দাবি কংগ্রেস করিয়া আসিতেছিল উহার পরিপ্রেক্ষিতেই ভারত সচিবের ক্ষমতা কতকটা হ্রাস করা হইয়াছিল। ভারত সচিবের কাউন্সিলের সদস্য-সংখ্যা বাড়াইয়া অন্তত দশ এবং অনধিক বার করা হয়। এই সংখ্যার অন্তত অর্ধেক এমন লোক হইতে হইবে যাঁহারা দশ বৎসর ভারতে বাস করিয়াছেন বা চাকরি করিয়াছেন এবং অল্পকাল পূর্বে ইংলণ্ডে ফিরিয়াছেন। এই সকল সদস্যের কার্যকাল হইবে পাঁচ বৎসর। ভারতের রাজস্ব সম্পর্কে কোন প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে পাস করা বাধ্যতামূলক হইল। ইহা ভিন্ন, ভারতের সিভিল সার্ভিস-

ইংলণ্ডে সংস্কারের ফল

* "The policy of His Majesty's Government......is that of increasing association of Indians in every branch of the administration and gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible Government in India as an integral part of the British Empire"—Montagu in House of Commons, August 20, 1917, Vide, Thompson & Garrat : *Rise and Fulfilment of British Rule in India*, p. 603.

সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন পরিবর্তন এবং কোনপ্রকার চুক্তি সম্পাদনে অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন থাকা বাধ্যতামূলক করা হইল।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন দ্বারা শাসনব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া কতকগুলির দায়িত্ব ভারতীয়দের উপর দেওয়া হয়। অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ব্রিটিশ সদস্যদের হাতেই রাখা হয়।

শাসনব্যবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত

কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদ বা এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের মোট আটজন সদস্যের মধ্যে তিনজন ভারতীয় হইবেন। ইঁহারা আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমিক, শিল্প প্রভৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত থাকিবেন। বৈদেশিক সম্পর্কে দেশরক্ষা, সরকারী ঋণ, দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক, পোস্ট্‌ ও টেলিগ্রাফ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন প্রভৃতি সর্বভারতীয় বিষয়গুলি গবর্ণর-জেনারেল ও কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করা হইল।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের কর্তব্য বণ্টন

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া একটি কেন্দ্রীয় তালিকা এবং অপরটি প্রাদেশিক তালিকা তৈয়ার করা হইল। উপরি-উক্ত সর্বভারতীয় বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় তালিকায় রাখা হইল এবং প্রাদেশিক তালিকায় জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, রাজস্ব, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, সেচ, আইন ও শৃঙ্খলা, কৃষি প্রভৃতি বিষয় রাখা হইল। প্রাদেশিক তালিকায় উল্লিখিত নহে, এইরূপ যাবতীয় বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিবে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক তালিকা

প্রাদেশিক তালিকার বিষয়সমূহকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 'সংরক্ষিত' (Reserved) এবং 'হস্তান্তরিত' (Transferred) বিষয় করা হয়। ইহার ফলে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় এক দ্বৈত শাসন (Diarchy or Dual Government) চালু করা হয়। বিচার, পুলিস, সেচ, অর্থ, দুর্ভিক্ষ, রাজস্ব, সংবাদপত্র প্রভৃতি সংরক্ষিত বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয় এবং গবর্ণরের এক্‌জিকিউটিভ্‌ কাউন্সিলের সদস্যদের দায়িত্বাধীন রাখা হয়। আর শিক্ষা (অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইওরোপীয়দের শিক্ষা ব্যতীত), কৃষি, পূর্ত, আবগারি, সমবায়, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আইনসভায় নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত মন্ত্রীদের দায়িত্বাধীন থাকিবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কেবলমাত্র সেই সকল বিষয়ই ভারতীয়দের নির্বাচিত সদস্যদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল যেগুলির ব্যর্থতা ব্রিটিশ স্বার্থে কোন আঘাত হানিবে না। এই অদ্ভুত ব্যবস্থার জনক ছিলেন ব্রিটিশ রাজনীতিক লায়নেল কার্টিস।

প্রাদেশিক সরকারের সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়াদি (Reserved and Transferred subjects)

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রদেশের মোট সংখ্যা ব্রহ্মদেশসহ ছিল দশ। প্রদেশগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া লেজিস্‌লেটিভ্‌ অ্যাসেম্বলী নামে এক-কক্ষযুক্ত (unicameral i.e., one chambered) আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা করা হইল। সংরক্ষিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাদেশিক আইনসভার কোন ক্ষমতা ছিল না, কেবলমাত্র হস্তান্তরিত বিষয়াদি সম্পর্কে বায়বরাদ্দের ক্ষমতা আইনসভার ছিল। সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়গুলি বণ্টনের ক্ষেত্রে কোন সুযৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাজ করা

প্রাদেশিক লেজিস্‌লেটিভ্‌ অ্যাসেম্বলী বা আইনসভার কার্যকলাপ ও দায়িত্ব

হয় নাই। যেমন, কৃষি ছিল হস্তান্তরিত বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত অথচ সেচ রাখা হইয়াছিল সংরক্ষিত বিষয়সমূহের মধ্যে। আবার শিল্প যেখানে হস্তান্তরিত বিষয় ছিল কারখানা, বয়লার, জলবিদ্যুৎ প্রভৃতি রাখা হইয়াছিল সংরক্ষিত বিষয় হিসাবে।

গবর্ণর-জেনারেল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী

গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কার্যকরী সভা তাহাদের কাজের জন্য ভারত সচিবের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী ছিলেন। ভারতীয় আইনসভার নিকট তাহাদের কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না।

কেন্দ্রীয় আইনসভা দুই-কক্ষ লইয়া গঠিত ছিল। ঊর্ধ্ব কক্ষের নাম ছিল কাউন্সিল অব্ স্টেট্। আর নিম্ন কক্ষের নাম ছিল কেন্দ্রীয় লেজিসলেটিভ্ এ্যাসেম্বলী।

কেন্দ্রীয় আইনসভার গঠন : দুই-কক্ষযুক্ত আইনসভা : ঊর্ধ্ব কক্ষ কাউন্সিল অব্ স্টেট্

কাউন্সিল অব্ স্টেট্-এর সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬০। ইহাদের মধ্যে ৩৩ জন নির্বাচিত এবং ২৭ জন গবর্ণর-জেনারেল কতৃক মনোনীত। ৩৩ জন নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ১৬ জন অ-মুসলমানগণ কর্তৃক, ১১ জন মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক, ৩ জন ইওরোপীয়ান, ২ জন সম্প্রদায়ভুক্ত নহে এরূপ লোক কর্তৃক এবং ৬ জন শিখদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। ২৭ জন মনোনীত সদস্যদের মধ্যে ১৭ জন সরকারী কর্মচারী হইতে এবং ১০ জন বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে লইতে হইবে। কাউন্সিল অব্ স্টেটের প্রেসিডেণ্ট ভাইসরয় কর্তৃক মনোনীত হইবেন। গবর্ণর-জেনারেল কাউন্সিল অব্ স্টেট্-এর অধিবেশন আহবান করিতে, সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে বা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন। কাউন্সিল অব্ স্টেটের সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে এবং সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইতে হইলে অন্তত বৎসরে দশ হাজার টাকার উপর আয় কর দিতে হইবে, অথবা বৎসরে ৭৫০ টাকা রাজস্ব হিসাবে দিতে হইবে। ফলে প্রাপ্তবয়স্ক ২৪ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র ১৭,৩৬৪ জন এই ভোটাধিকার পাইয়াছিলেন।

নিম্ন কক্ষ লেজিসলেটিভ্ এ্যাসেম্বলী ১৪৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। ইহাদের মধ্যে ১০৪ জন নির্বাচিত এবং ৪১ জন মনোনীত হইবেন। মনোনীত সদস্যের

নিম্ন কক্ষ লেজিসলেটিভ্ এ্যাসেম্বলী

মধ্যে ২৬ জন সরকারী কর্মচারী এবং ১ জন বেসরকারী ব্যক্তি হইতে লইতে হইবে। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ৫২ জন সাধারণ ভোটদাতাদের ভোটে নির্বাচিত হইবেন, ৩০ জন মুসলমানগণ কর্তৃক, ২ জন শিখদের দ্বারা, ৭ জন জমিদারগণ কর্তৃক, ৯ জন ইওরোপীয়দের দ্বারা এবং ৪ জন ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। আইনসভার কার্যকাল ছিল তিন বৎসর। তবে গবর্ণর-জেনারেল ইচ্ছা করিলে উহার মেয়াদ বাড়াইতে পারিবেন।

এ্যাসেম্বলীর সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে হইলে সেই ব্যক্তিকে বৎসরে ১৮০ টাকা ভাড়া, ১৫ টাকা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স অথবা অন্তত ২ হাজার টাকার আয়ের উপর আয়

ভোটদানের যোগ্যতা

কর দিতে হইবে। বৎসরে ৫০ টাকা রাজস্ব দিলেও ভোটাধিকার দেওয়া হইবে। ফলে প্রাপ্তবয়স্ক ২৪ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৯ লক্ষ ৯ হাজার ৮৭৪ জন লোক ভোট দিবার অধিকারী হইল।

বিভিন্ন প্রদেশকে সদস্য-সংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে দেওয়া হইল না। কোন

প্রদেশের কিরূপ গুরুত্ব তাহাই ছিল সদস্য-সংখ্যা বণ্টনের ভিত্তি। পাঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা প্রত্যেকটি প্রদেশকে ১২ জন করিয়া সদস্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল, যদিও পাঞ্জাবে বিহার-উড়িষ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ লোকের বসতি ছিল। পাঞ্জাবের লোক হইতে সামরিক বাহিনীতে সৈনিক গ্রহণ করা হইত এই কারণে পাঞ্জাবের সদস্য-সংখ্যা বেশি ছিল। বোম্বাই ও মাদ্রাজকে ১৬ জন করিয়া সদস্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল, যদিও বোম্বাইয়ের জনসংখ্যা ছিল মাদ্রাজের জনসংখ্যার অর্ধেক। বোম্বাইয়ের বাণিজ্যিক গুরুত্বই ছিল ইহার মূল যুক্তি।

সদস্য-সংখ্যা বণ্টন

আইনের পরিবর্তন বা আইন বাতিলের প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে গবর্ণর-জেনারেলের মত গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। অনুরূপ বৈদেশিক নীতি, ধর্ম, সরকারী ঋণ, সরকারের রাজস্ব প্রভৃতি বিষয়ে কোন আইন পরিবর্তন বা বাতিলের প্রস্তাব গবর্ণর-জেনারেলের অনুমতি ব্যতিরেকে উত্থাপন করা চলিত না। গবর্ণর-জেনারেলের ইচ্ছা অনুসারে কোন আইন যদি আইনসভা পাস না করে তাহা হইলে তিনি নিজেই উহা আইন হিসাবে বলবৎ করিতে পারিবেন। ছয় মাসের জন্য তিনি অর্ডিনান্স জারি করিতে পারিবেন। আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন গবর্ণর-জেনারেলের অনুমোদন ব্যতীত আইন হিসাবে বলবৎ হইতে পারিবে না। কোন বিল যদি ব্রিটিশ ভারতের বা উহার কোন অংশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিরোধী বলিয়া গবর্ণর-জেনারেল মনে করেন তাহা হইলে তিনি সেই বিল সম্পর্কে আলোচনা নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

আইন প্রবর্তনে নানাবিধ বাধা-নিষেধ

বাজেট সরকার পেশ করিবেন। আইনসভা বাজেটের কোন কোন ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা করিতে এবং ভোটে পাস বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে, কিন্তু কতক বিষয়ে সদস্যদের কোনপ্রকার আলোচনা করিবারও অধিকার ছিল না।

বাজেট পাস

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন ভারতবাসীর দাবীর তুলনায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। শাসনব্যাপারে প্রকৃত ক্ষমতা এই সংস্কার আইনে গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কার্যকরী সভার উপরই ন্যস্ত ছিল। প্রদেশের ক্ষেত্রে অনুরূপ ক্ষমতা গবর্ণরদের হাতে ছিল। এই শাসনব্যবস্থায় ভারতীয় সদস্যদের মতামত সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া শাসন পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা গবর্ণর-জেনারেল ও গবর্ণর এবং তাহাদের কার্যকরী সভার উপরে ন্যস্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করিয়া গবর্ণর ও তাঁহার কার্যকরী সভার সদস্যের হাতে দায়িত্বহীন ক্ষমতা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলে শাসনকার্যে দক্ষতা হ্রাস পাইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

সমালোচনা

প্রকৃত ক্ষমতা গবর্ণর-জেনারেল, গবর্ণর ও তাহাদের কার্যকরী সভার উপর ন্যস্ত

কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনের কতকগুলি ত্রুটি ভারতবাসীর অসন্তোষের কারণ ছিল। প্রথমত, এই ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তন করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এই সংস্কার আইনে কায়েম করিয়া ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তৃতীয়ত, প্রাদেশিক শাসনে লর্ড ক্লাইভের আমলের দ্বৈত শাসনের প্রায় অনুরূপ শাসন চালু করিয়া

সংস্কার সাধনের ত্রুটি

শাসনকার্যকে যেমন জটিল করিয়া তোলা হইয়াছিল, তেমনি ভারতবাসীর উপর ব্রিটিশ সরকারের আস্থার অভাব প্রমাণ করিয়াছিল।

সীমিত সাফল্য

তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সীমিত হইলেও আইনসভার সদস্যগণ জনসাধারণের মতামত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় প্রকাশ করিয়া সরকারকে যথেচ্ছভাবে চলিতে বাধাদান করিতে পারিয়াছিলেন। বিভিন্ন কমিটি সদস্যপদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গ্রহণ করিবার ফলে এবং আইনসভায় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, সমালোচনা করিয়া প্রশাসনকে অনেকটা প্রভাবিত করা সম্ভব হইয়াছিল।

টমসন ও গ্যারেট, কোপ্‌ল্যান্ড, পি. ই. রবার্টস্‌ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন বিফল হইয়াছিল মনে করেন না। কোপল্যান্ডের মতে এই আইন আইনসভাকে প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়াছিল। নির্বাচিত সদস্যগণ যে-সকল দপ্তর পরিচালনা করিতেন, সেই সকল দপ্তরের জন্য তাঁহারা জনসাধারণেব নিকট দায়ী ছিলেন। টমসন-গ্যারেট বলেন যে, এই শাসনব্যবস্থা যে অকর্মণ্য ছিল না, তাহা এই ব্যবস্থার স্থায়িত্বের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। ভারতের শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের নীতি ১৯১৯ খ্রীঃ হইতে ক্রমেই আরও ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল। রবার্টস্‌-এর মতে ব্রিটিশের হাত হইতে ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় যে-ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হইয়াছিল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন তাহা সাফল্যের সহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-আইন (The Government of India Act, 1935) : ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা আংশিকভাবেও পূরণ করিতে পারে নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসী ইংরেজদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সাহায্যদান করিয়াছিল। আশা ছিল, ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধাবসানে ভারতবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত দায়িত্বশীল শাসন চালু করিবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যে-সংস্কার প্রবর্তন করা হইল, তাহাতে এক অতি সীমিত ও সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ করিয়া ভারতবাসীকে আশার অনুপাতে অকিঞ্চিৎকর শাসনাধিকার দান করা হইয়াছে। জাতীয় কংগ্রেস এই সংস্কারকে 'অকিঞ্চিৎকর, অসন্তোষজনক ও হতাশাব্যঞ্জক' বলিয়া অভিহিত করিল। কিন্তু এই সীমিত পরিস্থিতিতেই কংগ্রেস ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার কার্যকরী করিতে রাজী হইল।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কারে হতাশা

কিন্তু সেই সময়ে সরকারের হঠকারিতার ফলে এক অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিল। বিচারপতি রাওলাটকে সভাপতি করিয়া নিযুক্ত এক কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা ১৯১৯-এর ফেব্রুয়ারিতে দুইটি আইন প্রবর্তন করিল। এই দুইটি আইনের বলে বিচারপতিরা রাজনৈতিক অপরাধের বিচারকালে জুরির সাহায্য না লইয়াই বিচার করিবার, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে আটক রাখিবার অধিকার দেওয়া হইল। এই আইন

রাওলাট আইন

দুইটি রাওলাট আইন (Rawlat Acts) নামে পরিচিত। মহাত্মা গান্ধীর এই আইন যখন আলোচিত হয় তখন সেগুলি পাস না করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছু না হওয়ায় তিনি সত্যাগ্রহ করিবার জন্য ভারতবাসীকে আহ্বান করিলেন। হরতাল প্রতিবাদসভা প্রভৃতি ভারতের সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। দেশের বিভিন্নাংশে সংঘর্ষ ঘটিল, পাঞ্জাবে পরিস্থিতি কঠিন বিবেচনায় সামরিক আইন জারি করা হইল। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক প্রতিবাদসভায় সমবেত নরনারীর উপর জেনারেল ডায়ারের আদেশে গুলিবর্ষণ করা হইলে ৪০০ জন নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, অন্তত ১২০০ জন আহত হইলেন। পার্শ্ববর্তী একটি রাস্তা দিয়া লোককে হামাগুড়ি দিয়া চলিবার আদেশ দেওয়া হইল। এই সকল ঘটনা সমগ্র ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব বিদ্বেষ ও বিরোধিতার সৃষ্টি করিল। ভারতের জাতীয়তাবাদ এক অসীম শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনা

ভারতীয় জাতীয়তা-বোধের শক্তি বৃদ্ধি

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ে তুরস্ক সাম্রাজ্যের সংহতি বিনাশ করিয়া সেভ্রের (Sevres) সন্ধি স্বাক্ষর পৃথিবীর মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরোধী করিয়া তুলিল। ভারতবর্ষের মুসলমানরাও খলিফার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল। এই সময় মহাত্মা গান্ধী সুযোগ বুঝিয়া খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে যুগ্মভাবে আন্দোলন শুরু করিলেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানদের যুগ্ম আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল খলিফার প্রতি অবিচারের প্রতিকার করা এবং ভারতের স্বরাজ আনা।

খিলাফৎ ও কংগ্রেস যুগ্ম আন্দোলন

এদিকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন ১৯১৯-এর সংস্কার আইন চালু হইল তখন মোতিলাল নেহরু ও সি. আর. দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হইল। আইনসভার মধ্যে থাকিয়া ব্রিটিশ শাসন বানচাল করা ছিল এই পার্টির উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় আইনসভায় সেই সূত্রে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে মোতিলাল নেহরু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন পরিবর্তন করিতে এবং সেজন্য একটি গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব পাস করাইলেন। কিন্তু গবর্ণর-জেনারেল এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। তবে 'সংস্কার তদন্ত কমিটি' (Reform Enquiry Committee) নামে একটি কমিটি নিয়োগ করিলেন। এই কমিটির অধিকাংশ সদস্য রিপোর্ট করিলেন যে সামান্য পরিবর্তন অপেক্ষা বেশি কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। সংখ্যালঘু দল তাহাদের রিপোর্টে বলিলেন যে, দ্বৈত শাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে ১৯১৯-এর সংস্কার আইনের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

স্বরাজ্য পার্টি : ১৯১৯-এর সংস্কার আইন পরিবর্তনের দাবি

সংস্কার তদন্ত কমিটি

ব্রিটিশ সরকার পূর্বে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৯১৯-এর সংস্কার আইন পাস হইবার দশ বৎসর পর একটি কমিশন নিয়োগ করিয়া এই সংস্কার

কতদূর সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা জানিবেন। কিন্তু সংস্কার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং ভারতবর্ষে যে আন্দোলন শুরু হইয়াছিল সেই কারণে ১৯২৯-এর পরিবর্তে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দেই সার্ জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করা হইল। সাইমন কমিশনকে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা কিরূপ কার্যকরী হইয়াছে, শিক্ষার কতদূর অগ্রগতি হইয়াছে এবং প্রতিনিধিমূলক সংস্থা কতদূর গড়িয়া উঠিয়াছে সে-বিষয়ে তদন্ত করিয়া ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা কতদূর চালু করা উচিত হইবে এবং প্রাদেশিক আইনসভার দ্বিতীয় অর্থাৎ ঊর্ধ্ব কক্ষ গঠন করা প্রয়োজন কিনা, এই সকল বিষয়ে রিপোর্ট করিতে বলা হইল। সাইমন কমিশন তাহাদের কাজ শুরু করিয়াই একথা উপলব্ধি করিলেন যে, ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার এবং দেশীয় রাজ্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক যদি বিবেচনা না করা হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার উন্নয়নের সুপারিশ করা অসুবিধাজনক হইবে। এজন্য এই বিষয়টিও কমিশনের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

সংস্কার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট, ভারতীয়দের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সাইমন কমিশন নিয়োগ (১৯২৭)

কমিশনের বিচার্য বিষয়সমূহ

এই কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য লওয়া হয় নাই এই কারণে কংগ্রেস সাইমন কমিশন বর্জন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। কমিশন যে-দিন ভারতবর্ষে পদার্পণ করিল সেইদিন সমগ্র দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড বার্কেনহেড্ ভারতীয়দের এই কমিশন গ্রহণ না করিবার যুক্তি হিসাবে বলিলেন যে, এই কমিশন যেহেতু পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত সেইহেতু ইহার সদস্যগণও পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্য হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা কিরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা ভারতবাসীর সহযোগিতার মাধ্যমে জানিবার চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র শেতাঙ্গদের বিচার-বুদ্ধির উপরই উহা ছাড়িয়া দেওয়া ভারতবাসী স্বভাবতই সহজ মনে গ্রহণ করিল না। সাইমন কমিশনকে কাল পতাকা প্রদর্শন, 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনি দিয়া ভারতবাসী সেইদিন ব্রিটিশ সরকারের অযৌক্তিকতার জবাব দিল। কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যদের একটি কমিটি গঠন করিয়া সেই কমিটি যাহাতে সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করে সরকারের সেই অনুরোধও কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইল।

কংগ্রেস তথা ভারতবাসী কর্তৃক কমিশন বর্জন

ভারতবাসীদের প্রতিনিধিহীন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

এদিকে এক সর্বদলীয় সভায় (মে ১৯, ১৯২৮) মোতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটির উপর ভারতবর্ষের জন্য সংবিধানের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতের দায়িত্ব দেওয়া হইল। তেজবাহাদুর সপ্রু, সোয়াব কুরেশী, সার্ আলি আমন, এম. এস. এ্যানি, জি. আর. প্রধান, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি ছিলেন এই কমিটির সদস্য। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মোতিলাল নেহরু রিপোর্ট পেশ করিলেন। এই রিপোর্টে ভারতের শাসনব্যবস্থায় একটি দুই-কক্ষযুক্ত পার্লামেণ্ট থাকিবে বলা হইল: (১) সিনেট, (২) হাউস অব্ রেপ্রেসেন্টেটিভস্। সেনেটের সদস্য-সংখ্যা হইবে ২০০, হাউস অব্ রেপ্রেসেন্টেটিভসের সদস্য-সংখ্যা হইবে ৫০০। গবর্ণর-জেনারেলের কার্য-নির্বাহক সভা কৃতকার্যের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী

নেহরু রিপোর্ট (১৯২৮)

থাকিবে। তিনি কার্যনির্বাহক সভার সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবেন। কোন সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকিবে না, তবে সংখ্যালঘুদের জন্য সদস্যপদ সংরক্ষিত থাকিবে। ধর্ম বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করা হইবে। কংগ্রেস এই রিপোর্ট অনুমোদন করিয়া স্থির করিল যে, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে যদি ব্রিটিশ সরকার নেহরু রিপোর্ট সংবলিত শাসনতন্ত্র গ্রহণ না করেন তাহা হইলে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু এবং কর দেওয়া বন্ধ করিবে।

কংগ্রেসের দাবি

ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দলের শাসনের স্থলে শ্রমিকদলের শাসন স্থাপিত হইলে ঘোষণা করা হইল যে, ১৯১৯-এর শাসন সংস্কারের স্বাভাবিক ফলই হইল ভারতে ডোমিনিয়ন স্টেটাস অর্থাৎ কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের অনুরূপ শাসন চালু করা। একথাও ঘোষণা করা হইল যে, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া গেলে পর ব্রিটিশ সরকার, ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া গোলটেবিল বৈঠকে সাইমন রিপোর্ট আলোচনার পর সর্বসম্মত সুপারিশ পার্লামেণ্টের নিকট করা হইবে। কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব সমর্থন করিল না। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিলেন।

গোলটেবিল বৈঠকের পরিকল্পনা

এই আন্দোলন ভারতের সর্বত্র এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি করিল। বিলাতী জিনিসপত্র বর্জন, স্কুল-কলেজের ধর্মঘট, অফিস-আদালতে পিকেটিং সমগ্র ভারতবর্ষে এক প্রবল আন্দোলনের সূচনা করিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খাঁ আব্দুল গফ্ফর খাঁ তাঁহার লালকুর্তাধারী অনুচরদের লইয়া আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিলেন। সরকারী দমননীতি ও নির্যাতন উপেক্ষা করিয়া মোট ষাট হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করিল। স্ত্রীজাতিও এই আন্দোলনে যোগদানে পশ্চাৎপদ রহিলেন না।

আইন অমান্য আন্দোলন

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আহূত গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগ না দেওয়ায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। এমতাবস্থায় ভাইসরয় লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধীকে বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন এবং গান্ধী ও আরউইনের মধ্যে এক চুক্তির (Gandhi-Irwin Pact) শর্তানুসারে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিলেন। হিংসাত্মক কাজের জন্য অভিযুক্ত এইরূপ সত্যাগ্রহী ভিন্ন অপরাপর সকল সত্যাগ্রহী বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হইল। কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩১) যোগদান করিতে রাজী হইল।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি : কংগ্রেসের দ্বিতীয় গোলটেবিলে যোগদান (১৯৩১)

এই বৈঠকেও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। মুসলিম লীগ প্রতিনিধিবর্গের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তুলিবার ও জেদের ফলে মহাত্মা গান্ধী সভা ত্যাগ করিয়া আসিলেন। কংগ্রেস পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিল।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা মুসলমান, শিখ,

অনুন্নত সম্প্রদায়কে পৃথক নির্বাচন অধিকার দিলে মহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশন শুরু করিলেন। শেষ পর্যন্ত আম্বেদকারের সহিত পুণাচুক্তি দ্বারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় অনুন্নত সম্প্রদায়কে যে-সংখ্যক সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি পদ দিবার শর্তে আম্বেদকার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রত্যাখ্যান করিলেন। শিখরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা গ্রহণে স্বীকৃত হইল না। একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায় এই বাঁটোয়ারার সুযোগ গ্রহণ করিল।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (১৯৩২)

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভারতবর্ষের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপনের সুপারিশ করা হইল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার অনুযায়ী প্রদেশগুলিতে যে দ্বৈত শাসন চালু করা হইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করা দরকার এবং প্রাদেশিক শাসনের সবকিছুই আইনসভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। মন্ত্রিসভা অবশ্য আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতে গবর্ণর নিজে নিযুক্ত করিবেন। আইনসভার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভোটদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হইল।

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট

প্রাদেশিক দ্বৈত শাসনের অবসান

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সভা (Executive) সম্পর্কে সাইমন রিপোর্টে নূতন কিছু বলা হইল না। ক্রমপর্যায়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর সে-বিষয়ে পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করা যাইবে, এই মন্তব্য করা হইল। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারকে আইনসভার নিকট কৃত কাজের জন্য দায়ী করা হইল না।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সভার কাজ অপরিবর্তিত

এই রিপোর্টে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একটি কাউন্সিল স্থাপনের সুপারিশ করা হইল। এই কাউন্সিল ব্রিটিশ ভারতীয় এবং দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠন করিতে হইবে এবং সর্বভারতীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করিবে। এই কাউন্সিল পরামর্শ-সভার ন্যায় কাজ করিবে এবং কি কি বিষয়ে তাহারা আলোচনা করিবে এবং মতামত দিতে পারিবে নূতন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার চালু করিবার সময় তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।

কেন্দ্রে সর্বভারতীয় পরামর্শ কাউন্সিল

সাইমন রিপোর্ট, নেহরু রিপোর্ট, গোলটেবিল বৈঠক, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্য লইয়া গঠিত জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি রিপোর্ট, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হোয়াইট পেপার (White Paper) প্রভৃতি সব কয়টির সুপারিশ ও আলোচনার ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-আইন (Government of India Act, 1935) রচনা করেন।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার চালু করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যে ভারত-আইন প্রবর্তন করা হইল তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্থাপন, ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাধীন দায়িত্বমূলক শাসন প্রচলন এবং সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রবর্তন।

প্রধান বৈশিষ্ট্য

এই আইনে ভারতের ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশসমূহ, দেশীয় রাজ্য এবং চীফ্ কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলি লইয়া এক সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা করা হইল। দেশীয় রাজ্যগুলির এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যোগদান ছিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। অবশ্য একথাও আইনে বলা হইল যে, যদি ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির মোট জনসংখ্যার অন্তত অর্ধেক বসবাস করে সেই সংখ্যক দেশীয় রাজ্য যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যোগদান করে তাহা হইলেই যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা চলিবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা : উহার শর্ত

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থাৎ কেন্দ্রের কার্যনির্বাহক সভার (Executive) দায়িত্ব এবং কর্তব্য নির্ধারণ করিতে গিয়া ১৯৩৫-এর ভারত-আইন সাইমন কমিশনের সুপারিশ উপেক্ষা করিয়া এক দ্বৈত শাসন চালু করিল। গবর্ণর-জেনারেল নিজ মনোনীত তিন জন সদস্য লইয়া একটি পরিষদের সাহায্যে ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং উপদলীয় জাতির শাসন প্রভৃতি কাজ করিবেন।

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট উপেক্ষিত : কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন প্রবর্তন

অপরাপর বিষয়াদির ব্যাপারে গবর্ণর-জেনারেল অনধিক দশজনের এক মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও সাহায্য লইবেন। মন্ত্রিগণ গবর্ণর-জেনারেলই মনোনীত করিবেন। ইহাদের কার্যকাল গবর্ণর-জেনারেলের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের কৃতকার্যের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রভৃতি—গবর্ণর-জেনারেল মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ নাও করিতে পারিবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কর্তব্য ও দায়িত্ব

ফেডারেল আইনসভা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভার দুইটি কক্ষ (House) থাকিবে উধর্ব কক্ষ কাউন্সিল অব্ স্টেট্স্ (Council of States), নিম্ন কক্ষ ফেডারেল এ্যাসেম্বলী (Federal Assembly)। কাউন্সিল অব্ স্টেট্স্ একটি স্থায়ী সংসদ হইবে, উহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রতি তিন বৎসর অন্তর কার্যকাল শেষ হইবে এবং সেই স্থলে নূতন সদস্য লওয়া হইবে। অবশ্য যাঁহাদের কার্যকাল শেষ হইবে তাঁহারাও পুনরায় সদস্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন। কাউন্সিল অব্ স্টেট্স্-এর সদস্য-সংখ্যা হইবে অনধিক ২৬০। এদের ১৫৬ জন ব্রিটিশ ভারত হইতে নির্বাচিত হইবেন এবং অনধিক ১০৪ জন দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

দ্বি-কক্ষযুক্ত আইনসভা : উধর্ব কক্ষ কাউন্সিলস্ অব্ স্টেট্স্

নিম্ন কক্ষ ফেডারেল এ্যাসেম্বলী পাঁচ বৎসরের মেয়াদে নির্বাচিত হইবে। ইহার সদস্য-সংখ্যা হইবে অনধিক ৩৭৫। ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলি হইতে মোট ২৫০ জন এবং অনধিক ১২৫ জন দেশীয় রাজ্য হইতে এই এ্যাসেম্বলীর সদস্য হইবেন। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ ২৫০ জন নির্বাচন করিবেন, দেশীয় রাজ্যের সদস্যগণ সেই সকল রাজ্যের শাসকদের দ্বারা মনোনীত হইবেন।

নিম্ন কক্ষ : ফেডারেল এ্যাসেম্বলী

ফেডারেল অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভা যে-সকল বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিতে পারিবে সেগুলি ফেডারেল লেজিস্লেটিভ্ লিস্ট, প্রাদেশিক আইনসভার জন্য প্রাদেশিক লেজিস্লেটিভ্ লিস্ট এবং একটি যুগ্ম লিস্ট বা তালিকা তৈয়ার করা হইল। ফেডারেল আইনসভা সমগ্র ভারতবর্ষ বা উহার অংশবিশেষের জন্য আইন প্রবর্তন করিতে পারিবে। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি সম্পর্কেও আইন পাস করিতে পারিবে।

ফেডারেল আইনসভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-আইন অনুসারে গবর্ণর-জেনারেলকে শাসনব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ করা হইয়াছিল। তিনি শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমাঞ্জস্য ও ঐক্য বজায় রাখিবার দায়িত্ব প্রাপ্ত। সাধারণত মন্ত্রিভার পরামর্শ অনুসারেই তিনি চলিবেন, কিন্তু এ-বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই চলিতে পারিবেন। কতকগুলি বিষয়ে তিনি মন্ত্রিসভার মতামত গ্রহণ করিতে বা না-করিতে পারেন এবং সে-সব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিজ বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইবেন। এই সকল বিষয় হইল: আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা যাহাতে বিঘ্নিত না হয় সেই ব্যবস্থা করা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থ বজায় রাখা, বিলাতী পণ্যদ্রব্য বা ব্রহ্মদেশ হইতে আনা হইয়াছে সেইরূপ দ্রব্যাদির বিরুদ্ধে কোনপ্রকার বাণিজ্যিক বৈষম্য না হয় সেই ব্যবস্থা করা, দেশীয় রাজগণের মর্যাদা রক্ষা করা প্রভৃতি। যে-সকল বিষয় সংরক্ষিত ছিল সেগুলি তিনি নিজ ইচ্ছামত সম্পাদন করিতে পারিবেন, যেমন, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি-নির্ধারণ, খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত বিষয়াদি, উপদলীয় জাতি-সংক্রান্ত কাজ, মন্ত্রিসভা নিয়োগ বা বাতিল করা, অর্ডিন্যান্স জারি করা, যে-খরচ বাজেটে উল্লিখিত থাকে কিন্তু আইনসভার ভোটে পাস করা প্রয়োজন হয় না সেই খরচ নিয়ন্ত্রণ করা, আইনসভা আহ্বান করা, স্থগিত রাখা বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, কোন আইন পাস করা সম্পর্কে নির্দেশ প্রেরণ করা এবং আইনসভায় গৃহীত আইন অনুমোদন করা বা না-করা। এইভাবে গবর্ণর-জেনারেলের হাতে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার রক্ষাকবচ দেওয়া হইয়াছিল।

গবর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতা ও কর্তব্যকার্য

প্রাদেশিক শাসনে গবর্ণর ফেডারেল অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শাসনে গবর্ণর-জেনারেলের অনুরূপ ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করিতেন। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে গবর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রীদের পরামর্শক্রমেই চালান হইবে। প্রাদেশিক মন্ত্রিগণের কার্যকাল গবর্ণরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল। কতক কতক বিষয়ে গবর্ণর তাঁহার মন্ত্রিসভার পরামর্শমত চলিতেন। কিন্তু কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে যেমন শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রভৃতি, তিনি সম্পূর্ণ নিজ বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইবেন। গবর্ণর ঘোষণা দ্বারা প্রদেশের শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন। যে-সকল ব্যয়বরাদ্দ আইনসভার ভোটে পাস করিবার প্রয়োজন ছিল না (Non-votable grants) সেই সকল ব্যয় গবর্ণরের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

গবর্ণরের কর্তব্য-কার্য ও ক্ষমতা

প্রাদেশিক আইনসভা কোন কোন ক্ষেত্রে এক-কক্ষযুক্ত আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বি-কক্ষযুক্ত ছিল। বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং আসামের আইনসভা ছিল দুই-কক্ষযুক্ত—লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিল ও লেজিস্লেটিভ্ এ্যাসেম্বলী।

প্রাদেশিক আইনসভা

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-আইনে মুসলমান, তফসিল জাতি, খ্রীষ্টান, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, শিখ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে পৃথক নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। শিখগণ অবশ্য পৃথক নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে। মহাত্মা গান্ধী ও তফসিলী সম্পদায়ের নেতা আম্বেদকারের মধ্যে পুণা চুক্তির ফলে তফসিলী সম্প্রদায়কে অধিকতর সংখ্যক আসন ছাড়িয়া দিয়া হিন্দু সমাজকে ভাঙ্গিবার ব্রিটিশ কূটনৈতিক চাল রোধ করা হইয়াছিল। উপরি-উক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন অপরাপর সকল লোককে সাধারণ নির্বাচক হিসাবে রাখা হইল। ব্রিটিশ সরকারের এই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা ভারত বিভাগের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভোটাধিকার

ভারত-আইনের (১৯৩৫) অপরাপর শর্ত ছিল এই যে, উহার পরিবর্তন ব্রিটিশ সরকার অর্ডার-ইন্-কাউন্সিল দ্বারা করিতে পারিবেন, অর্থাৎ সেইজন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কোন আইন প্রবর্তন করিবার প্রয়োজন হইবে না। ভারতের আইনসভাকে এ-বিষয়ে কোন ক্ষমতা দেওয়া হইল না। কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকার এবং প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনাধিকার কতক পরিমাণে ভারত-আইনে দেওয়া হইলেও কার্যত প্রকৃত ক্ষমতা গবর্ণর-জেনারেল এবং গবর্ণরের হাতেই রহিয়া গেল। দেশীয় রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহিত যোগদান করিবার পরও সেগুলির উপর ব্রিটিশ সরকারের যাবতীয় ক্ষমতা বজায় রাখা হইল ইংলণ্ডে ভারত সচিবের কাউন্সিল উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য কয়েকজন পরামর্শদাতা লওয়া হইল। কিন্তু তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা-না-করা ছিল ভারত সচিবের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। কেবলমাত্র ভারতে উচ্চপদস্থ কর্মচারী যেমন, আই. সি. এস. প্রভৃতি সম্পর্কে পরামর্শদাতাদের পরামর্শ তিনি গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিলেন।

গবর্ণর-জেনারেল ও গবর্ণরদের উপর প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা অবশ্য শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই। ফলে ফেডারেল আইনসভা ভারতের আইনসভা নামে অভিহিত হইল। অবশ্য প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা চালু করা হইল। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন চালু না হইলেও শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে মামলা-মোকদ্দমার বিচারের জন্য একটি ফেডারেল বিচারালয় স্থাপন করা হইল। এইভাবে ১৯৩৫-এর ভারত-আইনের যে-সকল অংশ কার্যকর করা হইয়াছিল তাহা ১৯৪৭-এর ভারতের স্বাধীনতা আইন পাসের সময় পর্যন্ত অপরিবর্তিত রহিল।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থগিত : প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চালু

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-আইন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত হইল। জওহরলাল নেহরু ইহাকে "অবাঞ্ছিত, অগণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তা-বিরোধী" শাসনতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করিলেন। ইহাকে তিনি একটি 'ব্রেকহীন মেশিন' (Machine without brake)-এর সহিত তুলনা করিলেন। মদনমোহন মালব্য এই শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের মুখোশের অন্তরালে অন্তঃসারশূন্য এক শাসনব্যবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিলেন। বাংলাদেশের মুসলমান নেতা ফজলুল হক ইহাকে না-হিন্দুরাজ, না-মুসলমানরাজ বলিয়া সমালোচনা করিলেন। চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারিয়ারের মতে ইহা দ্বৈত শাসন অপেক্ষাও খারাপ ছিল।

সমালোচনা

সাম্প্রদায়িক সমস্যা : মুস্লিম লীগ : পাকিস্তান (Communal Problem : Muslim League & Pakistan) : ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকেই বুঝায়। এই সমস্যা রাজনৈতিক কারণেই উদ্ভূত, ধর্মের কারণে ততটা নহে। মুসলমান শাসনকাল হইতে হিন্দু ও মুসলমানগণ পাশাপাশি বসবাসের ফলে যে পারস্পরিক সম্প্রীতি তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে ধর্মের জিগীর ছিল না।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি

কিন্তু ঊনবিংশ শতকে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধর্মসংস্কার এবং ধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন শুরু হয় তাহাতে এই দুই সম্প্রদায়ের বৈষম্যের দিকটি কতক পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ওহাবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে 'দারু-উল-ইসলামে' পরিণত করা এবং সেজন্য অ-মুসলমান শাসনের অবসান ঘটান। অপরদিকে দয়ানন্দের আর্যসমাজের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল শুদ্ধির মাধ্যমে অ-হিন্দুদিগকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা। ইহা ভিন্ন, বিবেকানন্দের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া ভারত-আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুরূপ আরবীয় তথা পশ্চিম-এশিয়ার সহিত ধর্মীয় সংযোগ পুনঃস্থাপনের আগ্রহ জাগাইয়া তুলে। তথাপি এই সবের ফলে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই মহান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ততটা উৎকট এবং নগ্ন রূপ ধারণ করিত না যদি না ইহার পশ্চাতে তৃতীয় শক্তির হস্তাবলেপন না থাকিত।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্মসংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন : ওহাবীদের অ-মুসলমান-বিরোধী আন্দোলন

ব্রিটিশের হস্তাবলেপন

উইলিয়াম হাণ্টার 'ভারতীয় মুসলমান' নামক গ্রন্থে মুসলমান সম্প্রদায়কে দুর্বল বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে অপারগ বলিয়া বর্ণনা করিয়া মুসলমানদের প্রতি সরকারের আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। 'মহমেডান এ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ'-এর অধ্যক্ষ মিঃ থিয়োডোর বেক মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-বিরোধী ভাব জাগাইয়া তুলিতে এবং ব্রিটিশ সরকারের মুসলমানদের প্রতি নীতির পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হন। এদিকে সার্ সৈয়দ আহম্মদ প্রথম দিকে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি এবং ভারতীয় জাতীয়তাবোধের প্রবক্তা ছিলেন কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই হিন্দু ও মুসলমান দুইটি ভিন্ন জাতির লোক এবং পরস্পর বিবদমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক জীবনে ঐক্য কখনও সম্ভব নহে—এরূপ বক্তৃতা দিতে শুরু করিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের অনগ্রসরতা তাঁহার অন্তরে এক হিন্দু-ভীতির উদ্রেক করিল। তাঁহার স্থাপিত 'মহমেডান এ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ' মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-বিরোধী এবং ব্রিটিশের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি স্বয়ং জাতীয় কংগ্রেসের এক বিরোধী শক্তি গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন।

উইলিয়াম হাণ্টারের মন্তব্য

মিঃ থিয়োডোর বেক্-এর চেষ্টা

সার্ সৈয়দ আহম্মদের হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টিতে অবদান

উনবিংশ শতকে ব্রিটিশদের রচিত ইতিহাসেও এমন সকল উক্তি করা হইয়াছিল যেগুলি হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে বিচ্ছেদ আনিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছিল। এই সকল রচনার পশ্চাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা ছিল, বলা বাহুল্য।

ইংরাজ ঐতিহাসিকদের ইতিহাস বিকৃতি

বীরদের প্রতি শ্রদ্ধার মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ জাগাইবার চেষ্টা : জাতীয়তাবাদের হিন্দু চরিত্র

বিংশ শতকের প্রথম দিকে শিবাজী, রাণা প্রতাপ, গোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি বীরদের প্রতি পুনরুজ্জীবিত শ্রদ্ধার মাধ্যমে জাতীয়তা-বোধের প্রসারের চেষ্টা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে কতকটা হিন্দু চরিত্র দান করিয়াছিল।

পশ্চাৎপদ মুসলমান-সম্প্রদায়ের তুলনায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুরা চাকরির ক্ষেত্রে যেমন অগ্রসর ছিল, রাজনীতি ক্ষেত্রেও এক ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তি হিসাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনপ্রকার ক্ষমতা ভারতবাসীকে দেওয়া হইলে হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই উহার সুযোগ গ্রহণ করিবে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আগা খাঁ লর্ড লিটনের কাছে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা দাবি করিলেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ কর্মচারীদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন-কারী কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান এবং উহার বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়কে কাজে লাগাইতে পারিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিরাপত্তা অনেকটা বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং লর্ড মিন্টো আগা খাঁকে পৃথক নির্বাচনের আশ্বাস দিতে ত্রুটি করিলেন না।

আগা খাঁর মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি (১৯০৬)

ঐ বৎসরই (১৯০৬) ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকার নবাব সলিম উল্লাহ্ মুশ্লিম লীগ নামে মুসলমানদের একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাইয়া তোলা, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং এই প্রধান উদ্দেশ্যের কোনপ্রকার ব্যাঘাত না ঘটাইয়া অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করা প্রভৃতি।

মুশ্লিম লীগের গোড়াপত্তন ও উহার আদর্শ

সুতরাং ইহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, জন্মলগ্ন হইতেই মুশ্লিম লীগ একটি সাম্প্রদায়িক সংস্থা হিসাবে রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে চেষ্টিত ছিল। এই সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় আলিগড়ে প্রদত্ত নবাব ওয়াকার-উল্-মুল্কের বক্তৃতায়। তিনি বলিয়াছিলেন, ভগবান না করুন, ভারতে যদি ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে তাহা হইলে হিন্দুরাই শাসনক্ষমতা হস্তগত করিবে। ইহা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়-ই হইল ব্রিটিশ শাসন কায়েম রাখা। ব্রিটিশের অনুগত সৈনিক হিসাবে মুসলমানগণের রক্ত দিতেও প্রস্তুত থাকা চাই।

মুশ্লিম লীগ সাম্প্রদায়িক দল

যাহা হউক, মুশ্লিম লীগ কিছুকালের মধ্যেই প্রগতিবাদী মুসলমান নেতা মৌলানা মাজরুল হক্, মৌলানা মহম্মদ আলি, সৈয়দ ওয়াজির হাসান, মহম্মদ আলি জিন্নাহ

প্রভৃতির প্রভাবে আসিলে মুশিলম লীগের কর্মপন্থা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পর মুশিলম লীগের কার্যকলাপের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে আসিলে কংগ্রেস উহা বয়কট করে কিন্তু মুশিলম লীগ অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে উহা বয়কট করে নাই। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বদলীয় কনফারেন্সে মুশিলম লীগ যোগদান করে এবং পরে নেহরু রিপোর্ট প্রস্তুত হইলে কতকগুলি রক্ষাকবচ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য দাবি করিল কিন্তু সেই রিপোর্ট অনুমোদন করিল না। পক্ষান্তরে সর্বদলীয় কনফারেন্সে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ যে চৌদ্দ দফা দাবি সংবলিত এক প্রচারপত্র বণ্টন করিয়াছিলেন তাহা মুশিলম লীগ অনুমোদন করে। এই চৌদ্দ দফা দাবি ছিল মুশলীম লীগের ন্যূনতম দাবি। প্রথম গোলটেবিল কংগ্রেস প্রতিনিধিদের অবর্তমানে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিল না। কংগ্রেসের নেতারা তখন জেলে বন্দী। এমতাবস্থায় গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট্ স্বাক্ষরিত হইলে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষে একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে গেলেন। কংগ্রেস ও মুশিলম লীগ যাহাতে একই দাবি উত্থাপন করে, সেজন্য মহাত্মা গান্ধী মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-এর সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইলেন, কিন্তু তাহাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইল না। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ গোপনে ব্রিটিশ সাহায্যপুষ্ট হইয়া কোন শর্তেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে রাজী না হইলে মহাত্মা গান্ধী হতাশ হইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন।

মুশিলম লীগ প্রগতিবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দের প্রভাবাধীনে আসিল

মুশিলম লীগ কর্তৃক নেহরু রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান : জিন্নাহ্-এর চৌদ্দ দফা দাবি অনুমোদন

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক জিন্নাহ্র একদেশদর্শিতায় ব্যর্থ

কংগ্রেস তথা অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি মুশিলম লীগের বিরোধিতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি বৃদ্ধি করিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদিগকে পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল। এই ব্যবস্থা Communal Award নামে পরিচিত (আগস্ট ৪, ১৯৩২)। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো আগা খাঁকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইল। এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর আরও প্রশস্ত করিয়া দিল।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (আগস্ট ৪, ১৯৩২)

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-আইন অনুসারে নির্বাচন হইলে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল, সিন্ধু ও আসামে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করিলেও একক গরিষ্ঠতা লাভ করায় মোট নয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করিল। কেবলমাত্র বাংলা ও পাঞ্জাবে মুশিলম লীগ একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পাইয়াছিল। জিন্নাহ্ কংগ্রেসের সহিত যুগ্মভাবে ভারতের সব কয়টি (১১) প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে চাহিলে কংগ্রেস মুশিলম লীগকে কংগ্রেসের আদর্শ গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হইতে বলে। জিন্নাহ্ এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। তারপর কংগ্রেস সরকারের নিন্দাবাদ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতে তিনি তাঁহার মুশিলম লীগ সহ মনোনিবেশ করিলেন।

কংগ্রেস কর্তৃক এগারটি প্রদেশের নয়টিতে সরকার গঠন

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার অনুমোদন না লইয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষকে জড়াইলে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আদর্শের মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও সন্নিবিষ্ট কিনা তাহা ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করিতে অসম্মত হইলে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ত্যাগ করিল (অক্টোবর, ১৯৩৯)। জিন্নাহ্ ইহাকে 'মুক্তি দিবস' বলিয়া আখ্যায়িত করিলেন। কংগ্রেস কর্তৃক পরিত্যক্ত মন্ত্রিত্ব মুশ্লিম লীগ গ্রহণ করিল। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ আদর্শবাদ ও নীতির দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য হইলেও ইহা রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কাজ হইয়াছিল, কারণ সেই সুযোগে মুশ্লিম লীগ ক্ষমতা হস্তগত করিয়া নিজ সংগঠনকে শক্তিশালী করিতে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে ফলবন্ত করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা ত্যাগ :

মুশ্লিম লীগের মুক্তি দিবস ঘোষণা

মুশ্লিম লীগ কর্তৃক সরকার গঠন

পর বৎসর (১৯৪০) মুশ্লিম লীগ লাহোর অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নামে পৃথক রাষ্ট্র দাবি করিল। ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান পৃথক দুইটি জাতি এই দ্বি-জাতিতত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া জিন্নাহ্ মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসভূমির দাবি উত্থাপন করেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসভূমির দাবি মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-এর কল্পনাপ্রসূত নহে। দশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মুশ্লিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে কবি ও রাজনীতিক মহম্মদ ইক্‌বাল ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার সমাধান হিসাবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বালুচিস্তান লইয়া একটি পৃথক অঞ্চল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত-ই হউক বা স্বাধীনভাবেই হউক, গঠনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু 'পাকিস্তান' কথাটির জনক ছিলেন কার্মব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণীতে পাঠরত রহমৎ আলি নামে জনৈক ছাত্র। তিনি হিন্দু ও মুসলনানদের মধ্যে জাতিগত মৌলিক পার্থক্যের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া এই দুই জাতির মধ্যে ধর্ম, আচার-আচরণ, ইতিহাস. ঐতিহ্য, অর্থনীতি, সাহিত্য, উত্তরাধিকার আইন, এমন কি, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ সকল দিক দিয়াই প্রভেদের কথা বলেন। হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি বলিয়া তিনি দাবি করেন। পৃথক জাতি হিসাবে মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসভূমি হিসাবে পাঞ্জাব, আফগান প্রদেশ (অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), কাশ্মীর, সিন্ধু ও বালুচিস্তান লইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের কথা ভাবেন। পাকিস্তান কথাটি উপরি-উক্ত অঞ্চল-গুলির আদি অক্ষর এবং বালুচিস্তানের 'স্তান' লইয়া গঠিত (Punjab = P, Afghan Province = A, Kashmır = K, Sind = S, Baluchistan = tan = PAKSTAN i. e., Pakıstan)।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে মুশ্লিম লীগ কর্তৃক পাকিস্তান দাবি

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কবি ও রাজনীতিক ইক্‌বাল কর্তৃক মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজ্য গঠনের প্রস্তাব

কার্মব্রিজে অধ্যয়নরত ছাত্র রহমৎ আলি কর্তৃক 'পাকিস্তান' কথার জন্মদান

কিন্তু পাকিস্তান দাবির সর্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং নিরলস প্রবক্তা ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। লাহোর অধিবেশনে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' কথাগুলি কোন ধর্মের নাম নহে এগুলি দুইটি ভিন্ন সমাজের নাম। এই দুই পৃথক সমাজ মিলিয়া একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হইবে একথা স্বপ্নেরও অতীত।

মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ও পাকিস্তান দাবি

কোন্ কোন্ অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইবে সে-বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবি করা হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান রাষ্ট্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও অপর দিকে বাংলাদেশ লইয়া গঠিত হইবে বলিয়াছিলেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে বিভিন্ন অঞ্চল দাবি

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কংগ্রেসের শর্তাধীনভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যোগদানের প্রত্যুত্তরে লর্ড লিনলিথগাও যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার জন্য একটি সংবিধান সভা গঠন করিবার ঘোষণা করিলেন; কিন্তু কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেই দিকে ব্রিটিশ সরকার নজর রাখিবেন একথা বলিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবার যে-দাবি কংগ্রেস করিল তাহা তিনি স্বীকার করিলেন না। লিনলিথগাওয়ের এই ঘোষণা মুশ্লিম লীগকে খুবই উৎসাহিত করিল। ইহা ভিন্ন, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীপ্স্ পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হইল যে, যুদ্ধের পর যে সংবিধান চালু করা হইবে তাহাতে যদি ভারতের কোন অংশ বা প্রদেশ যোগদান করিতে রাজী না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সম-মর্যাদাসম্পন্ন পৃথক সংবিধানের ব্যবস্থা তাহাদের জন্য করা হইবে। এই পরিকল্পনা ভারত বিভাগের ইঙ্গিত দিয়াছিল, কিন্তু কংগ্রেস ক্রীপ্স্ পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করিলে মুশ্লিম লীগও উহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং ভারতকে বিভক্ত করিবার দাবিতে অধিকতর সোচ্চার হইয়া উঠিল।

লিনলিথগাওয়ের ঘোষণা

ক্রীপ্স্ পরিকল্পনা: পাকিস্তান দাবির শক্তি বৃদ্ধি

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়াভেল কেবলমাত্র সামরিক সেনাপতি ভিন্ন তাঁহার কার্যনির্বাহক কাউন্সিলের অন্যান্য সকল সদস্য ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্য হইতে লইবার উদ্দেশ্যে সিমলায় কংগ্রেস ও মুশ্লিম লীগের প্রতিনিধিদের এক কন্‌ফারেন্স আহ্বান করিলেন। এই কন্‌ফারেন্সে কংগ্রেস ও মুশ্লিম লীগের মতানৈক্যের সমাধান করাও উদ্দেশ্য ছিল। এই কন্‌ফারেন্সে কংগ্রেস গবর্ণর-জেনারেলের কার্যনির্বাহক সভায় দুইজন কংগ্রেসী মুসলমানকে গ্রহণ করিতে বলিল, কিন্তু জিন্নাহ্ প্রত্যেক মুসলমান সদস্য মুশ্লিম লীগ কর্তৃক মনোনীত হইবে এই দাবি তুলিলেন। লর্ড ওয়াভেল কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া দিলেন। এইভাবে জিন্নাহ্‌র ইচ্ছাকে যুক্তির উপরে প্রাধান্য দিয়া ওয়াভেল মুশ্লিম লীগের পরোক্ষ সমর্থনই করিলেন।

সিমলা কন্‌ফারেন্স (১৯৪৫)

জিন্নাহ্-এর অনমনীয় অযৌক্তিকতায় ব্যর্থ

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাবিনেট মিশনের নিকট এক স্মারকলিপিতে মুশ্লিম লীগ পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান, সিন্ধু, বাংলা ও আসাম এই ছয়টি প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হউক, এই দাবি করে। ক্যাবিনেট মিশন পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলিকে একটি, মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিকে একটি এবং বাংলা ও আসামকে একটি—এই তিনটি জোটে ভাগ করিলেন। প্রত্যেকটি প্রদেশকে পূর্ণমাত্রায় স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে এবং একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশ রক্ষা বৈদেশিক নীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকিবে এই প্রস্তাব করিলেন। বস্তুত প্রদেশগুলিকে মুসলমান-প্রধান, হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে ভাগ করায় পাকিস্তান দাবি পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল। ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সংবিধান সভা নির্বাচিত হইল তাহাতে ২১০টি সাধারণ সদস্যপদের ১৯৯টি কংগ্রেস লাভ করিল। ৭৮ জন মুসলমান সদস্যের ৭৩ জন মুশ্লিম লীগ পাইল। জিন্না আপত্তি তুলিলেন যে, ২৯৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত সংবিধান ২১১ জনই কংগ্রেসের পক্ষে। এমতাবস্থায় মুসলমান স্বার্থ রক্ষার জন্য দুইটি সংবিধান সভা—একটি ভারতের জন্য এবং অপরটি পাকিস্তানের জন্য আহ্বান করিতে হইবে। এই দাবি করিয়া মুশ্লিম লীগ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা হইতে তাহাদের সমর্থন তুলিয়া লইল। ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬ মুশ্লিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' (Direct Action Day) পালনের নামে বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করিল। কলিকাতা নগরী এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কদর্যতম দিক প্রত্যক্ষ করিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ব্রিটিশের নিকট হইতে পাকিস্তান আদায়ের জন্য অনুষ্ঠিত না হইয়া হিন্দু-নিধন যজ্ঞে পরিণত হইল।

ক্যাবিনেট মিশন ও পাকিস্তান দাবি

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী সংবিধান সভার নির্বাচনে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা

জিন্নাহ্-এর দুইটি পৃথক সংবিধান সভা দাবি

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস (১৬ আগস্ট, ১৯৪৬)

ঐ বৎসরই কেন্দ্রে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে এক অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হইল। (২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬)। মুশ্লিম লীগ প্রথমে ইহাতে যোগদান না করিলেও লর্ড ওয়াভেলের গোপন পরামর্শে অক্টোবর মাসে যোগদানে রাজী হইল, কিন্তু সংবিধান সভায় যোগ দিল না। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লীমেন্ট এট্‌লি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুনের মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার অর্পণ করিয়া ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। কিন্তু সমগ্র ভারতের শাসনভার কোন্ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়া হইবে বা প্রাদেশিক সরকারের কোন্‌টির হাতে কোন্ অঞ্চলের শাসনভার ছাড়িয়া দেওয়া হইবে তাহা ভারতবাসীর স্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিয়া স্থির করা হইবে। ইহাতে পাকিস্তান স্থাপনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছিল। ওয়াভেলের পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন ভারত-ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা ঘোষণা করিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

অন্তর্বর্তী সরকার

এট্‌লির ঘোষণা

মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা : ভারত বিভাগ

প্রদেশ ও আসামের সিলেট জেলায় গণভোট গ্রহণ করিয়া সেগুলি ভারত বা পাকিস্তানে যোগদান করিবে তাহা স্থির করিবার ব্যবস্থা হইল। বাংলা ও পাঞ্জাবের আইনসভার হিন্দু ও মুসলমান সদস্যগণ পৃথকভাবে বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করা হইবে কিনা স্থির করিতে বলা হইল। বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দুরা তথা অ-মুসলমানগণ ভাগ করিবার সিদ্ধান্ত লইলে এই দুই প্রদেশকে মুসলমান-প্রধান ও হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা হইল। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাঞ্জাব ভারতের সহিত সংযুক্ত হইল আর পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম-পাঞ্জাব যোগ দিল পাকিস্তানের সঙ্গে। এইভাবে সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাস-ঐতিহ্য উপেক্ষা করিয়া অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হইল, উদ্ভূত হইল ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র (আগস্ট ১৫, ১৯৪৭)। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের Divide and Rule নীতি, মুস্লিম লীগের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও পৃথকীকরণের নীতি জাতীয় কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের ব্যবচ্ছেদ মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছিল।

ভারতবর্ষ ব্যবচ্ছেদের সিদ্ধান্ত

ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তি

১৯১৪ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের শিল্পোন্নতি (Indian Industrial Development from 1914 to 1947): ১৮৮০ এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ কমিশন দুইটি-ই দুর্ভিক্ষ সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে শিল্প স্থাপন এবং শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ফলে লর্ড কার্জন একটি পৃথক বিভাগ খুলিয়া বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি সূচনা করেন। এই বিভাগের নাম দেওয়া হইয়াছিল বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ (১৯০৫)।

দুর্ভিক্ষ কমিশন কর্তৃক শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ

কার্জন কর্তৃক শিল্পোন্নয়নের চেষ্টা

ঐ সময়ে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইলে ভারতের শিল্পের পুনরুজ্জীবনের এক গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা দেয়। ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্রিটিশ স্বার্থের দিক দিয়া মোটেই অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং সরকারের দিক হইতে শিল্পপ্রচেষ্টায় উৎসাহ দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল। এমন কি, তদানীন্তন ভারত সচিব ভারতবর্ষে শিল্প স্থাপনে সাহায্য বা উৎসাহ দান দূরের কথা, ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতের শিল্পপ্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহ করিতে সরকারকে নির্দেশ দিলেন (১৯১০)।

ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতি নিরুৎসাহিত করিবার চেষ্টা

কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে (১৯১৪) বিদেশ হইতে আমদানি যখন কঠিন হইয়া পড়িল তখন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ভিন্ন ব্রিটিশ সামরিক স্বার্থেও যে শিল্পোন্নয়ন প্রয়োজন সে-কথা সরকার উপলব্ধি করিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি বোর্ড গঠন করিয়া উহার উপর গোলাবারুদ উৎপাদনের এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অপরাপর সামগ্রী সংগ্রহ করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল। ইহার ফলে এবং যুদ্ধের প্রয়োজনের তাগিদে ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া হইল। কারিগরি জ্ঞান ও উপদেশ উভয়ই ভারতীয়দের দেওয়া হইতে লাগিল। দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করিতে বলা হইল। ফলে ভারতের শিল্প উন্নতির পথে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতবর্ষে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত

শিল্পপ্রচেষ্টা উৎসাহিত

কতকটা অগ্রসর হইতে লাগিল। এ-দিকে জনসাধারণের চাপে সরকার ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি শিল্প কমিশন (Industrial Commission) স্থাপন করিলেন। এই কমিশনের রিপোর্টে বলা হইল ভারতের শিল্প-প্রচেষ্টায় সরকারকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ ও সাহায্য-সহায়তা দান করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের শিল্প বিভাগ খুলিতে হইবে। শিল্প প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরামর্শ দিয়া, অর্থসাহায্য দিয়া উন্নত করিয়া তোলাও প্রয়োজন। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন পরিবহনের মাশুল প্রভৃতির ক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ সুযোগ দিবার কথাও সুপারিশ করা হইল। সরকার শিল্প কমিশনের রিপোর্ট (১৯১৮) গ্রহণ করিলেন এবং সেগুলি কার্যকর করিতে সচেষ্ট হইলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন দ্বারা প্রাদেশিক সরকারের হস্তান্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

শিল্প কমিশনঃ সুপারিশসমূহ

কিন্তু শিল্পোন্নয়নে সরকারী উৎসাহে শীঘ্রই ভাটা পড়িয়া গেল। যুদ্ধ শেষ হইলে শিল্পের উন্নতির ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের স্বাভাবিকভাবেই ততটা উদ্যোগ রহিল না। এ-দিকে যাহা কিছু শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল, বিদেশী সামগ্রীর প্রতিযোগিতায় সেগুলি অত্যন্ত অসুবিধাগ্রস্ত হইল। ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের উপর শুল্কনীতি পরিবর্তনের জন্য দাবি জানাইলে একটি শুল্ক কমিশন নিয়োগ করা হইল। ইহার ফলে বিভিন্ন শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হইল। অর্থাৎ, বিদেশ হইতে আমদানিকৃত সামগ্রী যাহাতে ভারতে উৎপন্ন সামগ্রীকে প্রতিযোগিতায় হঠাইতে না পারে সেজন্য প্রতিযোগী সামগ্রীর উপর শুল্ক স্থাপন করিয়া দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার নীতি গৃহীত হইল। শুল্ক কমিশন অবশ্য 'বিচারমূলক সংরক্ষণ' (Discriminating Protection) নীতি গ্রহণের কথা সুপারিশ করিয়াছিলেন।

শুল্ক কমিশন

বিচারমূলক সংরক্ষণ

১৯১৮ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ভারতবর্ষের আধুনিক শিল্পগুলির মধ্যে সিমেন্ট, কয়লা, লোহা ও ইস্পাত, সুতীবস্ত্র, পাটজাত দ্রব্যাদি, কাগজ, চিনি, সালফিউরিক এ্যাসিড, দিয়াশলাই প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন শিল্প

ভারতীয় প্রজাতন্ত্র
(Indian Republic)

স্বাধীন ভারত (Independent India) : প্রায় দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ পরাধীনতা হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কূটচাল হিসাবে লালিত সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষের 'পাকিস্তান' নামক বিষফল সেই দিন স্বাধীনতার আনন্দকে বহুলাংশে ম্লান করিয়াছিল। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-এর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাঁহার সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণতা এবং অহমিকার স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহাতে একদিকে যেমন দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা প্রমাণিত হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনি অসংখ্য নিরপরাধ হিন্দু ও মুসলমানের ধন ও প্রাণের সংহার সাধন করিয়া স্বাধীনতাকে অশ্রু ও রক্তে সিঞ্চিত করিয়াছিল। পাকিস্তানে অসংখ্য হিন্দুর এবং ভারতে অসংখ্য মুসলমানের অস্তিত্ব জিন্নাহ্-এর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ-বিভাগের মূল যুক্তিই নস্যাৎ করিয়া দিয়াছিল।

দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা

ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব, আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ এবং পূর্ববঙ্গ (বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ) লইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং ভারতের অবশিষ্টাংশ লইয়া ভারত রাষ্ট্র গঠিত হইল।

ভারত ও পাকিস্তান

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble of the Indian Constitution) : ভারতের সংবিধানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইনের বৈশিষ্ট্যের এক সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুকরণে ভারতের সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা সংযোগ করা হইয়াছে। প্রস্তাবনায় সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শ বর্ণিত আছে। প্রস্তাবনা যদিও সংবিধানের অঙ্গীভূত অংশ নহে, তথাপি উহার গুরুত্ব নেহাত কম নহে। এই প্রস্তাবনায় ভারতীয় সংবিধানের যে-উদ্দেশ্য ও আদর্শ বর্ণিত আছে, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সংবিধানের ধারা উপধারা ব্যাখ্যা করিবার সুবিধা হয়। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান সংশোধনে ভারত রাষ্ট্রকে একটি "সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

প্রস্তাবনার গুরুত্ব

প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, ভারতের সংবিধান ভারতের নাগরিকদিগকে (১) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়-বিচার, (২) চিন্তা, মতামত প্রকাশ, নিজের বিশ্বাস, নিজ ধর্ম অনুসরণ ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা, (৩) সামাজিক ক্ষেত্রে সম-মর্যাদা, সম-পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার দান করিতে দৃঢ়সংকল্প। ইহা ভিন্ন (৪) ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধ এবং সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে জাতিগত ঐক্য বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট।

সংবিধানের মূলনীতির বিশ্লেষণ

প্রস্তাবনা গভীরভাবে অনুধাবন করিলে কয়েকটি বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। যেমন, (১) ভারতের জনগণই হইল ভারত-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের উৎস। (২) ভারতীয় নাগরিক মাত্রেই সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমতা, ধর্ম, বৃত্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুসরণ এবং নিজ মত পোষণ ও প্রকাশের অধিকার সমানভাবে ভোগ করিবে। সরকার এই সকল অধিকার সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন। (৩) এই প্রস্তাবনার উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া হাইকোর্ট, বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ সংবিধানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিবেন। সংবিধান যাঁহারা রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা উপলব্ধি করিতে প্রস্তাবনার গুরুত্ব অত্যধিক বলা বাহুল্য। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ আরনেস্ট বার্কার এই প্রস্তাবনার মধ্যে আধুনিক উদার গণতন্ত্রের দার্শনিক বিধির উল্লেখের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রস্তাবনার গুরুত্ব

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (Chief Features of the Indian Constitution): ভারতীয় সংবিধানের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হইল ইহার বিশালতা। ৩৯৫টি ধারা এবং আটটি তফসিল সংবলিত ভারতের সংবিধান পৃথিবীর সংবিধানগুলির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৪৫ বার এই সংবিধান সংশোধন করা হইয়াছে। ফলে সংবিধানের কোন কোন ধারার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বাতিল, এক ধারার পরিবর্তে অন্য ধারা সংযোজিত হইয়াছে। তফসিলও আট হইতে নবটি হইয়াছে। এই সংবিধানে আমেরিকা, ইংলণ্ড, কানাডা, আয়র্লণ্ড অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা দেশের সংবিধানের কোন কোন বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হইয়াছে।

পৃথিবীর বিশালতম সংবিধান

দ্বিতীয়ত, ভারতের সংবিধান একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান। এই শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সর্বভারতীয় বিষয়াদি যেমন প্রতিরক্ষা, সেনা, নৌ ও বিমান বহর, যোগাযোগ, পররাষ্ট্রনীতি, মুদ্রাব্যবস্থা প্রভৃতি মোট ৯৭টি বিষয় কেন্দ্রীয় কর্তব্যাকার্যের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। রাজ্যগুলিকে রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, পুলিস, কৃষি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি মোট ৬৬টি বিষয় রাজ্যের কর্তব্যাকার্যের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ৪৭টি বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারেরই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল বিষয় যুগ্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List) রাজ্যতালিকা (State List) ও যুগ্ম-তালিকা (Concurrent List) এই তিন প্রকার তালিকা তৈয়ার করিয়া কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে। উদ্বৃত্ত সকল বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী রাখা হইয়াছে।

কেন্দ্র, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকা : শক্তিশালী কেন্দ্র

---

* বিভিন্ন সংশোধনের দ্বারা কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির কোন-কোনটিকে এক তালিকা হইতে অপর তালিকায় লওয়া হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক তালিকায় যে মোট সংখ্যক বিষয় ছিল তাহার সংখ্যা ৯৭, ৪৭ ও ৬৬ রাখা হইয়াছে। নূতন সংযোজনা (ক) (খ) এইভাবে দেখান হইয়াছে। **শিক্ষা ও জনসম্পদ রাজ্যতালিকা হইতে যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।**

তৃতীয়ত, ভারতের সংবিধান একটি লিখিত, অনমনীয় (Rigid) সংবিধান। ইহার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে হইলে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়। সাধারণ আইন-কানুন যে-ভাবে পাস করা হয় সেইভাবে ভারতের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা সম্ভব নহে। কিন্তু সংবিধানের কোন কোন অংশ আবার সাধারণ আইনের মতই পার্লামেণ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারে। এ-দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের সংবিধানকে আংশিকভাবে নমনীয় (flexible) বলা চলে।

লিখিত এবং অনমনীয়

আংশিকভাবে নমনীয়

চতুর্থত, ভারতের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতিকেই শাসনব্যবস্থার সর্বোপরি স্থাপন করা হইলেও এই সংবিধান রাষ্ট্রপতি-পদ্ধতির সংবিধান নহে। ইহা পার্লামেণ্টারী প্রথা অনুসরণ করিয়া চলে। রাষ্ট্রপতি নামেমাত্র সর্বময় কর্তা। প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত করা আছে।

পার্লামেণ্টারী বা শাসনব্যবস্থা

পঞ্চমত, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও মৌলিক কর্তব্য ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইলে সংবিধানে বর্ণিত উপায়ে উহার প্রতিকার করা চলে। জরুরী পরিস্থিতিতে অবশ্য রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখিতে হ্রাস করিতে পারেন।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার

ষষ্ঠত, ভারতীয় সংবিধানে ভারত রাষ্ট্রকে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে প্রভেদ করা হইবে না। ধর্মপালনে সকলেই সমান স্বাধীনতা ভোগ করিবে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি নানা ধর্ম নির্বিশেষে যোগ্যতা থাকিলে যে-কোন ব্যক্তি ভারতের সর্বোচ্চ পদে অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি-পদে পর্যন্ত আসীন হইতে পারিবে। ভারত একটি অ-সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র।

ধর্মনিরপেক্ষ অ-সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র

সপ্তমত, ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles) সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের প্রশাসকগণ এই সকল নীতি স্মরণ রাখিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। এই সকল নির্দেশমূলক নীতি অনুসরণের মাধ্যমেই ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করা চলিবে।

নির্দেশমূলক নীতি

অষ্টমত, সংবিধানে ভারত যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হইলেও জাতীয় বিপদে প্রয়োজনবোধে সংবিধানে বর্ণিত উপায়ে ভারতের শাসনব্যবস্থাকে এক-কেন্দ্রিক করা চলিবে।

প্রয়োজনবোধে এক-কেন্দ্রিক করা চলিবে

নবমত, ভারতের সংবিধান সর্বোচ্চ বিচারক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন, সংবিধানের বিশ্লেষণ, সংবিধান সংক্রান্ত বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষমতাও সুপ্রীম কোর্টকে দিয়াছে।

সুপ্রীম কোর্ট বিচার এবং সংবিধান সংক্রান্ত বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংবিধানের ৪২তম (১৯৭৬) সংশোধন দ্বারা নাগরিকদের কতকগুলি মৌলিক কর্তব্য নির্ধারিত করা হইয়াছে।

নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles) **:** ভারতের সংবিধানে শাসন-কার্যাদির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুসরণের জন্য কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতি সংযোজন করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল ভারতকে একটি জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। এই সকল নির্দেশমূলক নীতি যদি কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকার কার্যকরী না করেন তাহা হইলে কেহ আদালতে বিচারপ্রার্থী হইতে পারিবে না বটে, কিন্তু এই সকল নীতি রাষ্ট্র-কর্তব্যের পবিত্র নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি এই সকল নির্দেশমূলক নীতি মানিয়া চলিবে এই আশা সংবিধান রচয়িতাগণ পোষণ করিয়া এগুলিকে সংবিধানে সংযোজন করিয়াছেন।

নির্দেশমূলক নীতির উদ্দেশ্য

(১) নির্দেশমূলক নীতিতে প্রথমত বলা হইয়াছে যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারত রাষ্ট্রকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে। (২) জাতীয় সম্পদের ন্যায্য বণ্টন করিয়া ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য হ্রাস করিতে হইবে, স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলকেই সম-পরিমাণ কাজের জন্য সমান পরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে হইবে, শিশু ও যুবকদের শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে, বৃদ্ধদের পেনসন দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাতীয় সম্পদ যাহাতে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সঞ্চিত না হয়, সে-ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) শ্রমিকমাত্রেই যাহাতে জীবনধারণের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক পায়, উপযুক্ত পরিমাণ অবসর পায়, সেজন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা তাহাদিগকে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৪) দেশের সকলের জন্য কর্মসংস্থান, বেকার, পীড়িত, বৃদ্ধ ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের রাষ্ট্র হইতে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৫) সংবিধান চালু হইবার দশ বৎসরের মধ্যে কুটির-শিল্পের উন্নয়ন, চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। (৬) তফ্‌শীলভুক্ত ও অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের চেষ্টা করিতে হইবে। (৭) সকল নাগরিকের জন্য একই ধরনের আইন প্রয়োগ করিতে হইবে এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শাসনকার্য ও বিচারকার্য পৃথকীকৃত করিতে হইবে। (৮) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখা, পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ ও সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। (৯) গ্রাম পঞ্চায়েত স্থাপন করিয়া সেগুলি যাহাতে স্বয়ং-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। (১০) সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে ভারতীয় শিশুগণ যাহাতে স্বাধীন, সুস্থ ও মর্যাদাপূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকার এমন বিচার-ব্যবস্থা চালু করিবেন যাহাতে ন্যায্য-বিচার সকল নাগরিকই সমভাবে পাইতে পারে এবং বিশেষত, দারিদ্র্য যাহাতে ন্যায্য-বিচার লাভের অন্তরায় না হয় সেজন্য বিনা ব্যয়ে দরিদ্র নাগরিকগণ যাহাতে আইনের সাহায্য পাইতে পারে, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

নির্দেশমূলক নীতির ব্যাখ্যা

উপরি-উক্ত নির্দেশমূলক নীতি স্মরণ রাখিয়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার শাসন পরিচালনা এবং আইন প্রণয়ন করিবে। ভারত-রাষ্ট্রের সম্মুখে এই সকল নির্দেশমূলক নীতি কতকগুলি আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছে, যেগুলি অনুসরণ করিলে ভারত একটি অ-সাম্প্রদায়িক জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার নির্দেশমূলক নীতি স্মরণ রাখিয়া চলিবে

নির্দেশমূলক নীতি কার্যকরী করিতে গিয়া কোন গৃহীত আইন যদি কোন নাগরিকের ক্ষমতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার—এই কয়টি অধিকারের বিরোধীও হয় তাহা হইলেও উহা কোন বিচারালয় অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে না।

নির্দেশমূলক নীতি নাগরিক অধিকার অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ

ভারতের মৌলিক অধিকার কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে নাগরিক সংবিধানে বর্ণিত উপায়ে বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইতে পারিবে, কিন্তু নির্দেশমূলক নীতি লঙ্ঘিত হইলে আদালতে বিচারপ্রার্থী হওয়া চলে না। নির্দেশমূলক নীতি রাষ্ট্র কর্তব্যের নির্দেশ দিয়াছে, কোন নাগরিক অধিকার দেয় নাই, কিন্তু মৌলিক অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিক অধিকার। নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে ইহাই হইল পার্থক্য।

নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক অধিকারের পার্থক্য

সংবিধান সভা : সংবিধান রচনা (Constituent Assembly : Making of the Constitution) : ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই প্রাদেশিক আইন-সভার সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখ সংবিধান সভার অধিবেশন শুরু হইল। ১১ই ডিসেম্বর ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই সভার সভাপতি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন। সংবিধান রচনার দায়িত্ব যে-কমিটির উপর দেওয়া হইল উহার সভাপতি হইলেন ডক্টর আম্বেদকর।

সংবিধান সভার স্থায়ী সভাপতি-পদে নির্বাচিত হইয়া-ই (১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬) ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যত বাধা-বিপত্তিই থাকুক না কেন জনসাধারণের আস্থাভাজন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত গণ-পরিষদ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সার্বভৌম। কোন বহিঃশক্তি ইহার কার্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না বা ইহার সিদ্ধান্তের কোন প্রকার রদ-বদল করিতে পারিবে না।

সংবিধানসভার প্রথম অধিবেশন—রাজেন্দ্রপ্রসাদের ঘোষণা

ইহার দুই দিন পর (১৩ই ডিসেম্বর) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গণপরিষদের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এই প্রস্তাবে বলা হইল যে, গণপরিষদ ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic)-এ রূপান্তরিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে সংবিধান-প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছে। পূর্বেকার ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশসমূহ, দেশীয় রাজ্যগুলি এবং ভারতের অপরাপর অঞ্চলসমূহ যেগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে ইচ্ছুক তাহাদের লইয়া ভারতের প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র (Republic) গঠিত হইবে। প্রত্যেক অঞ্চলেরই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার থাকিবে। এই যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের

সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠনের আদর্শ গ্রহণ

ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। জনসাধারণের সকলে জাতি-ধর্ম-জন্মস্থান-নির্বিশেষে ন্যায়-বিচার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সমভাবে ভোগ করিবে। আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন পার্থক্য থাকিবে না। স্বমত-প্রকাশ, স্বাধীন চিন্তা, স্বধর্মের উপর বিশ্বাস ও ধর্মপালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সকলের থাকিবে। আইনসম্মতভাবে যে-কোন বৃত্তি বা পেশা গ্রহণ করা, সমবেত হওয়া প্রভৃতির অধিকার সকলেরই থাকিবে। সম্প্রদায়, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে। এই সকল উদার ও উন্নত নীতির উপর গঠিত ভারতের সাধারণতন্ত্র বিশ্বের দরবারে স্বীয় উপযুক্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করিবে এবং বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কল্যাণ-সাধনে এবং পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টায় যথাযথ অংশ গ্রহণ করিবে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি জওহরলালের এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য

তারপর দীর্ঘ তিন বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর স্বাধীন ভারতের সংবিধান গণপরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি নূতন সংবিধান অনুসারে ভারত 'ডোমিনিয়ন' হইতে এক সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইল। একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এই সংবিধান অনুসারে স্থাপিত হইল। 'ইউনিয়ন' অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও 'রাজ্য' অর্থাৎ আঞ্চলিক সরকার—এই দুই প্রকার শাসনের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারত-রাষ্ট্র গঠিত হইল।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি নূতন সংবিধানে ভারতবর্ষ সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত

নূতন সংবিধান : ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র : কেন্দ্রীয় সরকার (New Constitution : The Indian Union : Central Government) : ভারতের যুক্তরাষ্ট্র চারি প্রকার রাজ্য লইয়া গঠিত হইল। 'ক' পর্যায়ে স্থাপিত হইল আসাম, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পূর্ব-পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। 'খ' পর্যায়ে হায়দরাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যভারত, মহীশূর, পাতিয়ালা ও পূর্ব-পাঞ্জাব রাজ্যসমূহ, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও বিন্ধ্যপ্রদেশ স্থাপিত হইল। 'গ' পর্যায়ে রহিল আজমীর, ভোপাল, বিলাসপুর, কুর্গ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুর এবং ত্রিপুরা। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ লইয়া গঠিত হইল 'ঘ' পর্যায়ের রাজ্য।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশসমূহ

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (States Re-organisation Commission=SRC) গঠন করিয়া উহার সুপারিশ অনুসারে এবং ভারতীয় জনসাধারণের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাবশত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ-রাজ্যগুলির পুনর্বিন্যাস করেন। এ-বিষয়ে যদিও ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠনের কথা প্রথমে বলা হইয়াছিল, তথাপি কার্যক্ষেত্রে তাহা করা সম্ভব হয় নাই। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে যে রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাস করা হইল তাহাতে পূর্বেকার ক, খ, গ, ঘ, এই চারি প্রকার রাজ্যের ক্ষেত্র কেবল অঙ্গরাজ্য (Constituent States) এবং কেন্দ্র-শাসিত (Centrally

ক, খ, গ ও ঘ—চারি পর্যায়ের রাজ্য

Administered areas) বা ইউনিয়ন অঞ্চল—এই দুই প্রকার রাজ্য গঠন করা হইল। এগুলির মধ্যে সেই সময়ে মোট ১৪টি অঙ্গরাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছিল। পূর্বেকার ক, খ ও গ—এই তিন প্রকার রাজ্যের মধ্যে যে-পার্থক্য ছিল তাহা এখন বিলোপ করিয়া সব কয়টিকেই একই পর্যায়ে আনা হইল। পরবর্তী কালে এই পুনর্গঠনের কাজ আরও ব্যাপকভাবে করা হয় এবং বর্তমানে অঙ্গরাজ্যগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে মোট ২২টি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৯টি। ২২টি অঙ্গরাজ্যের নাম হইল : (১) অন্ধ্রপ্রদেশ, (২) আসাম, (৩) উড়িষ্যা, (৪) উত্তরপ্রদেশ, (৫) কেরালা, (৬) গুজরাট, (৭) জম্মু ও কাশ্মীর, (৮) নাগাভূমি, (৯) পশ্চিমবঙ্গ, (১০) বিহার, (১১) পাঞ্জাব, (১২) হরিয়ানা, (১৩) কর্ণটিক, (১৪) মহারাষ্ট্র, (১৫) তামিলনাড়ু, (১৬) রাজস্থান, (১৭) ত্রিপুরা, (১৮) মণিপুর, (১৯) হিমাচল প্রদেশ, (২০) মেঘালয়, (২১) মধ্যপ্রদেশ, ও (২২) সিকিম।

বর্তমানে ২২টি অঙ্গরাজ্য

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল : (১) আন্দামান-নিকোবর, (২) লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদ্বীপ (বর্তমানে এই সব কয়টির নাম দেওয়া হইয়াছে 'লাক্ষাদ্বীপ'), (৩) দিল্লী, (৪) চণ্ডীগড়, (৫) দাদরা ও নগর হাভেলি, (৬) গোয়া-দমন-দিউ, (৭) অরুণাচল, (৮) মিজোরাম ও (৯) পণ্ডিচেরি।

৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

রাজ্য পুনর্গঠন আইন দ্বারা প্রতিবেশী অঙ্গরাজ্যসমূহের এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পারস্পরিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সীমান্ত সংক্রান্ত সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য—এই পাঁচটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। উত্তরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইল : পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লী, চণ্ডীগড় ও হিমাচল প্রদেশ ; পূর্বাঞ্চলের—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা ; দক্ষিণাঞ্চলের—অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা ও পণ্ডিচেরি ; পশ্চিমাঞ্চলের—গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া-দমন-দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলি ; মধ্যাঞ্চলের—উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচল, নাগাভূমি, ত্রিপুরা ও মিজোরাম লইয়া উত্তর-পূর্ব আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়।

আঞ্চলিক পরিষদসমূহ

রাষ্ট্রপতি (President) : সমগ্র ইউনিয়নের সর্বোচ্চে স্থাপিত হইলেন একজন রাষ্ট্রপতি। ইনি পাঁচ বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্যবর্গ এবং রাজ্যসমূহের আইনসভার নির্বাচিত সদস্যবর্গ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। রাষ্ট্রপতি জাতির প্রতীকস্বরূপ। শাসনতন্ত্র অমান্য করিবার অপরাধে রাষ্ট্রপতিকে ইম্পীচ্ করা চলিবে। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন (১৯৭৬)। নামে রাষ্ট্রপতি হইলেও ভারতের রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় ক্ষমতার অধিকারী নহেন। তিনি ইংলন্ডের রাজা বা রাণীর ন্যায়, মন্ত্রিসভার মত কাজ করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু এক বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁহাকে নির্বাচন করা হয়। পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এজন্য একটি নির্বাচকমণ্ডলী বা Electoral College গঠন করা হয়। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সদস্যবৃন্দ এবং রাজ্যগুলির বিধানসভার সদস্যগণ এই নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য। তাঁহারা একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটদান পদ্ধতিতে ভোট দিয়া থাকেন (proportional representation by single transferable vote)।

রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন এবং তাঁহার পরামর্শক্রমে অপরাপর মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিবেন। মন্ত্রিসভা তাঁহাদের কার্যাদির জন্য কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবেন। রাষ্ট্রপতি আইনত

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

মন্ত্রিসভাকে যেমন নিযুক্ত করিতে পারেন তেমনি পদচ্যুতও করিতে পারেন। কিন্তু কার্যত মন্ত্রিসভার পশ্চাতে লোকসভার (House of the People) সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকিলে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে সম্ভব হয় না।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে পাঁচ ধরনের। যথা—(১) শাসন-সংক্রান্ত, (২) আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত, (৩) অর্থ-সংক্রান্ত, (৪) বিচার-সংক্রান্ত, এবং (৫) জরুরী ক্ষমতা।

শাসন-সংক্রান্ত বা কার্যনির্বাহক (Executive) বিভাগের সর্বোপরি হইলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার সুপারিশক্রমে অপরাপর মন্ত্রী নিয়োগ করেন. এবং সংবিধান-বিরোধী কাজ করিলে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারেন

শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা

এবং লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা বলে তিনি রাজ্যগুলির রাজ্যপাল, হাইকোর্টের বিচারপতি, ভারতের কম্পট্রোলার জেনারেল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, এ্যাটর্নি জেনারেল, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকেন। তিনি বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন এবং ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদিগকে পরিচয়পত্র দান করিয়া বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন। ভারতের শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামেই চলে।

স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ

আইনত রাষ্ট্রপতি ভারতের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ। অবশ্য তিনি এই সকল ক্ষমতা পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আন্দামান-নিকোবর, লাক্ষা দ্বীপ, দাদরা ও নগর হাভেলির শাসন পরিচালনা, শান্তিরক্ষা এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কার্যবিধি (Regulation) রাষ্ট্রপতি প্রণয়ন করেন। কেন্দ্রশাসিত

শাসন-সংক্রান্ত বিশেষ কতকগুলি ক্ষমতা

অঞ্চলের সংরক্ষিত ক্ষমতা (Reserved Powers) রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যকরী করা হয়। জরুরী অবস্থায় রাজ্যপালের প্রশাসনিক ব্যাপারে যে-কোন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করিতে পারেন।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বিশ্লেষণের প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁহার অনুমোদন ভিন্ন কোন আইনই বলবৎ হইতে

পারে না। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভার অধিবেশন আহবান করিতে, মুলতবী রাখিতে বা লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে এবং পুনরায় নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। পার্লামেন্টের প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতে রাষ্ট্রপতি তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় সেই অধিবেশনে সরকারের উদ্দেশ্য এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করেন। পার্লামেন্ট কোন বিল পাশ করিলে রাষ্ট্রপতি উহাতে নিজ স্বাক্ষর প্রদান করিয়া উহা আইন হিসাবে বলবৎ করিতে পারিবেন অথবা পার্লামেন্টের পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। পার্লামেন্ট অধিবেশনে না থাকিলে রাষ্ট্রপতি জরুরী আইন বা অর্ডিনান্স জারি করিতে পারেন। অবশ্য পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হওয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যে আইনে পরিণত করা না হইলে সেই অর্ডিনান্স বাতিল হইয়া যায়। রাষ্ট্রপতি লোকসভায় অনধিক দুইজন সদস্য এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্য হইতে মনোনীত করিতে এবং রাজ্যসভায় মোট ১২ জন সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। ইঁহারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া চাই।

আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা

অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা সম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ভিন্ন কোন বাজেট লোকসভায় উত্থাপন করা যায় না। কোন অনিশ্চিত আকস্মিক প্রয়োজনে ব্যয় করিবার প্রয়োজন হইলে 'অনিশ্চিত ব্যয় তহবিল' (Contingency Fund) হইতে রাষ্ট্রপতি ব্যয় করিবার অনুমতি দিতে পারেন। এই ধরনের ব্যয়ের জন্য পার্লামেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না।

অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা বাজেট পেশের সুপারিশ

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন কি অনুপাতে করা হইবে সেজন্য প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর রাষ্ট্রপতি 'অর্থ কমিশন' (Finance Commission) নামে একটি কমিশন সুপারিশ করিবার জন্য নিয়োগ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুসারে অর্থ কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী হইতে পারে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের হিসাব রক্ষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল গ্রহণ করিবেন, কিন্তু এ-বিষয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন হইবে।

অর্থ কমিশন নিয়োগের ক্ষমতা

বিচার ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড মকুব করিতে বা হ্রাস করিতে অথবা এক দণ্ডের পরিবর্তে অপর ধরনের দণ্ড দিতে পারেন। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও অনুরূপ ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করিতে পারেন। কোন ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অভিমত চাহিলে তাঁহারা সেই অভিমত দিতে বাধ্য।

বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা আছে। যুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ অথবা যুদ্ধ এবং বৈদেশিক আক্রমণের আশংকা অথবা অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আশংকা দেখা দিলে সেইরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রপতি "জরুরী পরিস্থিতি" (Emergency) ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে অঙ্গরাজ্যগুলির আইন প্রণয়ন ও শাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট ও সরকারের উপর বর্তাইবে। জরুরী পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি

জরুরী ক্ষমতা : জরুরী অবস্থা ঘোষণা

নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে বা হ্রাস করিতে পারেন। অবশ্য জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার স্থগিত তিনি রাখিতে পারিবেন না (৪৪তম সংশোধন, ১৯৭৮)। রাষ্ট্রপতি সমগ্র ভারত অথবা ভারতের যে-কোন একটি অংশের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন (৪২তম সংশোধন)।

আর্থিক জরুরী পরিস্থিতি ঘোষণা

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ পরিস্থিতি দেখা দিলে অথবা দেশের আর্থিক স্থায়িত্ব বিনাশপ্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে তাহা হইলে আথিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন। সমগ্র দেশ অথবা কোন এক অংশের ক্ষেত্রে এরূপ আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা তিনি করিতে পারেন। এইরূপ জরুরী পরিস্থিতি ঘোষণা করিলে তিনি ব্যয় সংকোচ এবং নানা বিষয়ে ব্যয় হ্রাস করিবার নির্দেশ দিতে পারেন। ইহা ভিন্ন, ব্যয়-সংক্রান্ত নানাবিধ বাধা-নিষেধ তিনি আরোপ করিতে পারিবেন।

উপরাষ্ট্রপতি: ভারতের সংবিধানে একজন উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। তিনি রাষ্ট্রপতির ন্যায় অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইবেন। তাঁহার বয়স অন্তত ৩৫ বৎসর এবং রাজ্যসভার সদস্য হইতে হইলে যে-যোগ্যতা থাকা দরকার তাহা তাঁহার থাকিতে

নির্বাচন ও যোগ্যতা

হইবে। নির্বাচনকালে তিনি কোন চাকরিতে নিযুক্ত থাকিতে বা কোন প্রকার অর্থাগম হয় সেইরূপ কোন কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের ভোটে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তিনি পার্লামেণ্টের উর্ধ্ব কক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভার সভাপতি পদাধিকার বলে লাভ করেন। রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্য ভোট দিয়া উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলে সেই প্রস্তাবে লোকসভা সম্মতি জানাইলে তাঁহাকে উপরাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত করা চলিবে।

উপ-রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতিত্ব ভিন্ন, পদত্যাগ, ইম্পিচমেণ্টের ফলে চ্যুতি অথবা মৃত্যুর ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে অস্থায়িভাবে রাষ্ট্রপতির কাজ করিয়া থাকেন। সেই সময়ে তিনি রাষ্ট্রপতির যাবতীয় ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন।

পার্লামেণ্ট (Parliament): কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট একটি দুই-কক্ষযুক্ত আইনসভা। ইহার উর্ধ্বকক্ষ রাজ্যসভা (Council of States) মোট ২৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত

পার্লামেণ্ট: উর্ধ্বকক্ষ রাজ্যসভা

হইবে। এই সকল সদস্যের ২৩৮ জন রাজ্য আইনসভাগুলির বিধানসভা (Legislative Assembly) দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। অবশিষ্ট ১২ জন যাঁহারা শিল্পকলা, বিজ্ঞান, জনকল্যাণমূলক কার্যাদিতে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন এইরূপ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন। এই সভাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার কোন প্রয়োজন হইবে না। প্রতি দুই বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পদত্যাগ করিবেন এবং নূতন সদস্য সেই সকল পদে নিযুক্ত হইবেন। রাজ্যসভার সদস্য পদপ্রার্থীকে ভারতের নাগরিক এবং অন্তত ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে।

নিম্নকক্ষ লোকসভা (House of the People) অঙ্গরাজ্য হইতে অনধিক পাঁচশত সদস্য এবং ইউনিয়ন অঞ্চল হইতে ২৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩১তম সংশোধন দ্বারা লোকসভার সদস্যসংখ্যা বাড়াইয়া অনধিক ৫৪৫ করা হইয়াছে। অঙ্গরাজ্যগুলি হইতে ৫২৪ জন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইতে ১৭ জন লোকসভায় নির্বাচিত হন। বিভিন্ন রাজ্যের ২১ বৎসর বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ ভোটারগণের প্রত্যক্ষ ভোটে এই সভার সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। প্রতি পাঁচ লক্ষ হইতে সাড়ে সাত লক্ষ লোক পিছু একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হইবেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর এই সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতনভাবে নির্বাচন করিতে হইবে। অবশ্য পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই এই সভা রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন। এই সভার কার্যাদি পরিচালনার জন্য একজন স্পীকার (Speaker) ও একজন সহকারী স্পীকার (Deputy Speaker) সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচন করিবেন। অর্থবিল (Money Bill) একমাত্র নিম্নকক্ষেই উত্থাপন করা চলিবে। অপরাপর বিল (Bill) যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা চলিবে। কিন্তু এই সকল বিল যদি এক কক্ষে পাস হওয়ার পর অপর কক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ করিয়া আইন অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যান করিবেন। অর্থবিলের ক্ষেত্রে উপর্বকক্ষের মতামতের তেমন মূল্য নাই। কারণ উহার আপত্তি থাকিলে অর্থবিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিয়া আইনে পরিণত হইবে। পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইলেই বলবৎ হইতে পারিবে। তিনি আইন স্বাক্ষর করিয়া বলবৎ করিতে পারিবেন, ভিটো করিতে পারিবেন বা নিজ মন্তব্যসহ পুনরায় বিবেচনার জন্য পার্লামেণ্টের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু পার্লামেণ্ট পুনরায় এই বিল পরিবর্তিত কিংবা অপরিবর্তিত ভাবে পাস করিলে, রাষ্ট্রপতি উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। পার্লামেণ্টের ক্ষমতার মধ্যে সংবিধান সংশোধন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিবার অধিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নিম্নকক্ষ লোকসভা

ইউনিয়ন পার্লামেণ্টের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা

রাজ্যসরকার : রাজ্যপাল (State Government : Governor) : কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্বোপরি যেমন রাষ্ট্রপতি আছেন, তেমনি রাজ্যশাসন ব্যবস্থার সর্বোপরি থাকেন রাজ্যপাল বা গভর্ণর। রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে পাঁচ বৎসরের জন্য নিয়োগ করেন। অবশ্য একই রাজ্যপালকে তাঁহার কার্যকালের মেয়াদ শেষে পুনর্নিয়োগ করিবার কোন বাধা নাই। সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে পদচ্যুত করিতে পারেন। রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হইতে হইলে তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিক এবং অন্তত ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে।

রাজ্যপাল : তাঁহার নিয়োগ-পদ্ধতি ও যোগ্যতা

রাজ্যপাল রাজ্যের শাসনব্যবস্থার নিয়মতান্ত্রিক সর্বোচ্চ শাসক (Constitutional Head)। শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা বলে তিনি রাজ্যের আইনসভার নিম্ন কক্ষের অর্থাৎ বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার সুপারিশক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন।

শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা

ইহা ভিন্ন, রাজ্যের এড্‌ভোকেট জেনারেল, পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যবর্গ, উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন। মন্ত্রিসভা সংবিধান ভঙ্গ করিলে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইবার পরও পদত্যাগ না করিলে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁহার সম্মতিসূচক স্বাক্ষর ভিন্ন কোন আইন আইনসভা কর্তৃক পাস হইলেও বলবৎ হইবে না। আইনসভা কর্তৃক গৃহীত বিল রাজ্যপাল স্বাক্ষর করিয়া আইনে পরিণত করিতে পারেন, আইনসভার পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন।

রাজ্যপালের আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতা

কোন আইন রাজ্যপাল আইনসভার নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইলে উহা পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত অবস্থায় পুনরায় পাস করিয়া আইনসভা রাজ্যপালের নিকট প্রেরণ করিলে রাজ্যপাল উহা স্বাক্ষর করিতে বাধ্য। রাজ্যপালের সুপারিশ ভিন্ন কোন অর্থবিল আইনসভায় উত্থাপন করা যায় না। কোন কোন রাজ্যে ঊর্ধ্বকক্ষ বিধান পরিষদও আছে। অর্থাৎ কোন কোন রাজ্যের আইনসভা বিধান পরিষদ ও বিধানসভা—এই দুই কক্ষ লইয়া গঠিত। পশ্চিমবঙ্গে বিধান পরিষদ উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যে-রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে সেখানে রাজ্যপাল সাহিত্য, সমাজসেবা ও সংস্কৃতিতে অবদান আছে এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে কয়েকজন সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। কতজনকে মনোনীত করিবেন তাহা বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা আছে। আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে রাজ্যপাল জরুরী আইন বা অর্ডিনান্স পাস করিতে পারেন।

বিধান পরিষদে সদস্য মনোনয়ন

বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা

বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতা বলে রাজ্যপাল কোন কোন ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ মকুব করিতে, হ্রাস করিতে পারেন।

রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হইলে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নিকট রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়া রিপোর্ট প্রেরণ করিতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন স্থাপন করা যাইতে পারে। রাজ্যের অভ্যন্তরে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রশাসন রাজ্যপালের ইচ্ছানুক্রমে চলে, এজন্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নহে।

বিশেষ ক্ষমতা

রাজ্য মন্ত্রিসভা (State Ministry): কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ পদ্ধতি রাজ্যের মন্ত্রিসভা নিয়োগেও অনুসরণ করা হইয়া থাকে। এখানে রাষ্ট্রপতির স্থলে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভা নিয়োগ করেন। বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে অথবা কোয়ালিশন দলের নেতাকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশক্রমেই অন্যান্য মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি রাজ্যপাল ও মন্ত্রিসভার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলেন। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন, মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করা, মন্ত্রিসভার শাসন-সংক্রান্ত ও আইন-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবহিত রাখা মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য। রাজ্যপাল নিজে কোন বিষয়ে কিছু জানিতে চাহিলে মুখ্যমন্ত্রী সে-বিষয়ে তথ্যাদি রাজ্যপালকে জানাইতে বাধ্য।

মন্ত্রিসভার কর্তব্য ও দায়িত্ব

রাজ্যপালের সুপারিশ অনুসারে মুখ্যমন্ত্রী কোন কোন বিষয় মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য উত্থাপন করেন। মন্ত্রিসভা তাহাদের কাজের জন্য প্রত্যেকে পৃথকভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে বিচারসভার নিকট দায়ী থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী যে-কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে বলিতে পারেন বা পদচ্যুত করিতে পারেন। তাঁহার পদচ্যুত করিবার সরাসরি ক্ষমতা অবশ্য নাই। মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাজ্যপাল মন্ত্রীর পদত্যাগ গ্রহণ করিতে এবং পদচ্যুত করিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। মন্ত্রিসভার যে-কোন একজন মন্ত্রী অথবা সমগ্র মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতনভাবে নির্বাচনের আদেশ জারি করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীর এবং রাজ্যের মন্ত্রিসভা কেন্দ্রের মন্ত্রিসভার ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

রাজ্য আইনসভা (State Legislature): রাজ্যের আইনসভা বিধান পরিষদ (Legislative Council) ও বিধানসভা (Legislative Assembly) লইয়া গঠিত।

আইনসভা : বিধান পরিষদ ও বিধানসভা

বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, বিহার মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত অপরাপর রাজ্যে বিধান পরিষদ নাই। রাজ্য বিধানসভার মোট সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য এবং উপস্থিত সদস্য দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে বিধান পরিষদ বিলোপের প্রস্তাব পাস হইলে বিধানসভা বাতিল করা যায়। অবশ্য পার্লামেণ্ট কর্তৃক ইহা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

বিধান পরিষদ উর্ধ্বকক্ষ (Council of State i.e. the Upper House): কোন অঙ্গরাজ্যেরই বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪০ জনের কম এবং বিধানসভার সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না। বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, জেলা পরিষদ প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান-

সদস্যসংখ্যা—নির্বাচন ও মনোনয়ন পদ্ধতি

গুলির সদস্যদের দ্বারা, এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা, এক-দ্বাদশাংশ স্নাতকদের দ্বারা এবং অপর এক-দ্বাদশাংশ শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। অবশিষ্ট সংখ্যক সদস্যপদ সমাজসেবা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি সমবায় আন্দোলন প্রভৃতি [illegible] ক্ষেত্রে বিশেষ [illegible] আছে এইরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইবেন। বিধান পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করিবেন। বিধান পরিষদের সদস্য প্রার্থীকে [illegible] ভারতের নাগরিক এবং অন্ততঃ ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে।

বিধান পরিষদে কোন অর্থ [illegible] উত্থাপন করা যায় না। [illegible] অবশ্য উত্থাপন

বিধান পরিষদের আইন পাসের ক্ষমতা

[illegible] বিধানসভা কর্তৃক [illegible] বিধান পরিষদের [illegible] করিতে হয় [illegible] নিম্নকক্ষ অর্থাৎ [illegible] যে পদ্ধতিতে বিল পাস করিয়া থাকে ঠিক অনুরূপ পদ্ধতিতে উহা [illegible] করিতে পারে বা উহা বিধানসভার নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য

প্রেরণ করিতে পারে। বিধান পরিষদ কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা যাইতে পারে। বিধান পরিষদ কখনও ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। ইহা একটি স্থায়ী সভা। ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর পদত্যাগ করেন এবং সেই শূন্য পদ নূতন সদস্য দ্বারা পূরণ করা হয়।

বিধানসভা বা নিম্নকক্ষ (Legislative Assembly i.e the Lower House) : বিধানসভা রাজ্য আইনসভার প্রকৃত ক্ষমতাশালী সভা। বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৬০-এর কম এবং ৫০০-এর বেশি হইবে না। তবে সংবিধানে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, সিকিমের বিধানসভার সদস্যসংখ্যা হইবে ৩০ (বর্তমান ৩২) এবং নাগাভূমির বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৪৬ হইবে। একুশ বৎসর বয়স্ক নরনারীর ভোটে রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা অথবা কোয়ালিশন দলের নেতাকে

সদস্যসংখ্যা নির্বাচন পদ্ধতি

মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। বিধানসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার অর্থাৎ সভাপতি ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করেন। স্পীকার বিধানসভার কার্যাদি পরিচালনা করেন।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

বিধানসভা রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়গুলি এবং যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করেন। যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত আইন যদি কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের বিরোধী হয় তাহা হইলে বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত আইন নাকচ হইয়া যাইবে। বিধানসভা অর্থবিল উত্থাপন করিবার একমাত্র অধিকারী। বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত আইন বিধান পরিষদ কর্তৃক পাস করা হইলে উহা যখনই রাজ্যপালের স্বাক্ষর লাভ করিবে তখনই উহা আইন হিসাবে বলবৎ হইবে। পার্লামেন্টারী রীতি অনুসারে বিধানসভা মন্ত্রিসভাকে উহার কার্যকলাপ সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া সরকারের উপর পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ চালু রাখে। বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা মন্ত্রিসভার পশ্চাতে না থাকিলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। বিধানসভায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইলে অথবা অর্থবিল বা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিল বিধানসভা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। বিধানসভার কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বৎসর। এই কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের পরামর্শ রাজ্যপালকে দিলে বিধানসভা রাজ্যপাল ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।

বিধানসভার ক্ষমতা

ইউনিয়ন অঞ্চল বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (Union Territories or Centrally Administered Territories) : কেন্দ্রশাসিত প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য রাষ্ট্রপতি একজন প্রশাসক (Administrator) নিয়োগ করেন। এই প্রশাসক চীফ কমিশনার বা লেফটেন্যান্ট গভর্ণর পদমর্যাদাসম্পন্ন হইয়া থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের উপর পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসনভার রাষ্ট্রপতি ন্যস্ত করিয়া থাকেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসনকার্যের জন্য প্রশাসক রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কোন কোনটিতে মন্ত্রিসভা

মন্ত্রিসভা, আইনসভাহীন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

আইনসভা নাই। যেমন আন্দামান-নিকোবর, লাক্ষাদ্বীপ, দাদরা ও নগর হাভেলি। এগুলির সুষ্ঠু শাসন, শান্তি বজায় রাখা ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রপতি কার্যবিধি (Regulations) পাস করিয়া থাকেন। যে-সকল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আইনসভা আছে, যেমন পণ্ডিচেরি, দিল্লী, মিজোরাম, গোয়া-দমন-দিউ প্রভৃতি সেগুলির আইনসভা কোন কারণে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে রাষ্ট্রপতি সেগুলির পরিচালনার জন্য রেগুলেশন প্রস্তুত করিতে পারেন। আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে প্রশাসক জরুরী আইন—অর্থাৎ অর্ডিনান্স জারি করিতে পারেন।

আইনসভা ও মন্ত্রিসভা সহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

পার্লামেন্ট প্রয়োজন মনে করিলে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হাইকোর্ট স্থাপন করিতে অথবা সেই অঞ্চলের বিচারালয়কে হাইকোর্টের মর্যাদায় উন্নীত করিতে পারে। অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের বিচার ক্ষমতাও প্রয়োজন বোধে পার্লামেন্ট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রসারিত করিতে পারে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হাইকোর্ট-এর ব্যবস্থা

ভারতের বিচারব্যবস্থা (Indian Judicial System): সুপ্রীম কোর্ট: ভারতের বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে রহিয়াছে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট। প্রথমে একজন প্রধান বিচারপতি ও ৭ জন অপরাপর বিচারপতি লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইয়াছিল। পরে পার্লামেন্ট আইন পাস করিয়া বিচারপতি-সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছে। বর্তমানে একজন প্রধান বিচারপতি এবং ১৭ জন অপরাপর বিচারপতি মোট ১৮ জন লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অপরাপর বিচারপতি নিয়োগ করেন। অপরাপর বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি-পদে নিয়োগের যোগ্যতা হইল অন্ততঃ (১) ভারতের নাগরিক হওয়া চাই, (২) অন্তত দশ বৎসর এ্যাডভোকেট হিসাবে অথবা পাঁচ বৎসর কোন হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকিতে পারিবেন। অবশ্য ইহার পূর্বে তাঁহারা পদত্যাগ করিতে অথবা অসদাচরণের অভিযোগে তাঁহাদের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে কোন প্রস্তাব পাস হইলে পদচ্যুত হইতে পারিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি: প্রধান বিচারপতি ও ১৭ জন অপরাপর বিচারপতি

বিচারপতি হইবার যোগ্যতা

সুপ্রীম কোর্ট মৌলিক বিচার ক্ষমতা বলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে, বা এক ও অপর রাজ্য, অথবা একাধিক রাজ্য ও অপর এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের বিচার করিতে পারে। সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত বিচার সুপ্রীম কোর্ট সরাসরি করিতে পারে। কারণ সুপ্রীম কোর্ট হইল সংবিধানের সংরক্ষক ও বিশ্লেষক।

মৌলিক বিচার ক্ষমতা

আপীল বিচারের দিক দিয়া সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান-সংক্রান্ত আপীল, ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের বিরুদ্ধে আপীল শুনিতে পারে। কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতার প্রশ্নের বিচার সুপ্রীম কোর্ট মোট সাতজন বিচারপতি লইয়া গঠিত বেঞ্চের মাধ্যমে শুনিতে পারে। জাতীয়

আপীল বিচার ক্ষমতা: (১) শাসনতান্ত্রিক

স্বার্থবিরোধী কাজকর্মের জন্য ধৃত এবং আটক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পরওয়ানা (writ) জারি করিয়া সেই আটক আইনসম্মত কিনা বিচার করিয়া দেখিতে পারে।

(২) ফৌজদারী

কোন ফৌজদারী মামলায় হাইকোর্ট যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে, এই ব্যাপারে জড়িত আইনের প্রশ্ন সুপ্রীম কোর্টে বিচারযোগ্য তাহা হইলে সেই মামলা সুপ্রীম কোর্ট শুনিতে পারে। ইহা ভিন্ন, নিম্ন আদালতে খালাস পাইবার পর যদি হাইকোর্টে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় অথবা হাইকোর্ট নিজ ক্ষমতা বলে নিম্ন আদালত হইতে কোন মামলা উঠাইয়া লইয়া উহার বিচারে যদি প্রাণদণ্ড দেয়, তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে।

(৩) দেওয়ানী

দেওয়ানী মামলায় হাইকোর্ট এই মর্মে যদি সার্টিফিকেট দেয় যে, উহাতে জটিল আইনের প্রশ্ন জড়িত আছে, সে-বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টে বিচার হওয়া উচিত, তাহা হইলে সেই মামলার আপীল সুপ্রীম কোর্ট শুনিয়া থাকে।

বিশেষ ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি কোন সংবিধানগত বা আইন-সংক্রান্ত কোন পরামর্শ বা মতামত সুপ্রীম কোর্টের নিকট চাহিলে সুপ্রীম কোর্ট তাহা দিতে বাধ্য। নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হইলে সুপ্রীম কোর্ট আদেশ, নির্দেশ বা পরোয়ানা জারি করিতে পারে।

হাইকোর্ট (High Court) : ভারতের সংবিধানে বলা আছে যে, ভারতের অঙ্গরাজ্য মাত্রেই একটি করিয়া হাইকোর্ট থাকিবে। অবশ্য পার্লামেন্ট প্রয়োজনবোধে একাধিক রাজ্যের জন্য অথবা একাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য একই হাইকোর্টের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। ভারতে বর্তমানে ২২টি অঙ্গরাজ্যের জন্য ১৭টি এবং দিল্লীর জন্য একটি হাইকোর্ট আছে। গোয়া-দমন-দিউ'র জন্য হাইকোর্টের পরিবর্তে একজন 'জুডিশিয়েল কমিশনার' (Judicial Commissioner) নিয়োগ করা হইয়াছে। সব কয়টি হাইকোর্টের বিচারপতি সংখ্যা অবশ্য এক নহে। তবে প্রত্যেক হাইকোর্টে একজন করিয়া প্রধান বিচারপতি এবং কয়েকজন অপরাপর বিচারপতি আছেন। ইঁহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

হাইকোর্ট—মোট সংখ্যা

প্রধান বিচারপতি ও অপরাপর বিচারপতি

বিচারপতি নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা

হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইতে হইলে অন্তত দশ বৎসর হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট অথবা বিচারকের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বিচারপতি-পদপ্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে এবং তাঁহারা একবার নিযুক্ত হইলে ৬২ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিচারক-পদে আসীন থাকিতে পারিবেন। অবশ্য ইহার পূর্বেই তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পদত্যাগ করিতে পারিবেন অথবা অসদাচরণের অভিযোগে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাস করা প্রস্তাবক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদচ্যুত হইতে পারেন।

হাইকোর্টের মৌলিক বিচার ক্ষমতা এবং আপীল বিচার ক্ষমতা—উভয় প্রকার বিচার ক্ষমতা আছে। পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক পরিমাণ অর্থের মামলা সরাসরি হাইকোর্টে করা চলে। মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হইলে হাইকোর্ট সরাসরি মামলার বিচার করিতে এবং আদেশ-নির্দেশ বা পরোয়ানা জারি করিতে পারে। নিম্ন আদালত হইতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার আপীল হাইকোর্টে করা চলে।

মৌলিক ও আপীল বিচার ক্ষমতা

নিম্ন বিচারালয়সমূহ (Lower Courts) : হাইকোর্টের অধীনে জেলাজজের আদালত, সাবজজের আদালত, মুন্সেফী আদালত প্রভৃতি বিভিন্ন নিম্ন পর্যায়ের আদালত আছে। জেলাজজ দেওয়ানী ও ফৌজদারী বা দায়রা (Sessions) বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত। সাবজজদের দেওয়ানী বিচার ক্ষমতা আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সাবজজকে দায়রা বিচারের ক্ষমতাও দেওয়া হয়। সাবজজের আদালত হইতে জেলাজজের আদালতে আপীল করা চলে। সাবজজের নীচে মুন্সেফী আদালত দেওয়ানী ছোট মামলার ভারপ্রাপ্ত। মুন্সেফের আদালত হইতে সা জজের আদালতে আপীল করা চলে। ফৌজদারী বিচার কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী এলাকায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট্ ও অপরাপর ম্যাজিস্ট্রেট্ করিয়া থাকেন। জেলা ও মহকুমায় সেই কাজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট্ প্রভৃতি ফৌজদারী বিচার করিয়া থাকেন। ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা আছে। সেই অনুযায়ী তাঁহাদের বিচার ক্ষমতারও তারতম্য রহিয়াছে। কলিকাতা সিটি সিভিল কোর্ট কলিকাতার বিভিন্ন এলাকার দেওয়ানী বিচার করিয়া থাকে।

জেলাজজ

সাবজজ

মুন্সেফ্

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট্ ও অপরাপর ম্যাজিস্ট্রেট্

সিটি সিভিল কোর্ট

গ্রামাঞ্চলের ন্যায় পঞ্চায়েৎ বা পঞ্চায়েৎ আদালত এক বা একাধিক গ্রামের ছোট ছোট মামলা-মকদ্দমার বিচার করিয়া থাকে। এইভাবে ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থা সর্বনিম্ন স্তর গ্রাম পঞ্চায়েৎ হইতে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত ক্রম পর্যায়ে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রসারিত।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা-বণ্টন (Distribution of powers between the Union and the States) : কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা-বণ্টন শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এজন্য তিনটি পৃথক তালিকা রচনা করা হইয়াছে, যথা : কেন্দ্রীয় বা ইউনিয়ন তালিকা (Union List), রাজ্য তালিকা (State List) ও যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। ইউনিয়ন তালিকার প্রতিরক্ষা, পরিবহন, সংযোগ ব্যবস্থা, বৈদেশিক নীতি, যুদ্ধ, শান্তি, মুদ্রাব্যবস্থা, বাণিজ্য প্রভৃতি মোট ৯৭টি বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন কেন্দ্রীয় সরকার করিবেন। রাজ্য তালিকার জেলখানা, বিচার, শিক্ষা, রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা বনসম্পদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত আইন-প্রণয়ন এবং যাবতীয় দায়িত্ব সংক্রান্ত

ইউনিয়ন তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা

মোট ৬৬টি রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। যুগ্ম-তালিকার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন-কানুন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমিক সঙ্ঘ প্রভৃতি মোট ৪৭টি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্যসরকার আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। কিন্তু এ-বিষয়ে উভয় সরকার-ই আইন প্রণয়ন করিলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন রাজ্যসরকারের আইনের উপর স্থান পাইবে। রাজ্য সরকারগুলি তাঁহাদের কার্য-সম্পাদনে এবং আইন প্রণয়নে কেন্দ্রীয় আইনের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া চলিবেন।

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights of the Indian Citizens): ভারতীয় শাসনতন্ত্রে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকল নাগরিককেই কতকগুলি মৌলিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে। নাগরিক মাত্রেরই (১) আইনের চক্ষে সমতা, (২) সম্পত্তি ক্রয়, ভোগদখল ও বিক্রয় করিবার স্বাধীনতা, (৩) স্বমত প্রকাশের এবং স্বধর্ম পালনের ও প্রচারের স্বাধীনতা, (৪) অবৈধভাবে গ্রেপ্তার অথবা বিনা-বিচারে দণ্ডিত না-হওয়ার স্বাধীনতা, (৫) যে-কোন আইনসম্মত বৃত্তি গ্রহণ এবং আইনসম্মতভাবে সমবেত হইবার স্বাধীনতা, (৬) নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বাধীনতা, (৭) দেশের এক স্থান হইতে অপর স্থানে অবাধ গমনাগমনের স্বাধীনতা এবং যে-কোন স্থানে বসবাসের স্বাধীনতা, এবং (৮) সংবিধানে বর্ণিত উপায়ে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে উহার প্রতিকারের অধিকার আছে। কেবলমাত্র জরুরী পরিস্থিতি বিবেচনায় রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে এই সকল মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখিতে পারিবেন। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইবে না স্থির হইয়াছে। সাধারণ আইনবিধি দ্বারা এই অধিকার নিয়ন্ত্রিত হইবে। অবশ্য বে-আইনীভাবে কাহাকেও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

বিভিন্ন ধরনের অধিকার

মৌলিক কর্তব্য (Fundamental Duties): সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে ভারতীয় নাগরিকদের কতকগুলি মৌলিক কর্তব্য সংযোগ করা হইয়াছে। এইগুলি হইল: (১) প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে ভারতের সংবিধান, সংবিধানের আদর্শ, সংবিধানে সন্নিবিষ্ট সকল সংস্থার প্রতি, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হইবে। (২) স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে যে-সকল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আন্দোলনকারিগণ অগ্রসর হইয়াছিলেন সেগুলি শ্রদ্ধা সহকারে পোষণ করিতে হইবে। (৩) ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব, সংহতি, অখণ্ডতা ধারণ ও সংরক্ষণ প্রতি ভারতীয় নাগরিককে করিতে হইবে। (৪) দেশরক্ষা ও দেশ সেবার জন্য প্রয়োজনবোধে বিনা দ্বিধায় অগ্রসর হইতে হইবে। (৫) জাতি ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক বা দলগত বৈষম্য বা বৈচিত্র্যের ঊর্ধ্বে থাকিয়া ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়িয়া তুলিতে সকল নাগরিককে সচেষ্ট হইতে হইবে। (৬) ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও উহা সংরক্ষণ প্রত্যেককে করিতে হইবে। (৭) জাতীয় বনসম্পদ, জাতীয় পরিবেশ, নদী, হ্রদ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণীর প্রতি সমবেদনশীল হইতে হইবে। (৮) বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি, মানবিক ও অনুসন্ধিৎসার মনোবৃত্তি এবং সংস্কারমূলক কাজের আগ্রহ প্রত্যেকের অন্তরে জাগাইয়া

ভারতীয় নাগরিক মাত্রেরই মৌলিক কর্তব্যসমূহ

তুলিতে হইবে। (৯) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা এবং হিংসার মনোভাব পরিত্যাগ করা সকলের পবিত্র কর্তব্য হইবে। (১০) জাতীয় জীবনের প্রত্যেক স্তরে চরম উৎকর্ষ সাধন, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে কার্য সম্পাদনে সচেষ্ট হইতে হইবে, যাহার ফলে জাতি হিসাবে ভারতবাসী উচ্চতর প্রচেষ্টায় ও উৎকর্ষ সাধনে সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হয়।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা (The National Flag of India) : স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার ক্রমবিকাশের একটি সুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে যখন সমগ্র ভারতে এক প্রবল জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়, তখন ভারতের বাহিরে ভারতীয়দের উপরও উহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। সেই সময়ে কয়েকজন দেশাত্মবোধসম্পন্ন প্যারিস-প্রবাসী ভারতবাসী এক সভায় যোগদান করিতে গিয়া দেখিলেন যে, অপরাপর সকল দেশেরই জাতীয় পতাকা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের সেইরূপ কোন জাতীয় পতাকা নাই। তখন তাঁহারা প্যারিসেই ভারতের জাতীয় পতাকার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। এইভাবে ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকার জন্ম হইয়াছিল (১৯০৬)। প্রথমেই এই পতাকায় গৈরিক, সাদা ও সবুজ এই তিনটি রং-এর তিনটি সমান অংশকে সমান্তরালভাবে সাজাইয়া উপরের গৈরিক অংশে আটটি তারা, মধ্যের সাদা অংশে হিন্দি ভাষায় 'বন্দে মাতরম্' এবং নিম্নের সবুজ অংশে বামে একটি সূর্য এবং দক্ষিণে চাঁদ অঙ্কিত ছিল। এই জাতীয় পতাকাটি ফ্রান্সের প্রবাসী ভারতীয়গণই ব্যবহার করিতেন।

১৯০৬ খ্রীঃ ভারতের জাতীয় পতাকার জন্ম

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এ্যানি বেসান্ত ভারতের স্বায়ত্তশাসনের জন্য (Home Rule) আন্দোলন শুরু করিলে ভারতের একটি জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করা হয়। ইহার মধ্যে চারখণ্ড লাল এবং তিনখণ্ড সবুজ রংয়ের কাপড় সমান্তরাল-ভাবে সাজান ছিল। বামে উপর দিকে ছিল ব্রিটিশ জাতীয় পতাকা —ইউনিয়ন জ্যাক্। নীচে ছিল সপ্তর্ষিমণ্ডলের আকারে সাজান সাতটি তারা।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের পরিকল্পিত পতাকা

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস কর্তৃক একটি জাতীয় পতাকা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পর বৎসর নিজেই উপরে সাদা, মধ্যে সবুজ ও নীচে লাল এই তিন রংয়ের একটি পতাকা প্রস্তুত করেন। পতাকার মধ্যস্থলে ছিল একটি চরকার ছাপ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসাবে সাদা অংশ, মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসাবে সবুজ অংশ, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য লাল অংশ এবং জাতীয় উন্নয়নের প্রতীক হিসাবে চরকার ছাপ—জাতীয় পতাকার এই ব্যাখ্যা মহাত্মা গান্ধী দিয়াছিলেন। জাতীয় পতাকা খদ্দর দ্বারা নির্মাণের নির্দেশও মহাত্মা গান্ধীই দিয়াছিলেন।

১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক পরিকল্পিত পতাকা

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় পতাকা কিরূপ হওয়া উচিত সে-বিষয়ে বিচার-বিবেচনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সমগ্র পতাকাটি গৈরিক হইবে এবং উহার বামদিকে উপরে একটি চরকার ছাপ থাকিবে বলিয়া সুপারিশ করেন। কিন্তু এই পতাকা দেশের সর্বত্র অনুমোদিত না হওয়ার ফলে ঐ বৎসরই আলাপ-আলোচনার পর একখানি তিন রংয়ের পতাকা-ই গৃহীত হয়। এই পতাকার উপরাংশ গৈরিক, মধ্যের অংশ সাদা ও নীচের অংশ সবুজ—এবং মধ্যস্থলে একটি চরকার ছাপ ছিল। ইহাই বর্তমানে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই পতাকার-ই সামান্য পরিবর্তন করিয়া—অর্থাৎ মধ্যস্থলে চরকার পরিবর্তে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের 'ধর্মচক্র-প্রবর্তন'-এর চক্রটির ছাপ দেওয়া হইল। ইহার রঙ গাঢ় নীল (Navy blue)। এই পতাকা-ই বর্তমানে আমাদের জাতীয় পতাকা। এই পতাকা-ই ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই গণপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ভারত সরকারের প্রতীক হিসাবে রাজর্ষি অশোকের সারনাথ স্তম্ভশীর্ষ গৃহীত হইয়াছে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে পতাকার পরিবর্তন কিন্তু অনুমোদনের অভাবে নূতন পতাকার পরিকল্পনা

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের গণ-পরিষদে জাতীয় পতাকার স্বরূপ গৃহীত জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা

সরকারী প্রতীক চিহ্ন

ভারতের জাতীয় পতাকার তাৎপর্য হইল নিম্নলিখিত রূপ: উপরের গৈরিক রঙ ত্যাগ ও নির্ভীকতা, মধ্যের সাদা রঙ শান্তি ও সত্যের এবং নীচের সবুজ রঙ শৌর্য ও বিশ্বাসের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত। মধ্যস্থলে চব্বিশটি পাখি-যুক্ত (Spoke) অশোক চক্রটি ন্যায়, ধর্ম ও অগ্রগতির প্রতীক। ইহার রঙ গাঢ় নীল। পতাকাটির তিন রঙের তিনটি অংশ সমান। ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হইল ৩ : ২ অর্থাৎ তিন মিটার লম্বা হইলে ২ মিটার চওড়া হইতে হইবে।

ভারতের জাতীয় পতাকার রঙের তাৎপর্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র

C. U. Questions (Pass)

1. Critically discuss the process of the decline of the Mughal power in India since 1707.
2. Describe the expansion of the Maratha power under the first three Peshwas.
3. Give a brief account of the Anglo-French struggle in the Deccan. Why did the French fail in the struggle ?
4. What was the importance of the Third Battle of Panipat (1761) ?
5. What led to the introduction of the Permanent Settlement in Bengal ? Assess its impact on the social and economic life in Bengal.
6. Trace the growth of Sikh power under Ranjit Singh.
7. Write a short account of the introduction of Western education in India and its impact on Indian society.
8. Do you agree with the view that the Revolt of 1857 was the first Indian War of Independence ? Give reasons for your answer.
9. Assess the contributions of Raja Ram Mohan Roy and Iswar Chandra Vidyasagar to the making of Modern Bengal.
10. What where the reforms of Lord Ripon ?
11. Discuss the historical importance of the 'Swadeshi' movement.
12. Review the role of Mahatma Gandhi in India's Freedom movement.
13. Stat briofly the attempts made to transfer power in India during the period 1942-47. Account for this transfer of power.

১ ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতে মুঘলশক্তির অবনতির সমালোচনামূলক বিবরণ লেখ।

২. প্রথম তিনজন পেশওয়ার নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির বিস্তার বর্ণনা কর।

৩ দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই সংঘর্ষে ফরাসীদের পরাজয়ের কারণ কি ?

৪ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের (১৭৬১) গুরুত্ব কি ছিল ?
৫. বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইল কেন ? বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব নির্ণয় কর।
৬ রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখশক্তির অগ্রগতি বর্ণনা কর।
৭. ভারতে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তন এবং ভারতীয় সমাজে তাহার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সংক্ষেপে লেখ।
৮. ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ কি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলিয়া মনে কর ? উত্তরের সমর্থনে কারণ উল্লেখ কর।
৯. আধুনিক বাঙালীর জীবনে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান নিরূপণ কর।
১০. লর্ড রিপনের সংস্কারগুলি কি কি ছিল ?
১১. স্বদেশী আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।
১২. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা পর্যালোচনা কর।
১৩. ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। ইহার কারণ নির্ণয় কর।

---

1. State briefly the effects of the foreign invasions of the Mughal empire in India in the days of its decline scince 1707.
2. Trace the rise of the English power in Bengal from the battle of Plassey to the battle of Buxar.
3. Explain the causes of the failure of the Marathas to establish their empire in India after the fall of the Mughal power.
4 What were the circumstances which led to the Grant of Diwani ? Assess its historical significance.
5. Revise briefly the condition of trade and industry in the days of the East India Company.
6. Write an account of the social reforms and religious movements in India in the 9th century.
7. Assess the role of Sir Syed Ahmad Khan in Indian Politics.
8. Discuss the foreign policy of Lord Curzon.
9. Why was the civil disobedience movement launched by Mahatma Gandhi ? How far was he successful ?
10. Review the role of Netaji Subhaschandra in India's Freedom movement.

১. ভারতের ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতির যুগে ইহার উপর বৈদেশিক আক্রমণের ফলাফল সংক্ষেপে বিবৃত কর।
২. পলাশীর যুদ্ধ হইতে বক্সার-এর যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলায় ইংরাজ শক্তির অভ্যুত্থানের কাহিনী লেখ।
৩. মুঘলশক্তির পতনের পর ভারতে সাম্রাজ্যস্থাপনে মারাঠাদের ব্যর্থতার কারণগুলি বুঝাইয়া বল।
৪ কিরূপ পরিস্থিতিতে 'দেওয়ানী' অর্পণ করা হয়? ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ণয় কর।
৫. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতে বাণিজ্য ও শিল্পের অবস্থা সংক্ষেপে পর্যালোচনা কর।
৬ উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে সমাজ সংস্কার এবং ধর্ম আন্দোলন হইয়াছিল তাহার বিবরণ লেখ।
৭. ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ-এর ভূমিকা নির্ণয় কর।
৮. লর্ড কার্জনের বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।
৯ মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন কেন প্রবর্তন করেন? এ-ক্ষেত্রে তিনি কতদূর সফল হইয়াছিলেন?
১০ ভরতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা পর্যালোচনা কর।

---

1. Answer any *fifteen* questions :

a. When and in which battle in India were the french finally defeated by the English ?

b. Who were the first three Peshwahs ?

c. In which year and from whom did the English East India Company receive the Diwani ?

d. Name the title of the book writen by Bankimchandra which contains an account of the famine of 1770.

e. Who was the first Chief Justice of the Supreme Court at Calcutta ? Which prominent Indian did he sentence to death ?

f. Mention the names of any two of the founders of the Hindu College.

g. Name some leaders of the 'Young Bengal' movement.
h. Who was Sir Charles Wood ? Why is he famous ?
i. Who was Tantiya Topi ? Why is he remembered ?
j Which book depicts the oppression of the Indigo planters ? Who was its author ?
k. Name two secret societies formed by the 'revolutionaries' of Bengal.
l When and under whose orders was the Jalianwalabagh massacre carried out ?
m. When did the Khilafat movement begin ? Name one of its leaders.
n. Who is called the 'Frontier Gandhi' ? How were his followers called ?
o. When and between whom was the Poona Pact concluded ?
p. Who became the President of the Congress at Tripuri ? Whom did he defeat in the presidential election.
q. In which year was the Pakistan resolution first adopted ? Where was the session of the Muslim League held ?
r. What was the exact date of 'Quit India' movement ?
s. What was the "Cripps Mission" ?
t. Name the first and last Governor-Generals of India.
2. Review briefly the circumstances which led to the Third Battle of Panipat. Assess its significance.
3. Give an account of the administrative and revenue reforms of Warren Hastings.
4. Discuss the impact of the Permanent Settlement on the social and economic life in Bengal.
5. State briefly how Lord Dalhousie extended British power in India. Do you consider him responsible for the Revolt of 1857 ?
6. Write a short essay on the introduction of Western education in India.
7. What led to the foundation of the Indian National Congress ? How did it later develop into a militant organisation ?
8. What led to the Partition of Bengal in 1905 ? Indicate its importance in Indian history.

১. যে-কোন পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও :—
ক. ভারতে ফরাসীরা ইংরাজদের নিকট কবে কোন্ যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় ?
খ. প্রথম তিন পেশোয়ার নাম লিখ।
গ. ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী কত খ্রীষ্টাব্দে কাহার নিকট হইতে দেওয়ানী লাভ করিয়াছিলেন ?

ঘ. বঙ্কিমচন্দ্রের কোন্ গ্রন্থে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের বর্ণনা আছে তাহার নাম উল্লেখ কর।

ঙ. কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন? কোন্ প্রসিদ্ধ ভারতীয়কে তিনি প্রাণদণ্ড দেন?

চ. হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে যে-কোন দুইজনের নাম লিখ।

ছ. 'ইয়ং বেঙ্গলের' কয়েকজন নেতার নাম কর।

জ. স্যার চার্লস্ উড কে ছিলেন? তিনি কিসের জন্য বিখ্যাত?

ঝ. তাণ্ডিয়া তোপী কে? কি জন্য তিনি স্মরণীয়?

ঞ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী কোন্ গ্রন্থে চিত্রিত হয়? গ্রন্থকারের নাম কি?

ট. বাংলায় বিপ্লবীদের সংগঠিত দুইটি গুপ্ত সমিতির নাম লিখ।

ঠ. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কবে কাহার আদেশে অনুষ্ঠিত হয়?

ড. খিলাফৎ আন্দোলন কখন হইয়াছিল? ঐ আন্দোলনের একজন নেতার নাম উল্লেখ কর।

ঢ. কাহাকে 'সীমান্ত গান্ধী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে? তাঁহার অনুগামীরা কি নামে পরিচিত?

ণ. 'পুণাচুক্তি' কোন্ সময়ে কাহাদের মধ্যে সম্পাদিত হয়?

ত. ত্রিপুরী কংগ্রেসে কে সভাপতি হন? নির্বাচনে তিনি কাহাকে পরাস্ত করেন?

থ. পাকিস্তান প্রস্তাব কত খ্রীষ্টাব্দে প্রথম গৃহীত হয়? মুসলিম লীগের সেই অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল?

দ. 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সঠিক তারিখ লিখ।

ধ. 'ক্রীপ্‌স্ মিশন' বলিতে কি বোঝ?

ন. ভারতের প্রথম ও শেষ—এই দুইজন গভর্ণর-জেনারেলের নাম কি?

২. কিরূপ পরিস্থিতিতে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে পর্যালোচনা কর। ইহার গুরুত্ব নির্ণয় কর।

৩. ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসন এবং রাজস্ব বিষয়ক সংস্কারের বিবরণ দাও।

৪. বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব আলোচনা কর।

৫. কিভাবে লর্ড ডালহৌসি ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য সম্প্রসারণ করেন সংক্ষেপে বিবৃত কর। তুমি কি মনে কর ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের জন্য তিনি দায়ী?

৬. ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখ।

৭. ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রথমে কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়? পরে ইহা কিরূপে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল?

৮. ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কি কারণে বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যবস্থা হয়? ভারত ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব নিরূপণ কর।

Group A

1. Answer any *fifteen* questions :

i. Who was the last Sikh Guru ? Who established the 'Khalsa' among the Sikhs ?

ii. Who are known as Sayyid brothers in Indian history ?

iii. When and between whom was the Battle of Buxar fought ?

iv. When did the 'Sannyasi Rebellion' take place ? What is the title of Bankimchandra's book which contains an account of it ?

v. When was the policy of introducing English education accepted in India ?

vi. Who were Dalhousie's opponents in the battle of Chilianwala ?

vii. Where did the wahabi movement originate ? Who first started it in India ?

viii. Name four principal leaders of the Indian Revolt of 1857.

ix. When and where did 'Indigo Revolt' take place ?

x. Who was the last Mughal emperor of India ? Where did he meet his end ?

xi. Who were the sponsors of the 'Hindu Mela' ?

xii. Who was Ilbert ? What was the main purpose of the Ilbert Bill ?

xiii. When was the Indian National Congress established ? Who was its first President ?

xiv. Name any two books written by Swami Vivekananda.

xv. In which year was the first Partition of Bengal effected under British rule ? Who was then the Government of India ?

vvi. By whom was the Muslim League founded and when ?

xvii. Why was the 'Rowlatt Act' passed ?

xviii. Who was the leader of the initial phase of the national movement in the Punjab ?

xix. Who first organise the Azad Hind Fauj ? When did Netaji become its Commander-in-Chief.

xx. Who was Lord Pethick-Lawrence. In which connection did he come to India ?

Group B

Answer any *four* questions :

2. What led Ahmad Shah Abdali to invade India? Bring out its significance.
3. What part did Clive play in the establishment of British rule in India?
4. Give a critical account of the administrative and judicial reforms of Cornwallis.
5. Review briefly the impact of British rule on trade and industry in India.
6. Give a short account of the social reform movements in India in the nineteenth century. Assess the role of Raja Rammohan Roy in this connection.
7. Write a short note on the 'Swadeshi movement.' Explain its historical importance.
8. State briefly the attempts made to transfer power in India during the period 1942-47.

বিভাগ 'ক'

১. যে-কোন পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

ক. শেষ শিখগুরু কে ছিলেন? কাহার দ্বারা শিখদের মধ্যে 'খালসা' প্রবর্তিত হয়?

খ. ভারতের ইতিহাসে কাহারা সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় নামে অভিহিত?

গ. কবে এবং কাহাদের মধ্যে বক্সারের যুদ্ধ হইয়াছিল?

ঘ. 'সন্ন্যাসীবিদ্রোহে'র সময়কাল মোটামুটি কি? বঙ্কিমচন্দ্রের যে গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে তাহার নাম কি?

ঙ ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের নীতি কবে গৃহীত হইয়াছিল?

চ. চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ডালহৌসির শত্রুপক্ষ কাহারা ছিল?

ছ. ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত কোথায় হয়? ভারতবর্ষে কে প্রথম ইহা শুরু করেন?

জ. ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বিদ্রোহের চারজন প্রধান নায়কের নাম লিখ।

ঝ. "নীল বিদ্রোহ" কবে এবং কোথায় কোথায় হইয়াছিল?

ঞ. ভারতের শেষ মুঘল সম্রাট কে ছিলেন? কোথায় তাঁহার জীবনের অবসান ঘটে?

ট. হিন্দুমেলার প্রবর্তক কাহারা ছিলেন?

ঠ ইলবার্ট কে ছিলেন? ইলবার্ট বিলের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল?

ড ভারতে জাতীয় কংগ্রেস কখন স্থাপিত হয় ? ইহার প্রথম সভাপতি কে ছিলেন ?
ঢ. স্বামী বিবেকানন্দ রচিত যে-কোনো দুইখানা গ্রন্থের নাম লিখ ?
ণ ব্রিটিশ শাসনে কত খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যবস্থা হয় ? তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল কে ছিলেন ?
ত. মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা করেন কে ? কোন্ সময়ে ?
থ রাওলাট আইন কেন প্রবর্তন করা হয় ?
দ. জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে পাঞ্জাবে কে নেতৃত্ব দেন ?
ধ আজাদ হিন্দ্ ফৌজ প্রথমে কাহার দ্বারা গঠিত হয় ? নেতাজী কখন ইহার সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন ?
ন. লর্ড পেথিক-লরেন্স কে ? কি প্রসঙ্গে তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন ?

বিভাগ "খ"

যে-কোনো **চারিটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

২ আহম্মদ শাহ আবদালি কেন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ? ইহার গুরুত্ব নিরূপণ কর।
৩ ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপনে ক্লাইভের ভূমিকা আলোচনা কর।
৪ কর্ণওয়ালিশ-প্রবর্তিত প্রশাসন ও বিচার সংক্রান্ত সংস্কারের সমালোচনামূলক বিবরণ দাও।
৫ ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পের উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব সংক্ষেপে পর্যালোচনা কর।
৬ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সমাজসংস্কার আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা নির্ণয় কর।
৭. 'স্বদেশী আন্দোলনে'র উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝাইয়া বল।
৮. ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

Group A

1. Answer any *fifteen* questions :
   i. What is meant by 'Khalsa' ? Who established the 'Khalsa' among the Sikhs ?
   ii. Where did Nadir Shah come from ? When did he invade India ?
   iii. Write the names of the first three Peshwas.

iv. In which year did the East India Company acquire the "Diwani"? What were its results?
v. Name the founder of the Asiatic Society. What was the main object behind the foundation of the Society?
vi. What was the object of the School Book Society?
vii. Why is Derozio remembered?
viii. Who was the first Governor-General of India? Mention two of his principal reforms.
ix. When and between whom was the Battle of Chilianwala fought?
x. Who was Tantiya Topi? Why is he famous?
xi. Who is the author of 'Nil Darpan'? What is its subject-matter?
xii. When did the Santal Revolt take place? Name two of its principal leaders.
xiii. Who was the first President of the Indian National Congress? Where was that session of the Congress held?
xiv. Why is Jalianwalabag remembered?
xv. What did the Khilafat movement aim at?
xvi. What was the programme of the Civil Disobedience Movement?
xvii. Who is known as 'Mastarda'? In what connection have you heard of him?
xviii. Name two chief exponents of 'Oriental Art.'
xix. What major resolution did the Lahore Session of the Muslim League (1940) adopt?
xx. Mention the names of two leaders of the Azad Hind Fauj.

Group B

Answer any *four* questions

2. Account for the decline of the Mughal power in India since 1707.
3. Analyse the significance of the reforms of Warren Hastings.
4. Analyse the main causes of the downfall of the Maratha power?
5. Write an account of the social reform and religious movements in India in the 19th century.
6. Review briefly the reforms of Lord Ripon.
7. Assess the role of Sir Syed Ahmed Khan in Indian Politics.
8. Analyse the background to the foundation of the Congress (1885). Account for the origins of "csetremism" in the Congress.
9. State briefly the role of Mahatma Gandhi in India's Freedom Movement.

বিভাগ 'ক'

১. যে-কোনো **পনেরটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :—

ক. 'খালসা' বলিতে কি বোঝায় ? কে শিখদের মধ্যে 'খালসা' প্রবর্তন করেন ?

খ. নাদির শাহ কোথা হইতে আসিয়াছিলেন ? কবে তিনি ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ?

গ. প্রথম তিনজন পেশোয়ার নাম লিখ।

ঘ. কোন্ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে ? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল ?

ঙ. এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে ? এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল ?

চ. 'স্কুল বুক সোসাইটি'র লক্ষ্য কি ছিল ?

ছ. ডিরোজিও কি জন্য স্মরণীয় ?

জ. ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেলের নাম কি ? তাঁহার দুইটি প্রধান সংস্কারের উল্লেখ কর।

ঝ. কবে এবং কাহাদের মধ্যে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ হইয়াছিল ?

ঞ. তান্তিয়া তোপী কে ? তিনি কি জন্য বিখ্যাত ?

ট. 'নীলদর্পণ' কে রচনা করেন ? ইহার বিষয়বস্তু কি ?

ঠ. সাঁওতাল বিদ্রোহ কবে হইয়াছিল ? ইহার প্রধান দুইজন নেতার নাম কর।

ড. ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন ? কংগ্রেসের সেই অধিবেশন কোথায় হইয়াছিল ?

ঢ. জালিয়ানওয়ালাবাগ কি কারণে স্মরণীয় ?

ণ. খিলাফৎ আন্দোলনের লক্ষ্য কি ছিল ?

ত. আইন অমান্য আন্দোলনের কি কর্মসূচী ছিল ?

থ. 'মাষ্টারদা' কে ? কি প্রসঙ্গে তাঁহার কথা শুনিয়াছ ?

দ. 'প্রাচ্যকলায়' দুইজন বিখ্যাত প্রবক্তার নাম লিখ।

ধ. লাহোর অধিবেশনে (১৯৪০) মুসলিম লীগ কি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল ?

ন. আজাদ হিন্দ ফৌজের দুইজন নায়কের নাম উল্লেখ কর।

বিভাগ 'খ'

যে-কোন **চারিটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

২. ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতে মুঘলশক্তির অবনতির কারণ নির্ণয় কর।

৩. ওয়ারেন হেষ্টিংসের সংস্কারগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৪. মারাঠা শক্তির পরাজয়ের প্রধান কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

৫. উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে সমাজ সংস্কার এবং ধর্ম আন্দোলন হইয়াছিল তাহার বিবরণ লিখ।

৬. লর্ড রিপণের সংস্কারগুলি সংক্ষেপে পর্যালোচনা কর।
৭. ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ-এর ভূমিকা নিরূপণ কর।
৮. কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার ( ) পটভূমিকা আলোচনা কর। কংগ্রেসে 'চরম-পন্থা'র উদ্ভব কেন হইয়াছিল ?
৯. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

Group A

1. Answer *any ten* questions :

i. What does 'Hindu Pad-Padshahi' mean ?

ii. What was the significance of the Battle of Buxar ?

iii. Where did the Wahabi movement originate ? Who first started it in India ?

iv. Indicate the major effects of the Famine of 1770.

v. What does the 'Permanent Settlement' (1793) mean ?

vi. Why was the College at Fort William established ? Why was it so named ?

vii. What does 'Young Bengal' mean ? Name some of its leaders.

viii. What is 'Indigo Revolt' ? What were its effects ?

ix. Name four leaders of the religious reform movements in India in the second half of the 19th century.

x What were the aims of the Aligarh movement ?

xi. What were the major aims of the Swadeshi movement ?

xii. Why was the 'Rowlatt Act' passed ?

xiii. Who formed the Swarajya Party ? What were their main odjectives ?

xiv. When was the Gandhi-Irwin pact signed ? What were its main provisions ?

xv. When and why did the Cripps Mission come to India ?

Group B

Answer *any five* questions.

2. State briefly the effects of foreign invasions on the Mughal empire in India in the days of its decline since 1707.
3. Trace the rise of the English power in Bengal from the battle of Plassey to the battle of Buxar. Analyse the causes of the English success.

4. What were the consequences of the Third Battle of Panipat ?
5. What were the circumstances that led to the grant of Diwani ? Assess its historical significance.
6. Review briefly the condition of trade and industry in India in the days of the English East India Company.
7. Assess the contributions of Raja Ram Mohun Roy and Iswar Chandra Vidyasagar to the making of Modern Bengal.
8. Trace the growth of the Sikh power under Ranjit Singh. Give a short account of his administrative system.
9. Why was the civil disobedience movement launched by Mahatma Gandhi ? How far was he successful ?
10. Write a short account of Peasant movements in India in the 19th century.

বিভাগ 'ক'

১. যে-কোন **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :—

ক. 'হিন্দু পাদ-পাদশাহী' বলিতে কি বোঝায় ?

খ. বক্সারের যুদ্ধের তাৎপর্য কি ?

গ. ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্রপাত কোথায় হয় ? ভারতবর্ষে কে প্রথম ইহা শুরু করেন ?

ঘ. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রধান ফলাফলগুলির উল্লেখ কর।

ঙ. 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলিতে কি বোঝায় ?

চ. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় ? কেন ইহার ঐরূপ নামকরণ করা হয় ?

ছ. "ইয়ং বেঙ্গল" বলিতে কি বোঝায় ? ইহার কয়েকজন নেতার নাম কর।

জ. 'নীলবিদ্রোহ' বলিতে কি বোঝায় ? ইহার প্রধান ফল কি হইয়াছিল ?

ঝ. ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের চারজন নেতার নাম কর।

ঞ. আলিগড় আন্দোলনের লক্ষ্য কি ছিল ?

ট. স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্যগুলি কি ছিল ?

ঠ. রাওলাট আইন কেন প্রবর্তন করা হয় ?

ড. 'স্বরাজ্য পার্টি' কাহারা গঠন করেন ? তাঁহাদের মূল লক্ষ্য কি ছিল ?

ঢ. গান্ধী-আরউইন চুক্তি কবে হইয়াছিল ? ইহার প্রধান সর্তগুলি কি ছিল ?

ণ. 'ক্রিপস মিশন' কবে এবং কি উদ্দেশ্যে ভারতে আসিয়াছিল ?

বিভাগ 'খ'

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :—

২. ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতির যুগে ভারতের উপর বৈদেশিক আক্রমণের ফলাফল সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৩. পলাশী হইতে বক্সার-এর যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলার ইংরাজশক্তির অভ্যুত্থানের কাহিনী বর্ণনা কর। ইংরাজদের সাফল্যের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

৪. তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর।

৫. কিরূপ পরিস্থিতিতে দেওয়ানী অর্পণ করা হয়? ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ণয় কর।

৬. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতে বাণিজ্য ও শিল্পের অবস্থা সংক্ষেপে পর্যালোচনা কর।

৭. আধুনিক বাংলার গঠনে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান নিরূপণ কর।

৮. রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখশক্তির অগ্রগতি বর্ণনা কর। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৯. মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন কেন প্রবর্তন করেন? এক্ষেত্রে তিনি কতদূর সফল হইয়াছিলেন।

১০. ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে কৃষক আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী লেখ।

Group—A

1. (i) Who were known as Sayyid Brothers in the Mughal period ? Why were they called 'king-makers' ? (ii) How did the Third Battle of Panipath affect the Marathas ? (iii) Name the first English newspaper of India. Who founded it and when ? (iv) Who started the Ferazee movement ? What were its objectives ? (v) What is 'Doctrine of Lapse' ? Name three States where the Doctrine was applied by Lord Dalhousie ? (vi) What were the political ideas of Sir Syed Ahmad Khan ? (vii) What did the Ilbert Bill seek to do ? (viii) When and why was the 'Carlyle Circular' issued ? (ix) Name two secret societies formed by the revolutionaries in Bengal. (x) What did the Khilafat movement aim at ? (xi) Who were the founders of the two Home Rule Leagues ? (xii) Who were the parties to the Poona Pact ? What were its main provisions ?

(xiii) What is the significance of the Lahore session of the Muslim League (March, 1940)? (xiv) When did Subhaschandra Bose escape from India? How was the Azad Hind Fouz formed? (xv) Who were the members of the Cabinet Mission? Why did they come to India?

Group—B

2. Review the internal causes of the decline of the Mughal Empire in India after 1707.

3. What led to the Battle of Plassey? Analyse the significance of the battle.

4. Discuss, in brief, the land revenue policies of Warren Hastings and Lord Cornwallis.

5. Write a note on the effects of Lord Wellesley's wars and diplomacy.

6. Give an account of the spread of English education during the 19th century. What were its effects on Indian society?

7. Account for the failure of the Revolt of 1857. Should it be regarded as the first war of Indian Independence?

8. Give an account of the religious reform movements in India during the 19th century.

9. What led to the growth of the Swadeshi movement. Assess its historical significance.

10. Sketch briefly the history of India's struggle for freedom during the Second World War.

গ্রুপ—এ

১। যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :—

(ক) মোগল যুগে কারা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত ছিলেন? তাঁদের কেন 'রাজ-স্রষ্টা' বলা হয়? (খ) মারাঠা শক্তির উপর পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের প্রভাব আলোচনা কর। (গ) ভারতের প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্রের নাম লেখ। এটি কে এবং কবে প্রতিষ্ঠা করেন? (ঘ) ফরাজী আন্দোলনের সূত্রপাত কে করেন? এর উদ্দেশ্য কি ছিল? (ঙ) "স্বত্ববিলোপ নীতি" কাকে বলে? এমন তিনটি রাজ্যের নাম কর যেখানে ডালহৌসী এ নীতি প্রয়োগ করেছিলেন। (চ) স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা কি ছিল? (ছ) "ইলবার্ট" বিলের উদ্দেশ্য কি ছিল? (জ) "কার্লাইল সার্কুলার" কবে ও কেন জারী করা হয়? (ঝ) বাংলায় বিপ্লবীদের দুটি গুপ্ত সমিতির নাম লেখ। (ঞ) খিলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি ছিল? (ট) দুটি হোমরুল লীগ কারা স্থাপন করেন? (ঠ) পুনাচুক্তি কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়? এর মূল সর্ত কি ছিল? (ড) মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের

(মার্চ, ১৯৪০) তাৎপর্য কি ? (চ) সুভাষচন্দ্র বসু কবে ভারত থেকে পালিয়ে যান ? কি ভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়েছিল ? (ণ) "মন্ত্রী মিশন"-এর সভ্য কারা ছিলেন ? তাঁরা কেন ভারতে আসেন ?

গ্রুপ—বি

যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের পর মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির আভ্যন্তরীণ কারণ বিবৃত কর।

৩। পলাশীর যুদ্ধ কি কারণে ঘটেছিল ? এই যুদ্ধের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৪। ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিশের ভূমিরাজস্ব-নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। লর্ড ওয়েলেসলীর কূট রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহের ফল সম্বন্ধে একটি টীকা লিখ।

৬। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসারের বিবরণ দাও। ভারতীয় সমাজে এদের ফলাফল কি হয়েছিল ?

৭। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় কর। একে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যায় কি ?

৮। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনগুলির বিবরণ দাও।

৯। স্বদেশী আন্দোলন কিভাবে গড়ে ওঠে ? এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিরূপণ কর।

১০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

Group—A

1. (i) What does 'Hindu Pad-Padshahi' mean ?

(ii) Who granted the Dewani to the English East India Company ? What were its effects ?

(iii) Who were the parties to the Treaty of Seringapatam (1792) ? What was its significance ?

(iv) What do you mean by the 'Cornwallis Code' ? Mention some of its principal aspects.

(v) Who founded the Brahmo Sabha ? When and why was it founded ?

(vi) Who was Sir Charles Wood ? Why is he famous ?

(vii) Who started the Hindu Mela and when ? What were its aims ?

(viii) What do you know about Titu Mir?

(ix) Who passed the 'Vernacular Press Act'? What were its main provisions?

(x) Name two exponents of 'Oriental Art'. Briefly indicate their ideals?

(xi) Who were the founders of the 'Prarthana Samaj' and the 'Arya Samaj'? Why were the two 'Samaj's founded?

(xii) When and whom was the Muslim League founded?

(xiii) Why was the Swarajya party founded?

(xiv) Who organised the "Khuda-i-Khidmatgar"? Mention some of its principal activities.

(xv) What was the background to the Naval Revolt (1946).

Group—B

2. Analyse the main causes of the decline of the Mughal Empire after 1707.

3. Briefly review the Anglo-French rivalry in the Deccan. Account for the failure of the French.

4. Why did the Marathas fail to build up their political supremacy in India after the collapse of the Mughal Empire.

5. Attempt a critical estimate of the roles played by Raja Rammohan and Pandit Iswar Chandra Vidyasagar in the social reform movement in India in the 19th century.

6. Give a brief account of Ranjit Singh's relations with the English. Why did the Sikh state rapidly decline after his death?

7. Write an essay on the rapid growth of the British Empire in India under Lord Dalhousie.

8. Estimate the part played by Mahatma Gandhi in the Non-cooperation and the Civil Disobedience movements

9. Review the plans made during the period 1942-'47 for effecting 'Transfer of Power'.

10. Discuss the impact of British rule on the trade and industry of India.

গ্রুপ—এ

১। যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও :—

(ক) 'হিন্দু পদ পাদশাহি' বলিতে কি বোঝায়?

(খ) ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কে দেওয়ানী দান করেন? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল?

(গ) শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি (১৭৯২) কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়? ইহার গুরুত্ব কি ছিল?

(ঘ) "কর্ণওয়ালিশ কোড" বলিতে কি বোঝায়? ইহার প্রধান কয়েকটা দিকের উল্লেখ কর।

(ঙ) ব্রাহ্মসভা কে প্রতিষ্ঠা করেন? কবে এবং কেন ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়?

(চ) স্যার চার্লস উড কে ছিলেন? তিনি কেন বিখ্যাত?

(ছ) হিন্দুমেলা কাহারা এবং কবে প্রচলন করেন? ইহার উদ্দেশ্য কি ছিল?

(জ) তিতু মীর সম্বন্ধে কি জান?

(ঝ) 'দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন' কে পাশ করেন? ইহার প্রধান সর্তগুলি কি?

(ঞ) 'প্রাচ্যকলা'র দুইজন প্রবক্তার নাম লেখ। সংক্ষেপে তাঁহাদের মতাদর্শের পরিচয় দাও।

(ট) "প্রার্থনা সমাজ" ও "আর্য সমাজ" কাহারা প্রতিষ্ঠা করেন? এই দুইটি সমাজের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি ছিল?

(ঠ) মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা কবে এবং কেন হইয়াছিল?

(ড) 'স্বরাজ্য পার্টি' কেন স্থাপিত হইয়াছিল?

(ঢ) "খুদা-ই-খিদমতগার" কে গঠন করেন? ইহার কয়েকটি প্রধান কার্যাবলীর উল্লেখ কর।

(ণ) ভারতীয় নৌ-বিদ্রোহের (১৯৪৬) পটভূমিকা কি ছিল?

গ্রুপ—বি

প্রশ্নগুলির মান সমমূল্যের

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের পর মোগল সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

৩। দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। ফরাসীরা ব্যর্থ হইয়াছিল কেন?

৪। মোগল শক্তির পতনের পর ভারতে রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনে মারাঠাদের ব্যর্থতার কারণ কি?

৫। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকার মূল্যায়ন কর।

৬। ইংরেজ শক্তির সহিত রণজিৎ সিংহের সম্পর্ক সংক্ষেপে বর্ণনা কর। তাঁহার মৃত্যুর পর শিখ সাম্রাজ্যের দ্রুত পতনের কারণ কি?

৭। লর্ড ডালহৌসীর আমলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখ।

৮। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৯। ১৯৪২ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা-গুলির পর্যালোচনা কর।

১০। ভারতে বাণিজ্য ও শিল্পের উপর বৃটিশ শাসনের প্রভাব আলোচনা কর।